প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৭ । বইমেলা ১৯৯১

সর্বস্বত্ব : কৌশল্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্গসজ্জা : কৌশল্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার । টেক্নোপ্রিণ্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৬

অনুবাদকের উৎসর্গ

সুখময় চক্রবর্তীর স্মরণে

ললিতাদিকে

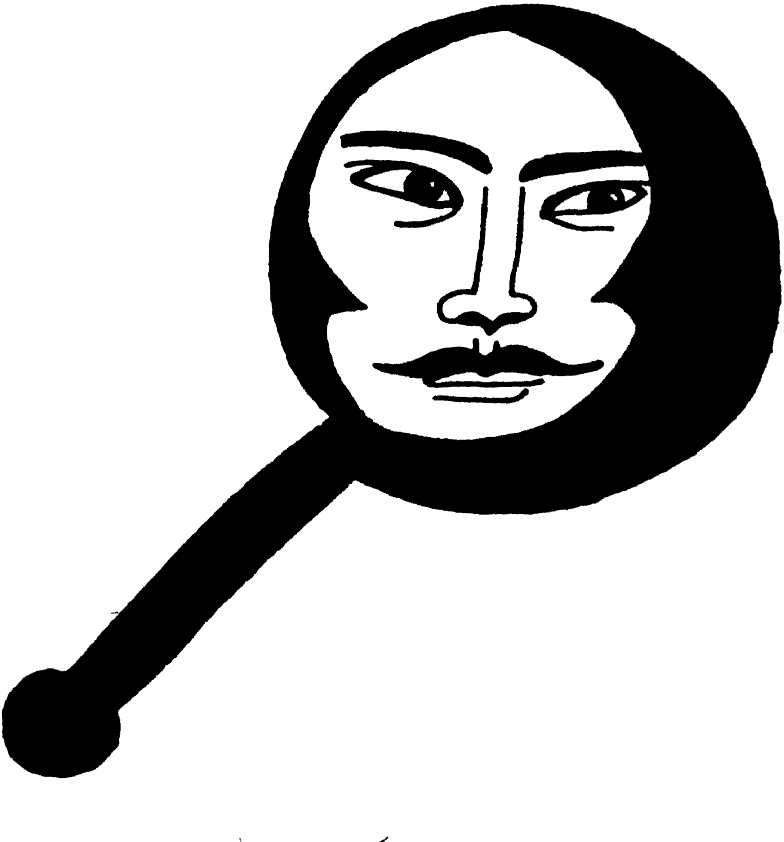
সূচি

উপন্যাস

. .

গল্প

. . .



এই মর্তের রাজত্ব

প্রথম

শয়তান : আমি চাই প্রবেশাধিকার···

ঈশ্বর : কে তুমি ? কী পরিচয় ?

শয়তান : প্রতীচীর রাজা।

ঈশ্বর : অভিশপ্ত ওরে, তোকে আমি
খুব ভালো জানি। আয় তবে।

(সে প্রবেশ করে)

শয়তান : ধন্য, রাজসভা, ধন্য,
চিরন্তন ঈশ্বর আমার !
কলম্বাস—তাকে তুমি পাঠাও কোথায় ?
আমার সমস্ত পাপ, সকল দুষ্কৃতী
সে আবার ঘটাক নতুন ক'রে, সত্যি এই চাও ?
তুমি কি জানো না তবে কতকাল সে যে
আমিই রাজত্ব করি ঐ রাজপাটে ?

—লোপে দে ভেগা

১

মোমে-তৈরি মাথা

জাহাজের কাপ্তেন—তার সঙ্গে নর্ম্যাণ্ডির এক পশুপালকের কিছু-একটা শরিকি ব্যবস্থা ছিলো—যে-কুড়িটা পয়দাবাজ ঘোড়া কাবো ফ্রান্সেস্-এ এনেছিলো, তার কাছ থেকে তি নোয়েল কোনো দোনোমনা না-ক'রেই বেছে নিয়েছিলো সেই মরদটাকে যার ছিলো শাদা চারটে পা আর ভরাট গোল পাছা—মাদি ঘোড়াদের তোফা কাজে লাগবে—মাদিগুলো সম্প্রতি যে-সব বাচ্চা পাড়ছিলো, তা প্রতি বছরই খুদে ন্যাগবেগে হ'য়ে আসছিলো। ক্রীতদাসটা যে ঘোড়ার মাংসের এলেম অদ্ভুতভাবে জেনে ফেলতে পারে মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি তা জানতেন; তার পছন্দকে কোনো প্রশ্ন না-ক'রেই তিনি ঝমঝমে সোনার লুই দিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়েছিলেন। মুখে পরাবার জন্যে লাগামের দড়িটা পাকিয়ে পাকিয়ে তৈরি করেছিলো তি নোয়েল; ফুটফুট দাগে-ভরা ভারি জানোয়ারটার শ্বাসপ্রশ্বাস বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই অনুভব করেছিলো সে, তার দুই ঊরুর ফাঁক দিয়ে ঝ'রে পড়া দরদর ঘাম তেজি ঘোড়াটার পুরু চামড়ায় মাখিয়ে দিয়েছিলো অম্ল কটু গন্ধ। মালিক চড়ছিলেন এক পাটকিলে রঙের হালকা ক্ষিপ্র ঘোড়া; তাঁর পেছন-পেছন তি নোয়েল পেরিয়ে এলো খালাশিদের মহল্লা, তাদের দোকানপাটগুলোর গায়ে নোনা আমিষ গন্ধ, স্যাঁৎসেঁতে ব'লে পালের কাপড়গুলো আড়-ধরা, সমুদ্রের চাপাটিগুলো এত শক্ত যে ঘুষি মেরে টুকরো করতে হয়; তারপর সে এসে পড়লো বড়ো রাস্তাটায়, সকালে এ-সময় রংবাহার থাকে এখানে: বাজার থেকে বাড়ি ফিরছে নেগ্রো মাগিগুলো, ঝলমলে সব চৌখুপি-কাটা বান্দানা মাথায় জড়ানো! দু-পাশে ভারি-ভারি সোনার পাত লাগানো রাজ্যপালের ঘোড়ার গাড়ি থেকে মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজির দিকে আদিখ্যেতায় ভরা সম্ভাষণ ভেসে এলো। তারপর মালিক আর গোলাম দুজনেই নাপিতের দোকানের সামনে তাদের ঘোড়াগুলো বাঁধলে। তার শিক্ষিত রইস খদ্দেরদের আলোকপ্রাপ্তির জন্যে এই নাপিত 'লেদেন গেজেট' পত্রিকা রাখে দোকানে।

মালিকের যখন দাড়ি কামানো হচ্ছে, তি নোয়েল তখন চোখ ভ'রে দেখে নিতে লাগলো দরজার পাশের কাউনটারটায় শোভা-পাওয়া মোমে-তৈরি মাথা চারটে। পরচুলার গোল কোঁকড়া লালচে পশমিনার ওপর থেকে থোকা-থোকা

নেমে এসেছে কোঁকড়ানো বিনুনি, অভিব্যক্তিবিহীন মুখগুলোর কাঠামোর মতো। এদের স্থির নিষ্পলক চাউনি এমন মরা। দেখতে হ'লে কী হবে, এই মাথাগুলোকে ঠিক সত্যিকার দেখায়—সেই-যে ভবঘুরে হাতুড়ে বদ্যিটি কয়েক বছর আগে কাবোতে দাঁতব্যথা আর বাতব্যধি সারাবার সঞ্জীবনী বেচতে এক কথা-কওয়া নরমুণ্ড নিয়ে এসেছিলো, হুবহু তারই মতো। মজার একটা কাকতালই হয়তো, পাশে যে মাংসের দোকানটা তারও জানলায় ছিলো বাছুরের মুণ্ড, চামড়া ছাড়ানো, প্রত্যেকটার জিভের ডগায় একগোছা ক'রে পার্‌স্লে, তাদের মধ্যেও ও-রকম একটা মোম-মোম ভাব। জারানো ষাঁড়ের ল্যাজ, বাছুরের পায়ের মোরব্বা, আর কাওঁ-র কেতায় বানানো পাকস্থলির ডেকচির মধ্যে তারা যেন দুলছে। শুধু একটা কাঠের দেয়ালই আলাদা ক'রে রেখেছে কাউনটার দুটোকে; আর, কাবাশে বাছুর মুণ্ডগুলোর সঙ্গে শাদা আদমিদের মুণ্ডুগুলো এবং দস্তরখানের ওপর পরিবেশন করা হচ্ছে—এই দৃশ্যটা মনে-মনে ভেবে তি নোয়েলের ভারি মজা লাগলো। ঠিক যেমন ভোজসভায় শোভা পায় পালক-ঢাকা শুদ্ধু পাখি-মুরগি, তেমনি কোনো ওস্তাদ করাল খানসামা হয়তো সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দেবে মাথাগুলো, তাদের সেরা পরচুল পরিয়ে। শুধু যা নেই, চারপাশে, তা হ'লে লেটুস পাতার একটা অঁচাল অথবা লিলি ফুলের মতো ক'রে কুঁচোনো মূলো। তাছাড়া, বাবলার আঠার বোয়ম, ল্যাভেণ্ডার জলের শিশি-বোতল, চালের গুঁড়োর বাক্স, বৃক্কের রেকাবি আর নাড়িভুঁড়ির চাটনির বদনার পাশে, খুব কাছে ব'লেই, এইসব গোলমরিচ, কাঞ্জিক ও তেল রাখবার শিশিবোতলের কাকতাল কেমন-এক বীভৎস ভোজের ছবিটাকেই ফুটিয়ে তোলে।

সকালবেলাটাই মাথায়-মুণ্ডে ছয়লাপ, কারণ মাংসওলার দোকানের পাশেই বইবিক্রেতা একটা কাপড়মেলবার তারের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে পারী থেকে আনা সর্বাধুনিক ছবিগুলো। তাদের অন্তত চারটেয় শোভা পাচ্ছে ফ্রান্সের রাজার মুখ, সূর্য, তলোয়ার আর পত্রালির কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু তাছাড়াও ছিলো আরো অনেক পরচুল শোভিত মাথা, সম্ভবত রাজসভার মাতব্বরদেরই। যোদ্ধাদের চেনা যায় তাদের রণংদেহি ভঙ্গি দেখে, বিচারপতিদের, তাদের ভয়াবহ ভ্রূকুটি দেখে; রসিক নাগরদের, তাদের ঠোঁটের কুশকায়িত হাসি দেখে; দুটো কাটাকুটি-করা কলমের ওপর কবিতার চরণগুলোর পুরোভাগে তারা শোভমান; তি নোয়েলের কাছে এ-কবিতার কোনোই মানে নেই, কারণ ক্রীতদাসেরা পড়তে পারে না। ছিলো কিছু রঙিন মিনে-করা খোদাইও, হালকা ধরনের: কোনো নগরীর দখল উদ্‌যাপন করার উৎসবে আতশবাজির খেলা, নাচের দৃশ্য—যেগুলোয় ডাক্তারেরা

সব মস্ত সরু পিচকিরি উঁচিয়ে আছে, একটা বিতানে কারা যেন কানামাছি খেলছে, তরুণ সব লম্পট পরিচারিকাদের বুকের জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে, অথবা প্রেমিকদের সেই চির-অবাধ কৌশল—একটা দোলনায় দোল খাচ্ছে এক তরুণী, নির্দোষ ভঙ্গিতে, আর শ্যামল তৃণভূমিতে শুয়ে ওপর দিকে সুখাবেশে তাকিয়ে থেকে কেউ দেখে যাচ্ছে তার অন্তর্বাসের সবখোল উড়াল। তি নোয়েলের মনোযোগ কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছে তামার পাতে খোদাই-করা একটা ছবির দিকে, সেই পর্যায়ের সেটাই শেষ ছবি, বিষয়বস্তু আর অঙ্কনরীতি দু-দিক দিয়েই সেটা অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। তাতে দেখা যাচ্ছে এক ফরাশি নৌসেনাপতি বা রাজদূতকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে সিংহাসনে বসে-থাকা এক নেগ্রো, পালকের চামরের ঝালর তার দু-পাশে, আর তার সিংহাসনের গায়ে আঁকা বাঁদর আর গিরগিটির মূর্তি।

'কেমনতর লোক এরা?' সাহসে ভর করে সে জিগেশ করলে বইওলাকে—যে তখন তার দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে লম্বা একটা মাটির পাইপ জ্বালাচ্ছিলো।

'তোদের দেশের রাজা!'

সে যা অনুমান করেছিলো, তার যাথার্থ্যস্বীকার কিন্তু আদপেই জরুরি ছিলো না। কারণ ততক্ষণে এই তরুণ ক্রীতদাসটির মনে পড়ে গেছে সেইসব কাহিনী, লেনরমাঁ দ মেজির খামারের সবচেয়ে বুড়ো ঘোড়াটা যখন চিনির কারখানার বেলনের মতো দাঁড়টাকে টেনে ঘোরাতো, মাকান্দাল তখন যা গুনগুন করে গেয়ে শোনাতো। নেগ্রো সুরটায় ইচ্ছে করে অবসাদ আর বিষাদ আনতো এই মান্দিঙ্গ, আর শ্রোতাদের ওপর প্রভাব ফেলবার পক্ষে তা খুবই কাজে লাগতো, সে বলতো কী-কী ঘটেছিলো পোপো, আরাদা, নাগোস আর ফুলাহ্‌দের মহান রাজত্বগুলোয়। সে বলতো উপজাতিদের সদলে দেশান্তরী হওয়ার কাহিনী, যুগযুগান্তরব্যাপী যুদ্ধের কথা, মহাকাব্যপ্রতিম সব সমর-কাহিনী—যাতে পশুরাও ছিলো মানুষের মিত্র। সে জানতো আদনহুয়েসোর গল্প, আঙ্গোলার রাজকাহিনী, রাজা ডা-এর উপাখ্যান—যে ছিলো স্বয়ং নাগদেবতারই অবতার, যে-নাগদেবতাই শাশ্বত সূচনা ও অনন্ত সমাপ্তি, যার রতিসুখ ছিলো ইন্দ্রিয়াতীত, যে-রানীর সঙ্গে তার রতিবিলাস হতো সে ছিলো ইন্দ্রধনু, জলের দেবী, সংসারের সবকিছুর জন্মের ধাত্রী। কিন্তু কাঙ্কান মুজার উপাখ্যানেই ভাষার বৈভব সে উপহার পেয়েছিলো সবচেয়ে বেশি—সেই-যে ভয়ংকর মুজা, যে কিনা মান্দিঙ্গদের দৃষ্টাতীত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, যার ঘোড়াগুলোর গায়ে ছিলো রোপ্যমুদ্রার আর কশিদার ঝালরের অলংকরণ, যাদের হ্রেষা ছিলো লৌহঝঙ্কনার চেয়েও বেশি সশব্দ, কাঁধ-থেকে-ঝোলা

দুই নাকাড়ার মধ্যে যারা বহন করতো বজ্রনিনাদ। উপরন্তু, এই রাজারা অস্ত্র উঁচিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতো তাদের বাহিনীর পুরোভাগে, আর পুরোহিতদের বিজ্ঞানের কল্যাণে তাদের আহত করা ছিলো অসাধ্য, তারা শুধু তখনই জখম হ'য়ে প'ড়ে যেতো যদি তারা কোনো কারণে রুষ্ট ক'রে তুলতো বিদ্যুৎ বা যুদ্ধের দেবতাকে রাজা ছিলো তারা, সত্যিকার রাজা, ও-রকম কোনো সার্বভৌম নয় যারা নকল চুলের পরচুলা লাগায় মাথায় আর পেয়ালা আর নাচের খেলায় মত্ত হ'য়ে থাকে আর শুধু তখনই এরা দেবতা হ'য়ে ওঠে যখন এরা নিজেদের রাজসভাব মঞ্চের ওপর পেখম তুলে ঘুরে বেড়ায়, মেয়েলিভাবে নিজেদের ঝালর-লাগানো পোশাক পরা ঠ্যাং দেখিয়ে এই শাদা রাজাগুলো অনেক বেশি কান পাতে বেহালার সমতানে আর কেচ্ছাগুজবের ফিশফিশানিতে, রক্ষিতাদের খুনশুটি-কথায় আর তাদের তন্দ্রাময় পক্ষিদের স্বরধ্বনিতে, প্রতিপদের চাঁদের বাঁকা কাস্তের পটে গর্জে-ওঠা কামানের নিনাদে নয়। যদিও শিক্ষা বলতে প্রায় কিছুই নেই তি নোয়েলের, তবু সে এইসব সত্যে দীক্ষা পেয়েছে মাকান্দালের গভীর প্রজ্ঞা থেকেই। আফ্রিকায় রাজা ছিলেন যোদ্ধা, শিকারি, বিচারক আর পুরোহিত ; তাঁর মূল্যবান ঔরস এক বিশাল বীরদের ধারা ছড়িয়ে দিয়ে শত-শত উদর ফুলিয়ে দিতো। ফ্রান্সে, এস্পানিয়ায় রাজা নিজে না গিয়ে যুদ্ধে পাঠায় তার সেনাপতিদের ; আইনের জট খোলায় সে নিতান্তই অসমর্থ ; উটকো যে-কোনো রাস্তার ফ্রায়ারকে এসে তাকে ধমকে যেতে দেয় সে। আর যখন পুরুষালি ক্ষমতার প্রশ্ন ওঠে, সে জন্ম দেয় কোনো ঘ্যানঘেনে ছিচকাঁদুনে রাজকুমারের, খেদাদের সাহায্য ছাড়া যে এমনকী একটা হরিণছানাকেও পেড়ে ফেলতে পারে না, এবং যে—কী অচেতন পরিহাস ব্যাপারটায়—কিনা শুশুকের মতো কোনো নিরীহ বোকা-হাবা মাছের নাম ধ'রে বসে। অথচ, ঐ ওখানে, সেখানে রাজকুমারেরা সবাই নেহাইয়ের মতো কঠিন, আর রাজকুমারেরা সেখানে এককেজন চিতাবাঘ আর রাজকুমারেরা জানে জঙ্গলের ভাষা, রাজকুমারেরা শাসন করে দিগদর্শিকার চতুর্বিন্দু, তারা সবাই মেঘমালার প্রভু, বীজ ও ঔরসের প্রভু, ব্রনজের প্রভু, আগুনের প্রভু।

তি নোয়েল তার মালিকের গলা শুনতে পেলে ; গালে বেজায় পাউডার ঘ'ষে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন ক্ষৌরকারের ডেরা থেকে। কাউনটারের ওপর ঐ যে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসছে চারটে রংচটা মোমের মাথা, এখন তাঁর মুখের সঙ্গে কী তাকলাগানো মিল তাদের ! বেরুবার পথে মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি মাংসওলার দোকান থেকে একটা বাছুরের মাথা কিনে নিলেন, এবং সেটা তুলে

দিলেন ক্রীতদাসটির হাতে। শ্যামল প্রান্তরের আকাঙ্ক্ষায় ঘোড়াটা হাঁপাচ্ছে; তার পিঠে চ'ড়ে তি নোয়েল কানে জড়িয়ে ধরলে সেই শাদা ঠাণ্ডা মাথাটা, মনে-মনে ভাবলে তাঁর পরচুলার আড়ালে মালিকের যে-টাকপড়া মাথাটা লুকোনো তার সঙ্গে সম্ভবত এর বিস্তর মিল। হাটবাজার থেকে ফিরতে থাকা নেগ্রো মেয়েদের বদলে রাস্তায় এখন দশটার প্রার্থনাসভা থেকে বেরুনো মহিলাদের ভিড়, কারু পেছনে হয়তো আসছে তার দাসী—তার নিজেরই মতো সন্দেহজনক যার গায়ের রং, হাতে তালপাতার পাখা, তার প্রার্থনাপুঁথি, আর তার সোনালি ঝালর লাগানো আতপত্র। একটা মোড়ে যাযাবর সঙেদের একটা দল নাচছে। তারও ওপাশে দূরে এক খালাশি মহিলাদের কাছে গছাবার চেষ্টা করছে হস্পানি পোশাক পরানো ব্রাজিলের এক বাঁদর। পানশালাগুলোয় লবণ আর ভিজে বালির মধ্যে গোঁজা মদের বোতলগুলো ঠাণ্ডা হচ্ছে, আর ছিপি খোলা হচ্ছে একেকটার। লিমোনাদ-এর পল্লিগির্জার সহকারী যাজক, পাদ্রি কর্নেঈ তাঁর রাসভবড়া খচ্চরে চেপে এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন ক্যাথিড্রালে।

যে-রাস্তাটা সমুদ্রতীরকে আঁচলের মতো জড়িয়ে রেখেছে, সেটা ধ'রে মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি আর তাঁর ক্রীতদাস শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। কেল্লার নিচু পাঁচিল থেকে বাবুম-বুবুম ক'রে উঠলো এক তোপধ্বনি সম্রাটের নৌবহরের জাহাজ 'সাহসিনী'কে দেখা গেলো,—হল্ দ্য লা তোর্ত্যু থেকে ফিরছে। জাহাজটার পাশের ঢালে ধাক্কা লেগে ফিরে এলো ফাঁকা আওয়াজগুলোর প্রতিধ্বনি। তার মালিকের বুকের মধ্যে নৌবহরের খুদে অফিসার হিশেবে কাজ করার স্মৃতি নড়ে-চ'ড়ে উঠলো, আর সে শিস দিতে লাগলো বাঁশিতে-বাজানো একটা কুচ-কাওয়াজের সুর। তি নোয়েল মনে-মনে, তার পালটা বিন্দু হিশেবেই যেন, নিঃশব্দে গুনগুন করলে একটা মাল বওয়ার গান, বন্দরে পিপেওলাদের কাছে যেটা খুবই জনপ্রিয়, যেটার মধ্যে ইংলণ্ডের রাজাকে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছেতাই খিস্তি করা হয়েছে। এই কথাটা সে কিন্তু নিশ্চিত ক'রেই জানে, যদিও গানের কথাগুলো কিন্তু মোটেই ক্রেয়োল নয়। তাছাড়া, ইংলণ্ডের বা ফ্রান্সের বা এস্পানিয়ার রাজাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো থোড়াই; তারা দ্বীপের অন্য অর্ধেক শাসন করে, আর তাদের বউয়েরা,—মাকান্দালের মতে—নাকি ষাঁড়ের রক্তে গাল রাঙায় আর একটা মঠে না সংঘে গিয়ে ভ্রূণগুলো গোর দেয়—মঠের মাটির তলার ভাঁড়ার ঘরটা হাড়ে-কঙ্কালে ভরপুর: সত্যিকার স্বর্গ যাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রকৃত দেবতাদের না-মেনে যারা মারা গেছে, তাদের সঙ্গে বাপু কোনো কাজ-কারবারই চলে না।

২

অঙ্গচ্ছেদ

তি নোয়েল নিজেকে বসিয়েছিলো একটা ওলটানো দ্রোণীর ওপর, বুড়ো ঘোড়াটাকে দিয়ে ঘোরাতে দিচ্ছিলো কলটা, এমন-একটা দুলকি চালে অভ্যাস যাকে ক'রে তুলেছে যান্ত্রিক। মাকান্দাল আখের আঁটি খাওয়াচ্ছিলো কলটাকে, লোহার বেলনের তলায় গুঁজে দিচ্ছিলো ডগাগুলো। তার রক্তরাঙা চোখ, শরীরের সবল খাঁচা, অবিশ্বাস্য সরু কোমর — সব মিলিয়ে এই মান্দিঙ্গ তি নোয়েলের ওপর এক আশ্চর্য সম্মোহন ছড়িয়েছিলো। লোকে বলতো, নেগ্রো মেয়েদের কাছে তাকে যা অপ্রতিরোধ্য ক'রে তুলেছিলো, সেটা তার গভীর অস্বচ্ছ কণ্ঠস্বর। আর তার গল্প বলার কলাকৌশল — বিশেষ ক'রে সে যখন মনে করতো সেই কবে তাকে যখন সিয়েরা লেওনের দাসব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি ক'রে দেয়া হয়েছিলো, সে অনেক কাল আগে, তার সেই বন্দীজীবনের অভিযানকাহিনী — ভয়াবহ সব অঙ্গিভঙ্গিসমেত সে নিজেই বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে দেখাতো — লোককে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতো। তি নোয়েল যখন তাকে শোনে, সে বোঝে যে তার ঘণ্টাঘর, পাথরবাড়ি, সামনে লম্বা ঝুলবারান্দা-ছড়ানো নর্ম্যান ঘরবাড়ি — সব-সমেত কাবো ফ্রান্সেস — গিনির সব নগরের তুলনায় নেহাৎই তুচ্ছ রংচঙে জিনিশ। সেখানে বিশাল সব কেল্লার ওপর উঠে গিয়েছে লাল মাটির বুরুজ গম্বুজ, তীর ছোড়বার জন্যে ঝাঁঝরা-লাগানো দেয়ালে ঘেরা; মরুভূমির সীমা ছাড়িয়েও তার হাটবাজারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো যদ্দুর অব্দি যাযাবর অধিজাতিরা যায়, তত-দূর। সে-সব শহরে মজুররা ধাতু নিয়ে কাজ করায় দক্ষ, তারা এমন-সব অসির ফলা বানায় যারা ক্ষুরের মতো মসৃণ কাটে আর যোদ্ধার হাতে যার ওজন একটা পালকের চেয়েও বেশি ব'লে বোধ হয় না। সেখানে আকাশ অব্দি উঠে গেছে বিশাল সব নদী, মানুষের পা চাটে তারা, আর লবণভূমি থেকে নুন নিয়ে আসার কোনো দরকারই সেখানে ছিলো না। গম, তিল, তিষি, জোয়ার মস্ত সব গুদোমে থরে-থরে সাজানো, রমরমা ব্যাবসা চলে এ-রাজ্য থেকে ও-রাজ্যে, এমনকী আন্দা-লুসিয়ার মাধ্বী আর জলপাইতেলেরও। তালপাতার ছাউনির তলায় ঘুমিয়ে থাকে অতিকায় সব ঢাক, ঢাকের মা-জননীরা, পাগুলো রাঙানো লালে আর মানুষের মুখশোভায়। বৃষ্টিরা সব প্রজ্ঞাবানেদের নিয়ন্ত্রণে, আর সুন্নতের ভোজে, যখন

কিশোররা নাচতো রক্তমাখা পায়ে, সুনাদী শিলার গায়ে দুম-দুম ঘা মেরে এমন সংগীত রচনা করা হ'তো, যা শুনে মনে হ'তো যেন বিশাল-সব জলপ্রপাতকে পোষ মানিয়ে নেয়া হয়েছে। দিব্যধাম গুহাদায় পুজো করা হ'তো ফণাধর গোখরো, আর শাশ্বত চক্রাবর্তের অতীন্দ্রিয় প্রতিরূপকে, সেইসঙ্গে স্তুতি করা হ'তো সেই দেবতাদেরও যাঁরা শাসন করেন উদ্ভিদজগৎ, আর দেখা দেন সিক্ত চকচকে লবণহ্রদের পাহাড়গুলোর শব্দ-বোধ-করা বিশাল তৃণভূমিতে।

ঘোড়াটা, কিসে হোঁচট খেয়ে, হাঁটু দুমড়ে প'ড়ে গিয়েছিলো। এমন-একটা অতিভীষণ চীৎকার উঠেছিলো—এত মর্মভেদী আর এত প্রলম্বিত—যে আশপাশের খেতখামারেও পৌঁছেছিলো তার রেশ, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো পায়রাদের। মাকান্দালের বাঁ-হাতটা আখের সঙ্গে-সঙ্গে বেলনের আচম্বিত টানে আটকা প'ড়ে গেছে, যেটা তার পুরো হাতটাকেই চাকার তলায় হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে, একেবারে কাঁধ অব্দি। যে-পিপেটায় আখের রস পড়েছিলো, সেখানে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছিলো একটি রক্তলোচন। একটা ছুরি তুলে নিয়ে, তি নোয়েল তক্ষুনি কেটে দিয়েছিলো সেই লাগাম, যা কলের কীলকের সঙ্গে আটকে রেখেছিলো ঘোড়াটাকে। চামড়ার কারখানা থেকে ছুটে এসেছিলো ক্রীতদাসেরা, মালিকের পেছন-পেছন, এসেছিলো মাংস শুকিয়ে জারিয়ে রাখে যারা, যারা শুকোয় কাকাও ঘাস। বেলনগুলোকে উলটোদিকে সরিয়ে, এবার মাকান্দাল তার থ্যাংলানো বাহুটা টানছিলো। ডান হাত দিয়ে সে নড়াতে চাচ্ছিলো তার একটা কনুই একটা বাজু একটা কব্জিকে—যারা কিছুতেই তার হুকুম মানছিলো না। তার মুখটা অভিভূত, স্তম্ভিত, যেন কী ঘ'টে গিয়েছে তার কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। তারা একটা দড়ি দিয়ে পাক-তাগা বাঁধতে শুরু করেছিলো তার বগলের তলায়, রক্ত-পড়া আটকাবে ব'লে। মালিক শানপাথরটা আনতে বলেছিলেন, অঙ্গচ্ছেদের জন্যে আখ-কাটা যে-মস্ত ছুরিটা ব্যবহার করা হবে, সেটাতে শান দেবার জন্যে।

৩

হাতটা কী দেখেছিলো

ভারি কাজের জন্যে অক্ষম, মাকান্দালকে দেয়া হ'লো গোরু-মোষ চরাবার ভার : সকাল ফোটবার আগেই সে গোয়াল-আস্তাবল থেকে তাদের বার ক'রে নিয়ে আসে, সোজা তাড়িয়ে নিয়ে যায় পাহাড়ের দিকে ; পাহাড়ের ছায়াস্নিবিড় ঢাল ঘন তৃণাকীর্ণ, সকাল আকাশে উঠে আসার পরেও ঘাসেরা ডগায় ধ'রে রাখে শিশির। সে তখন তাকিয়ে দ্যাখে গোরু-মোষের মন্থর ছড়িয়ে-পড়া আর চ'রে-চ'রে বেড়ানো, ঘাস খেতে-খেতে, ঘাসের মধ্যে হাঁটুডোবা ; আর সেখানে সে ক্রমে এমন কতগুলো উদ্ভিদ সম্বন্ধে প্রখর আগ্রহ গজিয়ে তুললো, যেগুলোর দিকে কেউ কোনোদিন নজরও করতো না। একটা শুঁটা গাছের ছায়ায় তার সক্ষম হাতটার কনুইতে ভর দিয়ে, পা ছড়িয়ে ব'সে, সে তার একমাত্র হাত দিয়ে চেনা ঘাসের দঙ্গলে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজতো অবজ্ঞায় মাড়িয়ে-যাওয়া আগাছাগুলোকে, আগে যাদের নিয়ে সে কখনোই কিছু ভাবেনি। অবাক হ'য়ে সে আবিষ্কার করলে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব আগাছার গোপন জীবন, যারা ছদ্মবেশ প'রে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দেয়, অন্যবেশ প'রে নিজেদের লুকিয়ে রাখে, খুদে-খুদে বর্মপরা কীটের যারা রক্ষক, সেই যারা পিঁপড়েদের পথ পরিহার ক'রে চলে। তার হাত জড়ো ক'রে আনে অনামা সব বীজ, গন্ধকমাখা উদ্ভট লতা, একরত্তি ধানি লঙ্কা ; যে-সব লতা পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে জাল বোনে ; একলা সব ঝোপ, পাতাগুলো লোমেভরা, আমিষ, যারা রাত্তিরে ঘামতে শুরু ক'রে দেয় ; স্পর্শাতুর সব উদ্ভিদ—যারা এমনকী মানুষের গলা শোনবামাত্র চুপি চুপি বুজে যায় ; যে-সব বীজপুট ফট ক'রে ফেটে যায় মধ্যদিনে, যেন নখের চাপে ম'রে গেলো কোনো নীলমাছি, সেইসব লতা যারা আঠালো রসকে জট বাঁধিয়ে বিনুনি পাকিয়ে থাকে রোদ থেকে অনেক দূরে। একজাতের লতা গায়ে ফুশকুড়ি গজিয়ে তোলে, আরেকটার ছায়ায় মাথা রেখে শোবামাত্র মাথা ফুলে ওঠে। কিন্তু, এখন, মাকান্দালকে যা সবচেয়ে আকৃষ্ট করলো, তা তার শ্যাওলা ও শিলীন্ধ্র। এমন ধরনের ছত্রাক আছে যাদের গায়ের গন্ধ যেন পচা কাঠের, কারু-বা গন্ধ কেমন ওষুধ-ওষুধ, ঝাঁজালো, কারু-বা গায়ে মাটির তলার ভাঁড়ারের গন্ধ, কারু-বা গায়ে কেমনতর অসুখ-অসুখ—ভুঁইফোঁড় সব, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে, কেউ দেখতে কানের মতো, কারু চেহারা দেখে মনে হয় যেন ষাঁড়ের

জিভ, কেউ দেখতে কোঁচকানো, আঁচিলের মতো, ক্ষরণজমা, ক্ষরণছাওয়া, স্যাৎসেঁতে ফাটলের মধ্য থেকে খুলে ধরেছে তাদের আতপত্র, ব্যাঙেদের সব আবাস, যার তলায় তারা ঘুমোয় অথবা চোখ খুলে তাকিয়ে-তাকিয়ে সব ছাখে। মান্দিঙ্গটি একটা ব্যাঙের ছাতার মাংসল কোয়া গুঁড়ো করলে আঙুলের চাপে, আর তার নাকে এসে পৌঁছুলো বিষের একটা ঝাপটা। সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে একটা গোরুর দিকে, গোরুটি সেটা শুঁকলো একবার, আর মাথাটা সরিয়ে নিয়ে পেছিয়ে গেলো, চোখে ভয়, নাকে ঘোঁৎ শব্দ। মাকান্দাল তুলে আনলে ঐ জাতের আরো ছত্রাক, তার গলার কাছ থেকে কাঁচা চামড়ার যে-ঝোলাটা ঝুলছে, তার মধ্যে সে তাদের রাখলে।

ঘোড়াদের নাওয়াবার ছুতো ক'রে তি নোয়েল ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেনর্মঁ দ্য মেজির খামার থেকে কেটে পড়তো, একহাতওলা লোকটার সঙ্গে এসে যোগ দিতো। তারা দুজনে হেঁটে চ'লে যেতো উপত্যকার কিনারে, যেখানে তরাই গেছে ভেঙে, জমিটা উবড়োখাবড়ো, আর পাহাড়গুলোকে ঘিরে রেখেছে গভীর সব গুহাগহ্বর— মাটি সেখানে যেন ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে ছ্যাঁদায়। তারা এসে থামলো এক বুড়ির বাড়িতে, বুড়ি একাই থাকে, আর দূর-দূর থেকে লোক আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। দেয়ালে ভারি-ভারি দাঁড়ের ওপর লাল সব মিশেল, তারই ফাঁকে-ফাঁকে ঝুলছে কতগুলো তলোয়ার, ঘোড়ার পায়ের নাল, উল্কার শিলাখণ্ড, তারে-তৈরি আংটায় ধ'রে-রাখা জং-ধরা চামচে, ক্রুশের আকারে সাজানো, যাতে ব্যারন সামদি, ব্যারন পিক, ব্যারন লা ক্রোয়া প্রভৃতি গোরস্থানের প্রভুরা এ-ধারটা না-মাড়ায়। তার চামড়ার থলে থেকে বার ক'রে সব লতাপাতা, ব্যাঙের ছাতা, ওষধি-উদ্ভিদ মামান লোইকে দেখালে মাকান্দাল। বুড়ি খুব সাবধানে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলো তাদের, কোনো-কোনোটাকে থেঁৎলে গুঁড়ো ক'রে শুঁকে দেখলো, কোনোটা-বা দেখবামাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলে। মাঝে-মাঝে কথা হ'তো অদ্ভুত-সব জানোয়ার নিয়ে, যারা মানুষের ছানা জন্ম দিয়েছে। আর কথা হ'তো তাদের নিয়েও, কতগুলো মন্ত্র প'ড়ে যারা জানোয়ার হ'য়ে যেতে পারে। প্রকাণ্ড সব শ্বাপদ ধর্ষণ করেছে স্ত্রীলোকদের, আর, রাত্তিরে, কথার বদলে বিকল্প দিয়েছে গররগর গর্জন। একটা গল্পের চরম পরিণতিতে পৌঁছুবার সময় মামান লোই একবার অদ্ভুতভাবে চুপ ক'রে গিয়েছিলো। কোনো রহস্যময় নির্দেশের উত্তরেই যেন সে চ'লে গিয়েছিলো রান্নাঘরে, ফোটানো তেলের টগবগে কড়াইতে ডুবিয়ে দিয়েছিলো তার দুই হাত। তি নোয়েল লক্ষ করেছিলো যে বুড়ির মুখে নির্বিকার উদাসীনতা ফুটে আছে, আর—যেটা আরো

তাজ্জব—যখন সে তেলের কড়া থেকে তার দুই হাত বার ক'রে আনলে, তখন তাতে না-ছিলো কোনো ফোস্কা না-ছিলো কোনো পোড়া দাগ, অথচ এক মুহূর্ত আগেও তি নোয়েল নিজের কানে স্পষ্ট শুনেছিলো কিছু ভাজা হবার ভীষণ ছ্যাক-ছ্যাক শব্দ। মাকান্দাল যখন পুরো ব্যাপারটা এমন শান্তভাবে মেনে নিলে যে কিছুই অস্বাভাবিক নয়, তখন তি নোয়েলও চেষ্টা করলে তার স্তম্ভিত ভাবটা চেপে রাখতে। আর দিব্বি স্থিরভাবেই কথাবার্তা চলতে থাকে দুজনে—মান্দিঙ্গ আর ডাইনির মধ্যে; আর, মাঝে-মাঝে কেমন একটা প্রলম্বিত বিরতি নেমে আসে, যখন দুজনেই দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলকে।

একদিন তারা লেনর্মাঁ দ মেজির কুত্তার দলের একটাকে গরমের মধ্যে পাকড়ালে। তি নোয়েল যখন কুকুরটার ওপর চেপে বসলো, দু-কান ধ'রে আঁকড়ে মাথাটা চেপে ধ'রে, মাকান্দাল তার ঝোলা মুখটা ঘষলো একটা পাথরের গায়ে, ব্যাঙের ছাতার রস যেটার রং ক'রে দিয়েছিলো হালকা হলুদ। কুকুরটার পেশীগুলো জড়িয়ে মড়িয়ে কুঁকড়ে গেলো, তার শরীরটা দমকা কাঁপলো প্রচণ্ড বিক্ষেপে, তারপর সে চিৎপাত গড়িয়ে পড়লো—পাগুলো আড়-খরা, দাঁতগুলো বার-করা।

সেদিন বিকেলে তারা যখন খামারে ফিরছে, মাকান্দাল অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো কলগুলোর দিকে, কফি আর কাকাও দানা শুকোবার ছাউনিগুলো, নীল বানাবার রান্নাঘর, চাপরশালা, নেহাই, চৌবাচ্চা, আর মাংস জারাবার পাটাতনগুলো—এদের দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'সময় হ'লো এতদিনে।'

পরদিন তারা যখন তার নাম ধ'রে হাঁক পাড়লে, সে আর সেখানে নেই। ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব না-দিয়ে মালিক কেবল অন্য নেগ্রোগুলোর জন্যেই একটা দাসমৃগয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। একহাতওলা এক ক্রীতদাস—সে তো অতিশয় তুচ্ছ জীব। তাছাড়া এ-কথা তো সকলেই জানে যে মান্দিঙ্গ মাত্রেই একেকজন সুপ্ত ও সম্ভাব্য পলাতক। মান্দিঙ্গ কথাটা অবাধ্য একগুঁয়ে জেদি বিদ্রোহী এমনকী শয়তানেরই সমার্থক। সেই জন্যেই মান্দিঙ্গ ক্রীতদাসেরা বাজারে বিকোয় শস্তায়। তারা সবাই সারাক্ষণ স্বপ্ন ছাখে পাহাড়-পর্বতে পালিয়ে যাবার। সে যাই হোক, চারপাশে এত-সব খামার, বিকলাঙ্গটা কদ্দুরই বা যাবে? যখন তাকে পাকড়ে ফিরিয়ে আনা হবে, হিড়-হিড় ক'রে টানতে-টানতে, তখন অন্যদের সামনে তাকে এমন নির্যাতন করা হবে যে সে একটা দৃষ্টান্ত হ'য়ে থাকবে। কোনো একহাতওলা লোক তো একহাতওলা লোকই। ওর জন্যে দুটো ভালো মাস্টিফ হারাবার ঝুঁকি নেয়া—মাকান্দাল হয়তো তার কাটারিটা দিয়েই তাদের ঠাণ্ডা ক'রে দিতো—বেদম বোকামিই হ'তো।

৪

দেনা-পাওনা

মাকান্দাল উধাও হ'য়ে যাওয়ায় খুব দুঃখিত হ'য়ে পড়েছিলো তি নোয়েল। মাকান্দাল যদি ঘূণাক্ষরেও একবার তাকে তার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করতো, তি নোয়েল সানন্দে মান্দিঙ্গর সেবা করার কাজটা লুফে নিতো। এখন তার মনে হ'লো মাকান্দাল তাকে নিশ্চয়ই নেহাৎই অকর্মণ্য ব'লে ভেবেছে, তাই তার সঙ্গে পরিকল্পনাটা ভাগ ক'রে নেয়নি। দীর্ঘ রাতগুলোয় যখন এই ভাবনাটা তাকে কুরে খেতো, সে আস্তাবলে যেখানটায় ঘুমোতো সেখান থেকে বেরিয়ে যেতো, আর কাঁদতে-কাঁদতে, ঐ নর্ম্যান টাটুটার গলা জড়িয়ে ধ'রে, নিজের মুখটা গুঁজে দিতো ঘোড়াটার উষ্ণ শুদ্ধগন্ধী বালামচিতে। মাকান্দালের অদৃশ্য হওয়া মানে তার বলা সব কাহিনীতে ফুটে-ওঠা জগৎটারও অদৃশ্য-হ'য়ে যাওয়া। তার সঙ্গে-সঙ্গে উধাও হ'য়ে গেছে কান্কান মুজা, আদনহুয়েসো, সত্যিকার রাজার মতো দলনায়কেরা, আর হুইদার ইন্দ্রধনু জীবন হারিয়ে ফেলেছে তার রস, তার স্বাদ, আর তি নোয়েল আবিষ্কার করলে যে রোববারের নাচগান তার বিষম অসহ্য লাগে; সবসময় থাকে তার জানোয়ারগুলোর সঙ্গে, তাদের কান আর গুহ্যদ্বার সে এঁটেল পোকার হাত থেকে দারুণ চেষ্টা ক'রে সাফ রাখে। এইভাবে কেটে গেলো আস্ত বর্ষাকালটাই।

নদীরা যখন যে-যার খাতে ফিরে গিয়েছে, সেই সময়ে, একদিন, আস্তাবল-গুলোর ধারে, তি নোয়েলের সঙ্গে পাহাড়ের সেই বুড়ির দেখা হ'য়ে গেলো। সে মাকান্দালের কাছ থেকে তার উদ্দেশে এক বার্তা এনেছে। উত্তরে, ঠিক ভোর ফোটবার সময়, ছোকরা চ'লে গেলো সরুমুখ গুহাটায়, ওপর থেকে চুনাপাথরের জল নেমে এসে জ'মে-জ'মে অদ্ভুতভাবে ঢেকে দিয়েছে মুখটা; সেটা মুখ ক'রে ছিলো ভেতরের গভীরতর আরেকটা মুখের দিকে, যেখানে পা-ওপরে মুণ্ডু তলায় ঝুলে আছে একঝাঁক বাদুড়। মেঝেটায় সমুদ্রপাখির গুয়ের একটা পুরু আস্তর বেছানো, আর তার ওপর প'ড়ে শিলীভূত সব হাড়গোড় আর মাছের কাঁটার জীবাশ্ম। তি নোয়েল লক্ষ করলে, মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা মাটির জালা ও কলস; এই স্যাঁৎসেঁতে আঁধারে তা থেকে ঝিমধরা তিতকুটে ভারি-ভারি একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। ঝাউয়ের পাতার ওপর স্তূপ হ'য়ে প'ড়ে আছে গিরগিটির

চামড়া। একটা মস্ত চ্যাপটা পাথরের পাশে প'ড়ে আছে কতগুলো মসৃণ গোল পাথর—কী-সব ছেঁচবার জন্যে সম্প্রতি তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। কাটারি দিয়ে চেঁছে-চেঁছে বাকল-সাফ-করা একটা কাঠের টুকরোর ওপর প'ড়ে আছে খামারের খাতাঞ্চির কাছ থেকে চুরি ক'রে আনা একটা হিশেবখাতা, তার পাতায়-পাতায় কাঠকয়লায় আঁকা বড়ো-বড়ো সব চিহ্ন। তি নোয়েলের মনে প'ড়ে গেলো কাপে-র ওষধিওলার দোকান, তার পেতলে তৈরি মস্ত হামানদিস্তা, তাকে-সাজানো ডাক্তারি সব বই, কুচিলা ফল আর হিঙের বোয়ম, দাঁত-ব্যথা সারাবার জন্যে শেকড়। শুধু যা নেই, তা হ'লো কোহলে চোবানো কিছু বিছে, গোলাপের নির্যাস, আর একটা চৌবাচ্চা ভর্তি জোঁক।

মাকান্দাল লোকটা রোগা-পাৎলা, টিংটিঙে। তার পেশীগুলো এখন যেন হাড়ের আস্তরের ওপর নড়ছে, তার কণ্ঠাটা বেরিয়ে আছে উগ্র, বেঢপ। কিন্তু তার মুখ—মোমের আলো তার ওপর জলপাইয়ের রং ফুটিয়ে তুলেছে—প্রকাশ করলে এক শান্ত নমাহিত সুখের ভঙ্গি। সে তার মাথায় জড়িয়েছে লাল-এক বান্দানা, তার ওপর কয়েক গোছা পুঁতির মালা। সে যে একে-একে সমতলের সব খেত-খামারেই গিয়েছে, সে-সব খামারে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়েছে, এটা একটুক্ষণের মধ্যেই টের পাওয়া গেলো; সে-রাতে পালিয়ে যাবার পর থেকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এই মান্দিঙ্গ যে অবিশ্রাম অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছে, সেটা আবিষ্কার ক'রে তি নোয়েল তাজ্জব হ'য়ে গেলো। সে জানে যে দোন্দোর নীলকুঠিতে সে নির্ভর করতে পারে মালি ওল'দার ওপর, গোলামখানার রাঁধুনি ফ্রোমাঁয়ার ওপর আর কামা জ্যাঁ-পিয়েরের ওপর; লেনরমাঁ দ্য মেজির খামারে সে এত্তেলা পাঠিয়েছে তিন পোঙ্গু ভাইদের কাছে, বাঁকা-পা ফুলাহ্‌টির কাছে, নতুন কঙ্গোলিটির কাছে, আর মারিনেৎ-এর কাছে—যে-মুলাটো মেয়েটি এতকাল মালিকের বিছানায় শুতো, কিন্তু এখন যাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ধোবিখানায়—জনৈক মাদমোয়াজেল দ্য লা মার্তিনিয়েরের আগমনে—উপনিবেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ার আগে ইনি লা হাব্‌র-এর কনভেনটেই বদলি মারফৎ, আমমোক্তারনামায় সই ক'রে, মালিককে বিয়ে ক'রে বসেছিলেন; লা বনে দ্য লেবেক-এর ওপাশে যারা থাকে, যাদের পাছায় জিব্রার ডোরা—ব্র্যাণ্ডি চুরি করার জন্যে তপ্ত লাল লোহা দিয়ে ছ্যাকা দেয়া হয়েছিলো যাদের—সেই দুই আঙ্গোলির সঙ্গেও সে যোগাযোগ করেছে। শুধু সে-ই যার পাঠোদ্ধার করতে পারে, এমন লিপিতে মাকান্দাল তার নথি-সেরেস্তায় নাম বসিয়েছে মিলো-র বোকো-র আর এমনকী সেইসব পেশাদার

পশু-লুঠেরাদেরও, পাহাড় পেরুবার কাজে যারা ওস্তাদ—আর্তিবোনিতের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করবার কাজে লাগবে তারা।

একহাতওলা লোকটা তার কাছ থেকে কী চায়, তি নোয়েল সেটা সেদিন জানতে পারলে। ঠিক তার পরের রোববারেই, প্রার্থনাসভা থেকে ফিরে মালিক জানতে পেলেন, খামারের দুটি সেরা জাতের দুধের গাই—রুয়ঁ থেকে আনা, সেই যাদের ল্যাজ ছিলো শাদা—তাদের নাদির স্তূপের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে মরছে—তাদের মুখ থেকে অনবরত ফেনা বেরুচ্ছে, বমি বেরুচ্ছে। তি নোয়েল তাঁকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালে যে ভিনদেশী জন্তুরা অনেক সময় চিনতে পারে না কোন ঘাস ভালো আর কোন ঘাস রক্ত বিষিয়ে দেয়।

৫

পাতাল থেকে ডাক

গরল হামাগুড়ি দিয়ে এগুলো উত্তরের সমভূমিতে, হামলা করলে যত চারণভূমিতে আর খোঁয়াড়ে আস্তাবলে। কেউ জানে না কেমন ক'রে সে এসে পড়লো তৃণে-পল্লবে, তেফলাপাতার উদ্ভিদপুঞ্জে, কেমন ক'রেই বা মিশে গেলো খড়ের আঁটিতে, অথবা বেয়ে উঠলো জাবনায় বা বাসনকোশনে। তথ্য এটাই যে, গোরুবাছুর, বলদমোষ, ঘোড়া বা ভেড়ার পাল শয়ে-শয়ে মরছে, সারা গ্রামগঞ্জকে ভ'রে দিয়েছে মরা মাংসের এক নাছোড় দুর্গন্ধে। রাত্তির নামলেই জ্বালানো হয় বিশাল-সব আগুনের কুণ্ড, আর শিখা ছড়িয়ে দেয় এক ভারি, চাপা, তৈলাক্ত ধোঁয়া, শিখায় লাল-হ'য়ে-যাওয়া খুরের রাশির মধ্যে আস্তে-আস্তে নিভে আসে স্তূপ-স্তূপ মিশকালো করোটি, পোড়া অস্থিপঞ্জর। কাবো-তে লতা-পাতার গুণ জানে যে-সব ওঝা ও গুণিন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ওস্তাদরা মিথ্যেই খুঁজে বেড়ালে লতাপাতা, রজন, গাছ-কাটার-পর-বেরিয়ে আসা দুধ—এদের মধ্যে কোনটা ব'য়ে বেড়াচ্ছে মড়ক। জানোয়ারগুলো অনবরত থুবড়ে পড়ছে, একের পর এক, উদরগুলো স্ফীত, ভনভন ক'রে তাদের ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে নীলমাছি। গাছের ডাল, ছাতের কাঠ সজীব হ'য়ে উঠেছে বিশাল সব কালো-কালো নির্লোম পাখিতে, ওৎ পেতে আছে কখন শিকার পড়ে থুবড়ে, কখন ফেটে যায় চামড়া; টান-টান, প্রায় ফেটে যাচ্ছে, এমন চামড়া তারা ছিঁড়ে দেয় তাদের ধারালো চঞ্চু দিয়ে, নতুন পচা গন্ধের ঢাকা খুলে দেয়।

আচমকাই বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়লো সকলের মধ্যে, জানা গেলো যে গরল হানা দিয়েছে বাড়িঘরের অন্দরেও। একদিন সন্ধেয়, তাঁর বৈকালীন ভোজনের পর, কক-সাঁৎ খামারের মালিক আচমকা মুখড়ে পড়লেন প্রাণহীন, আগে কখনো শরীর খারাপ বলেননি, সে ঘড়িটায় দম দিচ্ছিলেন, পড়বার সময় সেটাও তাঁর হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গিয়েছিলো মেঝেয়। আশপাশের খামারে খবরটা পৌঁছুবার আগেই, অন্য মালিকরাও পর পর পড়লো বিষের প্রকোপে—বিষ যেন ওঁৎ পেতে আছে, যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর. বিষ আছে রাতচৌকির পাশের গেলাসে, শুকনো বাটিতে, ওষুধের শিশিতে, রুটির মধ্যে, মদে, ফলমূলে, নুনে। সারাক্ষণ শোনা যাচ্ছে কফিনের গায়ে পেরেক ঠোকার অলুক্ষুণে আওয়াজ। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে চোখে পড়ছে অন্ত্যেষ্টির মিছিল। ক্যাথলিক গির্জেগুলোয় সারাক্ষণ শোনা যাচ্ছে অন্ত্যেষ্টির মন্ত্র আর বিলাপ, আর শেষকৃত্য সবসময়েই পৌঁছোয় দেরি হ'য়ে [illegible] যখন পরে পরে ঘণ্টার ঢং ঢং ঘোষণা ক'রে দেয় নতুন মৃত্যু। [illegible] সংক্ষিপ্ত ক'রে দিতে হ'লো সৎকারবিধি, যাতে ক'রে সমস্ত শোক [illegible] সারা সমভূমি জুড়ে ওঠে একই শোকাচ্ছন্ন শোকগীতি, এখন যা কণ্ঠস্থ হয়েছে বিভীষিকার আবৃত্তিতে। কারণ আতঙ্ক শুকিয়ে ফেলেছে মুখগুলি, দম আটকে ফেলছে গলার, রাস্তায়-রাস্তায় ওঠা-নামা করছে [illegible] ফুসফুসানি, [illegible] ছড়ায়, [illegible] বিষ, হলুদ বিষ, অথবা এমন বিষ যার কোনো রং নেই, বুকে হেঁটে এগুচ্ছে নেমে আসছে, রান্নাঘরের চিমনি বেয়ে, ফিস্‌ফিসে ঢুকে যাচ্ছে বদ্ধ ঘরের ফাটল দিয়ে, যেন কোনো অপ্রতিরোধ্য [illegible] ছড়িয়ে যাচ্ছে চুইয়ে চুইয়ে [illegible] ছায়ায় বদলে দিতে।

[illegible] চলেছে [illegible] চলেইছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যেন কোনো অলুক্ষুণে [illegible] ঢুকবার্নি

ভয়ে [illegible] মজে গেছে মনোবল—কারণ কুয়োর জল খাবারেও আর সাহস নেই [illegible] ঔপনিবেশিকরা চাবকাচ্ছে তাদের ক্রীতদাসদের, নির্যাতন করছে, [illegible] [illegible] বাবাবা। কিন্তু গরল পরিবারগুলোকে হ্রাস ক'রে চললো, বয়স্ক বা শিশু—কারু রেহাই নেই—সবাইকেই সে মুছে দিচ্ছে [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], কিংবা কোনো ব্রিটন খালাশির বেকায়দা মন্তর-তন্তর, ওঝা ডান গুণিন—কেউই মৃত্যুর গোপন অগ্রসর ঠেকাতে পারছে না। [illegible]স্থানের শেষ কবরটাকে দখল ক'রে নেবার অনিচ্ছুক তাড়ায় মাদাম [illegible] মারা গেলেন বুধবারে, একটা বিশেষ লোভনীয় সুস্বাদু

কমলা চেখে দেখার পর, চির-অনুগত কোনো-একটা হাত যেটা রেখেছিলো তাঁর নাগালের মধ্যে। সমভূমিতে যেন ঘোষিত হয়েছে জরুরি অবস্থা। সূর্যাস্তের পর যদি কাউকে দেখা যায় মাঠে-ঘাটে অথবা বাড়িঘরের আশপাশে হাঁটতে, তবে সাবধান না-ক'রেই তাকে গুলি ক'রে মারা হচ্ছে। কাবো-র গড় থেকে সেনাবাহিনী এসে রাস্তায়-রাস্তায় কুচকাওয়াজ ক'রে বেড়াচ্ছে, হাস্যকরভাবে স্পর্শাতীত শত্রুকে শাসাচ্ছে বীভৎস মরণ। কিন্তু গরল, অতীব অপ্রত্যাশিত সব পথ ধ'রে, মুখ অব্দি উঠে আসছে। একদিন দ্যু পেরিনৃই পরিবারের আটজনে তাকে পেলে আপেলের রসের একটা পিপেয়, সদ্য-জেটিতে-ভেড়া একটা জাহাজের খোল থেকে যেটাকে তারা নিজের হাতে নামিয়ে এনেছিলো। শটন আর পচন দখল ক'রে বসেছে সারা তল্লাট।

একদিন বিকেলে তারা যখন হুমকি দিলে যে তার পাছায় তারা একতাল গাদাবন্দুকের গুলি ঠুশে দেবে, বাঁকা-পা ফুলাহ্‌টি শেষ অব্দি সব কথা ফাঁস ক'রে দিলে। মাকান্দাল, সেই যার একটা হাত নেই, সেই নুলো কিনা এখন হ'য়ে উঠেছে রাদাদের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের এক 'বুনগান', এখন তার মধ্যে সুদে খাটছে পরামানুষিক সব শক্তি ও ক্ষমতা, কেননা বেশ কিছু বার তার মধ্যে ভর করেছিলেন বড়ো-বড়ো সব দেবতারা, আর তাই এখন সে নিজেই হ'য়ে উঠেছে গরলদেব। অপব দ্বীবের শাসকদের চরম কর্তৃত্বে ভরপুর, সে ঘোষণা করেছে উচ্ছেদের জিহাদ, শাদাদের একেবারে নির্মূল ক'রে দেবার জন্যে এখন সে নির্বাচিত, সে-ই এখন আদিষ্ট হয়েছে সান্তো দোমিঙ্গোতে স্বাধীন নেগ্রোদেব এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। হাজার-হাজার ক্রীতদাস তাকে অন্ধের মতো মানে। বিষের অগ্রগতি রোধ করার সাধ্যি কারু নেই।

এই উদ্‌ঘাটন খামারের মধ্যে কশাঘাতের ঘূর্ণিঝড় লেলিয়ে দিলে। আর, গনগনে-রোষে-ছোঁড়া গাদাবন্দুকের জমকালো গুলি যখন কালো খোচরটির নাড়ি-ভুঁড়ি ফাঁশিয়ে দিলে, এল্ কাবো-র উদ্দেশে এক দূত পাঠানো হ'লো। চারপাশে যত পুরুষ পাওয়া গেলো, সেই বিকেলেই সবাইকে জড়ো করা হ'লো মাকান্দালকে খুঁজে বার করতে। সবুজ মাংস, পোড়া খুর, কৃমি-কীটের দুর্গন্ধে ভরা সমভূমি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো ডালকুত্তোর ঘেউ-ঘেউ আর প্রচণ্ড দেবনিন্দা ও খিস্তিতে।

৬

রূপান্তরগুলো

কয়েক হপ্তা ধ'রে এল্ কাবো'র গড়ের সেনাবাহিনী আর খামারমালিকদের জল্লাদদল, দেওয়ান, খাতাঞ্চি আর উপদর্শকেরা পুরো অঞ্চলটা একেবারে চ'ষে ফেললে—প্রতিটি গাছ, সব নয়ানজুলি, সমস্ত আখের খেত তন্নতন্ন ক'রে তারা খুঁজে দেখলে: মাকান্দালের কোনো হদিশ নেই কোথাও। তার ওপর, এখন, যেহেতু সবাই জানে বিষের উৎস কী, বিষ তার আক্রমণ স্থগিত রাখলে—বিষ ফিরে গেলো কোনো বোয়েমে, ঐ একহাতের মানুষটি হয়তো তাকে পুঁতে ফেলেছে কোথাও, মাটির তলার আঁধার নিশীথিনীতে হয়তো এখন টগবগ ক'রে ফুটছে সে, গত কিছুদিন ধ'রে যে হ'য়ে উঠেছিলো কত-কত জীবিতের মৃত্যুরাত্রি। সন্ধেবেলায় পাহাড় থেকে ফিরে আসে ডালকুত্তো আর মানুষের দল, দেহের প্রতিটি রোমকূপ থেকে অবসাদ আর হতাশার ঘাম ঝরাতে-ঝরাতে। এখন যেহেতু মৃত্যু আবার তার স্বাভাবিক ছন্দ খুঁজে পেয়েছে—তার লয় এমনিতে দ্রুত হয় শুধু তখনই যখন মাঘের কোনো দাদগে হিম হাওয়া ব'য়ে যায়, অথবা তুখোড় বর্ষা নিয়ে আসে তুমুল জ্বর, সেনাবাহিনীর সঙ্গে যে বাধ্য হ'য়ে আঁতাত করতে হয়েছে তাতে হতোদ্যম হ'য়ে খামারমালিকরা নিজেদের সঁপে দিলে পানোল্লাসে ও পসারায় অশ্লীল গান, তাসের বাজিতে জোচ্চুরি, নেগ্রো মেয়েরা যখন ধোয়া গেলাশ নিয়ে আসে তখন তাদের স্তনমর্দন—এই সবেরই ফাঁকে-ফাঁকে তারা তাদের বাপ ঠাকুর্দার বীরমহিমার কাহিনী আওড়ায়। একদিন যারা কার্তাহেনার লুঠতরাজে অংশ নিয়েছিলো অথবা পকেটে পুরেছিলো এস্পানিওলের রাজার সম্পত্তি, যখন কাঠের পা ঠকঠক করতে-করতে পিয়েৎ হেইন চমৎকার শানিয়ে চলেছিলো সেই দুর্ধর্ষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা দুশো বছর ধ'রে পূর্বপুরুষেরা যার স্বপ্ন দেখে আসছিলো। মদের দাগে ভরা টেবিলে পাশার খেলের ফাঁকে-ফাঁকে তারা পান করলে লেসনমম্বাক, লেবর্ড দক্স্‌টা, আর দ্যু ক্লোসে-র উদ্দেশে আর—সেইসব [illegible] পুরুষদেরও উদ্দেশে যারা নিজেদেরই উদ্যোগে একদিন পত্তন করেছিলো এই উপনিবেশ, যাদের কাছে নিজেদের অভিলাষই ছিলো আইন, শেষ কথা, যারা পারীর অনুশাসন অথবা কৃষ্ণ সংহিতার মোলায়েম তিরস্কারে কখনোই কোনো পাত্তা দেয়নি। আর চৌকি বা বেঞ্চির তলায়, কুণ্ডলি-পাকিয়ে-ঘুমোনো

কুকুরগুলো উপভোগ করছিলো চোখা-চোখা ফলাওলা বকলশ না-পরার স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা।

সিয়েস্তার আলস্য আর গাছের ছায়ায় পানভোজন—মাকান্দালের তল্লাশিতে ঢিলে প'ড়ে গেলো। কয়েক মাস কেটে গেলো, তার কোনো সাড়া নেই। কেউ ভাবলে সে বুঝি দূরে-কোথাও দুর্গম ভেতরটায় চ'লে গিয়েছে, বিশাল-সব শিখর-দেশের মেঘমেদুর উচ্চতায়, সেই যেখানে নেগ্রোরা নাচে ফান্দাঙ্গো কাস্তানেৎ-এর তালে-তালে। অন্যরা বললে 'বুন্‌গান' নিশ্চয়ই কোনো পালতোলা জাহাজে চেপে শটকেছে, এখন হয়তো জাকমেল এলাকায় গিয়ে কারবার ফেঁদেছে, যতদিন তাদের নুন চেখে দেখে আটকে রাখা যায়, ততদিন যেখানে জমি চাষ করে মরা মানুষরা। অথচ তবু ক্রীতদাসগুলোর হাবেভাবে দেখা গেলো উদ্ধত এক খোশমেজাজ। যাদের কাজ ছিলো গম-পেষাই বা আখ-মাড়াইয়ের ছন্দ বানানো তারা এমন ক্ষিপ্র হাতে আগে কখনও ঢাক পেটায়নি। রাত্তিরে তাদের ছাউনি আর কুঠুরি থেকে নেগ্রোরা একে আরের সঙ্গে তথ্য চালাচালি করে, সঙ্গে থাকে প্রবল উল্লাস, আর অদ্ভুত যত খবর : একটা সবুজ গিরগিটি নাকি তামাক পাতার গোলাব ছাতে পিঠ গরম ক'রে শুয়েছিলো ; কেউ সেদিন দিনে-দুপুরে দেখেছে এক পেল্লায় নিশিপোকা উড়ে বেড়াচ্ছে হাওয়ায় ; এক তাগড়াই কুকুর—তার সব লোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে—বাড়ির মধ্য থেকে হুড়মুড় ছুটে বেরিয়ে এসেছিলো, মুখে ছিলো হরিণের মাংসের মস্ত এক রাং ; এক গাংচিল—সমুদ্র থেকে এত দূরে ! তাজ্জব ! —পেছনের বারান্দায় লতাপাতার ওপর ডানা থেকে উকুন ঝেড়ে ফেলে চ'লে গিয়েছে।

সবাই তারা জানতো যে সবুজ গিরগিটি, নিশিপোকা, অদ্ভুত কুকুর বা অবিশ্বাস্য গাংচিল আসলে নানারকম ছদ্মবেশ ছাড়া আর-কিছু নয়। আর, মাকান্দাল যেহেতু নানারকম চেহারা নিতে পারে—খুরওলা জন্তু, পাখি, মাছ অথবা পোকামাকড়ের—অতএব সে রোজ রাতে আসে সমভূমির খামারে, তার বিশ্বাসী অনুচরদের ওপর নজর রাখতে, আর এটাও জেনে নিতে যে, সে যে একদিন ফিরে আসবে, এ-বিষয়ে এখনও তাদের পুরোপুরি আস্থা আছে কি না। এই-ঐ রূপান্তর, যাতেই হোক না কেন, এই একহাতের মানুষটি আছে সাবধানে, সবখানে—বিশেষত এখন যখন তার জীবজন্তুর ছদ্মবেশ পরার অতিলৌকিক ক্ষমতা আছে। একদিন ডানা নেড়ে, অন্যদিন খুরে ঠকাঠক তুলে, কদম-কদম বা বুকে হেঁটে, সে এবার প্রভু হ'য়ে উঠেছে পাতালের সব স্রোতগুলোর আর এইভাবেই সে এখন শাসন করে সারা দ্বীপ। অসীম তার

ক্ষমতা। সে যেমন অনায়াসেই পারে কোনো মাদি ঘোড়ার সঙ্গে সংগম করতে, তেমনি পারে কোনো চৌবাচ্চার ঠাণ্ডায় বিশ্রাম করতে; যেমন ঝুলতে পারে কোনো দোদুল ডাল থেকে তেমনি গ'লে যেতে পারে কোনো চাবির ফোকর দিয়ে; কুকুররা তাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে না, ইচ্ছেমতো সে বদ্‌লে ফেলতে পারে তার ছায়া। এই-যে এক নেগ্রো মেয়ে এমন-এক ছেলের জন্ম দিলে মুখটা যার বুনো বরার, সে তো তারই জন্যে। রাত্তিরে সে দেখা দেয় রাস্তাঘাটে, গায়ে কোনো ছাগলের চামড়া, মাথায় দাউ-দাউ আগুনের শিং। একদিন সে নিশ্চয়ই দেবে মহাবিদ্রোহের সংকেত, আর ঐ দূর অতীতের প্রভুরা—যাঁদের পুরোভাগে আছেন পথের দেবতা দম্বোলা আর তলোয়ারের দেবতা ওগুন—তাঁরা নিয়ে আসবেন বজ্র আর বিদ্যুৎ আর লাগাম ছিঁড়ে বার ক'রে দেবেন ঘূর্ণিঝড় যা মানুষের হাতের সব কাজ চুকিয়ে দেবে। সেই মহান লগ্নে—তি নোয়েল বললে—শাদাদের রক্ত ব'য়ে যাবে ঝরনা দিয়ে আর লোয়ারা—আনন্দে উচ্ছল—সেই ঝরনায় গুঁজে দেবে তাদের মুখ, আর যতক্ষণ না ফুশফুশ ভ'রে যাবে কানায়-কানায়, পান ক'রেই চলবে একটানা।

উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা চার বছর টিকে ছিলো, আর উদ্‌গ্রীব কানগুলো কখনো বিশাল শঙ্খধ্বনি শুনবে না ভেবে হতাশ হয়নি, যে-কোনো মুহূর্তে পাহাড় থেকে পাহাড়ে শঙ্খনির্ঘোষে সবাইকে জানানো হবে যে অবশেষে মাকান্দাল তার রূপান্তরের বৃত্ত পুরোপুরি সম্পূর্ণ করেছে, আর উদ্যত, সে দাঁড়িয়েছে আবার, কঠিন, পেশল, কণ্ডরায় টান টান, শিলাখণ্ডের মতো অণ্ডকোষ, তার মানুষী পায়ের ওপর।

৭

মানুষী বেশ

ধোবানি মারিনেৎকে আবার দিন কয়েকের জন্যে শোবার ঘরে পুনর্বাহাল করবার পর মঁসিয়ে লেনরমঁ দ মেজি, লিমোনাদ-এর পল্লিযাজকের ঘটকালি মারফৎ আবার বিয়ে করেছেন—এক ধনী বিধবাকে, খোঁড়া আর পতিপ্রাণা। ফলে, সেবারকার ডিসেম্বরে যখন প্রথম উত্তুরে হাওয়ারা ঝাপটা দিতে লাগলো, বাড়ির দাসদাসীরা, নতুন মালকিনের ছড়ির নির্দেশনায়, প্রভঁসের সন্তদের পর-পর সাজাতে শুরু করলে, কাগজের-মণ্ড-তৈরি একটা সুড়ঙ্গের মুখে—তার গায়ে তখনও গরম-গরম আঠার গন্ধ—বড়োদিনের ছুটির সময় বাইরের ছাঁইচের ওপর যেগুলোকে আলো দিয়ে

সাজানো হবে। সিন্দুকনির্মাতা তুস্যাঁ কাঠের গায়ে কুঁদে-কুঁদে বানিয়েছে ত্রিপ্রজ্ঞাবান, কিন্তু হেসু ক্রিস্তোর জন্মোৎসবের তুলনায় তারা মাপে বড্ড বড়ো হ'লো ব'লে শেষটায় তাদের আর দাঁড় করানো হ'লো না—প্রধানত বালথাসারের চোখের ভয়াবহ শাদার জন্যেই—সেটা বিশেষ যত্ন নিয়ে রং করা হয়েছিলো, আর সেটা দর্শকদের ওপর এমন-একটা ছাপ ফেলতো যেন সে জলে-ডোবা মানুষের ভয়াবহ তিরস্কার নিয়ে আবলুশ কালো রাত্তির থেকে উঠে এসেছে। তি নোয়েল, এবং বাড়ির অন্য ক্রীতদাসেরা, হেসু ক্রিস্তোর জন্মকাহিনীর অগ্রগতি লক্ষ করলে; মনে-মনে জানে যে উপহারের দিন আর মাঝরাতের সমবেত প্রার্থনার লগ্ন আসন্নপ্রায়, যে-সময় অতিথিবিথিদের আনাগোনায় আর উৎসবের হৈ-হুল্লোড়ে মালিকদের কড়া শৃঙ্খলা একটু ঢিলে হ'য়ে যায়, যার ফলে রসুইখানায় ঝলশানো শুওরের কান হাতিয়ে নেয়া কঠিন হয় না, অথবা পিপের ছিপি খুলে এক চুমুক মদ টানতেও অসুবিধে হয় না, কিংবা রাত্তিরে হুট ক'রে ঢুকে পড়া যায় নতুন-কেনা আঙ্গোলিনির আস্তানায়, ছুটির পরে মালিক যাকে খ্রিষ্টান প্রথামতোই বলাৎকার করবেন। কিন্তু তি নোয়েল তো জানে যে এ-সময়ে যখন মোমগুলো জ্বালানো হবে এবং সুড়ঙ্গের সোনা যখন ঝিলিক ছিটোবে, তখন তিনি আশপাশে থাকবেন না। তিনি সে-রাতে থাকবেন অনেক দূরে, দ্যু ফ্রেনেদের খামারের মচ্ছবটায়, প্রতিজনে এক এক গেলাশ ক'রে ইস্পানি ব্র্যাণ্ডি দিয়ে মালিকের বাড়ির প্রথম মরদের জন্ম উদ্‌যাপন করার জন্যে।

Roulé, roulé, congoa roulé !

Roulé, roulé, congoa roulé !

A fort ti fille ya danse congo ya-ya ro´ !

দু-ঘণ্টারও ওপর ঢাকগুলো বুম-বুম ক'রে চলেছে মশালের আলোয়, মেয়েদের কাঁধ তালে-তালে এমনভাবে নেচেছে যেন তারা কাপড় ধোবার জন্যে আছড়াচ্ছিলো এতক্ষণ, এমন সময় মুহূর্তের কাঁপন জেগে উঠলো গায়কদের গলায়। জননী ঢাকটার আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালো মাকান্দালের মানুষী মূর্তি। সেই মান্দিঙ্গ, মাকান্দাল। মানুষ মাকান্দাল। একহাতওলা মানুষ। পুনকথিত। রূপান্তরিত। পুনর্নব। কেউ তার সঙ্গে কথা বললে না, কিন্তু তার দৃষ্টি মিললো সকলের দৃষ্টির সঙ্গে। আর ব্র্যাণ্ডির গেলাশগুলো হাতে-হাতে চ'লে এলো তার ঐ সবেধন হাতটির দিকে, যে জেনেছে দীর্ঘ অন্তহীন এক পিপাসা। তার ঐ রূপান্তরগুলোর পর এই প্রথম তাকে চোখে দেখলে তি নোয়েল। রহস্যময় সব আস্তানায় ঘাপটি মেরে

থাকার কী একটা চিহ্ন যেন লেপ্টে আছে তার গায়ে, তার এই পর-পর আঁশ, কাঁটা, লোম, খুরের বেশ প'রে নেবার চিহ্ন। তার চিবুক নিয়ে নিয়েছে এক শ্বাপদ তীক্ষ্ণতা, তার চোখগুলো যেন একটু বাঁকা হ'য়ে গেছে কপালের ওপর দিকে, ঠিক সেই পাখিগুলোর মতো যাদের বেশ সে ধরেছিলে ; মেয়েরা তার সামনে দিয়ে গেলো একবার, আবার গেলো, তাদের দেহ হিল্লোলিত হ'য়ে উঠেছে নাচের ছন্দে। কিন্তু হাওয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে এমনই আকীর্ণ হ'য়ে ছিলো যে, আচমকা, আগে থেকে কিছু ঠিক না-করা সত্বেও, সকলের গলা ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে যোগ দিলে এক গম্ভীর ডুকরানিতে—'ইয়েনভালো'য়'। চার বছর অপেক্ষার পর, মন্ত্র হ'য়ে উঠেছে অপরিসীম দুঃখ বেদনার এক প্রবল আবৃত্তি :

Yenvalo′ moin Papa !
Moin pas mangé q'm bambo
Yenvalo′, Papa, yenvalo′ moin !
Ou vlai moin lavé chandier,
Yenvalo′ moin ?

'আমাকে কি পিপেগুলো ধুয়ে যেতেই হবে ? আমাকে কি বাঁশগুলো খেয়ে যেতেই হবে ?' যেন তাদের আঁৎ থেকে পেঁচিয়ে টেনে বেরিয়ে এসে প্রশ্নগুলো একটা আরেকটাকে হুড়মুড় ক'রে মাড়িয়ে যাচ্ছে—সমস্বরে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে বন্দী মানুষদের সেই চরম দুমড়ে-যাওয়া হতাশা, যাদের দিয়ে গ'ড়ে তোলা হয়েছে পিরামিড, মিনার বা অন্তহীন সব প্রাচীর। 'হায় তাত, তাত আমার, কত দীর্ঘ এই রাস্তা ! হায় তাত, তাত আমার, কত দীর্ঘ এই দুঃখযন্ত্রণা !' এত বিলাপের মধ্যে তি নোয়েল ভুলেই গিয়েছিলো যে শাদাদেরও কান আছে। সেইজন্যেই, দু্য ফ্রেনেদের বিশাল বাড়িটার বারান্দায় সব গাদাবন্দুক, সেকেলে একনলা, আর পিস্তলে ঠাশা হ'লো বারুদের বল, এইমাত্র যাদের নামিয়ে আনা হয়েছে দেয়ালে তাদের খোপ থেকে। আর সবরকম বেকায়দার মোকাবিলা করার জন্যে রেখে যাওয়া হ'লো ছুরি, কাটারি, বল্লম, মুগুরের এক বিশাল সরবরাহ, সেই মেয়েদেরও —যারা এর মধ্যেই আওড়াতে শুরু করেছে প্রার্থনা, আর মাকান্দালের গ্রেফতারের জন্যে ঈশ্বরের কাছে কাকুতিমিনতি।

৮

মহা উড়াল

জানুয়ারির এক সকালবেলায়, দিন ফোটবার একটু আগে থেকেই, উত্তরের সমভূমির সব খামারের ক্রীতদাসেরা এল্ কাবো-য় প্রবেশ করতে শুরু করলে। ঘোড়ার পিঠে তাদের তদারক ক'রে নিয়ে এসেছে তাদের মালিক আর উপদর্শকেরা, সঙ্গে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রহরীর দল. ক্রীতদাসেরা কালো ক'রে তুলতে শুরু করেছে নগরীর চৌকো চত্বর, আর সামরিক কাড়ানাকাড়া থেকে উঠছে গম্ভীর আওয়াজ। কিছু সৈন্য একটা কেব্রাচো গাছের খুঁটির নিচে জড়ো করছে শুকনো ডালপালা, অন্যরা একটা পেতলের গামলায় এনে ফেলছে জ্বালানি। বড়ো গির্জেটার সামনের থামগুলোর মধ্যে, ধনুর্বন্ধনী দিয়ে টান ক'রে টাঙানো অন্ত্যেষ্টি চাঁদোয়ার ছায়ায় লম্বা-লম্বা আরামকেদারায় রাজ্যপালের পাশে ব'সে আছেন সব বিচারক ও রাজপ্রতিনিধির দল এবং ধর্মসভার উঁচু থেকে নিচু মাতব্বরেরা পর-পর। ঝুলবারান্দাগুলোয় ন'ড়ে যাচ্ছে ঝলমলে সব আতপত্র, যেন জানলার টবে-সাজানো ফুলগুলোরই উৎফুল্ল হিল্লোল। যেন কোনো-এক বিশাল প্রেক্ষাগৃহে এসে মেয়েরা এই খোপ থেকে ঐ খোপের কাউকে লক্ষ ক'রে কথা বলছে, তাদের দস্তানা-ঢাকা হাতে পাখা, সশব্দে কিচিরমিচির করছে সবাই, গলাগুলো উপভোগ্যভাবে উত্তেজিত। যাদের বাড়ির জানলা চত্বরের একেবারে মুখোমুখি, তারা অতিথিদের জন্যে তৈরি করেছে লেমোনেড আর পেস্তাবাদাম-দেয়া সরবৎ। নিচে, ঠাশাঠাশি দাঁড়িয়ে, প্রতিক্ষণে ঘেমে-নেয়ে অস্থির, নেগ্রোরা অপেক্ষা করছে প্রদর্শনীটার, তাদেরই জন্যে তো এই উৎসব, এই জমকালো অনুষ্ঠান—যার জাঁকজমকের জন্যে অকাতর অর্থব্যয়ে একফোঁটাও কার্পণ্য করা হয়নি। কারণ এবার শিক্ষাটা ঠুশে দিতে হবে এদের হাড়ে-মজ্জায়,—আগুন দিয়ে, রক্ত দিয়ে নয়, আর মনে রাখবার জন্যে জ্বালানো কোনো-কোনো দেয়ালি তো বেশ ব্যয়সাপেক্ষই।

একটা নির্দিষ্ট সময়ে সব পাখা একসঙ্গে সশব্দে মুড়ে গেলো। সামরিক কাড়ানাকাড়ার আড়ালে এক বিশাল স্তব্ধতা। মাকান্দাল, তার কোমর জড়িয়ে আছে ডোরাকাটা পাৎলুন, দড়িতে আর গিঁটে শক্ত ক'রে বাঁধা, সাম্প্রতিক ক্ষতগুলোর দরুন চকচক করছে তার চামড়া, এগিয়ে এসেছে চত্বরের ঠিক মাঝখানে। মালিকদের চোখ জিজ্ঞাসায় হাৎড়ালে ক্রীতদাসদের মুখ। কিন্তু নেগ্রোরা দেখালে এক

বিষেবেত্তরা ঔদাসীন্য। নেগ্রোদের ব্যাপার-স্যাপার কী জানে, কতটা জানে, শাদারা? তার রূপান্তরগুলোর আবর্তনে, মাকান্দাল মাঝে-মাঝেই ঢুকেছিলো কীটপতঙ্গের রহস্যময় জগতে, তার মানুষী হাতের অভাব সে পূরণ করেছিলো অনেকগুলো পায়ে, চারটে ডানায় অথবা লম্বা-লম্বা শুঁড়ে। সে হ'য়ে উঠেছিলো মাছি, প্রজাপতি, কেন্নো, পিঁপড়ে, টারানটুলা, কাচপোকা, এমনকী ফসফরের সবুজ আলো ছড়িয়ে জোনাকি। যখন লগ্ন আসবে, খ'শে পড়বে মান্দিঙ্গের সব বন্ধন: খুঁটির গা বেয়ে হড়কে পড়ার আগে, হাওয়ার মধ্যে কোনো মানুষমূর্তির আকার হাৎড়াতে-হাৎড়াতে, বন্ধনগুলো আবিষ্কার করবে দখলে রাখবার জন্যে কোনো শরীর নেই আর। আর, মাকান্দাল—এক ভনভনে মশায় রূপান্তরিত—শাদাদের হতাশাকে টিটকিরি দিয়ে নেমে পড়বে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের ত্রিচূড় টুপিটায়। এই কথাটাই জানে না মালিকরা; এইজন্যেই এই অবান্তর অপ্রয়োজনীয় প্রদর্শনীটার আয়োজন ক'রে, এত টাকা অপব্যয় ক'রে, শাদারা হাতে-নাতে টের পাবে যে মহান লোয়াস যার গায়ে পবিত্র তেল মাখিয়ে দিয়েছেন, তার কাছে তারা কেমন সর্বাঙ্গীনভাবে অসহায়।

এবার মাকান্দালকে ঠেশে আটকানো হয়েছে খুঁটির গায়ে। জল্লাদ সাঁড়াশি দিয়ে তুলে ধরেছে এক জ্বলন্ত অঙ্গার। আগের দিন সন্ধ্যায় আয়নার সামনে মহড়া দিয়ে-দিয়ে রাজ্যপাল যে-ভঙ্গিটা নিখুঁত করেছিলেন, সেই ভঙ্গিতে রাজ্যপাল কোষ থেকে খুললেন তাঁর পোশাকি অসিটা, আর দণ্ডাজ্ঞা পালনের আদেশ দিলেন। আগুন জেগে উঠতে শুরু করলো মান্দিঙ্গের দিকে, তার পা চেটে-চেটে। সেই মুহূর্তে মাকান্দাল এক ভয়াবহ মুদ্রায় নাড়ালে তার কাটা হাতের শুঁড়িটা, সেটা তারা দড়ি দিয়ে বাঁধতে পারেনি, আংশিক হওয়া সত্ত্বেও ভঙ্গিটা ভয়াবহ; অজানা সব মন্ত্র ডুকরে উঠলো সে, প্রচণ্ডভাবে সামনে চেতিয়ে ধরলে তার ধড়। বাঁধনগুলো খ'শে প'ড়ে গেলো, নেগ্রোটির শরীর উড়ে গেলো শূন্যে, আর মাথার ওপর দিয়ে উড়াল দিলে সে কিছুক্ষণ, তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্রীতদাসদের সমুদ্রের কালো ঢেউয়ের মধ্যে। একটা ধ্বনি ছড়িয়ে দিলে চত্বর:

'মাকান্দাল বেঁচে গিয়েছে!'

হুলুস্থুল প'ড়ে গেলো তারপর। প্রহরীরা বন্দুকের কুঁদো বাড়িয়ে পড়লো ডুকরে-ওঠা ক্রীতদাসদের মধ্যে—তারা এখন রাস্তা ভাসিয়ে যাচ্ছে, উঠে পড়ছে এমনকী জানলা অব্দি। আর শোরগোল আর চীৎকার আর হৈ-রৈ এমনই হ'লো যে খুব কম লোকেই দেখতে পেলে যে মাকান্দাল—তাকে পাকড়ে ধ'রে রেখেছিলো

দশ-দশজন সৈন্য—প্রথমে আগুনে ঠুশে ঢোকানো হয়েছে তার মাথা, আর তার চুল চেটে খেয়ে লেলিহান শিখা ডুবিয়ে দিয়েছে তার শেষ আর্ত চীৎকার। ক্রীতদাসদের মধ্যে যখন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হ'লো, তখন আগুন জ্বলছে স্বাভাবিক, ভালো কাঠ খেতে পেলে যেমন জ্বলে আগুন, আর সমুদ্র-থেকে-বওয়া হাওয়া তুলে নিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়া জানলাগুলোর দিকে, যেখানে একাধিক মহিলা তখন মূর্চ্ছা থেকে ফিরে আসছেন চেতনায়। আর-কিছুই কোথাও আর দেখবার নেই!

সেদিন বিকেলে ক্রীতদাসেরা সারা রাস্তা হাসতে-হাসতে ফিরে এলো খামার-গুলোয়। মাকান্দাল তার কথা রেখেছে, এই মর্তের রাজত্বেই সে থেকে গিয়েছে। আরো-একবার শাদাদের ভেলকি দেখিয়ে দিয়েছে অন্য তীরের বিশাল শক্তিরা। আর যখন মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি তাঁর রাতটুপিতে কান ঢেকে তাঁর পতিপ্রাণা স্ত্রীকে বললেন, নিজেদের জাতের কাউকে পুড়িয়ে মারতে দেখেও নেগ্রোদের কোনো অনুভূতি হয়নি—তা থেকে মানবজাতির বৈষম্য ও অসাম্য সম্বন্ধে কতগুলো দার্শনিক তত্ত্বও খাড়া করলেন যা তিনি লাতিন বুলির মাখন মাখিয়ে জম্পেশ ক'রে তৈরি করেছেন—ঠিক তখন, তি নোয়েল রসুইঘরের ছুকরিদের একটাকে যমজ বাচ্চা উপহার দিলে, আস্তাবলের মস্ত জাবনাটার ওপর মেয়েটিকে ফেলে সে পর-পর তিনবার রেতঃপাত করেছিলো।

দ্বিতীয়

…আমি তাঁকে বললুম যে ওখানে তিনি রানী হবেন, যে তিনি ঘুরে-ঘুরে বেড়াবেন পাল্কিতে; যে তাঁর ক্ষুদ্রতম ভঙ্গি দেখেই কোনো ক্রীতদাস তাঁর সব অভিলাষ পূরণ ক'রে দেবে, যে তিনি হেঁটে বেড়াবেন মুকুল-ধরা কমলা-লেবুর বনে, যে সাপখোপের কোনো ভয় নেই তাঁর—আন্তিইয়েতে কোনো সাপই নেই; যে জংলিদের ভয় পাবার কিছু নেই, যে ওখানে লোকজনকে শূলে বিঁধিয়ে ঝলশানো হয় না; শেষটায় আমি আমার কথা এই ব'লে শেষ করলুম যে ক্রেয়োলদের মতো সাজলে তাঁকে খুবই রূপসী দেখাবে।

—মাদাম দ্য' ব্রাঁতেস

১

মিনোস আর পাসিফাঈয়ের দুহিতা

মঁসিয় লেনর্‌মঁ দ্য মেজির দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর খুব বেশি পরে নয়, তি নোয়েলকে যেতে হয়েছিলো এল্‌ কাবোতে: সরকারি উৎসব উপলক্ষে ব্যবহার করার জন্যে পারী থেকে কিছু জিন ও লাগাম সরাসরি আনতে হুকুম করা হয়েছিলো—সেগুলো আনবার জন্যে। এই ক-বছরের মধ্যেই দারুণ উন্নতি হয়েছে শহরের, প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি। প্রায় সব বাড়িঘরই দোতলা—বিশাল ছাইচওলা অলিন্দ আর উঁচু ধনুকের মতো খিলানে বসানো দরজা, চকচকে ছিমছাম খিল আর পাল্লা, আর মাথার ওপর দিকটা তেফলা পাতার মতো। আরো কত দরজি, টুপিওলা, পালককর্মী, কেশ প্রসাধক: একটা দোকানে আবার ভেওলা আর আড়বাঁশিও বেচে, সেই সঙ্গে কঁৎর্‌দাঁন্স আর সোনাটার স্বরলিপি। বই-বিক্রেতারা সাজিয়ে রেখেছে সাঁন্তো দোমিঙ্গো গেজেটের সর্বশেষ সংখ্যা—পাৎলা কাগজে ছাপা, চারপাশে লতাপাতার সীমারেখা, আর ফাঁক-ফাঁক ক'রে সাজানো খবর। আর বিলাস-ব্যসনের আরো-এক দফা, রু ভঁদ্‌য়েইয়ে খোলা হয়েছে নাটক আর অপেরার জন্যে এক নাট্যমঞ্চ। রু দে এস্পানিওলের জন্যে এই সমৃদ্ধি বিশেষ সৌভাগ্যসূচক—ওস্তাদ বাবুর্চি অঁরি ক্রিস্তফ তার পুরোনো মালকিন মাদমোয়াজেল মঁজ'-এর কাছ থেকে সদ্য কিনে নিয়েছে ওবের্জ্‌ দ্য লা কুরন্ন্‌, সেখানে সবচেয়ে বড়োলোক অতিথিরা আস্তানা পাড়ে। নেগ্রোটির রান্নার খ্যাতি দারুণ; পারী থেকে সদ্য-আগত কোনো অতিথির মনোরঞ্জনের জন্যে সে যেমন চমৎকার মশলা ফোড়ন দেয় রান্নায়, তেমনি, দ্বীপের অন্য তীর থেকে যখন কোনো বুভুক্ষু এস্পানি আসে, আগেকার দিনের বোম্বেটেদের মতো সাজপোশাক গায়ে, তার রান্নায় তখন থাকে মালমশলার ঝাঁজালো প্রাচুর্য। তাছাড়া, উঁচু শাদা টুপি-পরা, অঁরি ক্রিস্তফ, ধোঁয়ায়-ধোঁয়াক্কার রসুইঘরে, কেমন যেন জাদু জানে, যখন সে রাঁধে কচ্ছপের ভলো-ভঁ অথবা বনপায়রা। আর যখন সে নিজে হাত দেয় মেশাই-বাটিতে, তার ফেটানো মশলার খুশবু ছড়িয়ে যায় এমনকী রু দে ত্রোয়া ভিসাজ অব্দি।

আরো-একবার শোকাহত, মঁসিয় লেনর্‌মঁ দ্য মেজি, প্রিয়াবিয়োগের স্মৃতিতে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা না-দেখিয়েই, এল্‌ কাবো-র নাট্যমঞ্চের এক অক্লান্ত দর্শক হ'য়ে উঠলেন; সেখানে পারীর নটীরা গান করে জঁা জাক রুসোর আরিয়া অথবা পর্বার্দের

মাঝখানে থেমে, কপাল থেকে ঘাম মুছতে-মুছতে, উঁচু গলায় শোনায় আচ্ছন্ন বিধুর আলেক্সান্দ্রাইন ছন্দ। কারু-একটা বেনামি মানহানির কবিতা, কোনো-কোনো বিপক্ষীকের ছ্যাকচোঁক ভাবকে ধিক্কার দিয়ে, জগতের কাছে উন্মোচিত করলে এই তথ্য যে, সমভূমির অনেক খামারমালিক নিত্যই নৈশ সান্ত্বনা লাভ করছেন মাদমোয়াজেল ফ্লরিদরের রসালো শাঁসালো ফ্লেমিশ সৌন্দর্যের মধ্যে—যে কিনা কোনো শ্রীছন্দ ছাড়াই বিশ্বস্ত সহচারীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে যায়, যার নাম সবসময় দেখা দেয় ভূমিকালিপির সবচেয়ে শেষে, কিন্তু রতিশিল্পে যার প্রতিভা নাকি তুলনাহীন। তারই প্ররোচনায় মালিক অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন, পালা-গানের মরশুম শেষ হ'তেই পারী চ'লে গেলেন. খামারের তদারকির ভার দিয়ে গেলেন এক আত্মীয়ের হাতে। কিন্তু, অদ্ভুত কিছু-একটা ঘটেছিলো নিশ্চয়ই তাঁর। কয়েকমাস পরেই, রোদ, খোলামেলা জমি, প্রাচুর্য, আদেশ-অনুজ্ঞা, আখের-খেতের-ধারে-পেড়ে-ফেলা নেগ্রো মাগিরা—এ-সবের জন্যে কামনা বেড়েই চললো, তাঁকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে যে, এত বছর ধ'রে উদ্‌গ্রীবভাবে যে-কামনা তিনি মনে-মনে পুষছিলেন, সেই 'ফ্রান্সে-ফিরে-আসা', তাঁর কাছে আদৌ আর সুখের চাবি নয়। উপনিবেশকে এত শাপশাপান্ত করার পর, এর আবহাওয়াকে এত গালাগাল দেবার পর, আর হঠাৎ-নবাব উপনিবেশওলাদের স্থূলতাকে এত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করার পর, তিনি শেষটায় খামারেই ফিরে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন অভিনেত্রীটিকে, পারীর নাট্যকে দলগুলো তাঁকে দলে রাখতে অস্বীকার করেছে, তাঁর অভিনয়ক্ষমতার সুপ্রকাশ অভাবের জন্যে। আর তাই, রোববারগুলোয়, দুটো চমৎকার ঘোড়ার গাড়ি, চাপরাশ-আঁটা কোচোয়ান সমেত, গির্জেয় যাবার ছলে আবার সমভূমির পথঘাট সুশোভিত ক'রে তুললো। মাদমোয়াজেল ফ্লরিদরের সুবিধের জন্যে—তিনি আবার মঞ্চের নামটি ব্যবহার করতেই বাধ্য করতেন—দশটি মুলাটো যুবতী কুঁকড়ে-মুকড়ে ব'সে থাকতো পেছনের আসনে, অবিশ্রাম কিচিরমিচির ক'রে কী-সব কথা বলতো, আর তাদের নীল পেটিকোট উড়তো হাওয়ায়।

এ-সবের মধ্যেই কেটে গেছে কুড়িটি বছর। এক রাঁধুনির গর্ভে তি নোয়েল পয়দা করেছে বারোটি ছেলেমেয়ে। আগের চেয়েও অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে খামার, তার রাস্তাগুলোর ধারে-ধারে বসানো হয়েছে ইপিকাক, আর তার লতাপাতার রস থেকে এর মধ্যেই বানানো হচ্ছে টক-টক এক সুরা। তবু, বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ছিট বেড়েছে মঁসিয় লেনরমাঁ দ্য মেজিঁর, বড্ড বেশি মদ খান। এক অনন্ত রতি-কামনায় ভোগেন তিনি, ক্রীতদাসদের ডাঁশা ছুঁড়িগুলোর পেছনে সারাক্ষণ

হাসফাঁস করেন, তাদের গায়ের গন্ধ তাঁকে পাগল ক'রে দেয়। পুরুষদের ওপর দৈহিক শাস্তি ও লাঞ্ছনার পরিমাণ তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেক গুণ, বিশেষ ক'রে যারা বিবাহের বাইরে সংগম করে। এদিকে অভিনেত্রী, ম্যালেরিয়ার কামড়ে বিলীয়মানা, তাঁর অভিনয়কলার ব্যর্থতার শোধ তোলেন সেই নেগ্রো মেয়েদের ওপর যারা তাঁকে স্নান করায়, চুল আঁচড়ে পরিপাটি ক'রে বেঁধে দেয়, একটু ছুতো পেলেই যাদের তিনি চাবকাতে হুকুম করেন। কোনো-কোনো রাতে বোতল আঁকড়ে ধরেন তিনি। সে-সময় তাঁর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক হ'তো না সব ক্রীতদাসকে বেরিয়ে আসতে বলতে—পূর্ণিমার চাঁদের তলায়, আঙুরের কড়া মদের হেঁচকির ফাঁকে-ফাঁকে, তাঁর বন্দী শ্রোতাদের সামনে সেই বিখ্যাত ভূমিকাগুলো তিনি অভিনয় ক'রে দেখান, যেগুলো তাঁকে কখনও করতে দেয়া হয়নি। সহচরীর ওড়নায় ঢাকা, ছোটো-ছোটো ভূমিকার ভীরু অভিনেত্রী কাঁপা-কাঁপা চড়া গলায় আক্রমণ ক'রে বসে চেনাশোনা সব কারদানি দেখাবার নাট্যাংশ :

> **Mes crimes désormais ont comblé la mesure**
> **Je respire à lafois l'inciste et l'imposture**
> **Mes homicides mains, promptes à me venger,**
> **Dans le sang innocent brulent de se planger.**
> [রাশি-রাশি পাপাচার উপচে পড়ে চারপাশে এখনি।
> ওতপ্রোত ভ'রে আছে ভণ্ডামি ও অজাচারে। শুধু দিন গণি,
> লাঞ্ছনার শোধ নেবে—এই ভেবে তাপিত, অধীর
> জিঘাংসু এ-দুই হাত কবে ছানবে নির্দোষ রুধির।]

তাজ্জব হ'য়ে হা ক'রে এ-সব যে কী, কিছুই বুঝতে না-পেরে, কিন্তু দু-একটা টুকরো-টাকরা কথা থেকে, যা ক্রেয়োলেও বোঝায় কিছু-কিছু কুকাজ, যার শাস্তি হয় কশাঘাত থেকে মুণ্ডচ্ছেদ অব্দি সবকিছুই, নিগ্রোরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো যে মহিলা অতীতে নিশ্চয়ই অজস্র পাপ করেছিলেন, আর এখন-যে উপনিবেশে এসেছেন তা নিশ্চয়ই কেবল পারীর কোতোয়ালির নাগাল এড়াবার জন্যেই, এল্ কাবো-র অনেক বেশ্যার মতোই, রাজধানীর সঙ্গে যাদের দেনাপাওনার হিশেবপত্র পুরোপুরি চোকেনি। দ্বীপের পাতোয়াতে 'পাপ' কথাটা একই ; সবাই জানে ফরাশি ভাষায় বিচারককে কী বলে ; আর নরক বা লাল শয়তানরা—তাদের তো

চাক্ষুষভাবেই বর্ণনা ক'রে দেখিয়েছিলেন মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজির-র দ্বিতীয়া পত্নী, শরীরের সব লালসা ও পাপাচারের তিনি ছিলেন দারুণ কড়া এক নিন্দুক। এক শাদা ঢোলা জামা গায়ে—মশালের আলোয় যেটা পুরোপুরি স্বচ্ছ—এই স্ত্রীলোকটি যে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে তার কিছুই খুব আধ্যাত্মিক উন্নতিসূচক নয়:

> Minos, juge aux enfers tous les pales humains,
> Alv, combien fremira son ombre é pouvantée,
> Lorsqu'il verra sa fille à ses yeux présentée,
> Contrainte d'avouer tant de forfaits divers,
> Et des crimes peut-etre inconnus aux enfers !
> [মিনোস বিচার করে মানুষের আত্মাকে, পাতালে।
> হায়, তার প্রেতচ্ছায়া শিউরে ওঠে নির্নিমেষ চোখে
> সমুখে তাকিয়ে রাখে যবে তার লাঞ্ছিত শিশুকে—
> নরকও জানেনি কভু অভিশপ্ত যে-ক্রিয়াকলাপ,
> বহুবিধ যে-কলুষ হীন কাজ, হীনতর পাপ,
> সব দেখে, প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর···]

এমন অধর্মাচরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, লেনরমঁ দ্য মেজির ক্রীতদাসেরা মাকান্দালের প্রতি শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় অবিচল থেকে গেলো। তি নোয়েল মান্দিঙ্গর কাহিনী হস্তান্তরিত ক'রে দিলে তার ছেলেমেয়েদের কাছে, তাদের শিখিয়ে দিলে সরল-সব ছোটো ছোটো গীতি ও গাথা, মাকান্দালের সম্মানে সে-সব গান বেঁধেছে সে নিজেই, আস্তাবলে ঘোড়াদের বালামচি আঁচড়াতে-আঁচড়াতে। তাছাড়া, এক-হাতওলা ঐ মানুষটার স্মৃতি সবুজ ও সতেজ রাখা ভালো কাজ, কারণ যদিও সে এখন জরুরি কাজে দূরে কোথাও ব্যস্ত হ'য়ে আছে, এই দেশে সে ফিরবেই একদিন—আচমকা—যখন লোকে তার প্রত্যাশা করবে সবচেয়ে কম।

২

সুগম্ভীর চুক্তি

মোর্‌ন রুজের শৈলশিরায় বরফ গড়িয়ে পড়ার মতো বজ্রের করতালি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো আর তারপর আস্তে-আস্তে ম'রে যাচ্ছিলো নয়ানজুলিগুলোর গভীরে, যখন উত্তরের সমভূমির বিভিন্ন খামারের প্রতিনিধিরা—তাদের কোমর অব্দি কাদায় মাখামাখি—ভিজে লেপটে-যাওয়া জামা গায়ে, ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে, পৌঁছুলো বোয়া কাইমঁ-র একেবারে হৃৎপিণ্ডে। ব্যাপারটাকে আরো অধম করবার জন্যে অগস্টের বৃষ্টি—কখনো তা পড়ে উষ্ণ, কখনো-বা ঠাণ্ডা হিম, হাওয়া যেমন-যেমন বদ্‌লে যায়—ক্রীতদাসদের উদ্দেশে সান্ধ্য নিষেধাজ্ঞা বাজবার পর থেকেই ক্রমবর্ধমান প্রকোপের সঙ্গে মুষলধারে পড়তে শুরু করেছে। তার পাঁৎলুন কুঁচকিতে লেপটানো, তি নোয়েল চেষ্টা করছিলো কেম্বিস কাপড়ের একটা বস্তাকে কানঢাকা টুপির মতো মাথায় জড়িয়ে নিয়ে মাথাটা বাঁচাতে। অন্ধকার সত্ত্বেও, কোনো খোচর এসে যে জমায়েতে ভিড়ে পড়বে, এমন সম্ভাবনা আদৌ নেই। যাদের বিশ্বাস করা যায়, চারপাশে শুধু তাদেরই কাছে বার্তা পৌঁছেছে—একেবারে শেষ মুহূর্তে। যদিও গলার স্বর অনেকটাই নামানো, তবু কথাবার্তার গুঞ্জন জঙ্গলকে ভ'রে দিয়েছিলো—কম্পমান পাতার ওপর বৃষ্টি পড়ার সবছাপানো একটানা আওয়াজের সঙ্গে তা মিলে-মিশে যাচ্ছিলো।

ছায়ামূর্তিদের সেই অধিবেশনে হঠাৎ সবাইকে ছাপিয়ে উঠলো কার প্রবল গলা—মাঝখানের স্তরপরম্পরা ছাড়াই এ-কণ্ঠস্বর চ'লে যেতে পারে কড়ি থেকে কোমলে, কথার মধ্যে অদ্ভুত ঝোঁক দেবার জন্য খাদ থেকে চ'লে এসে স্বরে উড়ে যায় রিনরিনে পর্দায়। ছিলো অনেক মন্ত্রঃপূত নিয়তি, এবং ভাষণের জাদু ছিলো অনেকটাই ক্রুদ্ধ উচ্চারণ আর চীৎকারে ভরা। কথা যে বলছে, সে বুকমান, জ্যামেকার লোক। যদিও বাজের আওয়াজ ডুবিয়ে দিচ্ছে আস্ত-আস্ত বাক্যাংশ, তি নোয়েল তবু অন্তত এটা বুঝতে পারলে যে কিছু-একটা ঘটেছে ফ্রান্‌সে, এবং খুবই প্রবল প্রতাপশালী কোনো মহোদয় ঘোষণা করেছেন যে নেগ্রোদের তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে, কিন্তু এল্ কাবো-র ধনী জমিমালিকেরা, তারা সবাই রাজতন্ত্রের কুত্তিদের বাচ্চা, সেই হুকুম মানতে অস্বীকার করছে। এইখানে এসে বুকমান কয়েক মুহূর্ত বৃষ্টি প'ড়ে যেতে দিলে গাছপালার ওপর, যেন সে অপেক্ষা ক'রে আছে

সেই বিদ্যুতের জন্তে যা সেলাই ক'রে দেবে সমুদ্রের ফাঁক। তারপর যখন বজ্র গেলো মিলিয়ে, সে বললে যে আফ্রিকার মহান লোয়াদের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছে—জলের এপারে যারা আছে দীক্ষিত তাদের সঙ্গে—লক্ষণ শুভ দেখতে পেলেই যুদ্ধ শুরু ক'রে দেবার জন্তে। আর তার চারপাশে যে-হর্ষধ্বনি ও সম্বর্ধনা উঠলো, তারই মধ্যে থেকে এলো এই চূড়ান্ত ভর্ৎসনা :

'গোরাদের ভগবান হুকুম করেছে দুষ্কৃতী। আমাদের দেবতারা আমাদের কাছে চান প্রতিশোধ। দেবতারাই পরিচালিত করবেন আমাদের বাহু, আমাদের দেবেন সাহায্য। গোরাদের দেবতার মূর্তি ধ্বংস ক'রে ফ্যালো—আমাদের অশ্রুর জন্তই সে পিপাসু; এসো, আমাদের নিজেদের গভীরে আমরা কান পেতে শুনি স্বাধীনতার আবেদন।'

প্রতিনিধিরা ভুলেই গেছে যে বৃষ্টি পড়ছে টপটপ, চিবুক থেকে উদরে নেমে এসে কোমরবন্ধের চামড়ায় আড় ধরিয়ে দিচ্ছে। ঝড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো এক ডুকরে-ওঠা ধ্বনি। বুকমানের পাশে দাঁড়িয়ে এক কৃশতনু দীর্ঘাঙ্গী নেগ্রো-রমণী নেড়ে যাচ্ছিলো পার্বণী কাটারি :

Fai Ogoun, Fai Ogoun, Fai Ogoun, O !
Damballah m'ap tiré canon,
Fai Ogoun, Fai Ogoun, Fai Ogoun, O !
Damballah m'ap tire canon !

লৌহ-আকরের ওগুন, বীর যোদ্ধা ওগুন, নেহাইয়ের ওগুন, ওগুন—সর্বাধিনায়ক, ভল্লবীর ওগুন, ওগুন-চাঙ্গো, ওগুন কাঙ্কানিকান, ওগুন ওবাতালা, ওগুন-পানামা, ওগুন বাকুলে—সবাইকে এখন স্মরণ করলে, রাদা-র এই স্ত্রীপুরোহিত :

Ogoun Badagri
Général Sanglant,
Saizi Z'orge
Ou Su Scell'orage
Ou fait Kataoun z'éclai !

কাটারিটা হঠাৎ ব'সে গেলো একটা কালো শুওরের পেটে, তিনটে আর্তনাদ ক'রে যে যার ক'রে দিলে তার নাড়িভুঁড়ি আর কলজে আর ফুশফুশ। তারপর, এক-এক ক'রে প্রতিনিধিদের ডাকা হ'লো তাদের মালিকদের নাম ধ'রে—কেননা

তাদের তো অন্তকোনো নামই আর নেই; প্রতিনিধিরা এগিয়ে এলো পর-পর, শুওরের সেই ফেনিল রক্তে ঠোঁট ভিজিয়ে নেবার জন্তে—একটা কাঠের ডেকচিতে রক্ত ধ'রে রাখা হয়েছিলো। তারপর তারা উপুড় হ'য়ে পড়লো ভিজে মাটির ওপর। তি নোয়েলও অন্তদের মতো, চিরকাল বুকমানকে মেনে চলবে ব'লে শপথ করলে। জ্যামেকার মানুষটি তখন তার বাহুতে জড়িয়ে ধরলে জ্যাঁ-ফ্রঁাসোয়া, বিয়াসু আর জ্যানোকে—তারা আজ রাতে আর খামারে ফিরবে না। অভ্যুত্থানের সাধারণ কর্মপরিষদের নাম ঘোষণা করা হ'লো। সংকেত দেয়া হবে আটদিন পরে। দ্বীপের অন্ত প্রান্ত থেকে, ইস্পানি ঔপনিবেশকদের কাছ থেকে সাহায্য আসার সম্ভাবনা আছে, তারা ফরাশিদের জিগরি দুশমন। আর এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, একটা ঘোষণা ও সনদ রচনা করা জরুরি—অথচ কেউই জানে না কেমন ক'রে কিছু লেখে, এমন সময় কার যেন মনে প'ড়ে গেলো আবে দ্য লা অঙ্গকে, দোন্দোর তিনি ধর্ম-যাজক, তিনি ভলতেয়ারের ভক্ত, যেদিন তিনি পড়েছেন মানবাধিকারের ঘোষণা, সেদিন থেকেই তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে নেগ্রোদের উদ্দেশে সহানুভূতি জানিয়ে এসেছেন—এবং তাঁর একটি হাঁসের পালকের কলম আছে।

বৃষ্টি যেহেতু স্ফীত ক'রে দিয়েছে নদীর প্রবাহ, তি নোয়েলকে, তাই, সেই আঠালো জলের ঝরনা সাঁৎরে পেরুতে হ'লো—যাতে উপদর্শকদের ঘুম ভাঙবার আগেই আস্তাবলে পৌঁছুতে পারে। উষার ঘণ্টাধ্বনি দেখতে পেলে সে গান গাইছে, ব'সে আছে খেতে, টাটকা এস্পার্তো ঘাসের স্তূপে কোমর গোঁজা, যে-ঘাসের গায়ে রৌদ্রের গন্ধ মাখা।

৩

শঙ্খ নির্ঘোষ

এল্ কাবোতে শেষ যে-বার গিয়েছিলেন, সেই থেকেই মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজির মেজাজ একেবারে তিরিক্ষি হ'য়ে আছে। রাজ্যপাল ব্ল্যাঁশ্‌ল—তিনি তাঁরই মতো রাজতন্ত্রী—সব ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে গেছেন; পারীর ঐ সব কল্পরাজ্যভক্ত খাশি-গুলোর বাষ্পোচ্ছল কথায় নেগ্রো ক্রীতদাসদের প্রেমে যাদের বুক থেকে যেন রক্ত ঝরে। প্যালে রয়্যালের তোরণের তলায় অথবা কাফে দ্য লা রেজ্যঁসের তাশের বাজির ফাঁকে-ফাঁকে মানবজাতির সাম্য সম্বন্ধে স্বপ্ন-দেখা কত সহজ। দিগ্‌দর্শক-

চিত্রকূটে হাওয়ায়-ফোলানো-গালের ট্রাইটন-শোভিত আমেরিকার বন্দরগুলোর দৃশ্যপরম্পরা ; উজ্জ্বল বুককোলানো ডবকা খুলাটো কিশোরী আর ন্যাংটো ধোবানিদের ছবি দেখে, অথবা আব্রাহাম ব্রুনিয়াসের আঁকা কলাবাগানের ছায়ায় সিয়েস্তা—ক্রান্সে যার প্রদর্শনী হয়েছিলো দ্য পারনির কবিতা আর 'Profession of Faith of the savogard vicar' ('স্যাভয়-এর পরিব্রাজকের বিশ্বাসের জীবিকা')-এর সঙ্গে—এইসব মনশ্চক্ষুতে দেখা নেয়। ভারি সহজ যে সান্তো দোমিঙ্গো হ'লো 'পোলবর্জিনী'র সেই পত্রশোভিত ভূস্বর্গ, যেখানে তরমুজগুলো যে গাছের ডাল থেকে ঝোলে না তার কারণ একটাই, কারণ এত উঁচু থেকে মাথায় পড়লে পথচারীদের তা মেরেই ফেলতো। ভলতেয়ারের বিশ্বকোষের তত্ত্বকথায় ভরপুর উদারনৈতিকদের দিয়ে ঠাসা, নির্বাচিত পরিষদ মে মাসে ভোট দিয়েছে যে নেগ্রোরা, মুক্ত ক্রীতদাসদের ছেলেরা, রাজনৈতিক অধিকার পাবে। আর এখন, খামারমালিকদের ভয়দেখানো গৃহযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়ায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এই পরাদৃষ্টিবাজেরা, উইম্‌ফেনের স্তানিস্লাউসের কেতায়, উত্তর দিয়েছে : 'আদর্শের চাইতে বরং উপনিবেশের সংসার প্রয়োজন'।

তখন নিশ্চয়ই রাত দশটা হবে, যখন মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি, তাঁর তিতকুটে সব ভাবনাচিন্তার ভাবর কেটে-কেটে অবসন্ন, বেরিয়ে গেলেন তামাকপাতার আড়তে, বলাৎকারের জন্যে কোনো-একটা ছুঁড়িকে যদি জোটানো যায়, বাবা যাতে চিবোতে পাবে এই জন্যে যে রাতরাতে কয়েকটা পাতা চুরি করতে এসেছে। অনেক দূর থেকে ভেসে এলো এক শঙ্খের নির্ঘোষ। যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য, সেই মন্থর বিলম্বিত ধ্বনির উত্তরে পাহাড়ি জঙ্গল থেকে আরো শঙ্খের আওয়াজ উঠলো। আর, তারপর, আরো ধ্বনি ভেসে এলো দূর দিগন্ত থেকে, সমুদ্রতীর থেকে, মিলো-র খামারের দিক থেকে। যেন উপকূলের সব শঙ্খ, সব ইণ্ডিয়ান শাঁখ, সব রক্তিম শঙ্খ—যা বাড়ির সামনের সিঁড়ির ধাপের রেলিঙে লাগানো, সব শাঁখ—যা প'ড়ে আছে একা-একা, শিলীভূত, পাহাড়ের চূড়ায়-শিখরে, সব একসঙ্গে, সমস্বরে, গান গাইতে শুরু ক'রে দিয়েছে। হঠাৎ আরেকটা শঙ্খ খামারের প্রধান বস্তি থেকে তুলে ধরলে তার ধ্বনি। অন্যরা, আরো-উঁচু পর্দায়, উত্তর দিলে নীলকুঠি থেকে, তামাকের আড়ত থেকে, আস্তাবল থেকে। মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি, ভয় পেয়ে, বুগানভিলিয়ার একটা ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

বস্তির সব দরজা একসঙ্গে দড়াম ক'রে খুলে গেলো, ভেতর থেকেই খিল ভেঙেই। লাঠিসোঁটা হাতে ক্রীতদাসেরা ঘিরে ধরলে উপদর্শকদের বাড়িগুলো, কেড়ে নিলে সব হাতিয়ার। খাতাঞ্চি—সে বেরিয়ে এসেছিলো পিস্তল হাতে—

সে-ই পড়লো প্রথম, তার গলাটা রাজমিস্ত্রির কর্ণিকে লম্বালম্বি এফোঁড়-ওফোঁড়। গোরার রক্তে হাত রাঙিয়ে নেগ্রোরা ছুটে এলো বড়ো বাড়িটার দিকে, তারা মৃত্যু চ্যাঁচাচ্ছে মালিকের, রাজ্যপালের, ঈশ্বরের, জগতের সব ফরাশির। কিন্তু, কত-কালের পিপাসার প্রবল তাড়ায়, তাদের বেশির ভাগই ছুটে গেছে মাটির তলার ভাঁড়ারে—মদের খোঁজে। শাবলের ঘা নোনামাছের পেটিগুলো সাবাড় ক'রে দিলে। কাঠ-মুচড়ে-তোলা পিপেগুলো ফিনকি দিয়ে ছোটালে মদের ধারা, মেয়েদের ঘাঘরার আঁচল রাঙিয়ে দিলে। ঠেলাঠেলি আর চ্যাঁচামেচির মধ্যে ছিনিয়ে-নেয়া সরুগলা ব্র্যাণ্ডির বোতল অথবা পেটমোটা খড়েমোড়া রামের বোতল দেয়ালে ঘা দিয়ে ভাঙা হ'লো। হেসে, ধাক্কাধাক্কি ক'রে, নেগ্রোরা পা হড়কে পড়লো টোম্যাটোর চাটনি, গন্ধ চা, হেরিঙের ডিম, মশলার পাতার ওপর—একটা চামড়ার ভিস্তি থেকে পচা তেলের স্রোত বেরিয়ে প'ড়ে আঠালো মাটির মেঝেকে পিছল ক'রে গেছে। উলঙ্গ এক নেগ্রো রসিকতা ক'রে লাফিয়ে পড়লো একটা চর্বির গামলায়। একটা মাটির বাসন নিয়ে দুই বুড়ি ঝগড়া করছে কঙ্গোলিতে। কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো হ্যাম আর কডমাছের শুঁটকি হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে আনা হ'লো। ভিড়ের পাশ কাটিয়ে, তি নোয়েল তার মুখ রাখলো ইস্পানি মদের একটা পিপের ছিপিখোলা মুখটায়, আর অনেকক্ষণ ধ'রে উঠলো আর নামলো তার কণ্ঠা। তারপর, তার বড়ো ছেলেদের পেছনে নিয়ে, সে গেলো বাড়ির দোতলায়। সে যে কতদিন ধ'রে সে মাদমোয়াজেল ফ্লরিদরকে ধর্ষণ করার স্বপ্ন দেখেছে। সেইসব রাত্তিরে, যখন তিনি শোকবিহ্বল সব সংলাপ আওড়াতেন, গ্রীকচাবির আঁচল লাগানো ঢোলা জামার তলায় মাদমোয়াজেল ফ্লরিদর এমন-দুটি স্তন দেখিয়েছিলেন যা বছরগুলোর সুনিশ্চিত দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও ছিলো অটুট ও আঁটো।

৪

বজরার ভেতরে দাগোন

একটা শুকনো কুয়োর তলায় দু-দিন ধ'রে লুকিয়ে থাকার পর—কুয়োটা অগভীর হ'লেও আঁধারঘেরা ছিলো—খিদেয় আর ভয়ে শুকিয়ে-যাওয়া মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি আস্তে-আস্তে কূপের মুখের কাছে তাঁর মাথা তুললেন। সব চুপচাপ। বর্বরদল হানা দিতে গেছে এল্ কাবোতে, পেছনে ফেলে রেখে গেছে কতগুলো আগুনের কুণ্ড,

কাঁসের আগুন তা বোঝা যায় যখন পেঁচিয়ে-ওঠা ধোঁয়ার স্তম্ভের তলায় এসে কেউ খোঁজ করে। ল্য কারেক্স্যু দে পের্-এর কাছে এইমাত্র একটা ছোটো বারুদশালা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। খাতাঞ্চির প'চে ফুলে-ওঠা মৃতদেহটার পাশ কাটিয়ে মালিক বাড়ির দিকে এগুলেন। পোড়া কুস্তার আখড়াটা থেকে একটা তীব্র দুর্গন্ধ আসছে —ভয়াবহ গন্ধ। সেখানে নেগ্রোরা অনেক দিনের দেনাপাওনার একটা হিশেব-নিকেশ করেছে—দরজাগুলোর গায়ে এমনভাবে আলকাৎরা লেপেছে, কোনো কুস্তাই যাতে বেরিয়ে আসতে না-পারে, এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি শোবার ঘরের দিকে তাঁর পা চালালেন। মাদমোয়াজেল ফ্লরিদর প'ড়ে আছেন ফরাশের ওপর, দু-ঠ্যাং ছড়ানো, একটা কাস্তে বিঁধে আছে নাড়ি-ভুঁড়ির মধ্যে। তাঁর মরা হাতটা এখনও শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে আছে খাটের একটা পায়া, ভঙ্গিটা এমন যে নিষ্ঠুরভাবে দেয়ালে-টাঙানো 'স্বপ্ন' নামের কামচেতানো খোদাই ছবির ঘুমন্ত তরুণীটিকে মনে করিয়ে দেয়। গুমরোনো কান্নায় ফুলে-ফুলে উঠলেন মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি, ব'সে পড়লেন তাঁর পাশে, তারপর তিনি হ্যাঁচকা টানে তুলে নিলেন এক জপমালা, যত প্রার্থনা জানেন সব ব'লে গেলেন পর-পর, এমনকী সেটা শুদ্ধু, ছেলেবেলার সেই প্রার্থনাটা, হাত-পায়ের হাজা সারাবার জন্যে যেটা জপ করা হ'তো। এইভাবেই তিনি কাটিয়ে দিলেন কয়েকটি দিন, ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত, বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে সাহস নেই একফোঁটা, বাইরে খোলা-মেলায় দাঁড়িয়ে সব যে দেখবেন, নিজের সম্পত্তির ধ্বংসস্তূপ, তারও সাহস নেই; শেষটায় একদিন ঘোড়ায় চেপে এলো এক দূত, এমন দ্রুত ঝাঁকুনি দিয়ে সে পেছনের বারান্দার কাছে থামালে তার ঘোড়া যে সেটা গিয়ে ঢুঁশ লাগালো একটা জানলায়, পাথর থেকে ফুলকি তুলে দিলে। তার খবর—গাঁক-গাঁক-করে-তড়বড়-বলা—মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজিকে তাঁর অভিভূত দশা থেকে টেনে তুললো। বর্বর-দল হেরে গিয়েছে। জ্যামেকার বুকমানের ছিন্ন মুণ্ড—সবুজ আর হাঁ করা—এর মধ্যেই কিলবিলে পোকার খোরাক হ'য়ে গেছে—ঠিক যেখানে একদিন দুর্গন্ধ-তোলা ছাইতে পরিণত হয়েছিলো মাকান্দালের শরীর। নেগ্রোদের সবাইকে মেরে ফেলবার হুকুম দেয়া হয়েছে, তবে কয়েকটি সশস্ত্র দল এখনও দূর-দূরের বসতিতে লুঠতরাজ চালাচ্ছে। স্ত্রীকে কবর দেয়ার তরটুকু না-দিয়ে মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি দূতের পেছনে লাফিয়ে উঠলেন ঘোড়ায়, সে অমনি জোর কদমে এল্ কাবোর উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। দূর থেকে ভেসে এলো বন্দুকের আওয়াজ। ঘোড়ার পাঁজরে সজোরে গোড়ালি চেপে ধরলে দূত।

সেনাবাহিনীর ছাউনির উঠোনে ঠিক যখন ভি নোয়েল এবং তাঁর খামারের লোহাদাগা আরো ক-জন ক্রীতদাসের মুণ্ডু উড়িয়ে দেবার উদ্যোগ চলছে, ঠিক তখন এসে পৌঁছুলেন মালিক। সেখানে পিঠোপিঠি-দুজন-ক'রে বাঁধা নেগ্রোদের শিরশ্ছেদ হচ্ছে—বন্দুকের গুলি বাঁচাবার জন্যে। এই ক-জন ক্রীতদাসই মোটে র'য়ে গেছে তাঁর—এইসবগুলো লা হাবানার বাজারে অন্তত সাড়ে ছ-হাজার ইস্পানি পেসো আনবে। মঁসিয়ে লেনরমঁ দ্য মেজি অনুনয় ক'রে বললেন, এদের যত খুশি দৈহিক সাজা দেয়া হোক, কিন্তু শিরশ্ছেদটা আপাতত মুলতুবি থাক—অন্তত রাজ্যপালের সঙ্গে একবার আলোচনা না-করা অব্দি। স্নায়ুর পীড়া, অনিদ্রা, আর বড্ড বেশি কফির প্রকোপে কাঁপতে-কাঁপতে মঁসিয় ব্লাঁর্শ্‌লঁ তাঁর আপিশে পায়চারি করছিলেন—আপিশের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে একটা ছবি—তাতে আছেন ষোড়শ লুই মারী আঁতোনায়েৎ আর দোফাঁ। তাঁর তেড়াবেঁকা বিকৃত একক ভাষণটির কোনো মর্মোদ্ধার করাই মুশকিল; এই তিনি দার্শনিকদের মা-বাপ তুলে খিস্তি করছেন, পরক্ষণেই, একান্তরভাবে, ব'লে উঠছেন তাঁর ভাবী কথকোচিত হুঁশিয়ারির কথা—পারীতে তিনি যথাসময়ে খবর পাঠিয়েছিলেন, অথচ এখনো অব্দি যার কোনো উত্তরই আসেনি। নৈরাজ্য জিতে নিচ্ছে জগৎটাকে। উপনিবেশ দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসের মুখে। সমভূমির প্রায় সমস্ত অভিজাত তরুণীদেরই ধর্ষণ করেছে নেগ্রোরা। এত-সব লেস ছিঁড়ে নেবার পর এত-সব লিনেনের চাদরের ওপর গড়াগড়ি যাবার পর, এত-সব উপদর্শকের গলাকাটার পর, তাদের আর কিছুতেই দাবিয়ে রাখা যাবে না। মঁসিয় ব্লাঁর্শ্‌লঁ ক্রীতদাসদের সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত, ব্যত্যয়হীন উচ্ছেদের পক্ষে—এমনকী স্বাধীন নেগ্রো বা মুলাটোদেরও যেন রেহাই দেয়া না-হয়। যারই ধমনীতে এককোঁটাও আফ্রিকী রক্ত আছে—দো-আঁশলা, তে-আঁশলা, চৌ-আঁশলা, সাকাত্রা, গ্রিফ্‌—পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, তাকেই মারা উচিত। বড়োদিনের উৎসবে হেসু ক্রিস্তোর জন্মোৎসবের মোম জ্বালাবার সময় কাফ্রিগুলোর শঙ্খধ্বনিতে ভোলাটাই বড্ড বোকামি হয়েছে। পাদ্রি লাবাৎই জানতেন দ্বীপে প্রথম পা দিয়েই তিনি কী বলছেন: নেগ্রোরা সব কাফিরদের মতো, বিধর্মীদের মতো, ফিলিস্তিনদের মতো; এরা পুজো করে বজরার ভেতরকার দাগোনকে—সেই অর্ধেক-মাছ অর্ধেক-মানুষ পুতুলের তারা স্তুতিগায়ক। রাজ্যপাল অতঃপর এমন-একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজির সে-কথাটা কখনও মাথায়ও আসেনি: ভুডু। এখন তাঁর মনে প'ড়ে গেলো, কেমন ক'রে, অনেক বছর আগে, এল্‌ কাবো-র গোলগাল, লালমুখো, ফুর্তিশিকারি উকিল মরো দ্য সাঁ মারী পাহাড়-

পর্বতের ডাইনি-পুরুতদের বর্বর প্রথাটথা সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য জড়ো করেছিলো। তা থেকে এই তথ্যটাও বেরিয়ে এসেছিলো যে কিছু-কিছু নেগ্রো সর্পপূজারী। এখন যখন তাঁর এ-কথা মনে প'ড়ে গেলো, কথাটা তাঁকে কেমন অস্বস্তিতে ভরিয়ে দিলে, তাঁকে বোঝালে যে, কিছু-কিছু ক্ষেত্রে, ঢাক হয়তো-বা ফাঁপা কাঠের ওপর টান-টান ক'রে বেছানো ছাগলের চামড়ার চাইতেও বেশি কিছু। ক্রীতদাসদের, স্পষ্টই, একটা গোপন ধর্ম আছে, যেটা তাদের সব বিদ্রোহের সময় তাদের ধ'রে রাখে, একতাবদ্ধ ক'রে দেয়। হয়তো বছরের পর বছর ধ'রে ঠিক তাঁর নাকের ডগাতেই তারা এই ধর্মের প্রথাপার্বণ পালন করেছে, তাঁর অগোচরে তাঁর সব সন্দেহের পরপারে উৎসবের ঢাকের আওয়াজে কথা চালাচালি করেছে পরস্পরের সঙ্গে। কিন্তু কোনো সভ্য মানুষ কি কখনো সেই তাদের বর্বর বিশ্বাস নিয়ে সত্যি মাথা ঘামাতে পারে, যারা কিনা পুজো করে একটা সাপকে?

রাজ্যপালের বিদঘুটে হতাশায় বিষম কাতর হ'য়ে মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি রাত অব্দি, লক্ষ্যহারা, উদ্দেশ্যহীন, শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন। বুকমানের মুণ্ডুটা দেখে চক্ষুর তৃপ্তি হ'লো একটু, পুত্রর সঙ্গে অবিশ্রাম তাকে লক্ষ্য ক'রে ছিটিয়ে গেলেন খিস্তি, যতক্ষণ-না একই খেউড় আউড়ে-আউড়ে তিনি ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন। একটা নাদুশনুদুশ পৃথুল লুইসৌ মাগির বাড়িতে কাটালেন তিনি কিছুক্ষণ, যার মেয়েগুলো আঁটসাঁট শাদা মসলিন প'রে ঝুলবারান্দার টবের পাতা বাহার গাছগুলোর মধ্যে ব'সে চুচি খুলে হাওয়া করছিলো। কিন্তু সবখানেই হালচাল কেমন অপ্রীতিকর। কাজেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন রু দে এস্পানিওলের দিকে—ওবের্জ দ্য লা কুরন্-এ গিয়ে এক পাত্তর মাল টানবার জন্যে। কিন্তু বন্ধ দরজাগুলো দেখে তাঁর মনে প'ড়ে গেলো, সরাইটার রাঁধুনি অঁরি ক্রিস্তফ এই কিছুদিন আগেই ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে উপনিবেশের গোলন্দাজ বাহিনীর উর্দি গায়ে চাপিয়েছে। এতদিন ধ'রে যে-টিনের মুকুটটা সরাইখানাটার প্রতীক ছিলো, সেটা নামিয়ে নেবার পর কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে এল্ কাবোতে ভদ্রভাবে খাওয়া-দাওয়া করারই কোনো জো নেই। একটা কাউনটারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই এক গেলাশ রাম খাবার পর খানিকটা মেজাজ শরীফ হ'লো তাঁর, মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি এক কয়লার নৌকোর মালিকের সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন—মেরামতির জন্যে ক-মাস ধ'রে কয়লা জাহাজটা জেটিতে প'ড়ে ছিলো—ফাঁক-ফোকরগুলো বুজিয়ে নিয়েই সেটা এবার রওনা হবে সান্তিয়াগো দে কুবার উদ্দেশে।

৫

সান্তিয়াগো দে কুবা

এল্ কাবো অন্তরীপের মুখটার পাশ কাটিয়েছে কয়লা জাহাজ। পেছনে প'ড়ে আছে শহর, নেগ্রোদের অবিরাম দৌরাত্ম্য আর ভীতির তলায়. নেগ্রোরা জানে যে তারা ইস্পানিদের প্রস্তাবিত অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নির্ভর করতে পারে, আর কিছু-কিছু মানবতাবাদী জ্যাকোবাঁও তো সোৎসাহে তাদের পক্ষ সমর্থন করতে শুরু করেছে। তি নোয়েল আর তার সঙ্গীরা যখন খোলের মধ্যে কয়লার বস্তার ওপর ঘেমে-নেয়ে একাকার, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা জাহাজের পেছনের পাটাতনের ওপর জড়ো হ'য়ে, স্ট্রেইট অব উইণ্ডস থেকে ব'য়ে-যাওয়া মৃদুমন্দ হাওয়ায় গভীর শ্বাস নিচ্ছিলো। এল্ কাবোর নতুন একটা দলের একজন গায়ক ছিলো : অভ্যুত্থানের রাতে তার হোটেল পুড়িয়ে ফেলা হয়, তার একমাত্র পোশাক ছিলো পরিত্যক্ত দিদোর বেশভূষা ; সে আলসাসের লোক, সংগীতজ্ঞ, কেমন ক'রে যেন তার ক্লাভিকর্ডটা সে বাঁচাতে পেরেছে—অবশ্য নোনা হাওয়া সেটাকে বিচ্ছিরি বেসুরো ক'রে দিয়েছে, সে যখন মাঝে-মাঝে য়োহান ফ্রিডরিখ এডেলমানের সোনাটার এক-আধটা টুকরো বাজায়, তখন কোনো উড়ুক্কু মাছ একরাশ হলদে শামুক-গুগলির ওপর যদি লাফিয়ে যায়, তো সে বাজনা থামিয়ে তাকিয়ে থাকে। এক রাজতন্ত্রী মার্কি, দু-জন গণপ্রজাতন্ত্রী উঁচু কর্মচারী, একজন লেসনির্মাতা আর জনৈক ইতালীয় যাজক—সে তার গির্জের সোনার বাটিটা নিয়ে চলেছে—এরাই যাত্রীতালিকা সম্পূর্ণ করেছে।

সান্তিয়াগোতে পৌঁছুবার রাত্রেই, মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি সোজা ছুটেছিলেন টিভোলির দিকে : তালপাতার ছাউনি দেয়া নাটমঞ্চটা সদ্য-সদ্য প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রথম ফরাশি উদ্বাস্তুরা—কারণ কুবার সব সরাইখানার সামনে মাছিমারা চেটালো লাঠি ভাড়া করা গাধা দাঁড়-করানো দেখেই তাদের বমি পাচ্ছিলো। এত উদ্বেগ, এত আতঙ্ক, এত বদলের পর, কাফে শাঁতাৎ-এর আবহাওয়ায় একটু সান্ত্বনা পেলেন মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি। সেরা টেবিলগুলো জুড়ে ব'সে আছে তাঁরই পুরোনো ইয়ারদোস্তরা, জমিমালিকরা, যারা তাঁরই মতো এখোগুড়ের গায়ে শানদেয়া কাটারিগুলো থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এটাই যে পুরোনো ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কাঁদুনি না-গেয়ে বরং যেন নতুন ইজারা

নিয়েছে জীবনের—যদিও তাদের সকলেরই ধনসম্পত্তি উবাও, সর্বস্বান্তই শুধু নয়—পরিবারের আদ্ধেক লোকেরই কোনো পাত্তা নেই, আর তাদের দুহিতারা নেগ্রো-ধর্ষণের পর রোগশয্যায় সেরে উঠছে—সেটাও কোনো ফ্যালনা ব্যাপার নয়। এদের চেয়ে যাদের দূরদৃষ্টি বেশি, তারা যখন সান্তো দোমিঙ্গো থেকে টাকাকড়ি পাচার করেছিলো, এবং নিউ অর্লিন্সে চ'লে গিয়েছিলো অথবা কুবায় নতুন-নতুন কফির খেত বানাতে শুরু করেছিলো, তাদের তুলনায় ধ্বংসস্তূপ থেকে যারা কিছুই বাঁচাতে পারেনি, তারা দিন-এনে-দিন-খাওয়া, সব-দায়দায়িত্ব-থেকে-নিস্তার, শুধু-এই-মুহূর্তটারই-তত্ত্বতালাশ, এইসব থেকে তারা চুষে খাচ্ছিলো সুখ, নিংড়ে নিচ্ছিলো আমোদ আর ফুর্তি : বিপত্নীক আবিষ্কার করলে একা থাকার সুখ-সুবিধে; অভিজাত ঘরের বউ প্রায় কোনো আবিষ্কারকের উৎসাহে নিজেকে লেলিয়ে দিলে ব্যভিচারে; সৈন্যরা সব আনন্দে আত্মহারা—প্রত্যুষে আর ঘুম ভাঙার সংকেত নেই; প্রটেস্টান্ট তরুণীরা জানতে পেলে মরুমায়ার স্তবস্তুতির মোহ, গালে সৌন্দর্য-বিন্দু লাগিয়ে সাজগোজ ক'রে লোকের সামনে হাজির হবার মজা। সমস্ত বুর্জোয়া রীতিনীতি ধ্বসে পড়েছে। এখন শুধু যা জরুরি, তা শিঙা বাজানো, একটা মিনুয়েৎ ক্রিয়োর ঝকঝকে অনুষ্ঠান, অথবা টিভোলি অর্কেস্ট্রার গরীয়ান মহিমার জন্যে তেকোণা ঢাকে একটা জবরদস্ত তাল বাজানো! লেখ্যপ্রমাণকেরা এখন মাঝে-মাঝে স্বরলিপি টোকে; প্রাক্তন রাজস্বসংগ্রাহকেরা বারো ফুট পর্দায় আঁকে কুড়িটা সুলেমানি স্তম্ভ। মহড়ার সময়, যখন সারা সান্তিয়াগো কর্পুস ক্রিস্তি তিথির বিকট ধূলিধূসর মূর্তিগুলোর সঙ্গে, কাঠের খড়খড়ি আর পেরেক-আঁটা দরজার আড়ালে সিয়েস্তায় আচ্ছন্ন, এটা শোনা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে কোনো বাড়িউলি মাসি—এককালে যাঁর খ্যাতি ছিলো দারুণ ধর্মপ্রাণা ব'লে—অলস সুরে টেনে-টেনে গান গাইছেন :

নিত্যই চাহে প্রীতি, যেহেতু রীতি তা-ই,
আমরা যেন পাই সুখ নিরন্তর।

পারীতে কবেই যে-দস্তুরটা বাতিল হ'য়ে গেছে, সেই রকমই একটা মস্ত রাখালিয়া বলনাচের আসরের পরিকল্পনা করা হচ্ছিলো—আর নেগ্রো বিক্ষোভের পর যত তোরঙ্গ বাঁচানো গিয়েছিলো, পোশাকআশাকের জন্যে, সেগুলো সব এক জায়গায় জড়ো করা হ'লো। তালপাতার বাগলোয় তৈরি সাজঘরগুলো এখন উপভোগ্য ও সুমধুর সাক্ষাৎকারের দৃশ্যপট, যখন হয়তো কোনো ব্যারিটোন স্বামী তার

ভূমিকায় মশগুল হ'য়ে মঞ্চের ওপর মনৃসিনিইর 'লা দেসেরৃত্যর'-এর ফুর্তিবাজ চটপটে আরিয়ায় অভিভূত হ'য়ে আছে। এই প্রথম সানৃতিয়াগো দে কুবা শুনতে পেলে 'পাসপি' আর 'কোঁৎরদান্স'-এর সুর। ঔপনিবেশিকদের দুহিতারা যা মাথায় দিতো, শতাব্দীর সেই শেষ পাউডার-লাগানো পরচুলগুলো ভাল্ক্জের অগ্রদূত ক্ষিপ্রচপল মিনুয়েতের তালে-তালে দোল খেতে লাগলো। শহরটায় যেন ঝেঁটিয়ে ব'য়ে গেছে সবচল ফ্যানটাসি আর বিশৃঙ্খলার হাওয়া। তরুণ কুবানারা দেশান্তরী-দের সাজগোজ নকল করতে শুরু ক'রে দিলে. চিরকালই বেতারিখের যে-এস্পানি বেশভূষা তারা পরতো সে-সব রেখে দিলে শুধু নগরপরিষদের সদস্যদের জন্যে। তাঁদের স্বীকারোক্তি-শোনা ধর্মযাজকদের অজানিতেই কুবার মহিলারা ফরাশি আদব-কায়দায় পাঠ নিলেন, তাঁদের চপ্পলের সৌষ্ঠব দেখাবার ছলে পা দেখাবার কলাকৌশল রপ্ত করার তালিম নিতে লাগলেন। রাত্তিরে, লেনর্মঁ দ্য মেজি যখন কোমরবন্ধের তলায় বেশকিছু সুরা পাচার ক'রে অভিনয় দেখতে যান, সকলের সঙ্গে-সঙ্গে শেষ অনুষ্ঠানটির পর তিনিও উঠে দাঁড়ান—উদ্বাস্তুরা নিজেরাই চালু করেছিলো প্রথাটা—আর গান করেন 'সঁ লুইসের স্তব' আর 'লা মার্সাইঁ'।

অলস, কোনো কারবারেই মন বসাতে অক্ষম, মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি তাঁর সময় ভাগাভাগি ক'রে নিলেন তাশের টেবিল আর প্রার্থনার মধ্যে। জুয়োর আখড়াগুলোয় তাশের বাজি খেলবার জন্যে এক-এক ক'রে ক্রীতদাসদের তিনি বিক্রি ক'রে দিলেন, টিভোলিতেও দেনা-চোকানো জরুরি—কিংবা হয়তো জাহাজ-ঘাটার রাস্তায় ঘুরঘুর-করা, কোঁকড়া চুলে সেই-যে পরতো শ্বেতনলিনী, সেই নেগ্রো মাগিটাকে ঘরে নিয়ে যেতে হবে, তারও পয়সা চাই। কিন্তু, সেই সঙ্গে, আয়নায় যখন দ্যাখেন একেকটা সপ্তাহ কাটবার সঙ্গে-সঙ্গে কতটা ক'রে বয়েসের ছাপ প'ড়ে যাচ্ছে, তিনি ঈশ্বরের আসন্ন শমনের ভয়ে কাবু হ'য়ে যান। একদা ছিলেন উড়োন-চণ্ডী, এখন তিনি ত্রিভুজকেই অস্বীকার করতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। আর তাই, তি নোয়েলের সমভিব্যাহারে, তিনি সানৃতিয়াগো ক্যাথিড্রালে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে হেঁড়ে গলায় কাৎরে আর কাকুতিমিনতি ক'রে কাটিয়ে দেন। অবস্থা যখন এমনি চলেছে, নেগ্রো তখন ঢুলতো কোনো যাজকের ছবির তলায় অথবা ব'সে-ব'সে দেখতো বড়োদিনের 'কানৃতাতা'র মহড়া, দোন এস্তেবান সালাস নামে এক চিমশে, শুকনো, হেঁড়েগলার কালো লোক সেটা পরিচালনা করতেন। সবসত্ত্বেও এই সংগীত-পরিচালককে সবাই শ্রদ্ধা করতো ব'লেই মনে হয়, যদিও সত্যি-সত্যি বোঝাই দায় ছিলো কেন তিনি পণ ক'রে বসেছিলেন যে গায়করা সবাই সমস্বর গানে যোগ

দেবে একজনের পর আরেকজন—অন্তরা আগেই যা গেয়ে ফেলেছে নতুন-কেউ আবার সেই অংশটা গাইবে—আর তারপর তিনি কণ্ঠস্বরের এমন এক জটিল তালগোলপাকানো বিশৃঙ্খলা শুরু ক'রে দিতেন যে তাতে সবাই পুরোদস্তুর বেহাল হ'য়ে পড়লেও বলার কিছু থাকতো না। কিন্তু যাজকের আশাশোঁটাধারীর কাছে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বেশ উপভোগ্যই ঠেকতো, তার ওপর তি নোয়েল চাপিয়ে দিয়েছিলো যাজকবিদ্যার বিপুল কর্তৃত্ব পুরোটাই, যেহেতু সে চলতো সশস্ত্র আর অস্ত্রদের মতো, পাৎলুন পরতো : কাঠের বাঁশি, রামশিঙা, ও তারায় গলাচড়ানো বালকসহযোগে সমৃদ্ধ-করা এই বেসুরো ধ্বনিসংযোগ সত্ত্বেও দোন এস্তেবান সালাসের এই কান্তাতা নেগ্রো-হিস্পানি গির্জেয় পেলে এক ধরনের ভুডু উষ্ণতা তি নোয়েল যেটা কোনোদিনও এল্ কাবোব সাঁ স্বলপিসের গির্জেয় পায়নি। বারোক সোনার কাজ, ক্রিস্তোব মাসুর্যী কেশপাশ, ধাঁকারোক্তিকুঠুরির কাঠের গায়ের বিপুল জাঁকজোক, দমিনিক সাধুদের প্রহরী করা সন্তদের পায়ের তলায় চুরমার ড্র্যাগন, সান্ আন্তোমিওর শুয়র, সান্তো বেনিতোর সন্দেহজনক রং, কালো কুমারীগণ, ফরাশি বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেতাদের মতো দেহত্রাণ আর হাঁটু-ঢাকা জুতো-পরা সান জোরহেরা—সব মিলিয়ে বড়োদিনের আগের সন্ধেয় বাজানো বাদ্যযন্ত্রগুলোর এক ধরনের আকর্ষণ ছিলো—উপস্থিতি, প্রতীক, আরোপণের মধ্যে ভোজবাজি ছিলো যেন এক ধরনের, যার ফলে তাকে মনে হ'তো সর্পদেবতা দাম্বালার প্রতি উৎসৃষ্ট চিহ্ন-প্রতীকে ভরা বেদীই যেন। তাছাড়া তো সান্তিয়াগো হ'লো ওগুন ফাই, ঝড়ের সেনাপতি, যার মায়াতেই সেদিন জেগে উঠেছিলো বুকমানের অনুবর্তীরা। সেই জন্যেই তি নোয়েল, প্রার্থনা হিশেবে, প্রায়ই আপন মনে গুনগুন করতো একটা পুরোনো গান, যেটা সে শিখেছিলো মাকান্দালের কাছে :

> সান্ তিয়াগো, হে, আমি যুদ্ধের ছেলে :
> সান্ তিয়াগো, হে,
> তুমি কি বোঝো না আমি যুদ্ধেরই ছেলে ?

৬

কুকুরদের জাহাজ

একদিন সকালে সান্তিয়াগো বন্দর ভ'রে গেলো ঘেউ-ঘেউতে। একটার সঙ্গে আরেকটা শেকল দিয়ে জোড়া, মুখসাজের আড়ালে লালা ঝরাচ্ছে, গরগর ক'রে খেঁকিয়ে উঠছে পাহারাকে বা একে অন্যকে খ্যাঁক ক'রে কামড়ে দেবার চেষ্টা করছে, গরাদের ওপাশে যারা তাদের দিকে তাকিয়ে আছে বা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে—শয়ে-শয়ে কুকুর, চাবকে তাদের সজুত ক'রে ঢোকানো হচ্ছে একটা সমুদ্রগামী জাহাজের খোলে। আরো কুকুর এসে পড়লো, তারপর আরো, আরো—উঁচু হাঁটুমোড়া জুতো-পরা শিকারি, চাষী ও খামারের উপদর্শকদের তত্ত্বাবধানে! তি নোয়েল, সে সবেমাত্র তার মালিকের জন্যে মাছ কিনেছে, এই অদ্ভুত জাহাজের কাছে এসে দাঁড়ালে—তখনও তারা তার মধ্যে ডজন-ডজন মাস্টিফ ঢোকাচ্ছে, আর এক ফরাশি কর্মচারী একটা গণকযন্ত্রের পুঁতি নেড়ে-নেড়ে, আওয়াজ ক'রে, চটপট গুনে যাচ্ছে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এদের?' বিষম শোরগোলের মধ্যেই তি নোয়েল চেঁচিয়ে একজন মুলাটো খালাশিকে জিগেশ করলে—ঘুলঘুলির ওপর টান ক'রে মেলে দেবে ব'লে সে তখন একটা গোটানো জাল খুলছিলো।

'নিগারগুলোকে খেতে!' গাঁকগাঁক ক'রে হেসে বললে অন্যজন।

ক্রেয়োলে বলা এই উত্তরটা তি নোয়েলের কাছে সব পুরোপুরি খুলে বুঝিয়ে দিলে। সে তক্ষুনি জোর কদমে রাস্তা দিয়ে ছুটলো, ক্যাথিড্রালের উদ্দেশে; সেখানে অন্যসব ফরাশি নেগ্রোর সঙ্গে মোলাকাৎ করাটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে—মালিকরা কখন প্রার্থনা থেকে বেরোয় তারই জন্যে তারা অপেক্ষা ক'রে থাকে। দ্যু ফ্রেনে পরিবার, জমিজিরেত বাঁচাবার সব আশা হারিয়ে, অবশেষে, তিন দিন আগে এসে পৌঁছেছে সান্তিয়াগোয়, তারা ফেলে এসেছে তাদের খামার, মাকান্দালকে ওখানে পাকড়ানো হয়েছিলো ব'লে জায়গাটা বিখ্যাত হ'য়ে আছে। দ্যু ফ্রেনে নিগ্রোরা এল্ কাবো থেকে এক মস্ত খবর নিয়ে এসেছে।

যে-মুহূর্তে অন্তিইয়েগামী সৈন্যবোঝাই ছিমছাম ছোট্ট রণতরীটায় পা দিয়েছে—বিশাল, বন্ধুর ঢেউয়ের আঘাতে যার হালমাস্তুল সারাক্ষণ মড়মড় ক'রে উঠছে—

তখন থেকেই নিজেকে একটু রানী-রানী লাগছে পাউলিনার। তার প্রেমিক অভিনেতা লার্ককে তার বিনোদনের জন্যে নামজাদা সব নাটকের সবচেয়ে রাজসিক শ্লোকগুলো আওড়াতে শুনে-শুনে পাউলিনা রানীর ভূমিকা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'য়ে উঠেছিলো। স্মরণশক্তির কৃপা তার কখনোই তেমন ছিলো না. পাউলিনার আবছাভাবে মনে পড়ে, 'আমাদের দাঁড়ের তলায় ধবল হ'য়ে যায় হেলেসপন্ট', যেটা চমৎকার খাপ খেয়ে যায় জাহাজের পেছন-গলুইয়ের গা থেকে ওঠা ফেনার সঙ্গে, পাল টাঙিয়ে, পৎপৎ ক'রে সংকেত নিশেন উড়িয়ে, 'লোসেয়' জাহাজ যে-ফেনা পেছনে রেখে চলেছে। কিন্তু এখন হাওয়ার প্রতিটি দিকবদল উড়িয়ে নিয়ে যায় বেশকিছু আলেক্সান্দ্রাইন। একটা গোটা বাহিনীর যাত্রা আটকে রেখেছিলো সে, একটা ডুলিতে ক'রে প্যারী থেকে যাবে ব'লে একটা ছেলেমানুষি খেয়ালে। এখন সে তার মন বসিয়েছে আরো-সব অধিকতর জরুরি বিষয়ে। সীলমোহর করা ঝুড়ি ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে মরিশাস দ্বীপ থেকে কেনা সব রুমাল, রাখালমেয়েদের পরার খাটো ঘাঘরা, ডোরা-কাটা মশলিনের ঘাঘরা—যেটা সে ঠিক ক'রে রেখেছে প্রথম গরম দিনটায় পরবে। এ-সব বিষয়ে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন অব্রাঁতেস-এর ডাচেস। বাঁচোয়া যে যাত্রাটা খুব একটা একঘেয়ে বা বিরক্তিকর হ'য়ে ওঠেনি। বিস্কে উপসাগরের তুলকালাম রূঢ় জল থেকে বেরিয়ে আসবার পর সামনের গলুইয়ের কাছে ধর্মযাজক প্রথম যে সমবেত প্রার্থনা জপিয়েছিলেন, তাতে সব উঁচু অফিসারেরা এসেছিলো পোশাকি উর্দি গায়ে, আর সকলের পুরোভাগে ছিলেন ল্যক্লের্ক, তার স্বামী। বেশ রূপবান সব নমুনা ছিলো তাদের মধ্যে, আর পাউলিনা—যে তার কচি বয়েস সত্ত্বেও ছিলো পুরুষশরীরের সুরসিক সমঝদার—বেশ তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করেছিলো, যখন সব অভিবাদন আর গোড়ালির সশব্দ ঠোকাঠুকি এবং মিনতি উৎকণ্ঠা আগ্রহের আড়ালে তাকে দেখে এদের কামনার তাড়া বেড়ে যাচ্ছিলো। সে জানে যে মাস্তুলে যখন লণ্ঠনগুলো দোল খায় আরো-জলজলে সব তারায়-ভরা রাতে, শয়ে-শয়ে পুরুষ তাদের রাজশয্যায় গলুইয়ের খোলে শুয়ে-শুয়ে তারই স্বপ্ন দেখছে। সেইজন্যেই রোজ সকালে সামনের পালটার কাছে দাঁড়িয়ে সে ভাবুক-ভাবুক উদাস ভঙ্গি করে, হাওয়া এলোমেলো ক'রে দিয়ে যায় তার চুল আর খেলা করে তার জামাকাপড় নিয়ে, আর উন্মোচিত ক'রে দেয় তার স্তনের সুঠাম সৌষ্ঠব আর শ্রী।

আজোরেস প্রণালী দিয়ে চ'লে আসার কয়েক দিন পরে, দূরের পোর্তুগিস গাঁগুলোর ছোটো-ছোটো শাদা-শাদা গির্জের চুড়োগুলো উদাসভাবে দেখতে-

দেখতে পাউলিনা খেয়াল করেছিলো সমুদ্র যেন নতুন জীবন পাচ্ছে। যেন মালা পরেছে জল, হলদে-সব আঙুরের থোলো ভেসে যাচ্ছে পুবদিকে; সবুজ কাচের মতো নল মাছ, নীল পোঁটকার মতো জেলি মাছ, পেছন-পেছন টেনে নিয়ে আসছে লম্বা লাল আঁশ, ঘিনঘিনে, দন্তিল তারা মাছ, বান মাছ, আর স্কুইড— সেগুলো আবার যেন জড়াজড়ি ক'রে থাকে নববধূর ফিনফিনে ওড়নার স্বচ্ছতায়। লাক্লের্কের দেখানো দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে ঝকঝকে সব অফিসারেরা খুলতে শুরু করে তাদের কোট, খোলা উর্দির তলায় জামার ফাঁক দিয়ে দেখায় তাদের বুক। একটা ভীষণ গরম ভ্যাপশা রাতে, পাউলিনা তার রাতকাপড়েই বেরিয়ে এলো, হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়লো মাস্তুলের কাছের ওপরের পাটাতনটায়, যেখানে সে সাধারণত তার দীর্ঘ সিয়েস্তাগুলো সারতো। ফসফরের অদ্ভুত আলোয় সমুদ্র ছিটোচ্ছে সবুজ আলো। আকাশের তারাদের মধ্য থেকে যেন নেমে এসেছে মৃদু হিম, রোজ একটু-একটু ক'রে বড়ো দেখায় তারাগুলোকে। সকালবেলায় সাগ্রহ বিস্ময়ের সঙ্গে সন্ধানী-পাহারা আবিষ্কার করলে যে একটা গোটানো পালের ওপর ঘুমিয়ে আছে এক নগ্নিকামূর্তি—নিচু মাস্তুলটার তেকোণা পালের ছায়ায়। কোনো পরিচারিকা হবে বুঝি, এই ভেবে সে একটা দড়ি বেয়ে তার কাছে যাবে, এমন সময় নিদ্রিতার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেলো সে জেগে উঠছে, এবং শুধু তা-ই নয়, যে-শরীর দেখে তার চক্ষুর ভূরিভোজ হচ্ছিলো সেটা আর কারু নয়, পাউলিনা বোনাপার্ত-এর। পাউলিনা তার চোখ রগড়ালে, ঠিক একটা বাচ্চার মতো খিলখিল হেসে উঠলো, সকালের খোলা হাওয়ায় তার চুল উড়ছে এলোমেলো, সে ভেবেছে নিচের পাটাতন থেকে সে বুঝি কেম্বিস কাপড়ের ঢাকায় সুরক্ষিত, সে চট্ ক'রে কয়েক বালতি টাটকা জল ফেললে কাঁধে। সেই রাত থেকেই সে শোয় খোলামেলায়, আর তার বদান্য ঔদাসীন্য এতই চাউর হ'য়ে গেলো যে এমনকী কাষ্ঠমূর্তিবৎ মঁসিয় দেস্‌মেনার—তিনি চলেছেন অভ্যুত্থান কী ক'রে দমানো হয় তারই তদারক করতে—আবিষ্কার করলেন দু-চোখ খুলেই তিনি এই প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন ছাখেন, যেটা তাঁর মনে করিয়ে দিয়েছে গ্রীকদের গালতেয়ার কথা।

আখের খেত থেকে পেঁচিয়ে-ওঠা ফিনফিনে কুয়াশায় ঝাপশা-হ'য়ে-যাওয়া পাহাড়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এল্ কাবো আর উত্তরের সমভূমির দৃশ্য পাউলিনাকে খুশি ক'রে তুললো: সে পড়েছে 'পৌলবর্জিনী', সে শুনেছে 'লেঁস্থলেয়ার'—একটা মনমাতানো ক্রেয়োল কোঁৎরদাঁস-এর বাজনা, যার ছন্দটা অদ্ভুত আর ভিনদেশী,

-ক দ্য সোয়ঁয় পারীতে তা প্রকাশিত হয়েছিলো। তার উড়াল-দেয়া মশলিনের ঘাঘরায় নিজেকে তার মনে হ'লো যেন খানিকটা অন্তরকম আর খানিকটা সে আবিষ্কার করলে সুকোমল ঝাউপাতার সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, মেডলার পাতার বাদামি রুপালিদ্যুতি, এমন-সব পাতা যারা এত বড়ো যে পাখার মতো ভাঁজ ক'রে নেয়া যায়। রাত্তিরে পাস্কেক ভুরু কুঁচকে বলেন ক্রীতদাসদের অভ্যুত্থানের কথা, রাজতন্ত্রী খামারমালিকদের সঙ্গে ঝুটঝামেলার কথা, যত রাজ্যের বিপদ-আপদের কথা। আরো বড়ো বিপদের আশঙ্কায় তিনি স্থির করেছেন ইল দ্য লা তোরতুতে একটা বাড়ি কেনার। কিন্তু পাউলিনা তাঁর কথাবার্তাকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি। জোসেফ লাভাল্লের অশ্রুসজল উপন্যাস ***Un Négre comme il y peu des blancs*** প'ড়ে সে এখনও বেশ আন্দোলিত, তাছাড়া তার চারপাশ ঘিরে যে বিলাসবৈভব ছড়ানো, যে-প্রাচুর্য ছড়ানো, তাকে সে কায়মনে উপভোগ করছিলো। তার ছেলেবেলা কেটেছে শুকনো ডুমুর, ছাগলের দুধের পনির, আর আধপচা জলপাই খেয়ে -সব কী গরিব, কী সাধারণ—ছেলেবেলায় সে এমন বৈভব দ্যাখেইনি কখনো। একটা ছায়ানিবিড় বিতানঘেরা বিশাল অট্টালিকার মধ্যে আছে সে, প্রধান গির্জেটা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ছড়ানো তেঁতুলগাছগুলোর তলায় সে হুকুম করলে একটা সাঁতারের চৌবাচ্চা খুঁড়তে, নীল কাচ মর্মর পাথরে মোড়া। সেখানে সে স্নান করতো নগ্ন। গোড়ার দিকে সে তার ফরাশি দাসীদের দিয়ে নিজের অঙ্গসংবাহন করাতো; কিন্তু একদিন তার মাথায় এলো যে পুরুষের হাত হবে আরো সবল ও উদ্দীপক, আর অমনি সে হামামের প্রাক্তন পরিচারক সলিমানের সেবা নিয়োগ করলে--সলিমান তার শরীরের যত্ন নেয়া ছাড়া তার গায়ে মালিশ করে কাগজিবাদামের ক্ষীর, তার গায়ের রোমগুলো কামিয়ে দেয়, পায়ের আঙুলের নখে বুলিয়ে দেয় রং। যখন সে তাকে স্নান করায়, পাউলিনা একটা অস্বস্থ আনন্দ পেতো জলের তলায় তার নিজের শরীর দিয়ে সলিমানের উরুর দু-পাশে ঘ'ষে যেতে, সলিমান-যে অবিশ্রাম কামের তাড়ায় থর্থর করে সেটা তার জানা, সে-যে সবসময়েই তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকে চাবুক-দিয়ে-ভালো-ক'রে-শেখানো কুকুরের মতো মিথ্যে নম্রতায়, তাও সে জানে। একটা হালকা সবুজ লতা দিয়ে তাকে ব্যথা না-দিয়েই মোলায়েমভাবে চাবকাতো পাউলিনা, শুধু সলিমান যে মিথ্যে ব্যথা পাবার মুখভঙ্গিটা করবে সেটাকে দেখবার জন্যে। সত্যি বলতে, সলিমান যে তার রূপের এত যত্ন নেয়, সেজন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞই বোধ করে সে।—কোনো-একটা কাজ চট ক'রে সেরে ফেললে বা ভক্তি-

ভরে উপাসনা করলে, পুরস্কার হিশেবে এইজন্তেই সে সময়-সময় নেগ্রোটিকে অনুমতি দিতো তার সামনে নতজানু হ'য়ে ব'সে তার পায়ে চুমো খেতে, এমন ভঙ্গিতে যেটা দেখে 'পৌলবর্জিনী'-প্রণেতা বের্নার্দা দ্য সাঁ-পিয়ের হয়তো ভাবতেন এ হ'লো আলোকপ্রাপ্তির বদান্ত শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে আসার দরুন কোনো সরল মিঠে প্রাণের সগৌরব কৃতজ্ঞতার প্রতীক।

এইভাবেই পাউলিনা তার সময় কাটাচ্ছিলো সিয়েস্তা আর জাগরণের মধ্যে— সময়-সময় লাক্লের্ক যখন দক্ষিণে গেছেন, কোনো রূপবান অফিসারের তরুণ উৎসাহে সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া সত্ত্বেও, নিজেকে তার মনে হ'তো অংশত বর্জিনী, অংশত আতালা। কিন্তু একদিন বিকেলে যে ফরাশি কেশবিলাসিনী চারজন নেগ্রো সহকারীর সহায়তায় তার কেশসজ্জা করছিলো, সে থুবড়ে পড়লো দুর্গন্ধে-ভরা চাপ-চাপ রক্তবমির মধ্যে। এক রুপোলি ফুট-ফুট ছোপের খাটো ঘাগরা প'রে এক ভয়ানক আনন্দঘাতক এসে হাজির হয়েছে ভনভনে গুঞ্জন তুলে— পাউলিনা বোনাপার্ৎ-এর উষ্ণ মণ্ডলের স্বপ্নকে চুরমার ক'রে দিতে।

৭

সা ন্ ত্রা স্তো র্নো

পরদিন সকালে, লাক্লের্ক-এর নাছোড় উপরোধে— তিনি প্লেগে-ছারখার গ্রামগুলো পেরিয়ে সদ্য ফিরেছিলেন— পাউলিনা পালিয়ে গেলো ইল দ্য লা তোর্‌তুতে, সঙ্গে গেলো নেগ্রো সলিমান আর পুলিন্দা বোঝাই দাসীরা। প্রথম দিনগুলো সে কাটিয়ে দিলে এক বালুকাময় খাঁড়ির জলে স্নান ক'রে আর শল্যচিকিৎসক আলেহন্দ্রো ওলিভিয়ের এক্সেমেলিঙের স্মৃতিকথার পাতা উলটে, আমেরিকার সব বোম্বেটে হার্মাদদের চালচাল আর বদমায়েশির সেটা প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা তথ্য-ভাঁড়ার : দ্বীপে তাদের তুলকালাম অস্থির জীবনের স্মারক হিশেবে তারা ফেলে রেখে গেছে এক কুৎসিত কেল্লার ধ্বংসাবশেষ। তার শোবার ঘরের আয়না যখন তার সারা গা খুলে দেখালে পাউলিনা খুশিতে হেসে উঠলো; তার গায়ের রং এখন চমৎকার এক মুলাটোর মতো, রোদে-পোড়া হালকা খয়েরি। কিন্তু এই বিদ্রুমকের আয়ু হ'লো তাৎক্ষণিক। একদিন বিকেলে লাক্লের্ক পদার্পণ করলেন ইল দ্য লা তোর্‌তুতে, ভয়াবহ ঠাণ্ডায় তার শরীর কাঁপছে, চোখ দুটো কেমন হলদে। তাঁর সঙ্গে সামরিক

বাহিনীর যে-চিকিৎসক গিয়েছিলেন তিনি তাঁকে কড়া মাত্রায় রেউচিনির জোলাপ খাওয়ালেন।

পাউলিনা ভ'রে গিয়েছিলো আতঙ্কে। তার মনে ঝাপশাভাবে আহাকসিওর কলেরার মহামারীর স্মৃতি জেগে উঠেছে : কালো পোশাক-পরা লোকদের কাঁধে ক'রে বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কালো কফিন; কালো ওড়নায় মুখ ঢাকা বিধবারা ডুমুর গাছের তলায় বিনিয়ে-বিনিয়ে বিলাপ করছে; কালো বেশ-পরা দুহিতারা নিজেদের ছুঁড়ে ফেলতে চাচ্ছে মা-বাবার কবরে আর তাদের হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোরস্থান থেকে। হঠাৎ তাকে হামলা করলে সেই দম-আটকানো ভাবটা, ছেলেবেলায় প্রায়ই যেটা তাকে নাজেহাল করতো। ইল্ দ্য লা তোর্ত্যু আর তার শুকনো পোড়া মাটি, তার লালচে উপকূলের পাহাড়, ফণিমনসা আর পঙ্কপালে ছাওয়া তার পোড়ো জমি, তার চিরবর্তমান সমুদ্র—এখন মনে হচ্ছে এ বুঝি তারই শৈশবের দ্বীপ, যেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। দরজার আড়ালে যে-লোকটা খাবি খাচ্ছে সে এতটাই অবিবেচক যে সে কিংখাবের ফিতের তলায় লুকিয়ে নিয়ে এসেছে সাক্ষাৎ মরণ। চিকিৎসকেরা যে কিছুই করতে পারবে না, এ-বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হ'য়ে পাউলিনা সলিমানের পরামর্শে কান পাতলো। সলিমান ব্যবস্থাপত্র দিলে যে ধুপধুনা, নীল আর লেবুর খোশা পুড়িয়ে ধোঁয়া দিয়ে ঘর সাফ করতে, মহাবিচারক সান্ হোর্হে আর সান ত্রান্তোর্নোর উদ্দেশে অসাধারণ কোনো ফলপ্রসূ প্রার্থনার আয়োজন করতে। সে তামাকপাতা, গন্ধলতা, পাতাবাহারের পাতা দিয়ে বাড়ির দরজাগুলো ঘ'সে-মেজে মসৃণ করালো, একটা কালো কাঠের ক্রুশচিহ্নের তলায় জমবালো ভঙ্গি ক'রে বসলো নতজানু খানিকটা যেন সেইরকম চাষীদের ভক্তির আধিক্য যেমন থাকে; নেগ্রোটির সঙ্গে প্রতিটি প্রার্থনা মন্ত্রের শেষে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো : মাতো, প্রেস্তো, পাস্তো, এফ্ফাসিও, আমেন। তাছাড়া ঐ সব তুকতাক—ঐ যে একটা লেবুগাছের ডালে পেরেক ঠুকে ক্রুশ বানানো—সে-সব তার মধ্যে আলোড়ন তুলে জাগিয়ে দিলে পুরোনো কর্সিকান রক্তের তলানিটুকু, যেটা আসলে ফ্রান্সের বিপ্লবী পরিষদের নির্দেশ বইয়ের অলীক মিথ্যাগুলির চেয়েও নেগ্রোটির সজীব সৃষ্টিরহস্যতত্ত্বের অধিক আত্মীয়, অথচ যাকে অবিশ্বাস ক'রে সে বড়ো হ'য়ে উঠেছে। কেন যুগের হিড়িকে গা ভাসিয়ে দিয়ে এ-সব পবিত্র জিনিশকে সে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছে সে নিয়ে এখন সে অনুতাপ করলে। ল্যাক্লেক-এর অসহ্য যন্ত্রণা তার আতঙ্ককে আরো উদগ্র ক'রে তুললো, তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এলো সলিমানের মন্ত্র আর ঝাড়ফুঁকে জাগিয়ে-তোলা শক্তিগুলোর জগতের

আরো-কাছে, সলিমানই এখন দ্বীপের সত্যিকার প্রভু, অন্তত তীর থেকে ধাবমান প্লেগমড়কের সম্ভাব্য রক্ষক, অর্থহীন ব্যবস্থাপত্রলেখকদের মধ্যে একমাত্র চিকিৎসক। জল পেরিয়ে যাতে অলুক্ষুণে সব পচা কুটো বা গন্ধ না-আসে, নেগ্রোটি সেই জন্তে ভাসিয়ে দিলে নারকোলের খোলে তৈরি ছোটো-ছোটো ডিবের নৌকো, পাউলিনার শেলাই বাক্স থেকে বার-করা ফিতে দিয়ে সাজানো সে-সব, আসলে এগুলো হ'লো সমুদ্রের আওয়াস্থর কাছে পাঠানো নৈবেদ্য ও ভেট। একদিন সকালে ল্যাক্লের্কের বাক্সপ্যাটরার মধ্যে পাউলিনা আবিষ্কার করলে একটা মানোয়ারি জাহাজের খুদে নমুনা . সে দৌড়ে চ'লে এলো বেলাভূমিতে, যাতে সলিমান এই শিল্পসামগ্রীটাকেও তার নৈবেদ্যের মধ্যে জুড়ে দিতে পারে। রোগের বিরুদ্ধে সব প্রতিরোধব্যবস্থাকেই কাজে-লাগানো চাই : ব্রত, মানৎ, উপবাস, চুল কেটে বানানো জামা, প্রায়শ্চিত্ত, যিনি কর্ণপাত করবেন তাঁরই উদ্দেশে স্তবস্তুতি, এমনকী সময়-সময় তা যদি হয় তার শৈশবের মিথ্যাবাদী শত্রুর লোমশ কর্ণকুহরে, তাও সই। হঠাৎ, পাউলিনা বাড়ির মধ্যে হেঁটে বেড়াতে শুরু করলে অদ্ভুত ভঙ্গিতে, যে-ক'রেই হোক টালির জোড়গুলো থেকে পা ফেলা এড়ানো চাই—ঐ জোড়গুলো, সব্বাই তো জানে, কাফেরদের অধার্মিক প্ররোচনা ও উশকানিতে চৌকো-চৌকো বর্গ ক'রে বসানো, যারা চায় যে লোকে সারা দিন ক্রুশের ওপর পা ফেলে হাঁটুক। এখন তার স্তনের ওপর সলিমান যে-জল ঢালে তা মোটেই সুগন্ধি আতর-মেশানো ঠাণ্ডা পুদিনা জল নয় —বরং গুঁড়ো-করা বিচি, তেলতেলে ফলের রস, পাখির রক্ত আর ব্র্যাণ্ডি মেশানো মলম। একদিন সকালে আতঙ্কিতা ফরাশি দাসীরা হঠাৎ দেখতে পেলে, পাউলিনাকে ঘিরে-ঘিরে নেগ্রোটি একটি অদ্ভুত নাচ নাচছে, আর সে ব'সে আছে মেঝেয় নতজানু খোলাচুল আলুথালু। সলিমান প'রে আছে শুধু একটা কোমরবন্ধ, যা থেকে ঝুলছে একটা রুমাল, নেংটির মতো, তার পুরুষাঙ্গ ঢাকা তাইতে, তার গলায় শোভা পাচ্ছে লাল-নীল পুঁতি, একটা জংধরা কাটারি উঁচিয়ে সে পাখির মতো ছোটো-ছোটো লাফ দিয়ে চলেছে। দুজনেই গভীর গোঙাচ্ছে, যেন ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে বেরিয়ে আসছে আওয়াজ, যেন পূর্ণিমার ভরা চাঁদের রাতে ডুকরে উঠছে কুকুর। একটা গলাকাটা মোরগ ঘরময় ছড়ানো গমের দানার মধ্যে তখনও দমকা ঝাপটাচ্ছে। নেগ্রোটি যখন দেখলে যে একটি দাসী দৃশ্যটা তাকিয়ে দেখছে সে রেগে লাথি মেরে দরজার পাল্লা বন্ধ ক'রে দিলে। সেইদিন বিকেলে দেখা গেলো কয়েকজন সন্তের মূর্তি ঝুলছে কড়িকাঠ থেকে —পা-ওপরে, মুণ্ডু-তলায়। সলিমান—সে এখন আর মুহূর্তের জন্তেও পাউলিনার কাছ থেকে নড়ে না—রাতে সে তার ঘরেই একটা লাল ফরাশের ওপর শোয়।

ল্যাক্রের্কের মৃত্যু এলো হলদি জ্বরে, আর পাউলিনাকে তা একেবারে পাগলামির শেষ সীমায় নিয়ে এলো। এখন উষ্ণ মণ্ডলকে তার মনে হয় অসহ্য আর জঘন্য. বাড়ির ভেতরে কেউ যন্ত্রণায় কালঘাম ছোটাচ্ছে আর প্রখর নাছোড় শকুন হা ক'রে ব'সে আছে বাড়ির ছাদে। সিডারের তৈরি একটা কফিনে পোশাকি উর্দি পরিয়ে তার স্বামীর দেহ শোয়াবার পর, পাউলিনা প্রায় চক্ষের পলকে উঠে পড়লো 'সার্ফ শিওর' জাহাজে, রোগা, কোটরে-বসা চোখ, স্তন দুটি সন্ন্যাসিনীদের পোশাকের পট্টি দিয়ে বাঁধা। কিন্তু বেশিক্ষণ লাগলো না, পুবালি হাওয়া যেই নারীকে ক্রমে গলুইয়ের কাছে এনে ফেললে আর নোনা হাওয়া কফিনের অংটা-গুলোয় জং ধরিয়ে দিলে, তরুণী বিধবাটি তার রুক্ষ বসন মোচন করতে শুরু করলে। আর একদিন বিকেলে যখন শুভ্রশীর্ষ সমুদ্র পাটাতনের কাঠে মড়মড় শব্দ তুললো, তার শোকবিধুর ওড়নার আঁচল এক তরুণ অফিসারের জুতোর সোনার নালের গায়ে তালগোল পাকিয়ে জড়িয়ে গেলো, জেনারেল লাক্রের্কের মরদেহের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব ছিলো তার। যে-বেতের ঝুড়িটায় তার দলাপাকানো ক্রেয়োল ছদ্মবেশগুলো ছিলো, তাতে ভ্রমণ করছিলো পিতা লেগবার এক মন্ত্রঃপূত কবচ, সলিমানের বানানো, যেটা পাউলিনা বোনাপার্ৎ-এর জন্য রোমের রাস্তা খুলে দেবে ব'লেই ছিলো নিয়তিনির্দিষ্ট।

উপনিবেশে তখনও যেটুকু কাণ্ডজ্ঞান অবশিষ্ট ছিলো, পাউলিনার বিদায় নেবার ঘটনা তারও অবসান সূচিত করলে। রশাম্বুর সরকারের আমলে, সমভূমির বাকি সব জমিমালিকরা—প্রাক্তন সমৃদ্ধি ফিরে পাবার সব আশা হারিয়ে—এক বিশাল ইন্দ্রিয়বিলাসের তালমানছেঁড়া আসরে অকাতরে, নির্বোধে, নিজেদের ছেড়ে দিলে। ঘড়ির দিকে আর কেউ দৃক্‌পাতও করে না, ঊষাও আর সূচিত করে না রাত্রির অবসান। সংকেতবাক্য হ'লো, সর্বনাশ সব সুখ কপাৎ ক'রে গিলে ফেলার আগে যা-পারো পানভোজনফূর্তি ক'রে নাও। মেয়েছেলেদের বিনিময়ে রুপা বিলোন রাজ্যপাল। এল্ কাবোব মহিলারা লাক্রের্কের ঘোষণাকে টিটকিরি দেয়, যিনি বারফট্টাই ক'রে বলেছিলেন, 'পদমর্যাদা যা-ই হোক না কেন, যে-শ্বেতাঙ্গিনী নেগ্রোদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি করবে তাকে ফ্রান্সে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হবে।' অনেক স্ত্রীলোকই হ'য়ে গেলো সমকামিনী, নাচের আসরে তারা হাজির হয় মুলাটো তরুণীদের সঙ্গে, যাদের তারা বলে নষ্ট মেয়ে। বাচ্চা বয়সেই ধর্ষণ করা হ'লো ক্রীতদাসদের মেয়েদের। এইই হ'লো বিভীষিকার দিকে সরাসরি ধাবমান রাস্তাটা।

ছুটির দিনে রশাম্বু নেগ্রোদের ছুঁড়ে দেন কুত্তার পালের কাছে, আর জানোয়ার-গুলো যদি এত দর্শকের সামনে ঝকমকে চমৎকার সাজা হিশেবে কোনো নেগ্রোর গায়ে দাঁত বসাতে ইতস্তত করে, বলিকে খোঁচানো হয় তলোয়ারের ডগায়, যাতে রক্ত ঝ'রে পড়ে লোভনীয়. তাতিয়ে তোলে। এতে নেগ্রোরা যথাস্থানে থাকবে, এই পূর্বানুমান ক'রে রাজ্যপাল কুবায় শয়ে-শয়ে মাস্টিফ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন : 'ওরা নিগার বশ্যি করবে!'

তি নোয়েল যে-জাহাজটাকে দেখেছিলো, সেটাকে যেদিন দেখা গেলো এল্ কাবোয় ঢুকতে, সেটার সঙ্গে বাঁধা ছিলো মার্তিনিক থেকে আসা আরেকটা তিন-মাস্তল জাহাজ, তাতে ছিলো বিষধর সব সাপ; জেনারেল ফন্দি এঁটেছিলেন তাদের তিনি সমভূমিতে ছেড়ে দেবেন, যাতে তারা দূরে-দূরে কুঠুরিগুলোয় গিয়ে চাষীদের ছোবলায়—হতভাগারা পাহাড়ে-পর্বতে পালিয়ে-যাওয়া ক্রীতদাসের সাহায্য করে। কিন্তু সাপেরা—তারা দাম্বালার জীব—ডিম না-পেড়েই মারা গেলো; প্রাচীন সরকারের শেষ ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে-সঙ্গেই তারাও উধাও হ'য়ে গেলো। এখন মহান লোয়া হাস্ত ছাড়লেন নিগ্রোদের বাহুতে। জয় তাদেরই হ'লো যাদের ছিলো স্তুতি করার মতো রণদেবতা। ওগুন-বাদাগ্রি পরিচালনা করলেন ঠাণ্ডা ইস্পাতের ফলাগুলোর হামলা—যুক্তির দেবীর শেষ কেল্লাটির বিরুদ্ধে। আর, যেমন হয় স্মরণযোগ্য সব দ্বৈরথেই—কেননা কেউ-একজন সূর্যকে থমকে দিয়েছিলো নিশ্চল অথবা শিঙার একফুঁয়ে নামিয়ে ফেলেছিলো দেয়াল—তখনকার দিনে এমন পুরুষ ছিলো যারা তাদের খোলা বুক দিয়ে ঢেকে দিতো শত্রুর কামানের মুখ, যারা তাদের শরীর থেকে শিশের গুলিকেও অন্যদিকে পিছলে ফেলবার ক্ষমতা রাখতো। এই সেই সময় যখন গ্রামেগঞ্জে দেখা দিতে লাগলো নিগ্রো যাজকেরা মস্তকমুণ্ডন না-ক'রেই, বিদ্যাভাস না-ক'রেই, যাদের বলা হ'তো সাভান্নার পাদ্রি। মুমূর্ষুর তৃণশয্যার পাশে যখন লাতিনে প্রার্থনা করার সময় আসতো, তারা ছিলো ফরাশি পাদ্রিদের মতোই সমান জ্ঞানী। কিন্তু তারা আগের চেয়ে ভালো ক'রে বোঝাতে পারলো নিজেদের, কারণ যখন তারা আবৃত্তি করতো প্রভুর স্তব অথবা মারিয়ার বন্দনা, তারা কথাগুলোয় এমন ঝোঁক, এমন স্বরাঘাত দিতো, যাতে সে-সব শোনাতো সকলেরই চেনাজানা স্তবস্তুতির মতো। অবশেষে, অন্তত, জীবন-মরণের কিছু-কিছু সমস্যার দেখাশুনো করা যাচ্ছে পরিবারের গণ্ডিতেই।

তৃতীয়

যে-কোনোখানেই দেখা যেতো সোনার রাজমুকুট—কোনো-কোনোটা এত ভারি যে তুলতে গেলেও কষ্ট হ'তো।

—কার্ল রিটার

(সান স্বসির লুঠতরাজের অন্যতম সাক্ষী)

১

অলক্ষণ

একজন নেগ্রো, বুড়ো, তার কড়া-পড়া বুড়ো আঙুলের হাড়ের কাছে মাংস বেরিয়ে এসেছে, অথচ তবু সেই পায়ের ওপর অটল খাড়া, তিন-মাস্তল জাহাজটা থেকে নেমে এলো—এইমাত্র জাহাজটা কে সাঁ মার্ক-এ নোঙর ফেলেছে। দূরে, উত্তরে, এক শৈলশিরা ভূদৃশ্যের নীল সীমারেখা এঁকে দিয়ে গেছে, আকাশের নীলের চেয়ে তা গাঢ় নয় মোটেই। সময় নষ্ট না-ক'রে তি নোয়েল, তার হাতে একটা শক্ত লিগন্থুম ভাইতের লাঠি, শহর থেকে বেরিয়ে পড়লো। সেই যেদিন সান্তিয়াগো দে কুবার এক খামারমালিক তাকে মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজির কাছ থেকে তাশের জুয়োয় জিতে নিয়েছিলো, তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। তাব একটু পরেই মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি মারা গেছেন দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে। কুবার মালিকের কাছে, তি নোয়েলের বেঁচে-থাকাটা উত্তরের সমভূমির ফরাশিদের চেয়ে তুলনায় সহজতর ছিলো, সহ্য করা যেতো। বছরের পর বছর তার বড়োদিনের বখশিশ জমিয়ে, সে শেষটায় একটা জেলে-নৌকোয় ক'রে আসার ভাড়া জোগাড় করেছে, ঘুমিয়েছে জাহাজের খোলা পাটাতনেই। যদিও তাকে দু-দু-বার লোহাদাগা হয়েছিলো, তি নোয়েল এখন স্বাধীন। সে এখন এমন-এক দেশের মাটিতে পা দিয়েছে, যেখানে চিরকালের মতো ক্রীতদাসপ্রথা বাতিল হ'য়ে গেছে।

তার প্রথমদিনের পথচলা তাকে নদীর তীরে নিয়ে এলো, সেখানে একটা গাছতলাতেই সে রাতটা কাটিয়ে দিলে। পরদিন সকালেই সে আবার বেরিয়ে পড়লো, এবার রাস্তাটা গেছে বুনো আঙুরের খেত আর বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে। ঘোড়াদের যারা স্নান করাচ্ছিলো, তারা তাকে দেখে কী-সব কথা বললে হেঁকে, সে তা তেমন ভালো বুঝতে পারেনি, তবে সে নিজের মতো ক'রেই যা-হোক একটা উত্তর দিয়েছে। তাছাড়া, তি নোয়েল যখন একা থাকে, তখনও কখনো একা থাকে না। অনেক দিন ধ'রেই সে আয়ত্ত করেছে চেয়ারটেবিল, বাসন-কোশন, এমনকী গোরুবাছুর অথবা তার নিজেরই ছায়ার সঙ্গে কথা বলার বিদ্যে। এই লোকগুলো সব বেশ হাসিখুশি। কিন্তু রাস্তার একটা মোড় ঘুরতেই মনে হ'লো গাছপালা লতাপাতা সব শুকিয়ে আছে, মাটি আর আগের মতো লাল চকচকে দেখাচ্ছে না, বরং কোনো মশিকোঠার ধুলোর আস্তরের মতো হ'য়ে আছে—আর গাছপালাগুলো সব

যেন গাছপালার কঙ্কাল। নেই কোনো ঝলমলে গোরস্থান, শাদা পলেস্তারা-বোলানো ছোটো-ছোটো সমাধিগুলো আর নেই, যেগুলোকে এককালে ক্রুপদী মন্দিরের মতো দেখাতো, বরং জায়গাটা এখন যেন কুকুরের আস্তানার মতো হ'য়ে আছে। এখানে মৃতেরা সমাহিত হয় রাস্তার পাশে, এক সুগম্ভীর মনখারাপ চুপচাপ সমতল জমিতে—যেখানে এখন হামলা করেছে ফণিমনসা আর কাঁটাঝোপ। মাঝে-মাঝে চারটে থামের ওপর দাঁড়-করানো পরিত্যক্ত ছাদগুলো ব'লে দেয় দূষিত মহামারীর সংক্রাম থেকে তার বাসিন্দাদের পলায়নের কাহিনী। এখানে যা-কিছু গজায় তারই আছে ধারালো কিনার, কাঁটা বার-করা বনগোলাপের ঝোপ, অলুক্ষুণে, সব শুকনো-শুকনো গর্ত। যে-অল্প ক-জন লোকের সঙ্গে তি নোয়েলের দেখা হ'লো তারা তার সম্ভাষণের উত্তরও দিলে না, কুকুরের ঝোলা চোয়ালের মতো চোখ নামিয়ে তারা যেন মাটির ওপর দৃষ্টি দিয়েই থপথপ ক'রে চলেছে। হঠাৎ নেগ্রোটি থেমে গেলো, দম আটকে গেলো তার। একটা কাঁটাগাছ থেকে ঝুলছে ফাঁসি-দেয়া একটা ছাগল। জমিটা চিহ্নপ্রতীকে ভরা: তিনটে পাথর এমনভাবে সাজানো যেন একটা অর্ধবৃত্ত, একটা ভাঙা ডাল যেন দরজার ওপর চোখা কোণতোলা খিলেন। আরো এগিয়ে দেখা গেলো, একটা আঠালো ডাল থেকে কয়েকটা কালো মোরগ ঝুলছে, মুণ্ড নিচে। চিহ্নগুলো অবশেষে যেখানে শেষ হ'য়ে গেলো, সেখানে একটা বেজায় অলুক্ষুণে গাছ দাঁড়িয়ে: তার ডালগুলো যেন কালো-কালো কাঁটার রোঁয়া ফুলিয়ে আছে, আশপাশে প'ড়ে আছে নৈবেদ্য। পথের দেবতা লেগবার যষ্টির মতো তার শেকড়-বাকড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে দোমড়ানো তেড়াবেঁকা গ্রন্থিল ডালপালা।

তি নোয়েল প'ড়ে গেলো নতজানু, আবার তাকে গরীয়ান সনদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে ধন্যবাদ দিলে আকাশকে। কারণ সে তো জানে—সান্তিয়াগো দে কুবার সব ফরাশি নেগ্রোই যেমন জানে—যে জয় শুধু এক বিশাল সম্মেলনের ফল, যে চুক্তির মধ্যে যোগ দিয়েছে লোকো, পেত্রো, ওগুন-ফেরাই, ব্রিস-পিম্বা, কাপলাউ-পিম্বা, মারিনেৎ বোয়া শেশ এবং আগুন ও বারুদের আরো-সব দেবতা, যে-মৈত্রীটা চিহ্নিত হ'য়ে আছে এমনই ভয়াবহ কতগুলো আক্ষোভের পরম্পরায় যে কিছু লোক মন্ত্রবলে ভোজবাজির মতো উৎক্ষিপ্ত হয়েছে শূন্যে অথবা নিক্ষিপ্ত হয়েছে মাটিতে। তারপর রক্ত, বারুদ, গম আর কফির গুঁড়ো মিশিয়ে এমন-একটা ঠাশ-বুনুনি ডেলা পাকানো হয়েছে যেটা মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে পূর্বপুরুষের দিকে, যখন দপদপ ক'রে উঠেছিলো পবিত্র সব ঢাক, আর এক লেলিহান অগ্নিশিখার ওপর

দাক্ষিতের অসির ফলা গায়ে-গায়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়েছিলো। যখন দিব্যোল্লাস পৌঁছেছিলো জরাতুর তীব্রতায়, অধিকৃত মানুষ লাফিয়ে উঠেছিলো দু-জন পুরুষের কাঁধে—সেই দুই পুরুষ হ্রেষাধ্বনি করছিলো—আর তারপর সবাই জুড়ে গিয়েছিলো ধাবাওলা সেন্টরের এক পার্শ্বচিত্রে—যে কদমে-কদমে নেমে গিয়েছিলো সমুদ্রে, রাত্রি পেরিয়ে, অনেক অনেক রাত্রিরও দূরে, যে সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ছিলো প্রবল শক্তিধরদের জগতের তীরে।

২

সান্ সুসি (নির্ভার)

কয়েকদিন একটানা পথচলার পর, তি নোয়েল কোনো-কোনো জায়গা চিনতে শুরু করলে। জলের স্বাদ তাকে ব'লে দিলে যে এই জলে সে এককালে স্নান করেছে, তবে আরো ভাটির দিকে, যেখানে ঝরনা ঘুরে-ঘুরে নেমে গেছে উপকূলের উদ্দেশে। যে-গুহাটায় এককালে মাকান্দাল তার বিষ জ্বাল দিতো, তার কাছ দিয়ে সে চ'লে গেলো। উত্তরের সমভূমিতে নেমে আসার জন্যে ক্রমবর্ধমান অধীরতার সঙ্গে সে নেমে এলো দোন্দোর সরু উপত্যকার ঢাল। তারপর, সমুদ্রতীর ধ'রে, সে চললো মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজির পুরোনো খামারের উদ্দেশে।

যে-তিনটে সোনাঝুরি রেশমগাছ একটা ত্রিভুজ তৈরি ক'রে দিয়েছে, তাদের দেখে সে বুঝতে পারলে যে সে পৌঁছে গেছে। কিন্তু কিছুই আর প'ড়ে নেই সেখানে—না আছে নীলকুঠি, অথবা তামাকের আড়ত, না আছে গোলাবাড়ি অথবা মাংস জারাবার ও শুকোবার পাটাতন। শুধু যা প'ড়ে আছে বাড়িটার, সেটা ইটে তৈরি একটা ধোঁয়া ওগরাবার নল, এককালে ছাওয়া ছিলো আইভিলতায়, ছায়া নেই ব'লে এখন যা হুতাশে শুকিয়ে গিয়েছে; শুধু কাদায় ডোবা কয়েকটা শানপাথর ব'লে দিলে কোথায় দাঁড়িয়েছিলো গুদোমঘরগুলো, গির্জেটার যা অবশিষ্ট প'ড়ে আছে, সেটা হাওয়ামোরগের লোহার কঙ্কাল; এখানে-সেখানে প'ড়ে আছে দেয়ালের টুকরোটাকরা—যাদের দেখাচ্ছে কোনো বর্ণমালার মোটা-ভাঙাচোরা অক্ষরের মতো। সরল গাছের ঝাড়, আঙুরখেত, ইওরোপের গাছগুলো সব উধাও হয়েছে, বাগানটাও তাই—যেখানে অতীতে শতমূলীরা তুলে দিয়েছিলো তাদের বিবর্ণ ডাঁটি আর মোটা-মোটা পাতার আড়ালে হাতিচোকেরা লুকিয়ে

রেখেছিলো তাদের হৃদয়, পুদিনা আর ধনেপাতার গন্ধের মধ্যে। খামারটা যেন কোনো পোড়ো জমি, যার মধ্য দিয়ে গেছে রাস্তা। তি নোয়েল পুরোনো ইমারতটার এককোণার একটা পাথরের ওপর ধপ ক'রে ব'সে পড়লো—যাদের মনে নেই তাদের কাছে এই পাথরটা অন্য যে-কোনো পাথরের মতোই দেখাবে। পিঁপড়েদের সঙ্গে কথা বলছিলো সে, হঠাৎ একটা আকস্মিক শব্দ শুনে মাথা ঘুরিয়ে তাকালে। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে আসছে চকচকে উর্দিগায়ে এক ঘোড়সোয়ার, লম্বা, নীল কুর্তা, ছিমছাম কোষ আর কাঁস জড়ানো, চুনটকরা সূচিকর্মেভরা গলবন্ধ, পুরু আঁচললাগানো কিংখাবের ফিতে, পালক-লাগানো টুপি, আর নাল-লাগানো ঘোড়সোয়ারের বুটজুতো। শাদাশিধে ইস্পানি ঔপনিবেশিক উর্দির সঙ্গে পরিচিত, তি নোয়েল হঠাৎ অবাক হ'য়ে আবিষ্কার করলে নাপোলিয়ঁর শৌখিন পোশাকের জাঁকজমক, এ-পোশাক তার জাতির লোককে এমন-এক সমারোহ দিয়েছে, কর্সিকার সেই সেনাপতি যা স্বপ্নেও ভাবেননি। ঘোড়সোয়ারেরা তার পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলো মিলো-র দিকে, যেন সোনালি ধুলোর মেঘে ঢাকা প'ড়ে মিলিয়ে গেলো। বুড়ো এই দৃশ্য দেখে সম্মোহিত, সে ধুলোর মধ্যেই ঘোড়ার রাস্তা অনুসরণ করলে।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই তার মনে হ'লো সে যেন এক ঐশ্বর্যে-ভরা সুখবিতানে এসে হাজির হয়েছে। মিলো গ্রামটার চারপাশে সব জমি যেন বাগানের মতো যত্ন নিয়ে সাজানো; জ্যামিতিক নকশার মতো বসানো সেচের খাল, আর কচি অঙ্কুর ঘন দূর্বায় শ্যামল কুসুমশয্যা। বিস্তর লোক কাজ করছে মাঠগুলোয়, চাবুক হাতে সৈন্যদের সজাগ তত্ত্বাবধানে, যারা মাঠে-মাঠে নিরুদ্যম পেছিয়ে-পড়া লোকদের তাগ ক'রে ঢিল ছুঁড়ছে। 'বন্দী সব,' নিজের মনেই ভাবলে তি নোয়েল, আর তাকিয়ে দেখলে যে প্রহরীরা সবাই নেগ্রো, কিন্তু মজুররাও তাই; সান্তিয়াগো দে কুবায় কোনো-কোনো রাতে ফরাশি নেগ্রোদের উৎসবমুখর জমায়েতে গিয়ে সে যে-ধারণা করেছিলো, এ-দৃশ্য তার বিরোধী। তবু বুড়ো তার পথে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো: তার দীর্ঘজীবনের সবচেয়ে-অভিভূত-করা দৃশ্য এটা। গভীর-সব নয়ানজুলির মধ্যে থেকে বেগনি-ডোরা-কাটা গিরিমালাকে পশ্চাৎপটে রেখে উঠেছে গোলাপি এক প্রাসাদ, সূক্ষ্মাগ্র ধনুকাকৃতি খিলান দেয়া জানলা তার, তার পাথরে তৈরি উঁচু সোপানশ্রেণীর জন্য তাকে প্রায় শূন্যচারী দেখাচ্ছে, প্রায় বায়বীয়। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ ছাতের ছাউনি—সেগুলো সম্ভবত কারখানা, আস্তাবল আর শিবির। অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছে এক সুগোল ইমারৎ, শাদা-শাদা স্তম্ভের ওপর তার গম্বুজটা যেন মুকুটের মতো

পরানো ; সেখান থেমে ঢোলা আলখাল্লা পরা ধর্মযাজকেরা আসছে যাচ্ছে। যত কাছে এগিয়ে এলো, তি নোয়েল ক্রমে-ক্রমে তত দেখতে পেলে অলিন্দ, মূর্তি, তোরণশোভিত পথ, উদ্যান, লতায়-ছাওয়া বীথিকা, কৃত্রিম ঝরনা আর চিরহরিৎ গাছপালার জটিল গোলকধাঁধা। ভারি-ভারি স্তম্ভের তলায়—কালো কাঠের এক বিশাল সবিতাষে ধ'রে আছে সেই স্তম্ভগুলো দুটি—ব্রন্জে তৈরি সিংহ পাহারা দিচ্ছে। প্রধান এসপ্লানাদের ওপাশে শাসা উর্দিপরা সামরিক কর্মীরা ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে; দ্বিচূড় টুপি-পরা তরুণ কাপ্তেন ঝিকিয়ে দিচ্ছে রোদের ফলাগুলো, উরুর পাশে ঝনঝন করছে অসি। একটা খোলা জানলা দিয়ে ভেসে এলো নাচের অর্কেস্ট্রার আওয়াজ—তালিম চলেছে পুরোদমে। প্রাসাদের বাতায়নে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের, মাথায় পালক-বসানো টুপি, তাদের ভরা বুক তাদের শৌখিন ঘাঘরার আঁটো কোমরবন্ধের জন্যে আরো উত্তুঙ্গ হ'য়ে উঠেছে। একটা বাহির-উঠোনে দুই কোচোয়ান একটা সোনায়মোড়া মস্ত ঘোড়ার গাড়ি ধুচ্ছে—গাড়ির ওপর পেতলের গায়ে সূর্য আঁকা। সেই-যে গোল ইমারৎটা থেকে যাজকরা বেরিয়ে আসছিলো তার সামনে দিয়ে যাবার সময় তি নোয়েল আবিষ্কার করলে সেটা আসলে নিষ্কলুষ-জন্মের প্রতিমা বসানো একটা গির্জে—পর্দা, নিশেন আর চাঁদোয়ায় সাজানো।

কিন্তু তি নোয়েলকে যেটা সবচেয়ে তাজ্জব করলে সেটা এই আবিষ্কার, যে এই অবিশ্বাস্য জগৎ—এর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন-কিছুর কথা এল্ কাবোর ফরাশি রাজ্যপালরা কক্খনো জানেননি—আসলে নেগ্রোদেরই জগৎ। কারণ ঐ রূপবতী সুডৌল নিতম্বের মহিলারা, ঐ যারা ট্রাইটনের ফোয়ারাটাকে ঘিরে-ঘিরে নাচছে, তারা নেগ্রো ; ঐ যে শাদা দুই আলখাল্লা পরা ধর্মযাজক বগলে চামড়ার থলে নিয়ে প্রধান সোপান দিয়ে নেমে আসছেন, তাঁরাও নেগ্রো ; বাবুর্চি—সেও নেগ্রো ; তার লম্বা টুপিটায় একটা নেউলের ল্যাজ ; প্রধান শিকারির নেতৃত্বে কয়েকজন গ্রামবাসী ঐ-যে একটা হরিণকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে, বাবুর্চি সেটা নিতে বেরিয়েছে ; ঐ-যে ঘোড়সোয়ারবাহিনীর ছোকরাগুলো ঘোড়া চালানোব গোল চত্বরে ধনুকের মতো পিঠে বাঁকিয়ে ঘোড়াদের দিয়ে যে লাফ দেয়াচ্ছে, তারাও নেগ্রো ; ঐ-যে প্রধান কঞ্চুকী ঐ যার গলায় রুপোর হার বাইরের নাটমঞ্চে নেগ্রো অভিনেতাদের মহড়া দেখছে রাজার বাজপাখিপালকের সঙ্গে, সে নেগ্রো ; ঐ-যে শাদা পরচুল-পরা খানশামার দল—ঐ যাদের সোনার বোতামগুলো খুঁটিয়ে দেখছে সবুজ মখমলে শোভিত এক খানশামা—তারাও সবাই

নেগ্রো ; আর, সবশেষে, নেগ্রো, শুভ, সুমঙ্গল এবং নেগ্রো—যে অভিনন্দনগানের মহড়া দিচ্ছে নেগ্রো সংগীতজ্ঞরা, তাদের দিকে তাকিয়ে গির্জের উঁচু বেদী থেকে যে নিষ্কলুষ জন্মদাত্রী মৃদুমধুর হাসছেন, তিনিও নেগ্রো। তি নোয়েল বুঝতে পারলে সে সান্ সুসিতে এসেছে, রাজা ক্রিস্তফের যেটা প্রিয় আবাস, যে-ক্রিস্তফ একদিন ছিলো ওবের্জ দ্য লা কুরন্-এর মালিক, যে ক্রিস্তফ একদিন ছিলো রু দ্য এসপানিওলের প্রাক্তন বাবুর্চি, যে এখন নিজের স্বাক্ষর করা টাকা বানাচ্ছে, যে টাকার গায়ে খোদাই করা হচ্ছে এই আপ্ত বাক্য : 'ঈশ্বরই আমার ন্যায় এবং আমার তরবারি।'

বুড়োর পিঠে একটা ভারি চাপড় পড়লো। সে মুখ ফুটে কোনো প্রতিবাদ করার আগেই, এক প্রহরী তার পাছায় লাথি কষাতে-কষাতে তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে চললো একটা ছাউনির দিকে। যখন সে আবিষ্কার করলে যে একটা ছোট্ট কুঠুরিতে সে তালাবন্ধ প'ড়ে আছে, তি নোয়েল চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে বলতে লাগলো যে সে ব্যক্তিগতভাবে রাজা ক্রিস্তফের পরিচিত—শুধু তাই নয়, তার এই ধারণাটাও সে ব্যক্ত করতে ছাড়লে না যে সে শুনেছে ক্রিস্তফ যাকে বিয়ে করেছেন সেই মারিয়া-লুইসা কোয়াদাভিদকেও সে চেনে, সে ছিলো মুক্ত লেসনির্মাতার ভাগ্নী, মাঝে-মাঝে মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজির খামারেও আসতো। কিন্তু কেউ তার দিকে দৃকপাতও করলে না। বিকেলবেলায় অন্য কয়েদীদের সঙ্গে তাকেও নিয়ে যাওয়া হ'লো লা বনে দ্য লেভেক-এর তলায়—যেখানে বাড়ি বানাবার জন্যে ইঁটচুনসুরকির একটা বিশাল স্তূপ প'ড়ে ছিলো। তারও হাতে একটা ইঁট তুলে দেয়া হ'লো।

'নিয়ে যাও ওপরে—আরেকটার জন্যে ফিরে এসো।'

'আমি বড্ড বুড়ো।'

একটা মুগুরের বাড়ি পড়লো তি নোয়েলের মাথার খুলিতে। আর-কোনো আপত্তি না-ক'রে সে খাড়া পাহাড়টা বেয়ে উঠতে শুরু করলো, যোগ দিলে এক লম্বা মিছিলে : বাচ্চা-কাচ্চা, গর্ভিনী মেয়ে, বুড়োবুড়ি, সবাই একটা ক'রে ইঁট নিয়ে যাচ্ছে। বুড়ো পেছন ফিরে মিলো-র দিকে তাকালে। অপরাহ্ণের আলোয় প্রাসাদকে আরো গোলাপি দেখাচ্ছে। পাউলিনা বোনাপার্ৎ-এর একটা আবক্ষ মূর্তির সামনে—মূর্তিটা এককালে তার এল্ কাবো-র বাড়িতে শোভা পেতো—ছোট রাজকন্যারা, আতেনা আর আমেতিস্তা, লেসের ঝালক-লাগানো সাটিনে সেজে, হালকা ছোটো ঝাঁঝরি ব্যাট আর পালকে বানানো মোরগ-ফুলের বল নিয়ে

খেলা করছে। একটু দূরেই, রানীর যাজক—সারা ছবির মধ্যে এই একটাই গোরা-মুখ—আঁরি ক্রিস্তফের তৃপ্ত দৃষ্টির নিচে যুবরাজকে প'ড়ে শোনাচ্ছেন প্লুতার্ক-রচিত 'জীবনচরিতগুলো,' আঁরি ক্রিস্তফ তাঁর সচিবদের নিয়ে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছেন রানীর কুঞ্জবনে। মর্মর পাথরের রূপকগুলির মধ্যে চিরহরিৎ পাতাবাহারের ঝোপ-গুলো এমনভাবে সাজানো যে মুকুটের মতো দেখায় তাদের ; যেতে-যেতে, মহামান্য রাজা, অবহেলাভাবে হাত বাড়িয়ে ঝাড়ের মধ্য থেকে একটা সদ্য-ফোটা শ্বেত গোলাপ তুলে নিলেন।

৩

ষাঁড় বলি

ল্য বনে দ্য লেভেক-এর শিখরে, মাচায়-মাচায় খাঁজ-কাটা, উঠে গেছে সেই দ্বিতীয় পাহাড়—পাহাড়ের ওপর আরেক পাহাড়—যা হ'লো লা ফেরিয়ের-র নগরদুর্গ। প্রধান মিনারের পাশ বেয়ে, কিংখাবের বাহুল্যহীন মসৃণতায় উঠে যাচ্ছে লাল ছত্রাকের সমারোহ—এর মধ্যেই তারা ছেয়ে দিয়েছে ভিত্তিভূমি আর আলম্ব, আর গেরি-রং দেয়ালগুলোয় ছড়িয়ে দিচ্ছে শতপদ পরিলেখ। পোড়া ইঁটের একটা বিরতিহীন বিস্তার—মেঘেরও ওপরে মিনারের মতো এমন ঋজু ও সটান উঠে গিয়েছে যে যথানুপাত চক্ষুর অভ্যাসকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে: সুড়ঙ্গ, ঢাকা বারান্দা, মৌচাকের মতো বিন্যস্ত সব গুপ্ত পথ, ধোঁয়া-ওগরানো লম্বা নলগুলো—সব ভারি ছায়ায় আচ্ছন্ন। কী-রকম যেন সিন্ধুশ্যামল দেখায় আলোকে, ঠিক যেমন দেখায় কাচের চৌবাচ্চায়, এরই মধ্যে শূন্যে তাতে ঝাউপাতার ছোপ লেগেছে—উঁচু-উঁচু গবাক্ষ ও বাতায়ন দিয়ে এসে এক বাষ্পময় কুয়াশার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। বহুবিধ সাজসরঞ্জাম সমেত তিনটে প্রধান কামানশ্রেণীর বারুদশালা সমেত গোলন্দাজদের গির্জে, রান্নাঘর, চৌবাচ্চা, কামারশালা, ঢালাইঘর, বুরুজ—তাদের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে পাতালে নেমে যাচ্ছে সোপানশ্রেণী। কুচকাওয়াজের জন্য নির্দিষ্ট চৌকো চত্বরটায় প্রতিদিন কতগুলো ষাঁড়ের গলাকাটা হয় যাতে কেল্লাকে অভেদ্য ক'রে তোলবার জন্যে রক্ত মিশিয়ে দেয়া যায় চুন-সুরকির সঙ্গে। সমুদ্রের দিকে মুখ-করা যে-পাশটা সমভূমির মাথাঘোরানো সুবিস্তীর্ণ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে, সেদিকে প্রাসাদের কোঠাগুলোয় মজুররা এর মধ্যেই জিপসাম আর গুঁড়ো মর্মরশিলা

মিশিয়ে গলেস্তারা বোলাতে শুরু করেছে : জেনানামহল, খাবার আর বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, দেয়ালে-দেয়ালে কাঠের কাঠামোর মধ্যে পোরা চতুশ্চক্রবগির চক্রনেমি ঝোলানো সেতুটার গায়ে লাগানো তারা—যার ওপর দিয়ে সবচেয়ে উঁচু অলিন্দটায় ইটপাথর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—সেতুটা যেন ছড়িয়ে আছে ভেতরের আর বাইরের পাতালের ওপর, যেটার ওপর দিয়ে যাবার সময় মিস্ত্রিদের পেট মোচড় দিয়ে ওঠে ঘূর্ণিরোগে। প্রায়ই কোনো নেগ্রো মিলিয়ে যায় মহাশূন্যে, সঙ্গে নিয়ে যায় চুন-সুরকির পাত্র। তক্ষুনি আরেকজন নেয় তার জায়গা ; যে প'ড়ে গেলো, তার সম্বন্ধে আর-কিছুই ভাবে না কেউ। সেই বিশাল ইমারৎটার পেটের মধ্যে, চাবুক-বন্দুকের চিরজাগ্রত চোখের তলায়, শয়ে-শয়ে লোক কাজ ক'রে যায়, এমন কীর্তি সুসম্পন্ন করে আগে যা শুধু দেখা গিয়েছিলো পিরানেসির কাল্পনিক স্থাপত্যে। দড়ি দিয়ে ওপরে-তোলা, পাহাড়ের মুখোমুখি, প্রথম কামানগুলো আসতে শুরু করেছে, তাদের বসানো হচ্ছে সিডার কাঠের কামানবাহকে, ছায়া-ঢাকা ছোটো-ছোটো ধনুকাকৃতি কুঠরিতে, গাঁয়ের দিকে এগুনো সব গিরিসংকট আর প্রবেশপথের ওপর নজর রাখা যায় এদের ঘুলঘুলি দিয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তিন কামান 'সিপিও', 'হানিবাল' আর 'আমিলকার', সাটিন-মসৃণ, এমন-এক ব্রন্‌জে তৈরি করা যার রঙের ছোপটা যেন সোনারই ; এগুলোর সঙ্গে আছে আরো কামান, সেগুলোকে ঢালাই করা হয়েছে ১৭৮৯-র পর, এখনও-অপ্রমাণিত স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতিবচন সমেত। আর আছে একটা ইস্পানি কামান যার নলটায় উৎকীর্ণ এক বিষণ্ণ বয়ান *Fiel pero dcsidichado* (বিশ্বস্ত কিন্তু দুর্ভাগা) ; আর কয়েকটা আছে যাদের চোঙের ব্যাস আরো বড়ো, আর যাদের নল আরো অলংকৃত ও প্রাচীন, যার ওপর সূর্যদেবতার মোহর খোদাই-করা, উদ্ধতভাবে যা ঘোষণা ক'রে যাচ্ছে *Ultima Ratio Regum* (রাজাদের চূড়ান্ত ভিত্তি)।

তি নোয়েল যখন একটা দেয়ালের নিচে তার ইটটা নামিয়ে রাখলে তখন প্রায় মধ্যরাত। তবুও অগ্নিকুণ্ড আর মশালের আলোয় নির্মাণের কাজ চলেছে। রাস্তার দু-পাশে লোকে ঘুমিয়ে আছে বড়ো-বড়ো শিলাখণ্ডের ওপর, কামানের ওপর, ওপরে ওঠবার সময় বারে-বারে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যে-খচ্চরগুলোর হাঁটুতে কড়া প'ড়ে গেছে তাদের পাশে। অবসাদে ছিঁড়ে গিয়ে বুড়ো ঝোলানো সেতুর তলাকার একটা পরিখায় নেমে পড়লো। ভোরবেলায় তাকে জাগিয়ে দিলে চাবুকের শপাং। ওপরে, আলো ফুটলে যে-ষাঁড়গুলোর গলা কাটা হবে, সেগুলো ডুকরোচ্ছে। ঠাণ্ডা মেঘগুলো চ'লে যেতেই নতুন মাচা নতুন ভারা বানানো

হয়েছে ; আর, আস্ত পাহাড়টাই জ্যান্ত হ'য়ে উঠেছে হ্রেষায়, চীৎকারে, হাঁকডাকে, রামশিঙার আহ্বানে, চাবুকের শপাংএ, আর শিশিরভেজা দড়ির আড়ভাঙার আওয়াজে। আরেকটা ইটের খোঁজে তি নোয়েল মিলোর দিকে নামতে শুরু করলে। নামার পথে সে দেখতে পেলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সব পথ গলি ফাঁক-ফোকর দিয়ে উঠে আসছে শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধের স্তম্ভের মতো স্ফীত সার, প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে ইট, সেটাকে তারা কেল্লার পাদদেশে এনে রাখছে, আর কেল্লা উঠে যাচ্ছে পিঁপড়ের ঢিবির মতো ; এই-যে অবিশ্রাম ঋতু থেকে ঋতুতে, বছর থেকে বছরে, সব মরশুমে পোড়ামাটির দানা ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারই সৌজন্যে তি নোয়েল অচিরেই জানতে পেলে যে বারো বছরেরও বেশি হ'য়ে গেলো এই রকমই চলেছে, আর এই অবিশ্বাস্য কাজের জন্যে জোর ক'রে ধ'রে আনা হয়েছে উত্তরের সমস্ত লোককেই। সব প্রতিবাদকেই চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে রক্তে। হাঁটা, শুধু হাঁটা, ওপরে আর নিচে, নিচে থেকে ওপরে ; নেগ্রোটির মনে হ'লো, সান্ স্যুসির সংগীতভবনের অর্কেস্ট্রা, উর্দির জমকালো সমারোহ, ফুলের কেয়ারির পাশে-পাশে আঁচলের মতো বিছানো সর্পিল অলংকৃত বেদীর ওপর রৌদ্রস্নাতা গৌরাঙ্গিনীদের নগ্নমূর্তি—সবকিছুই এমন-এক দাসত্বের উৎপাদন, যা সে জেনেছিলো মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজির খামারে—তেমনি জঘন্য তেমনি বমি-পাওয়ানো দাসপ্রথার সৃষ্টি এইসব। এমনকী তার চেয়েও অধম, কারণ নিজেরই মতো মিশমিশে কালো এক নেগ্রো, যার মাথায় নিজেরই মতো কোঁকড়া পশমচুল আর নিজেরই মতো যার পুরু ঠোঁট আর থ্যাবড়া নাক, তার হাতে মার খাওয়ায় একটা সীমাহীন স্বপ্রকাশ অপমান আছে ; তেমনি নিচু তারও জন্ম, হয়তো তার গায়েও আছে লোহাদাগা—ছ্যাকা দিয়ে খোদাই-করা মালিকের নাম। এ যেন, একই পরিবারে, ছেলেমেয়েরা পেটাচ্ছে বাবা-মাকে, নাতি-পুতি ঠাকুমাকে, ঘরের বউরা শাশুড়িকে—যিনি কিনা এতকাল রেঁধে-বেড়ে তাদের খাইয়েছেন সযত্নে। তাছাড়া, তখনকার দিনে, ঔপনিবেশিকরা—যখন তারা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসতো সে-সময়টা বাদ দিলে—অন্তত সতর্ক থাকতো, দেখতো যে ক্রীতদাসটি যাতে প্রাণে না-ম'রে যায়, কারণ মরা ক্রীতদাস মানেই পকেট থেকে বেদম গচ্চা। অথচ এখানে কোনো দাসের মৃত্যু জনগণের কোষাগারে বিন্দুমাত্র চাপ ফ্যালে না। যতদিন ছেলেপুলের জন্ম দেবার জন্যে কালো স্ত্রীলোক থাকবে—ছিলো তো অতীতে, থাকবেও ভবিষ্যতে, চিরকাল—ল্যা বনে দ্য লেভেক-এর শিখরে ইট ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্য মজুরের কোনো ঘাটতি হবে না।

কাজ কেমন এগুচ্ছে, সরেজমিন দেখতে এসে, রাজা আঁরি ক্রিস্তফ মাঝে-মাঝে নগরদুর্গের ওপরে উঠে যান, সঙ্গে থাকে ঘোড়সোয়ারদের এক বাহিনী। দশাসই, বলিষ্ঠ, বুকের খাঁচাটা পিপের মতো, থ্যাবড়া নাক, তাঁর চিবুক তাঁর পোশাকের গলবন্ধের ঝালরের আড়ালে আদ্ধেক ঢাকা, রাজা ক্রিস্তফ তন্নতন্ন ক'রে ভাখেন গোলন্দাজদের সাজসরঞ্জাম ও কামানশ্রেণী, কামারশালা, কারখানা; সীমাহীন সোপান বেয়ে ওঠবার সময় ঝনঝন ক'রে ওঠে তাঁর জুতোর গোড়ালির নাল। তাঁর নাপোলীয় ত্রিচূড় টুপি থেকে তাকিয়ে থাকে দোরঙা মোরগঝুঁটির পক্ষীচোখ। কখনো-কখনো চাবুক একটু নেড়ে তিনি মৃত্যুদণ্ড দেন কোনো ফাঁকিবাজ অলসের যাকে আচমকা পাকড়ানো গেছে নিদারুণ আলস্যের মধ্যে, অথবা যে হয়তো খুব আস্তে একটা গ্র্যানাইট পাথরের চাঙর তুলছে খাড়া ঢালটাকে বেয়ে। তাঁর আগমন সবসময়েই শেষ হয় সবচেয়ে উঁচু অলিন্দে নিয়ে-আসা একটা আরামকেদারায় ব'সে পড়ে, যেটা অপলক তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে, যার পাশেই প'ড়ে আছে হা-করা এক বিশাল পাতাল—যাকে দেখে যারা এমনকী সবচেয়ে অভ্যস্ত তারা অব্দি চোখ বুজে ফ্যালে। তারপর, যখন কিছুই থাকে না যা তাঁর ওপর কোনো উদ্বেগ বা ছায়া ফেলতে পারে সকলের চেয়ে উঁচুতে, তাঁর নিজেরই ছায়ার ওপর দাঁড়িয়ে, তিনি পরিমাপ করেন তাঁর ক্ষমতার প্রসার। দ্বীপটা ফিরে দখল ক'রে নেবার জন্যে যদি কোনো চেষ্টা করে ফ্রান্স, তিনি, আঁরি ক্রিস্তফ, 'ঈশ্বরই আমার ন্যায় ও আমার তরবারি', তাদের প্রতিরোধ করবেন এখানে, মেঘেরও ওপরে, যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ, আর তাঁর সঙ্গে থাকবে তাঁর গোটা রাজসভা, তাঁর সেনাবাহিনী, তাঁর ধর্মযাজক, তাঁর গায়ক-সাংগীতিক, তাঁর কাফ্রিভৃত্য, তাঁর ভাঁড় ও সং। ঐ একচক্ষু রাক্ষুসে দেয়ালগুলোর ভেতর তাঁর সঙ্গে থাকতে পারবে পনেরো হাজার লোক এবং কোনো অভাবেই তাদের কোনো কষ্ট হবে না। একমাত্র ফটকটির ঝুলসেতুটা একবার টেনে তোলবামাত্র লা ফেরিয়েৎ-র নগরদুর্গ হ'য়ে উঠবে তাঁর দেশ, তাঁর স্বাধীনতা, তাঁর রাজত্ব—তাঁর কোষাগার আর সব জাঁকজমক সমেত। কারণ, নিচে, এটাকে গ'ড়ে তোলবার পেছনে যে-দুঃসহ যন্ত্রণা জড়ানো ছিলো, সে-সব ভুলে গিয়ে, সমভূমির লোকেরা মুখ তুলে তাকাবে দুর্গের দিকে—শস্য বোঝাই, বারুদ বোঝাই, লোহায় সোনায় ভরপুর, ভাববে যে সেখানে, পাখিদেরও ওপরে, ওখানে, যেখানে নিচের জীবন শুধু মোরগের ডাক আর ঘণ্টার শব্দের সুদূর ধ্বনি মাত্র, তাদেরই জাতির একজন রাজা অপেক্ষা ক'রে আছেন, স্বর্গের কাছাকাছি, আর রাজা—সবখানেই তিনি একরকম—অপেক্ষা ক'রে আছেন গুণনের দশ হাজার ঘোড়ার

ব্রনৃজের খুরের খটখট আওয়াজের জন্তে। এমনি-এমনি তো আর এই মিনারগুলো তৈরি হয়নি প্রবল ডুকরে-ওঠা রক্তাক্ত ষাঁড়গুলোর ওপর—যাদের অণ্ডকোষগুলো উঁচোনো ছিলো সূর্যের দিকে; যে-কারিগররা নিজের হাতে এদের গড়েছে তারা ভালো ক'রেই জানে বলিদানের গভীর তাৎপর্য, যদিও তারা অজ্ঞদের এই কথাই বুঝিয়েছে যে এটা সামরিক প্রকৌশলবিদ্যারই অগ্রগতির প্রতীক।

৪

কারারুদ্ধ

নগরদুর্গের কাজ যখন শেষ হ'য়ে আসছে, ইঁটবাহকদের চাইতে যখন মিস্ত্রিদেরই প্রয়োজন বেশি, নিয়মানুবর্তিতার সুকঠোর শৃঙ্খলায় একটু ঢিলে পড়লো। চুনশুরকি আর সেকেলে-সব কামানকে তখনও যদিও উঁচু শিখরটায় ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অনেক স্ত্রীলোককেই অনুমতি দেয়া হয়েছিলো মাকড়শার জালে প্যাঁচানো তাঁদের হাঁড়িকুঁড়ির কাছে ফিরে যাবার। নিরতিশয় অপ্রয়োজনীয়তার জন্য যাদের চ'লে যেতে দেয়া হয়েছিলো তাদের সঙ্গে তি নোয়েলও একদিন সকালে পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে শটকে পড়লে—রাজকন্যাদের মহলের কামানগুলোর পাশে তখন আর কোনো ভারা বাঁধা ছিলো না—কিন্তু তবু তি নোয়েল সেদিকটায় আর ফেরেনি। বাসকক্ষের মেঝেগুলো তৈরি করা হবে ব'লে এখন ঢাল বেয়ে শাবলের সাহায্যে গড়িয়ে তোলা হচ্ছে বড়ো-বড়ো কাঠ। কিন্তু এ-সব কিছুতেই তি নোয়েলের আর কোনো আকর্ষণ ছিলো না; তার শুধু একটাই চিন্তা—কেমন ক'রে আবার লেনরমঁ দ্য মেজির পুরোনো জমি-জিরেতে ফিরে গিয়ে নিজের থাকার একটা ব্যবস্থা করতে পারে, যে-কাদার মধ্যে জন্ম হয়েছিলো কোন্-এক টানে তার মধ্যেই যেমন ক'রে ফিরে যায় বান মাছ, তেমনিভাবেই সে এখন ফিরে যাচ্ছে ঐ জমিতে। গোলা-বাড়িতে ফিরে এসে নিজেকে তার কেমন একটু মালিক-মালিক লাগলো, এই জমির সীমানাসরহদ্দির যদি কোনো তাৎপর্য থেকে থাকে, সে তবে শুধু তার কাছেই: তার কাটারিটা দিয়ে সে ধ্বংসস্তূপটাকে একটু-একটু ক'রে সাফ করতে শুরু ক'রে দিলে। দুটো বাবলাগাছ হুড়মুড় প'ড়ে গিয়ে খুলে দেখালো দেয়ালের একটা অবশেষ। একটা বুনো ঝোপের পাতার আড়াল থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বেরুলো খাবার ঘরের নীল টালি। পুরোনো রসুইঘরটার ফাটলগুলো তালগাছের বাগলো

দিয়ে বুজিয়ে দিয়ে, নেগ্রোটি নিজের জন্যে এমন-একটা শোবার ঘর ঠিকঠাক ক'রে নিলে, যার মধ্যে তাকে ঢুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে; সেটা সে ভরিয়ে দিয়েছে শুকনো ঘাসে, যাতে তার ওপর রাখতে পারে তার ক্লান্ত দেহ, ল্য বনে জ্য লেভেক-এর রাস্তায় মার খেয়ে-খেয়ে কালশিটে প'ড়ে গেছে তার শরীরে।

সেখানে সে পেলে কনকনে শীতের হাওয়ার কাছ থেকে আশ্রয়, তারপর যে বৃষ্টি নামলো তার কাছ থেকেও, তারপর তাকিয়ে দেখলে এসে পড়েছে বসন্ত। অতিরিক্ত পানসে আম আর কাঁচা ফলমূল খেয়ে-খেয়ে তার পিলে ফেঁপে উঠেছে; অঁরি ক্রিস্তফের স্যাঙাৎদের এড়াবার জন্যে যতটা সম্ভব রাস্তাঘাট থেকে দূরে থাকতো সে—তারা হয়তো নতুন-কোনো প্রাসাদ বানাবে ব'লে মজুর ধ'রে বেড়াচ্ছে, হয়তো তাঁরে যেটা বানাবে ব'লে গুজব শুনেছিলো সেটাই বানানো হচ্ছে এখন—বছরে যতগুলো দিন, সেখানে নাকি ততগুলো জানলা বসানো হবে। কিন্তু নতুন-কোনো ঝুটঝামেলা ও ঘটনা ছাড়াই যখন মাসের পর মাস কেটে গেলো, তি নোয়েল, অনাহারে তার উদরভরা, বেরিয়ে পড়লো এল্ কাবো-র উদ্দেশে, সমুদ্রের ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে প্রায়-মুছে-যাওয়া পায়ে-চলার-পথ ধ'রে ধ'রে—অন্য সময় এ-রাস্তা দিয়ে সে কতবার গেছে তার মালিকের পেছন-পেছন: একবার সে এই পথে খামারে ফিরেছিলো একটা বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে, তখনও ঘোড়াটার দাঁত ওঠেনি, সেই-যে ঘোড়াটা, ঘাড়ের ওপর কচি বয়েসের ভাঁজ-পড়া চামড়া ছিলো যার, যার কদমের আওয়াজ ছিলো করদোবার চামড়ার ঘষটানির মতো। শহর ভালো। পিঠের ঝোলায় পোরবার মতো কতকিছু জোটে সেখানে—কত-কিছু কুড়োনো যায় আঁকশি দিয়ে। চিরকাল শহরে থাকে দু-একজন বেশ্যা, দয়ার শরীর, সবসময় কোনো বুড়োহাবড়াকে ভিক্ষে দিতে যারা সুপ্রস্তুত; সেখানে আছে হাটবাজার, নাচগান, হল্লা, ফুর্তি, খেলদেখানো জানোয়ার, কথা-কওয়া পুতুল, আর এমন-সব রগুইকর যারা বেশ মজাই পায়, ভুখ পাওয়ার কথা না-ব'লে কোনো ভিখিরি যখন আঙুল তুলে দেখায় ব্র্যান্ডির বোতল। তি নোয়েল অনুভব করলে তার হাড়ে-মজ্জায় যেন বিষম হিম জ'মে গিয়েছে। অতীতের সেইসব বোতলের জন্যে দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার—বড়ো-বড়ো বাড়িগুলোর মাটির তলার ভাঁড়ারে থাকতো যে-সব বোতল—চৌকো, চ্যাপটা, পুরু কাচের, ভেতরে ভরা থাকতো ফলের খোশার কুচি, ওষধি, জাম, আর কোহলে-চোবানো শামুক বা শাপলা, যারা ছিটিয়ে দিতো খুবই মোলায়েম খুশবুর চুপি-চুপি চাপা রং।

কিন্তু শহরে এসে তি নোয়েল দেখতে পেলে সারা শহরটা যেন মৃত্যুর প্রহর

গুনে ধুঁকছে। যেন সব বাড়িঘর, সব খড়খড়ি, সব ঘুলঘুলি, সব দরজা-জানলা আর্চ-বিশপের প্রাসাদের কোণটার দিকে ফেরানো কোনো-এক তীব্র ও শঙ্কাতুর প্রত্যাশায়—প্রত্যাশার তীব্রতাটা এতই বেশি যেন বাড়িঘরের সদরকেও তারা কোনো মানুষী ভ্রূকুটিতে বিকৃত ক'রে ফেলেছে। ছাতগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের কার্নিশের ছাঁইচ, কোণাগুলো উঁকি দিচ্ছে সামনে, তীক্ষ্ণভাবে, দেয়ালগুলোর গায়ে জোলো স্যাঁতসেঁতে সব দাগ যেন রাশি-রাশি কান এঁকে দিয়েছে। প্রাসাদের কোণায় নতুন চুনশুরকির পলেস্তারা লেপা চৌকো চত্বরটা সবে শুকিয়েছে, মিশে গিয়েছে দেয়ালের চুনশুরকির সঙ্গে, কিন্তু ছোট্ট একটা ফোকর খোলা রেখে গেছে। এই কোটরটার মধ্য থেকে—দন্তহীন মুখের মতো কালো এই কোটরটা—মাঝে-মাঝেই ফেটে বেরোয় এমন-এক আর্তচীৎকার যেটা এতই ভয়ানক যে সব লোককে তা শিউরে তোলে আর বাচ্চাদের কাঁদিয়ে ছাড়ে। চীৎকারটা যখন ফেটে পড়ে, গর্ভবতী মেয়েরা দু-হাতে চেপে ধরে তাদের পেট, পথিকরা ক্রুশ-আঁকার-তর-সয়-না-এত-জোরে ছুট লাগায়। আর আর্তচীৎকার, অর্থহীন ডুকরানি—চলতেই থাকে আর্চবিশপের প্রাসাদের কোণায়, যতক্ষণ-না গলাটা—রক্তে দম আটকানো—নিজেকে ছিঁড়ে ফ্যালে শাপশাপান্তে, আঁধার শাসানিতে, ভবিষ্যদ্বাণীতে আর জুজুর ভয়ে। তারপর স্বর বদলে যায় কান্নায়, এমন এক কান্না যেটা উঠে আসে একেবারে বুকের তলা থেকে, যেন কোনো বুড়োর গলায় কোন-এক ছিঁচ-কাঁদুনে বাচ্চার হেঁচকি-তোলা নাকি কান্না, ঐ গলাফাটানো আর্তচীৎকারের চেয়েও যেটা সহ্যাতীত। অবশেষে অশ্রু হ'য়ে ওঠে ফোঁস-ফোঁস দমকা তেতালা শ্বাস—যেটা ক্রমে মিলিয়ে যায় দীর্ঘ-এক হাঁপানির টানে, তারপর পরিণত হ'য়ে যায় নিছক সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসে। আর এই একই জিনিশের পুনরাবৃত্তি হয় দিন-রাত, প্রাসাদের কোণায়। এল্ কাবোতে কেউ ঘুমোয় না। কেউ সাহস করে না আশপাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে; বাড়ির সবচেয়ে ভেতর ঘরে নিচু স্বরে ইষ্টদেবতার নাম জপে। কী-যে ঘটছে, সে-সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করারও সাহস নেই কারু। আর্চবিশপের প্রাসাদে কারারুদ্ধ সেই কাপুচিন—ছোট্ট উপাসনা কুঠুরিটায় তাঁর জীবন্ত সমাধি হয়েছে—হলেন কোর্নেহো ব্রেইয়ে, স্বয়ং ডিউক, আঁরি ক্রিস্তফের স্বীকারোক্তি-শ্রোতা। সেখানেই মরবার দণ্ডাদেশ বর্তেছে তাঁর ওপর, নতুন পলেস্তারা লাগানো দেয়ালের আড়ালে, কারণ তাঁর অপরাধ নাকি এটাই যে তিনি রাজার সব গুপ্ত তথ্য, নগর-দুর্গের যাবতীয় গুপ্ত রহস্য জেনে ফেলে ফ্রান্সে যেতে চেয়েছিলেন; আর, লাল মিনারগুলোয় এর মধ্যেই বাজ পড়েছে কয়েকবার। মিথ্যেই রানী মারিয়া-লুইসা

স্বামীর জুতো জড়িয়ে ধ'রে তাঁর হ'য়ে কাকুতি-মিনতি করেছেন। তাঁর দুর্গের বিরুদ্ধে এইমাত্রই একটা নতুন ঝড় লেলিয়ে দেবার জন্তে দান পেদ্রোকে অপমান ও ভর্ৎসনা করেছেন ঋরি ক্রিস্তফ, ফলে কোন-এক ফরাশি কাপুচিন তাঁকে নিষ্ফলভাবে ধর্মচ্যুত করলো. তাতে তিনি মোটেই ভয় পান না। আর, কোনো সন্দেহের লেশই যাতে না-থাকে, সান্ স্নসিতে এক নতুন অনুগ্রহভাজন এসেছেন. এক ইস্পানি ধর্মযাজক, মাথায় তাঁর লম্বাটে সূক্ষ্মাগ্র টুপি, তাঁর চমৎকার দানাদার খাদে-ভরা গলায় তিনি যেমন প্রার্থনায় গান করেন তেমনি সারাক্ষণ নানা কেচ্ছা-কাহিনী নিয়ে হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটোছুটি করেন, সবাই যাঁকে জানে পাদ্রি হুয়ান দে দিওস নামে। কড়াইশুঁটি আর শুকনো গো-মাংস খেয়ে-খেয়ে ক্লান্ত হ'য়ে ধূর্ত এই ধর্মযাজক অবশেষে হেইতির রাজসভাকে মনের মতো জায়গা ব'লে আবিষ্কার করেছেন, যেখানে মহিলারা তূপ ক'রে তাঁকে খাওয়ায় শর্করার রসে চোবানো ফলমূল আর পোর্তুগালের মদ। একদিন যখন রাজা ক্রিস্তফ ডালকুত্তোগুলোকে শেখাচ্ছিলেন ফ্রানসের রাজার নাম শোনবামাত্র কেমন ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তখন এই পাদ্রি এমন ভঙ্গিতে তাঁর সামনে কিছু-কিছু কথা ব'লে ফেলেছিলো যেন খুব-কিছু ভেবেচিন্তে বলেনি. সেই কথাগুলোই কোর্নেহো ব্রেইয়ের এই ভয়ংকর অসম্মানের কারণ ব'লে জনরব।

এক সপ্তাহ কারাবরোধের পর কাপুচিনের গলার স্বর প্রায় অশ্রুত হ'য়ে এলো: এমন-এক মৃত্যুঘর্ঘরে তা মিলিয়ে যাচ্ছে যে সেটা শোনা যায় না. শুধু অনুভব করা যায়। অতঃপর আর্চবিশপের প্রাসাদের কোণায় স্তব্ধতা এসে হাজির হ'লো। স্তব্ধতাকে যে-শহর বিশ্বাস করে না. সেই শহরে নেমে এলো এক অতি-প্রলম্বিত স্তব্ধতা—গোড়ায় যাকে ভাঙবার সাহস পেতো শুধু কোনো সদ্যোজাত শিশুই, তার অজ্ঞানভাব কাৎরানিতে। তারপর জীবনকে আবার ফেরৎ পথে শহর নিয়ে এলো তার অভ্যস্ত শোরগোলে: ফিরিওলার হাঁক, রাস্তার হৈ-হল্লা, নমস্কার-বিদায়, গুজব-জনরব, রোদে কাপড় শুকোতে দেয়ার সময় গেয়ে-ওঠা গান। এই সেই মুহূর্ত যখন তি নোয়েল অবশেষে তার ঝোলায় ঢোকাতে পেরেছে কিছু-কিছু জিনিশ, আর একের পর এক ঢক-ক'রে-গেলা পাঁচ-পাঁচ গেলাশ ব্র্যাণ্ডির বদলে এক মাতাল খালাশির কাছ থেকে বাগিয়েছে কিছু টাকা। চাঁদের আলোয় টলতে-টলতে সে বেরিয়ে পড়লো তার বাড়ির উদ্দেশে, মাথায় ঝাপশাভাবে গুনগুন করছে একটা গান, অতীতে শহর থেকে বাড়ি ফেরার পথে যেটা সে গাইতো। এমন-একটা গান যেটা কোনো রাজার প্রতি খিস্তি আর খেউড় দিয়ে ভরপুর।

আর সেটাই জরুরি : কো নো রা জা র প্র তি। আর এইভাবে, অঁরি ক্রিস্তফ, তাঁর মুকুট, তাঁর বংশধর—সকলের সম্বন্ধে যত খিস্তি যত খেউড় সে ভাবতে পারে সব গলগল ক'রে বার ক'রে দিলে নিজের ভেতর থেকে—আর তাইতে ফেরার পথটা তি নোয়েলর কাছে এতই ছোটো লাগলো যে সে যখন হাত-পা ছড়িয়ে গড়িয়ে পড়লো তার তৃণশয্যায়, সে এমনকী নিজেকেই বারে-বারে জিগেশ করলে, সত্যি সে গিয়েছিলো তো এল্ কাবোতে!

৫

প নে রো ই আ গ স্টে র কা ল প ঞ্জি

> ***Quasi palma exaltata sum in Cades, et quasi plantatio rosae in Jericho. Quasi oliva speciosa in Campis, et quasi platanus exaltata sum juxta aqnam in plateis. Sieut cinnamonum et balsemum aromatizans odorem dedi : quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris.***

হুয়ান দে দিওস গন্‌সালেসের উদাত্তস্বরের উত্থান-পতনের অব্যর্থ অভিঘাতে সম্মোহন-জাগানো লাতিনের একফোঁটাও না-বুঝে রানী মারিয়া-লুইসা সেই সকালটিতে অনুভব করেছিলেন এক রহস্যময় একতানের সুর—ধূপের গন্ধ, কাচের উঠোনের নারঙ্গ গাছগুলোর সৌরভ, আর দিনের সেই স্তবগানের কতগুলো কথা যার মধ্যে এইসব সুবাসেরই নাম, সান্ সুসির ওষধিবিক্রেতার দোকানের চিনেমাটির বোয়মগুলোর গায়ে তো লেখা থাকে এ-সবেরই নাম। অঁরি ক্রিস্তফ, পক্ষান্তরে, ঠিকমতো মন দিয়ে উপাসনাকে অনুসরণ করতে পারেননি, তাঁর বুকের মধ্যে এমন-একটা উৎকণ্ঠা চেপে বসেছিলো, তার কোনো কারণই তিনি বুঝতে পারছিলেন না। লিমোনাদ-এর গির্জের সূক্ষ্মশির ধূসর মর্মরশিলা ঠাণ্ডার এমন-এক উপভোগ্য আমেজ তৈরি ক'রে দেয় যে লোকে বোতামআঁটা সোয়ালোপুচ্ছ কোট আর পদকভূষণের ওজনের তলায় কম ঘামে—সেই জন্যেই সকলের পরামর্শের বিরুদ্ধেই ক্রিস্তফ হুকুম করেছিলেন যাতে এই গির্জেতেই মাতা মারিয়ার স্বর্গলাভের ভোজসভার স্তবগান গাওয়া হয়। কিন্তু এখন রাজার মনে হচ্ছিলো তাঁকে যেন প্রতিকূল, বিরূপ আবহাওয়া ঘিরে আছে। তাঁর আবির্ভাবের সময় যে-জনসমাবেশ

তাঁকে সমস্বরে বিপুল স্বাগত জানিয়েছিলো, এখন তারাই রুষ্ট ও অশুভ অভিপ্রায়ে মুখ ভার ক'রে আছে—এই শস্যশ্যামলা উর্বরা দেশে যে কোনো ফসল ফলেনি তার কারণ সব লোককে কাজ করতে হয়েছে নগরদুর্গে, আর এই কথা কেউই ভোলেনি। কোনো দূর বাড়িতে—তাঁর সন্দেহ—হয়তো তাঁর কোনো মূর্তি বানিয়ে অজস্র ছুঁচ দিয়ে বেঁধানো হয়েছে অথবা হৃৎপিণ্ডে ছোরা বসিয়ে তাঁকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে পা-ওপরে মুণ্ডু-তলায়। দূর থেকে সময়-সময় ভেসে আসছে ঢাকের আওয়াজ, নিশ্চয়ই এই ধ্বনি তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করছে না। কিন্তু, এই যে, উৎসর্গের গান শুরু হ'য়ে যাচ্ছে :

Assumpta est Maria in caelum ; gandent Angeli, collaudantes benedicunt Dominum, alleluia !

হঠাৎ হুয়ান দে দিওস গন্‌সালেস রাজআসনগুলোর দিকে কুঁকড়ে পিছোতে লাগলো, আর তিনটে মর্মরসোপানের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কেমন জেবড়াজোবড়া-ভাবে আছাড় খেলে। রানীর জপমালা প'ড়ে গেলো তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে। রাজার হাত পৌঁছে গেলো তাঁর তলোয়ারের বাঁটে। বেদীর সামনে, মুখ ক'রে, উঠে দাঁড়িয়েছেন আরেকজন যাজক--যেন হাওয়া থেকেই ভোজবাজির মতো তাঁর উদয় ঘটেছে, তাঁর কাঁধ আর বাহু এখনও অসম্পূর্ণভাবে গড়া। আর যখন তাঁর মুখ নিচ্ছে পরিণাহ আর অভিব্যক্তি, তাঁর ওষ্ঠাধরবিহীন দন্তহীন মুখ—এমন-কালো যেন কোনো ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো বাজের মতো গমগমে স্বর যেটা গির্জের ভেতরটা ভরিয়ে দিলে কোনো অর্গানের শব্দতরঙ্গকম্পে রাঙানো কাচের জানলাগুলো তাদের শিশের কাঠামোয় কাঁপিয়ে দিয়ে যেন অর্গানটার সব চাবি একসঙ্গে বাজানো হয়েছে :

Absolve Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum···

তাঁকে কেমন বোবা ক'রে দিয়ে, কোর্নেহো ব্রেইয়ের নামটা আর ক্রিস্তকের গলায় আটকে গেলো। কারণ, এ যে সেই কারারুদ্ধ আর্চবিশপই, যাঁর মৃত্যু আর অবক্ষয় সকলেরই সুপরিজ্ঞাত, অথচ যিনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন উঁচু বেদীর সামনে তাঁর আনুষ্ঠানিক পোশাকে, উচ্চারণ করছেন ***Dies irae***। কোনো নাকাড়ার বজ্রধ্বনির মতো যখন ***Coget omnes ante thronus*** কথাগুলো উঠলো, হুয়ান দে দিওস গন্‌সালেস গোঙাতে-গোঙাতে উপুড় হ'য়ে পড়লো রানীর পায়ের কাছে।

অরি ক্রিস্তক—তাঁর চোখ দুটি মাথা থেকে বেরিয়ে এসেছে—সজ্ঞ করলেন *Rey tremende majestatis* অব্দি। সেই মুহূর্তে একটা বাজ—যা শুধু তাঁরই কর্ণকুহর বধির ক'রে দিলে—আঘাত হানলে গির্জের মিনারে, সব ঘণ্টাকে একযোগে কাঁপিয়ে দিয়ে। উপাসকদের প্রধান গায়ক, ধুনুচিবাহক, সমস্বরগায়করা দাঁড়িয়ে উঠলো। খ'শে নেমে এলো প্রচারবেদী। রাজা প'ড়ে রইলেন মেঝেয়, অভিভূত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ছাদের কড়িবরগার দিকে তাঁর বিস্ফারিত চোখ নিবদ্ধ। এবার, এক প্রচণ্ড লাফ দিয়ে, ছায়ামূর্তি গিয়ে বসেছেন ও-রকম একটা কড়ির ওপর, ঠিক অরি ক্রিস্তকের দৃষ্টিরেখায়, ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর দুই পা আর দুই বাহু যেন তিনি ভালো ক'রে দেখাতে চান তাঁর রক্তরাঙা কিংখাব। রাজার কানের মধ্যে ক্রমশ গড়িয়ে আসছে একটা ছন্দ, যা হয়তো তাঁর নিজেরই ধমনীর স্পন্দন, অথবা পাহাড়ের ঐ ঢাকগুলোর গুমগুম। তাঁর অফিসারদের বাহুতে ধরাধরি ক'রে বেরিয়ে গিয়ে রাজা বিড়বিড় ক'রে অভিশাপ দিচ্ছেন, লিমোনাদ-এর সব অধিবাসীকে, শাসাচ্ছেন, ভয় দেখাচ্ছেন, যদি কোথাও মৃত্যুর কোনো মোরগ ডাকে। যখন মারিয়া-লুইসা ও রাজকন্যারা তাঁকে প্রাথমিক শুশ্রূষা করছেন, সমস্ত গ্রামবাসীরা সব মোরগ-মুরগি ঝুড়িতে চাপাতে শুরু ক'রে দিলে আর তারপর তাদের নামিয়ে দিতে লাগলে। গভীর সব কূপের অন্ধকারে, যাতে তাদের সব ক্যাচরম্যাচর বা অবাধ্যতা ভুলে থাকা যায়। দুমদাম লাঠির বাড়ি আঁৎকে-ওঠা গাধার পালকে ছোটালো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। ঘোড়াগুলোকে পরিয়ে দেয়া হ'লো মুখঢাকা, নইলে কেউ যদি ভুল মানে ক'রে বসে তাদের হ্রেষার!

আর সেদিনই অপরাহ্নে, ছটি জোরকদমে ছোটা ঘোড়ায় টানা রাজশকট এসে দাঁড়ালো সান্ সুসির সম্মানে গড়া এসপ্লানাদেয়। জামার বুক খোলা, রাজাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'লো তাঁর শোবার ঘরে। একটা শেকলের বস্তার মতো ধপ ক'রে পড়লেন তিনি বিছানায়। তাঁর চোখ—কনীনিকার চাইতে অচ্ছোদপটলই বেশি—উদ্‌ঘাটিত করে দিলে এমন-এক ক্ষিপ্ত বিক্ষোভ যেটা হাত-পা নাড়তে না-পারায় এলো তাঁর আত্মার গভীরতম দেশ থেকে। তাঁর অসাড় শরীরে ব্র্যাণ্ডি মালিশ করতে লাগলো চিকিৎসকেরা, সঙ্গে বারুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো মলম। রাজপ্রাসাদ জুড়ে ওষুধের গন্ধ, রস আর আরক, নুন, মলম, অফিসার আর সভাসদে ঠাশাঠাশি বসবার ঘরগুলোয় উষ্ণ আবহাওয়ায় ঝিম ধরিয়ে দিলে। রাজকন্যা আতেনা আর আমেতিস্তা তাঁদের উত্তরমার্কিন আয়ার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদছেন। উপকুঠুরিতে, রানী—সহবতের দিকে থোড়াই নজর—কাঠকয়লার

উনুনে একটা পাতিলে কী-একটা শেকড় সেদ্ধ হচ্ছে, তার সামনে উবু হ'য়ে ব'সে আছেন, উনুনের শিখা প্রতিফলিত হচ্ছে পারীতে তৈরি জরির কাজ-করা চাঁদোয়ায়, যাতে দেখা যাচ্ছে ভালকানের নেহাইয়ের পাশে ভীনাস. দেয়ালশোভিত করা চাঁদোয়ার কারুকাজের রঙে তা এক অদ্ভুত বাস্তবতা ছিটিয়ে দিয়েছে। নিচু আঁচের উনুনটার আঁচ চড়াবার জন্যে, রানী একটা পাখা দিতে হাঁকলেন। বড্ড তাড়াতাড়ি ঘিরে ফেলছে ছায়াদের প্রদোষ—কেমন-একটা অলুক্ষুণে ভাব তাতে। পাহাড়ে-পাহাড়ে সত্যি-সত্যি ঢাকের গুমগুম উঠছে কি না জানা অসম্ভব। কিন্তু মাঝে-মাঝে, দূর শিখর থেকে আসে একটা ছন্দের রেশ, সিংহাসনঘরে যে মেয়েগুলো 'আভে মারিয়া' গাইছে তার স্বরের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায় সেটা, আর একাধিক বুকেই জাগিয়ে দিয়ে যায় অস্বীকৃত অনুরণন।

৬

Ultima Ratio Regum

[রাজাদের চূড়ান্ত ভিত্তি]

পরের রোববার সূর্যাস্তের সময় আঁরি ক্রিস্তফের মনে হ'লো যে তাঁর হাঁটু আর হাত—যদিও এখনও অসাড়—হয়তো ইচ্ছাশক্তির কোনো বিপুল তাড়নায় সাড়া দেবে। কেমন বিদঘুটেভাবে বিছানায় পাশ ফিরে, চিৎ হ'য়ে শুয়ে-শুয়েই তিনি তাঁর পা নিয়ে এলেন পাশে, যেন কোমরের ওপর থেকে তাঁর পক্ষাঘাত হয়েছে। তাঁর পরিচারক সলিমান তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলে। রাজা তারপর একটা কলের পুতুলের মতো আস্তে হেঁটে যেতে পারলেন জানলায়। ভৃত্যের কথা শুনে, রানী আর রাজকন্যারা পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকেছিলেন, তাঁরা এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঘরের যেখানটায় মহামান্য রাজার এক ঘোড়ায়-চড়া মূর্তি ছিলো, তার তলায়। তাঁরা জানতেন যে ও-দ-কাতে বড্ড বেশি মদ টানছে লোকে। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে মস্ত সব ডেকচি থেকে বিক্রি হচ্ছে সুরুয়া আর ভাপে-শুকনো শুওরের মাংস, ঘেমে অস্থির বাবুর্চিরা টেবিল চাপড়াচ্ছে চামচেয় আর হাতায়। উৎফুল্ল হৈ-হৈ দর্শকদের সারির মধ্যে নাচের তালে-তালে রুমাল উড়ছে।

অপরাহ্নের বাতাসকে গভীরভাবে বুকে টেনে নিলেন রাজা, আর যে-একটা ভার তাঁর বুকের মধ্যে চেপে বসেছিলো সেটা আস্তে-আস্তে স'রে যেতে শুরু-

করলো। পাহাড়ের ঢালের ওপর গুঁড়ি মেরে নামছে রাত, গাছপালা আর দুর্বোধ্য-জড়াজড়ি-করা বস্তুগুলোর রূপরেখা ঝাপসা হ'য়ে আসছে। তখনি হঠাৎ আঁরি ক্রিস্তফের চোখে পড়লো রাজবাড়ির বাজনদারেরা তাদের বাজনা সঙ্গে নিয়ে প্রবেশচত্বরটা পেরিয়ে যাচ্ছে। সবাই কেমন খুলে দেখাচ্ছে তাদের পেশাদার অঙ্গবিকৃতি। হার্পবাদক ঝুঁকে আছে, যেন তার হার্পের ভারে নুয়ে-পড়া এক কুঁজো; আরেকজন সরলরেখার মতো রোগা, কিন্তু তাকে তার গলা থেকে ঝোলা তম্বুরাটার জন্যে তাকে দেখাচ্ছে গর্ভবতী; আরেকজন আঁকড়ে ধ'রে আছে এক হেলিকন; আর তাদের পেছন-পেছন চলেছে এক বামন, এক বিশাল চৈনিক শিঙার ভারে হারিয়ে-যাওয়া, প্রতি পদক্ষেপে সেটার ছোটো ঘুন্টিগুলো ঝুনঝুন ক'রে বাজছে। তাঁর বাজনদারেরা যে এই সময়ে হঠাৎ বেরিয়ে যাচ্ছে—যেন তারা কোনো-একটা বিশাল নিঃসঙ্গ সাইবা গাছের তলায় বাজনার আসর বসাবে এখন—এটা দেখে রাজার বিস্ময়ে বাধা পড়লো আটটি সামরিক কাড়ার ঝাপটায়। এটা প্রহরীবদলের সময়। মহামান্য রাজা তাঁর পদাতিকদের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলেন: যে-কঠোর শৃঙ্খলায় তিনি তাদের অভ্যস্ত করেছেন, তাঁর এই অসুখের ফাঁকে তাতে কোনো ঢিলে পড়েনি তো! কিন্তু হঠাৎ রাজার হাত একটা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ের ভঙ্গি ক'রে উঠলো। সুরে না-বাঁধা ঢাকগুলো সুনির্দিষ্ট আহ্বানটা বাজাচ্ছে না, বরং চামড়ার ওপর হাত চাপড়ে যাচ্ছে।

'ওরা মান্দুকুমান বাজাচ্ছে,' মেঝেয় তাঁর দ্বিচূড় টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে আঁরি ক্রিস্তফ চেঁচিয়ে উঠলেন।

সেই মুহূর্তে প্রহরীরা সার ভেঙে বেরিয়ে এলো, সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে তারা পেরিয়ে গেলো এসপ্লানাদে। অফিসাররা দৌড়ুচ্ছে খোলা তলোয়ার হাতে। ছাউনির জানলাগুলো থেকে ঝপঝপ ক'রে লাফিয়ে নামছে লোক, দলে-দলে, কুর্তা খোলা, পাঁৎলুনের ডগা জুতোর ওপর গোটানো। আকাশের দিকে ফাঁকা আওয়াজ করা হ'লো। যুবরাজের বাহিনীর ঝাণ্ডার মুকুট আর শিশুমারের ওপর পৎপৎ ক'রে এলোপাথাড়ি উড়লো একটা রঙিন নিশেন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই একদল হালকা অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী জোরকদমে তুলকালাম ছুটে এলো প্রাসাদ থেকে, পেছনে এলো জিন-লাগামে বোঝাই একটি পরিবহণশকটের খচ্চরেরা। হাত দিয়ে চাপড়ে বাজানো সামরিক কাড়ার আওয়াজ ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই পুরো ব্যাপারটা হ'য়ে উঠলো উর্দি ও শৃঙ্খলার একটা সামগ্রিক উচ্ছেদ। ম্যালেরিয়ায় কাতর এক সৈন্য, সেনাবাহিনীর বিক্ষোভে চমকে গিয়ে, তার পালক-গোঁজা টুপির

চিবুকবন্ধ গালে লাগাতে-লাগাতে, একটা চাদরে গা মুড়ে হাসপাতালের রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। অঁরি ক্রিস্তফ যেখানে দাঁড়িয়ে সেই জানলার তলা দিয়ে যেতে-যেতে সে একটা অশ্লীল ভঙ্গি করলে, তারপরেই ছুট লাগালে যত জোরে পারে। তারপরে নেমে এলো সন্ধেবেলার দমকা স্তব্ধতা, কোথায় দূর-এক ময়ূরের কেকাধ্বনিতে সেটা অকস্মাৎ ছিঁড়ে গেলো। রাজা তাঁর মুখ ফেরালেন। ঘরের মধ্যেকার জমাট রাত্রির মধ্যে রানী মারিয়া-লুইসা আর রাজকুমারী আতেনা আর আমেতিস্তা তখন কাঁদতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। এতক্ষণে বোঝা গেলো কেন লোকে সেদিন অমন হল্লা ক'রে ও-প-কা-তে মদ টানছিলো।

রেলিং, পর্দার কোণা, চেয়ারের পিঠ ধ'রে-ধ'রে ভর সামলে, অঁরি ক্রিস্তফ প্রাসাদের মধ্যে এগিয়ে চললেন। সভাসদ ও পারিষদ, অনুচর ও প্রহরীদের অনুপস্থিতি ঘরে-বারান্দায় এক বুকচাপা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। দেয়ালগুলোকে দেখাচ্ছে যেন আরো উঁচু, চৌকো-চৌকো টালিগুলোকে আরো-চওড়া। দর্পন-ভবন শুধু ফিরে দেখালো রাজারই প্রতিবিম্ব, এমনকী দূর-দূর মুকুরের সর্বশেষ কোণাতেও। আর তারপর, ছাতের কড়িকাঠ থেকে এলো ঝিঁঝিপোকার গুঞ্জন, তাদের লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়ে চলা—অথচ আশ্চর্য, আগে কিন্তু কখনো তাদের শোনা যায়নি, আর এখন তারা, তাদের বিরতি ও বিশ্রাম সমেত, স্তব্ধতাকে যেন গভীরতার পঞ্চমে পৌঁছে দিচ্ছে। শামাদানগুলোয় আস্তে গ'লে যাচ্ছে মোমবাতি। একটা পতঙ্গ পরামর্শঘরের মধ্যে অনবরত পাক খেয়ে-খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে। একটা সোনার কাঠামোয় নিজেকে চুঁড়ে ফেলবার পর একটা শ্যামাপোকা থুবড়ে প'ড়ে গেলো মেঝেয়, প্রথমে এখানে, তারপর ওখানে, আর উড়ন্ত একটা আরশোলার সন্দেহাতীত ফরফর উঠলো তারপর। তাঁর চরম নিঃসঙ্গতার বোধটাকে আরো বাড়িয়ে দিলে বিশাল আপ্যায়নভবন, তার দুই-দেয়াল-জোড়া গবাক্ষ, ফিরিয়ে দিলে অঁরি ক্রিস্তফের গোড়ালির প্রতিধ্বনি। ভৃত্যাদের একটি দরজা দিয়ে তিনি নেমে এলেন রান্নাঘরে; না, শিককাবাবের শিকগুলোয় মাংস পরানো নেই, আর শূলগুলোর তলায় আগুন নিভু-নিভু হ'য়ে এসেছে। মাংস-কাটার টেবিলের পাশে মেঝেয় প'ড়ে আছে কতগুলো মদের বোতল। আগে যেখানে ধোঁয়ানলের সরদল থেকে ঝুলতো রশুনের কোয়া, সারি-সারি দিগুন-দিগুন ব্যাঙের ছাতা ঝোলানো সুতো, ভাপে শুকনো শুওরের মাংস—সব নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাসাদ পরিত্যক্ত, চাঁদহারা রাতের কাছে ফেলে-যাওয়া। এ হচ্ছে অবাধ লুঠের সম্পত্তি—যে যা চায়, তা-ই পাবে, কারণ এমনকী শিকারি কুকুরগুলোও আর

নেই। আঁরি ক্রিস্তফ আবার তাঁর নিজের তলায় ফিরে এলেন। শাদা সিঁড়িগুলো কেমন অনুষ্কুণে ও শীতলভাবে উঠে গেছে, শামাদানের মিটমিটে আলোয় কেমন করুণ আর আর্ত দেখাচ্ছে তাদের। গোল ঘরের উঁচু গবাক্ষ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো একটা বাদুড়, কড়িকাঠের ফ্যাকাশে সোনারঙের তলায় কেমন জবড়-জংভাবে ঘুরে-ঘুরে উড়ছে সে। রাজা রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন, খুঁজলেন মর্মরশিলার নিরেট সমর্থন।

নিচে যেখানে তাঁর গৌরবসোপানের শেষ ধাপে ব'সে ছিলো পাঁচটি তরুণ নেগ্রো, তারা তাদের উদ্বিগ্ন কষ্ট-কষ্ট মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালে। সেই মুহূর্তে আঁরি ক্রিস্তফ অনুভব করলেন তাদের জন্য ভালোবাসার উৎসারণে তাঁর বুক ভ'রে যাচ্ছে। এই পাঁচজন রাজার দেহরক্ষী : পরিচালক ডেলিভারেন্স, ভালেন্তিন, লা কুরোন, জন, আর বিয়ঁ-এমে। সবাই এরা আফ্রিকার, এদের মুক্তি দেবার জন্যে রাজা তাদের কিনেছিলেন এক দাসব্যবসায়ীর কাছ থেকে, তারপর তাঁর বালকভৃত্য হিশেবে এদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছেন। হেইতির স্বাধীনতার প্রথম নেতাদের আফ্রিকাঘটিত মরমিয়াবাদ থেকে সবসময়েই নিজেকে উদাসীন সরিয়ে রেখে-ছিলেন আঁরি ক্রিস্তফ, চেষ্টা করেছিলেন তাঁর রাজসভাকে একটা পুরোপুরি ইওরোপীয় চেহারা দিতে। কিন্তু যখন এখন নিজেকে আবিষ্কার করলেন একাকী, সঙ্গহীন, তাঁর ডিউক, ব্যারন, সেনাপতি আর সচিবদের-দ্বারা ফেঁসে-যাওয়া, শুধু যে-ক-জন র'য়ে গেছে এখনও তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত, সে এই পাঁচজন আফ্রিকার ছেলে, পাঁচজন কঙ্গো, ফুলাহ্‌, কিংবা মান্দিঙ্গ কিশোর, অপেক্ষা ক'রে আছে বিশ্বস্ত কুকুরের মতো, তাদের পাছা বসানো সিঁড়ির ধাপের হিম মর্মরশিলায়; তাঁর রাজত্বের চূড়ান্ত যা ভিত্তি তা আর কখনো কামানের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে না। আঁরি ক্রিস্তফ, একটু থেমে, তাদের দিকে তাকালেন, তাদের উদ্দেশ ক'রে স্নেহের একটা ভঙ্গি করলেন, তারা যার উত্তর দিলে করুণভাবে মাথা নুইয়ে, তারপর রাজা চ'লে গেলেন সিংহাসন-কক্ষে।

যে-চাঁদোয়াটায় তাঁর রাজভূষণ আঁকা, তার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মুকুটপরা দুই সিংহ তুলে ধরেছে এক বর্ম, যার গায়ে আঁকা মুকুট-শোভিত এক ফিনিক্স পাখি, আর সেইসঙ্গে অলংকৃত হরফে লেখা : 'আপন ভস্মেরই মাঝে আমার উত্থান'। একটা সংকেত-নিশানের গায়ে লেখা ধ্বজার মূলমন্ত্র : 'ঈশ্বরই আমার ন্যায় ও আমার তরবারি'। মখমলের আঁচলের তলায় লুকিয়ে-রাখা একটা ভারি পেটিকা খুললেন আঁরি ক্রিস্তফ। একমুঠো রৌপ্যমুদ্রা তুলে নিলেন তিনি হাতে,

তাতে তাঁরই নামের মোহর আঁকা। তারপর তিনি ঝনঝন ক'রে মেঝেয় ছুঁড়লেন ভিন্ন-ভিন্ন ওজনের কতগুলো স্বর্ণমুকুট—একটার পর একটা। একটা গড়িয়ে গেলো দরজায়, তারপর ধুমধুম ক'রে গড়িয়ে গেলো সিঁড়ি বেয়ে, সারা প্রাসাদ জুড়ে তার প্রতিধ্বনি উঠলো। রাজা উঠে বসলেন তাঁর সিংহাসনে, তাঁর চোখ প'ড়ে রইলো শামাদানে নিভু-নিভু একটা মোমবাতির ওপর। যান্ত্রিকভাবে তিনি আবৃত্তি ক'রে গেলেন তাঁ'র সরকারের সব ঘোষণার ভণিতাটুকু: 'হেইতির রাজা, তোর্তু আর বোসভে দ্বীপ দুটি ও সমীপবর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তা, অত্যাচারের ধ্বংসকর্তা, হেইতির অধিবাসীদের পুনর্জনক ও পালক, তার নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্রষ্টিকর্তা, নতুন জগতের প্রথম অভিষিক্ত নৃপতি, আস্থা ও বিশ্বাসের রক্ষক, সাঁ আঁরি নামক রাজকীয় ও সামরিক ভূষণের প্রতিষ্ঠাতা, আঁরি ক্রিস্তফ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও রাজ্যের সাংবিধানিক আইন বলে, উপস্থিত ও অনাগত সকলের উদ্দেশে জানায়: স্বাগতম্।'...আর অকস্মাৎ ঠিক তক্ষুনি আঁরি ক্রিস্তফের মনের মধ্যে উপস্থিত হ'লো লা ফেরিয়ে-র নগরদুর্গটির কথা—মেঘেরও ওপরে যে-কেল্লাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই রাত্রি যেন নিবিড় হ'য়ে গেলো ঢাকের গুমগুম শব্দে। একে-অন্যকে ডাক পাঠিয়ে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে সাড়া দিয়ে, উপকূল থেকে ছিটকে উঠে, গুহার মুখ ছুটে বেরিয়ে এসে, গাছের তলা দিয়ে দৌড় দিয়ে, সব বনজঙ্গল আর নদীর খাতে গুমগুম করতে লাগলো ঢাক, রাদা আর কঙ্গো আর বুকমানের ঢাক, মহান সম্মিলনের ঢাক, ভুডুর-সব ঢাক। এক সুবিশাল সর্ববিসারী ঢাকের আওয়াজ এগিয়ে আসছে সান্ সুসির (নির্ভার-এর) দিকে, বৃত্তটাকে ক্রমশ আঁটো ক'রে ছোটো ক'রে। যেন বজ্রের একটা দিগন্ত কাছে এগিয়ে আসছে। এমন-একটা তুফান যার চোখ এখন সিংহাসন—চামরবাহক অথবা নকিববিহীন সিংহাসন। রাজা তাঁর শোবার ঘরে তাঁর জানলায় ফিরে এলেন। আগুন ধরানো হচ্ছে তাঁর শস্যখামারে, দুধের গোশালায়, আখের খেতে। এখন আগুন দৌড়ের বাজিতে হারিয়ে দিয়েছে ঢাককে, লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে আসছে বাড়ি থেকে বাড়িতে, খেত থেকে খেতে। গোলাঘর থেকে ভুউশ ক'রে উঠে এলো লেলিহান এক শিখা, খড়ের গাদায় ছিটিয়ে দিলো লাল-কালো জলন্ত ফুলকি। উত্তুরে হাওয়া তুলে নিয়ে এলো গমের খেতের জ্বলন্ত ছড়াগুলো, তাদের নিয়ে এলো কাছে, আরো কাছে, আগুনজলা ছাই ঝ'রে পড়ছে প্রাসাদের বারান্দা থেকে বারান্দায়।

আঁরি ক্রিস্তফের ভাবনা নগরদুর্গের কাছে ফিরে গেলো। রাজাদের চূড়ান্ত

ভিত্তি। কিন্তু বিশ্বে-অপ্রতিম, অদ্বিতীয়, সেই সুরক্ষিত শক্তির আশ্রয় কোনো একজন লোকের পক্ষে বড্ড বড়ো, বিষম বিশাল, আর রাজা ককখনো ভাবেননি এমন-একটা দিন হয়তো আসবে যেদিন তিনি নিজেকে আবিষ্কার করবেন সম্পূর্ণ একা। ঐ মোটা দেয়ালগুলো যে-ষাঁড়ের রক্ত পান করেছে তা শাদা আদমিদের অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে এক অব্যর্থ, অভ্রান্ত জাদু। কিন্তু এই রক্ত তো কোনোদিনও লেলিয়ে দেয়া হয়নি নেগ্রোদের বিরুদ্ধে যাদের চীৎকার ও হট্টগোল এখন কাছে, আরো-কাছে এসে পড়েছে, মন্ত্র প'ড়ে ডাকছে সেই শক্তিদের যাঁদের কাছে এই রক্ত আহুতি দেয়া হয়েছিলো। অঁরি ক্রিস্তফ, সংস্কারক, চেয়েছিলেন ভুডুকে অস্বীকার করতে, চাবুকের শপাং দিয়ে ছাঁচ গ'ড়ে দিতে চেয়েছিলেন ক্যাথলিক ভদ্রলোকের। এখন তিনি টের পেলেন যে তাঁর আসল দুশমন হ'লো তাঁর সব চাবি সমেত সান্ পেদ্রো, সান্ ফ্রানসিস্কোর কাপুচিন, তাঁর নীল আলখাল্লায় ঢাকা কৃষ্ণামুখশ্রী সম্বল কুমারীমাতা সমেত কালোমুখ সান্ বেনিতো, এবং সেই খ্রিষ্টিয় যাজকেরা যাঁদের তিনি সুসমাচারের পুথি চুম্বন করতে হুকুম করেছিলেন প্রতিবার আনুগত্যের শপথ নেবার সময়। আর, অবশেষে, সেই তাঁরাও তাঁর শত্রু—সেই শহিদেরা, যাঁদের উদ্দেশে তিনি তেরোটি স্বর্ণমুদ্রাভরা মোম জ্বালাতে হুকুম করে-ছিলেন। গির্জের শাদা গম্বুজটাকে এক ক্রুদ্ধ কটাক্ষে বিদ্যুৎঝলশিত ক'রে গির্জে ভ'রে গেলো সেইসব মূর্তিতে যারা এখন যোগ দিয়েছে দুশমনদের সঙ্গে। রাজা হেঁকে বললেন বসন আর সুবাস পালটাতে। রাজকুমারীদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে আদেশ করলেন তিনি, প'রে নিলেন তাঁর সবচেয়ে জমকালো ও দামি পোশাকি বেশ। তিনি পরলেন তাঁর দু-রঙা বিশাল কোমরবন্ধ ; যা ছিলো তাঁর অভিষেকের চিহ্নপ্রতীক, তাকে বাঁধলেন তাঁর তলোয়ারের বাঁটের ওপর। ঢাকের আওয়াজ এখন এতটাই কাছে যে মনে হচ্ছে তারা যেন এখানেই দপদপ করছে, প্রধান ফটকের রেলিঙের আড়ালে, ভিত্তিমর্মরের বিশাল সোপানশ্রেণীর পায়ের কাছে। সেই মুহূর্তে আগুন আলো ক'রে দিলে প্রাসাদের সব আয়না, বেলোয়ারি সব পানপাত্র, বাতির ও গেলাশের স্ফটিক, দেয়াল-থেকে-বেরিয়ে-আসা টেবিলের গায়ের শুক্তির কারুকাজ—শিখারা সবখানে, আর এটা বোঝা অসম্ভব কোন্‌টাই বা শিখা, আর কোন্‌টাই বা তার প্রতিফলন। সান্ সুসির (নির্ভার-এর) সব আয়না একসঙ্গে জ্ব'লে উঠেছে লেলিহান। আস্ত ইমারৎটা এই হিমশীতল আগুনে উধাও হ'য়ে গেলো, যে-আগুন ছড়িয়ে গেলো রাতের মধ্যে, সব ক-টা দেয়ালকে ক'রে তুললো আঁকাবাঁকা বিসর্পিল শিখার তরলিত আধার।

গুলির আওয়াজটা প্রায় শোনাই যায়নি, যেহেতু ঢাকের আওয়াজ ছিলো এত কাছে। তাঁর ক্ষত-করা কপাল ছোঁবে ব'লে, অঁরি ক্রিস্তফের হাত খুলে গেলো, খ'শে পড়লো পিস্তলটা, সব ভূষণ-পদকের মধ্যে মুখ থুবড়ে প'ড়ে যাবার আগটায়, তাঁর শরীর ঋজু দাঁড়িয়ে রইলো একঝলক, সটান, যেন একটা পা ফেলবেন সামনে। বালকভৃত্যেরা এসে দাঁড়ালো ঘরের চৌকাঠে। রাজা মরতে চলেছেন, নিজের রক্তে মাখামাখি।

৭

'দ্বার সংকীর্ণ ও পথ দুর্গম'

পাহাড়ের দিকে মুখ-করা, পেছনের একটা দরজা দিয়ে কাফ্রি বালকভৃত্যেরা বেরিয়ে এলো ; যত জোরে পারে, ছুটছে তারা, কাঁধে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে কাটারি-দিয়ে-ছিমছাম-কাটা ডাল, যা থেকে ঝুলছে দোলখাটিয়া আর জাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রাজার জুতোর নাল। তাদের পেছনে, পেছনের দিকে তাকিয়ে, রাজার পেয়েনসিয়ানা গাছের ডালপালায় শেকড়ে হোঁচট খেতে-খেতে আসছেন রাজকুমারীরা, আতেনা আর আমেতিস্তা, তাঁরা তাঁদের নিজেদের শৌখিন জুতোর বদলে পরেছেন দাসীদের চপ্পল ; আর রানী—তিনি ছুঁড়ে ফেলেছেন তাঁর চপ্পল যখন রাস্তার পাথর হ্যাচকা ছিনিয়ে নিয়ে গেলো একটা গোড়ালির শুখতলি। রাজার সাজভৃত্য সলিমান—এককালে সে ছিলো পাউলিনা বোনাপার্ত-এর অঙ্গসংবাহক—আসছে সকলের পেছনে, কাঁধ থেকে ঝুলছে বন্দুক, আর হাতে মাশেতে, কাটারি। যত তারা পাহাড়ের তরুগুল্মনিবিড় নিশীথিনীর গভীরে ঝাঁপ খেলো, নিচের আগুনকে দেখালো আরো ঘন, প্রকাণ্ড, শিখায়-শিখায় নিরেট জমাট, আঁটবাঁধা যদিও প্রাসাদের এসপ্লানাদেতে পৌঁছুবার আগেই সেটা নিভতে শুরু ক'রে দিয়েছে। মিলো-র দিকে অবশ্য খড়ের গাদায় আগুন ধরেছে। যন্ত্রণায় দুমড়ে-যাওয়া বাচ্চাদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মতো সুদূর হ্রেষাধ্বনি ভেসে আসছে, আগুন-জ্বলা ফিনকি-ছোটা কাঠকুটো ভেঙে যাওয়ার এক বিরাট বিস্ফোরণের মধ্যে পুরো আস্তাবলটাই ভেঙে গিয়েছে আর উগরে দিয়েছে একটা উন্মত্ত ঘোড়াকে, তার বালামচি পোড়া, ল্যাজটা হাড় অব্দি জ্ব'লে-যাওয়া। হঠাৎ প্রাসাদে আলো নড়তে শুরু করলো। মশালের একটা নাচ, ঘুরে-ঘুরে চলেছে রান্নাঘর থেকে চিলেকোঠায়,

খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ছে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে, জলপড়ার নালীর ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, যেন অগুনতি জোনাকি দখল ক'রে নিয়েছে ওপরতলাগুলো। লুঠতরাজ শুরু হ'য়ে গেছে। বালক-ভৃত্যেরা চলার গতি বাড়িয়ে দিলে। জানে যে লুঠপাট এখন বেশ কিছুক্ষণ বিদ্রোহীদের চিত্তবিনোদন করবে। সলিমান তার বন্দুকের ঘোড়ার নিরাপদ ঢাকাটা বসালে, বাঁটটা ঢুকিয়ে দিলে বগলের তলায়।

দিন যখন ফুটলো, তখন পলাতকেরা লা ফেরেইয়ের নগরদুর্গের প্রত্যন্তে এসে পৌঁছেছে। উৎরাইয়ের খাড়াইয়ের জন্যে গতি তাদের মন্থর, তাছাড়া পথে প'ড়ে আছে অগুনতি কামান, সেইসব কামান যারা এখনও ওঠেনি তাদের কাঠের আসনে, আর এখন তারা প'ড়েই থাকবে এইভাবে, যতদিন-না জং ধ'রে যায়। ইল দ্য লা তোর্‌তুর দিকে সমুদ্র আলো হ'য়ে উঠছে, অলুক্ষুণেভাবে আওয়াজ ক'রে পাথরের গায়ে আছাড় খাচ্ছে ঝুলসেতুর শেকল। আস্তে-আস্তে একমাত্র ফটকটার পেরেক-খচিত ভারি পাল্লাটা খুলে গেলো। আর অঁরি ক্রিস্তফের মৃতদেহ ঢুকলো; প্রথমে ঢুকলো নেয়ারের জাল দিয়ে জড়ানো তাঁর বুটজুতো—যে-নেয়ারের খাটটায় ক'রে তাঁকে বয়ে নিয়ে এসেছে নেগ্রো বালকভৃত্যেরা। প্রতি পদক্ষেপে আরো-ভারি হ'য়ে উঠছে শরীর, তিনি উঠতে শুরু করলেন অন্দরমহলের সিঁড়ি, শিশির ভেজা, ওপরের ধনুকাকৃতি খিলান থেকে ঠাণ্ডা ফোঁটা ঝরছে। দুর্গের এককোণা থেকে আরেক কোণায় পরস্পরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্তব্ধতাকে চুরমার ক'রে ফেললো উষা; সমভূমির অগ্নিশিখায় পেট-ফোলা ধুসর মেঘের রাশির মধ্য থেকে, লাল ছত্রাকে আগাগোড়া-মোড়া, এখনও রাত্রি-ঢাকা, নগরদুর্গ বেরিয়ে এলো—ওপরটা রক্তরাঙা, নিচেটায় জং-ধরা লোহার রং।

এখন, এই বিশৃঙ্খল কোলাহলের মধ্যখানে, নগরদুর্গের রাজ্যপালকে পলাতকেরা খুলে বললে শোকান্তিক দুর্ভাগ্যকাহিনী। খবরটা দাউদাউ ক'রে ছড়িয়ে পড়লো গবাক্ষ, সুড়ঙ্গ, ঢাকা-বারান্দা দিয়ে—ঘুমন্ত ঘরে-ঘরে, রান্নাঘরে। কামানের পাশ থেকে, প্রহরীতোরণ থেকে, যে যার পাহারা ছেড়ে সবখান থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো সৈন্যরা, সিঁড়ি দিয়ে নামা একটা নতুন উর্দির পর-পর ঠেলায় বিশৃঙ্খল। প্রধান মিনারের বারান্দায় একটা উল্লাসের রোল উঠলো, কারারক্ষীরা মুক্ত ক'রে দিলে বন্দীদের, আর কয়েদীরা বেরিয়ে এলো তাদের কুঠুরি ছেড়ে, এক তেরিয়া উদ্ধত আনন্দ ছুটে আসছে যেন রাজপরিবারের সদস্যদের দিকে। এই ভিড় এঁটে আসছে চারদিক থেকে, উশকো-খুশকো বালকভৃত্য, খালি-পা রানী মারিয়া-লুইসা, আর রাজকুমারীদের অসহায়ভাবে আগলাবার চেষ্টা করছে সলিমান, তাঁদের বাঁচাতে

চাচ্ছে উদ্ধত সব উদ্যত হাত থেকে, আর দলটা একটু পেছিয়ে গেলো একরাশ নতুন মেশানো চুনসুরকির দিকে, এখনো-অসমাপ্ত কাজটার জন্যে মেশানো চুনসুরকির মশলার একটা প্রকাণ্ড স্তূপ, যার মধ্যে এখনো মিস্ত্রিদের কতগুলো শাবল আর বেলচা প'ড়ে আছে। পরিস্থিতি ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাচ্ছে দেখে রাজ্যপাল হুকুম দিলেন এক্ষুনি চত্বর সাফ ক'রে দিতে। তাঁর হুকুম একটা বিশাল টিটকিরির অট্টরোল তুললো। বন্দীদের একজন—তার গায়ের জামাকাপড় এতই ছেঁড়া যে পাৎলুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো তার পুরুষাঙ্গ—একটা আঙুল বাড়িয়ে দেখালো রানীর গ্রীবা :

'গোরাদের দেশে, যখন কোনো সর্দার মারা যায়, তারা তার বউয়েরও গলা কেটে ফ্যালে।'

রাজ্যপাল যেই বুঝতে পারলেন যে প্রায় তিরিশ বছর আগে ফরাশি বিপ্লবের আদর্শবাদীরা যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো, সেটা এখনও এই লোকটার স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর মনে হ'লো, সব বুঝি গেলো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গুজব ছড়ালো যে একদল প্রহরী শিবির ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, তারা হুড়মুড় ক'রে পাহাড় বেয়ে ছুটে আসছে, অমনি ঘটনার স্রোত একটা নতুন বাঁক নিলে। ছুটতে-ছুটতে, এ ওর গায়ে আছাড় খেতে-খেতে, ভিড় সিঁড়ি বেয়ে, সুড়ঙ্গ দিয়ে, বারান্দা দিয়ে হুড়নুড় ক'রে বিশৃঙ্খলভাবে এগুলো নগরদুর্গের বিশাল ফটকের দিকে। লাফিয়ে, পিছলে প'ড়ে, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে তারা ছুটলো রাস্তার দিকে, খুঁজলো হ্রস্বতম রাস্তা, যা তাদের সান্ সুসি (নির্ভার-এ) নিয়ে যাবে সকলের আগে। অঁরি ক্রিস্তফের সেনাবাহিনী প্রায় পাহাড়ের ধস নামার মতো ভেঙে পড়ছে। এই প্রথমবার এই বিশাল ইমারৎ দাঁড়িয়ে রইলো ফাঁকা, জনশূন্য, আর তার ঘরগুলোর বিপুল স্তব্ধতার মধ্যে নিয়ে এলো এক রাজসমাধির অন্ত্যেষ্টির গাম্ভীর্য।

মহামান্য রাজাকে শেষবারের মতো দেখবেন ব'লে রাজ্যপাল দোলখাটিয়ার ঢাকা খুললেন। ছুরি দিয়ে তিনি কেটে নিলেন একটি ক'ড়ে আঙুল, রানীর হাতে সেটা তুলে দিলেন, তিনি সেটা অমনি গুঁজে দিলেন বুকের জামার মধ্যে, অনুভব করলেন যে একটা কিলবিলে পোকার মতো সেটা পিছলে নেমে যাচ্ছে উদরের দিকে। তারপর রাজ্যপাল আদেশ দিলেন আর বালকভৃত্যেরা মৃতদেহটা শুইয়ে রাখলো চুনসুরকির মশলার স্তূপে, আর মৃতদেহটা তার মধ্যে ডুবে যেতে লাগলো, যেন চটচটে আঠালো কতগুলো হাত মৃতদেহটাকে টেনে নামাচ্ছে নিচে। পাহাড়ের গা বেয়ে ব'য়ে আনতে-আনতে মৃতদেহটা একটু আড় ধ'রে বেঁকে গিয়েছিলো,

তবে এখনো উষ্ণ আছে। সেই জন্যেই তলপেট আর উরুদুটি অদৃশ্য হ'য়ে গেলো প্রথমে, বাহুদুটি আর বুটজুতোজোড়া একটু ভেসে রইলো ওপরে, ঐ ফুলে-ওঠা ধূসর মিশ্রণের ওপরে, যেন মনস্থির করতে পারেনি কী করা উচিত। তারপর যা বাকি রইলো, সেটা মুখটাই, দ্বিচূড় টুপির চিবুকবন্ধের কাঠামোয় তুলে-ধরা। মাথাটা পুরোপুরি ডুবে যাবার আগেই যদি চুনসুরকি শুকিয়ে যায়, রাজ্যপাল তাই তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজার কপালে, তাঁকে দ্রুত ঠেলে ঢোকাবেন ব'লে; এমন-একটা ভঙ্গি তাঁর, যেন কোনো রোগীর কপালে হাত দিয়ে কেউ বোঝবার চেষ্টা করছে জ্বর কত। চুনসুরকি অবশেষে আবার ঘনিয়ে এসে ঢেকে দিলে অঁরি ক্রিস্তফের চোখ দুটি—ভেজা পলেস্তারার নাড়িভুঁড়ির মধ্যে তাঁর মন্থর অবতরণ শুরু হ'য়ে গেছে। তারপর মৃতদেহ থেমে গেলো একসময়, যে-পাথর তাঁকে বন্দী ক'রে রেখেছে তার সঙ্গে মিলে এক হ'য়ে গেলো।

নিজের মৃত্যু নিজেই বেছে নিয়ে, অঁরি ক্রিস্তফ কোনোদিনই জানতে পাবেন না যে তাঁর শরীরের ক্ষয়, তাঁর মাংস আর মজ্জা সব মিলে গেলো দুর্গেরই উপকরণের সঙ্গে, নিজের স্থাপত্যের মধ্যেই প্রস্তরিত হ'য়ে গেলো, উড়াল-দেয়া ছাঁইচের সঙ্গে মিলে গেলো। ল্য বন লেভেক—পুরো পাহাড়টাই হ'য়ে উঠেছে হেইতির প্রথম রাজার সমাধিসৌধ।

চতুর্থ

আমার আতঙ্ক ছিলো এইসব ভবিষ্যদর্শনে।
অথচ যেহেতু এই অন্তসব পর-পর দেখেছি
আমার আতঙ্ক আরো, সঙ্খ্যাতীত, প্রচণ্ড বেড়েছে।

—কাল্‌দেরোন

১

পাষাণমূর্তির নিশা

চুড়িবালা তাগাতাবিজের ঠুনঠুন বাজিয়ে মাদ্‌মোয়াজেল আতেনা তাঁর বোন আমেতিস্তার নতুন-কেনা পিয়ানোটায় সুর বাজাচ্ছিলেন, আর আমেতিস্তা নিজে ঈষৎ ঝাঁজালো স্বরে অলস বিলম্বিত মূর্ছনা তুলছিলেন রস্‌সিনির 'তানক্রেদি'র একটা আরিয়ায়। গায়ে একটা প্রাতঃকালীন শাদা ঢোলা জামা, হেইতির কেতায় মাথায় একটা রুমাল-বাঁধা, রানী মারিয়া-লুইসা ব'সে-ব'সে পিসার কাপুচিনদের জন্যে একটা বেদিঢাকায় স্থঁচ-স্থতো দিয়ে ফুল তুলছিলেন আর একটা বেড়ালকে বকছিলেন—তাঁর স্থতোর গোলা নিয়ে বেড়ালটা খেলা করছিলো। যুবরাজ ভিক্তরের প্রাণদণ্ডের শোকাতুর দিনগুলোর পর, যে-ইংরেজ বানিয়ারা তাঁদের রশদ জোগাতো, তাদেরই সাহায্যে পোর্‌-ও-ফ্রঁাস থেকে বিদায় নিয়ে, এই প্রথম-বার ইওরোপে এসে রাজকুমারীরা এমন-এক বসন্তকে উপভোগ করছিলো যাকে সত্যি-সত্যিই বসন্ত ব'লেই মনে হয়। এমন-এক স্থর্যের তলায় দরজা-জানলা খোলা রেখে রোম আছে, সব মর্মরশিলা যা ঝলশে তুলেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে সাধুসন্তদের আলখাল্লার বিকট বদ গন্ধ, আর মনে করিয়ে দিচ্ছে পেস্তার বরফিওলাদের ডাক। এমন-এক নির্মেঘ আকাশের তলায় নগরীর হাজারটা ঘণ্টা অনভ্যস্ত আলস্যে বেজে ওঠে, যেটা মনে করিয়ে দেয় সমভূমির জানুয়ারি মাসের আকাশ। অবশেষে, ঘেমে-নেয়ে, হাসিখুশি আর উষ্ণ, আতেনা আর আমেতিস্তা তাঁদের দিন কাটান, পাথরের মেঝেয়, খালি পায়ে, ঘাঘরাগুলোয় ফাঁস না-লাগানোই থাকে, আর খেলার ছকের মধ্যে ফ্যালেন পাশার দান, তাক থেকে পেড়ে নেন সর্বশেষ উপন্যাসগুলো, হালফ্যাশান অনুযায়ী, যাদের মলাটগুলো হয় গভীর রাতের গোরস্থান, স্কটল্যাণ্ডের হ্রদ আর ঝিল, তরুণ শিকারিকে ঘিরে কৃশাঙ্গী স্থন্দরী, অথবা বুড়ো ওকগাছের কোটরে প্রেমপত্র-লুকিয়ে-রাখা কুমারীদের কাঠখোদাইতে স্থশোভিত।

রোমের এই বসন্ত সলিমানেরও বেশ মনোমতো হয়েছে। বাঁধাকপির পাতা, কফির গুঁড়ো, উচ্ছিষ্ট আর জঞ্জালে নোংরা ভেজা কাপড় থেকে টপটপ ক'রে জল ঝ'রে স্যাৎসেঁতে হ'য়ে-থাকা গরিব পাড়াগুলোয় তার আবির্ভাব দারুণ একটা আলোড়নই তুলেছিলো। নাপোলির অন্যতম ভিখিরিরও চোখ দুটি খুলে

দিয়েছিলো এই প্রচণ্ড বিস্ময় আর তার ম্যাণ্ডোলিন ও হার্মনিকাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলো—এই নেগ্রোটিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখবার জন্যে। কিছু-কিছু ভিখিরি সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিলো ঠুঁটো হাত, তাদের ক্ষত আর অঙ্গবিকৃতির যাবতীয় ছলকৌশল—কে জানে, দৈবদয়ায় এ যদি হ'য়ে থাকে সমুদ্রপারের কোনো রাজদূত। সে যেখানেই যায়, বাচ্চারা তার পেছন নেয়, রীতিমতো শুরু ক'রে দেয় হার্মনিকা আর য়িহুদিদের বীণার সেরেনাদ। শুঁড়িখানায় তাকে আপ্যায়িত করা হয় মদ-ভর্তি গেলাশে। সে পাশ দিয়ে চ'লে যাবার সময় দোকানিরা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে কখনো তাকে উপহার দেয় টোম্যাটো বা একমুঠো আখরোট। অনেক দিন ধ'রেই কোনো সত্যিকার নেগ্রোর ছায়া পড়লো ফ্লামিনিও পনৎসিওর বাড়ির দেয়ালে অথবা আন্তোনিও লা বাক্কোর দুয়ারে। তাকে যখন কেউ জীবনকাহিনী শোনাতে বলে, সে সোৎসাহে শুরু ক'রে দেয় এক রূপকথা, তাকে অলংকৃত ক'রে তোলে প্রচণ্ডতম অলীক তথ্যে ও অনৃতভাষণে, নিজেকে সে চালিয়ে দেয় অঁরি ক্রিস্তফের ভাগ্নে ব'লে, যে প্রায় অলৌকিকভাবেই হাত এড়িয়েছে এল্ কাবো-র সেই নৃশংস হত্যারজনীর মরণদূতদের, যারা বেরিয়েছিলো রাজার বেজন্মা সব ছেলেদের খতম ক'রে দিতে, সঙিনের খোঁচায়, কারণ বন্দুকের অজস্র গুলিও কিছুতেই তাকে পেড়ে ফেলতে পারেনি। তার বিস্ময়ে-হা-করা শ্রোতাদের কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিলো না কোথায় কোন্ দেশে ঘটেছে এইসব ঘটনা। কেউ-কেউ ভাবলে ঘটেছে নিশ্চয়ই মাদাগাস্কারে, অন্যদের ধারণা নিশ্চয়ই পারস্যে, অথবা বর্বরদের মুলুকে। সবসময়েই উৎসুক হ'য়ে থাকতো কেউ-না-কেউ, সে ঘামতে শুরু করলেই রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দেবার জন্যে—এটাই দেখতে যে রংটা উঠে আসে কি না। একদিন বিকেলে, ঠাট্টা হিশেবেই, তারা তাকে নিয়ে গেলো এক সরু, ঘিঞ্জি, দুর্গন্ধেভরা নাট্যশালায় যেখানে এক উদ্ভট হৈ-হৈ রৈ-রৈ পালাগান হচ্ছিলো। একটা জটিল কাহিনীর উপসংহারের পর—কাহিনীটা ছিলো আলজেরিয়ার ইতালীয়দের সম্বন্ধে—তাকে ঠেলাঠেলি ক'রে উঠিয়ে দেয়া হ'লো মঞ্চে। তার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব দর্শকদের মধ্যে এমনই তুলকালাম হুল্লোড় তুললো যে দলের অধ্যক্ষ এসে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললে যে যখন খুশি এসে সে যেন আবার এমনতর অভিনয় ক'রে যায়। এখন, সবকিছু আরো-জমিয়ে-তোলবার-জন্যে, সে আবার বোর্ঘেস প্রাসাদের এক দাসীর সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছিলো, পিয়েমঁর এক দশাসই তরুণী, যার ঐসব পুতু-পুতু মধুর মধুর প্রেমিকে মন উঠতো না। সত্যিকার গরম দিনগুলোয় সলিমানের অভ্যাস

ছিলো ফোরামের ঘাসের ওপর লম্বা একটা সিয়েস্তা লাগানো, যেখানে সবসময়েই ঘাস খেয়ে বেড়াতো পালে-পালে ভেড়ারা। ধ্বংসস্তূপ বেশ মধুর ছায়া ফেলতো সুপ্রতুল ঘাসের ওপর, আর কেউ যদি নোংরা-টোংরা একটু খুঁড়ে দেখতো, তো, তার পক্ষে মর্মরশিলায় তৈরি কোনো কর্ণকুহর, পাথরের তৈরি কোনো অলংকার অথবা কোনো জং-ধরা ধাতুমুদ্রা পেয়ে যাওয়া বিচিত্র ছিলো না। জায়গাটা আবার মাঝে-মাঝে বেছে নিতো রাস্তার বেশ্যা—সেমিনারির এক ছাত্রের সঙ্গে তার জম্পেশ ব্যাবসা চালাবার জন্যে। কিন্তু তার সবচেয়ে অধ্যবসায়ী অতিথিরা ছিলো চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, অথবা সবুজ ছাতা হাতে যাজকেরা, অথবা কোমল হাতের ইংরেজরা—একটা ভাঙা থাম দেখেই যারা ভাবাবেশে প্রায় মূর্ছা যেতো, আদ্ধেক-ক্ষ'য়ে-যাওয়া কোনো শিলালিপি তারা নকল ক'রে নিতো কাগজে। সন্ধের দিকে নেগ্রোটি দাসদাসীদের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তো বোর্যেস প্রাসাদে, আর পিয়েমঁর তরুণীর সঙ্গে লাল মদের বোতলের ছিপি খোলার কাজে নিজেকে সঁপে দিতো। প্রাসাদের মধ্যে রাজত্ব করতো চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, কারণ মালিকরা কেউই বাড়ি ছিলো না। দরজার বাতিগুলো কালো হয়েছে মরা শ্যামাপোকার স্তূপে, দাস-দাসীদের উর্দিগুলো সব নোংরা, কোচোয়ানেরা সবসময়েই নেশায় বুঁদ, ঘোড়ার গাড়ি ঘষামাজা হয় না, আর গ্রন্থাগারের মাকড়শার জালগুলো এমনই নিবিড়ঘন যে ভয়ে কত বছর হ'লো এ-ঘরে কেউ ঢুকতে যায়নি—যদি এই বীভৎস মাকড়গুলো ঘাড় বেয়ে হাঁটে অথবা বুকের জামার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এক ছোকরা মোহান্ত যদি না-থাকতো—সে আসলে যুবরাজেরই এক ভাগ্নে—দাসদাসীরা তবে কবেই ওপরতলায় গিয়ে সেইসব বিছানায় শুতো এককালে যেখানে ঘুমোতেন কার্দিনালরা।

একদিন গভীর রাতে, যখন সলিমান আর তার হৃদয়রানী রান্নাঘরে একা আছে, নেগ্রো—সে নেশায় টং—ঠিক করলে যে সে দাসদাসীদের এলাকা ছেড়ে সব ঘুরে-ঘুরে টহল দিয়ে দেখবে। একটা লম্বা ঢাকা বারান্দা দিয়ে দুজনে এসে পড়লো এক প্রকাণ্ড ভেতর-উঠোনে, মর্মরশিলায় ভর্তি, জ্যোৎস্নায় কেমন যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে। দু-সার স্তম্ভ, একটার গায়ে যেন আরেকটা চাপানো, ভেতর উঠোনটাকে কাঠামোর মতো ধ'রে আছে, স্তম্ভশীর্ষের ছায়া দেয়ালের অর্ধেক ওপরে কেমন সব রেখা ফেলেছে। যে-হাতলণ্ঠনটা হাতে ক'রে যাচ্ছিলো, সেটা উঠিয়ে-নামিয়ে পিয়েমঁর তরুণীটি সলিমানের চোখে উন্মোচিত ক'রে দিলে পাশের দরদালানটায় সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো রাশি-রাশি পাষাণমূর্তি। সব নগ্ন স্ত্রীলোকের

মূর্তি—যদিও সবাই প'রে ছিলো ওড়না, তবু কোনো কাল্পনিক হাওয়ার ঝাপটা আঁচলটাকে এমন-সব জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছে, শোভনতা যতটুকু অনুমোদন করে। অনেক জীবজন্তুও ছিলো সেখানে, কারণ এক মহিলা তাঁর কোলে ক'রেছিলেন এক রাজহাঁস, আরেকজন জড়িয়ে ধরেছিলেন এক ষাঁড়ের গলা, অন্তরা ডালকুত্তোর সঙ্গে ছুটেছে অথবা ছাগলের পাওলা শিংওলা মানুষদের কাছ থেকে পালাচ্ছে—তারা সম্ভবত শয়তানেরই আত্মীয়। একটা শাদা, হিমজমাট, অচঞ্চল জগৎ কিন্তু তাদের ছায়ারা যেন প্রাণ পেয়ে গিয়েছে আর ক্রমশ বড়ো হচ্ছে লণ্ঠনের আলোয়, যেন দৃষ্টিহীন চোখের এই জীবেরা, যারা কিছু না-দেখেই তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ, তাদের গভীর রাতের আগন্তুকদের মধ্যে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাতালের যেটা দুর্লভ ক্ষমতা, আড়চোখেই ভয়ংকর-সবকিছু-দেখে-ফেলা, তার দরুনই সলিমানের মনে হ'লো একটা মূর্তি যেন তার হাতটা একটু নামালে। অস্বস্তিভরে সে পিয়েমঁর যুবতীটিকে টেনে নিয়ে গেলো ওপরতলায় যাবার একটা সিঁড়ির দিকে। এবার মনে হ'লো দেয়াল থেকে নেমে আসছে ছবিরা: এক সহাস্য তরুণ তুলে ধরলে পর্দার কোণা, আঙুরপাতার মুকুটপরা এক নগ্ন কিশোর তার ঠোঁটে তুলে ধরলে বোবা একটা নলখাগড়ার বাঁশি অথবা চুপ করতে ব'লে ঠোঁটের ওপর তুলে ধরলে তর্জনী। ফুলপাতায় অলংকৃত মুকুরশোভিত একটা দরদালান পেরিয়ে গিয়ে, দাসী, একটু চেতিয়ে-তোলা কামনার ভঙ্গিতে, ছোট্ট একটা আখরোট কাঠের দরজা খুলে লণ্ঠনটা নামিয়ে নিলে।

সেই ছোট্ট কুঠুরিটায় দূর দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটিই মূর্তি। এক নগ্ন স্ত্রীমূর্তি, শুয়ে আছে বিছানায়, তুলে ধ'রে আছে একটা আপেল। তার বিশৃঙ্খল তালগোলপাকানো ভাবনাগুলোকে ঠিকভাবে সাজাবার চেষ্টা ক'রে সলিমান টলোমলো পায়ে চ'লে গেলো মূর্তিটার কাছে। বিস্ময় তার নেশা বেশ-খানিকটা ছুটিয়ে দিয়েছে। এই মুখটাকে সে চেনে, এই শরীরটাকেও সে জানে; আস্ত শরীরটা জাগিয়ে তুলছে একটা স্মৃতি। উৎসুক হাতে সে ছুঁয়ে দেখলো মর্মর-শিলা, তার আঙুলের ডগাতেই মেশানো আছে দৃষ্টি আর ঘ্রাণের শক্তি। সে হাত বুলিয়ে দেখলো স্তনে। উদরের ওপর ঝোলানো অবতল তালু নাভির তলায় নেমে গেলো তার ক'ড়ে আঙুল। সে আদর ক'রে হাত বোলালো পিঠের বঙ্কিমায়, যেন শরীরটাকে উলটে দেবে। তার আঙুল খুঁজে বেড়ালো সুগোল নিতম্ব, সুকোমল উরুদেশ, স্তনের আঁটো সুষমা। তার আঙুলের এই অভিযান সজীব ক'রে তুললো তার স্মৃতি, ফিরিয়ে আনলে সুদূর সব ছবি। এই স্পর্শ—তাকে

সে তো জেনেছিলো আগে। এই একই বৃত্তাকারে হাত বুলিয়ে একদিন সে ব্যথা কমিয়েছিলো তার মচকানো গোড়ালির। বস্তুটা ভিন্ন, কিন্তু রূপ, অবয়ব—সে তো হুবহু এক। এবার ইল্ দ্য লা তোর্‌তুর সেই ভয়ের রাতগুলো ফিরে এলো তার কাছে, যখন এক ফরাশি সেনাপতি মুমূর্ষু শুয়েছিলো এক বন্ধ দুয়ারের ওপাশে। তার মনে প'ড়ে গেলো সেই-তাকে, যার মাথা সে টিপে দিয়েছিলো ঘুম পাড়াবে ব'লে। আর, আচমকা, অস্বীকার-করার-জো-নেই এমন-এক স্মৃতির তাড়ায়, সলিমান শুরু করলে অঙ্গসংবাহনের প্রক্রিয়া, অনুসরণ ক'রে গেলো পেশীর কাঠামো কণ্ডরার পরিণাহ, পিঠের মাঝখান থেকে দু-পাশে ডলতে-ডলতে নিয়ে এলো হাত আঙুল দিয়ে ডললো স্তনের পেশী, তর্জনীটা বোলালো এখানে-সেখানে। কিন্তু হঠাৎ তার কব্জিতে উঠে এলো মর্মরের হিম, যেন মৃত্যুর এক কঠোর সাঁড়াশি তাকে চিপটে ধ'রে তার ভেতর থেকে নিংড়ে নিয়ে এলো আর্তনাদ। তার মাথার মধ্যেকার মদিরা বনবন ক'রে ঘুরতে শুরু করেছে। এই মূর্তি, লণ্ঠনের আলোয় পীতাভ, পাউলিনা বোনাপার্ৎ-এর মৃতদেহ, এমন-এক মৃতদেহ যেটায় সদ্য আড় ধ'রে গেছে, অতি সম্প্রতি বেরিয়ে গেছে যার প্রাণবায়ু ও সজীব দৃষ্টি, হয়তো সংবাহন এখনও তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে জীবনে। এক ভীষণ আর্তনাদ ক'রে—যেন তার বুকটা ছিঁড়ে গেছে—নেগ্রোটি বোর্ঘেস প্রাসাদের সেই স্তব্ধতায় চীৎকার করতে শুরু ক'রে দিলে, গলা-ফাটানো চীৎকার, যত জোরে পারে তত জোরে। আর তার চেহারা এমনই আদিম হ'য়ে গেলো—সে তার গোড়ালি ঠুকছে মেঝেয় জোরে-জোরে, নিচের গির্জেটাকেই যেন বদ্‌লে দিয়েছে ঢাকের চামড়ায়—যে আতঙ্কিতা পিয়েমঁ যুবতীটি ছিটকে পালিয়ে এলো সিঁড়ি বেয়ে, সলিমানকে কানোভার ভীনাসের কাছে একা রেখেই।·

উঠোন আলোয় আলোময় হ'য়ে গেলো মোমবাতিতে আর লণ্ঠনে। তেতলা থেকে এমন জোরালোভাবে প্রতিধ্বনিত-হওয়া চীৎকারে জেগে উঠে, দারোয়ান আর কোচোয়ানেরা তাদের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো রাতকাপড়েই, পাৎলুন আঁটতে-আঁটতে। পাশের দরজায় কড়া নাড়ার জোরালো আওয়াজ, রাত-পাহারার শান্ত্রীদের ভেতরে আসবার জন্যে সেটা খুলে দেয়া হ'লো, অনেক ভীত সন্ত্রস্ত পড়শিকে পেছনে নিয়ে সার বেঁধে ঢুকে পড়লো শান্ত্রীরা। আয়নাগুলো যখন আলো হয়ে উঠলো, নেগ্রোটি চট ক'রে ঘুরে দাঁড়ালো। এইসব আলো, শাদা মর্মরমূর্তির মধ্যে লোকের ক্রমবর্ধমান ভিড়, তাদের হালকা বাঁশি সমেত উর্দি, সন্দেহাহীত সব দ্বিচূড় টুপি, কোষখোলা এক তরবারির হিম বক্রতা—তাকে

পলকে হিঁচড়ে নিয়ে এলো ঐরি ক্রিস্তফের মৃত্যুর রাত্রির শিহরনে। জানলায় একটা চেয়ার তুলে ছুঁড়ে ফেলে, সলিমান লাফিয়ে পড়লো রাস্তায়। আর প্রথম প্রভাতী উপাসনার গান তাকে আবিষ্কার করলে জ্বরাতুর, কম্পমান, কারণ সে ছিলো মস্তিষ্কের ম্যালেরিয়ার বলি—আর পাপা লেগবাকে সে অনুনয় ক'রে বলছিলো তাকে এক্ষুনি সান্তো দোমিঙ্গোতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। তার হাতে তখনো লেগে আছে দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণাময় স্পর্শ। তার মনে হ'লো সে যেন বিকারের ঘোরে এসে পড়েছে কবরের পাথরের ওপর, ঠিক যেমন হ'তো ঐ ওখানে, ভূতে ধরতো যাদের, চাষীরা যাদের ভয়ও করতো আবার ভক্তিও করতো, কারণ তারা তো সবার চাইতে বেশি ভাব ক'রে ফেলেছে কবরের সব প্রভুদের সঙ্গে।

তেতো শেকড়বাকড়ের রস খাইয়ে রানী মারিয়া-লুইসা তাকে মিথ্যেই শান্ত করার চেষ্টা করলেন—শেকড়বাকড়গুলো তিনি পেয়েছিলেন এল্ কাবো থেকে, লণ্ডন মারফৎ, রাষ্ট্রপতি বোয়ারের বিশেষ অনুগ্রহ হিশেবে। সলিমানের দেহ হিম ঠাণ্ডা। এক বেমরশুমি শীত ঠাণ্ডা ক'রে যাচ্ছে রোমের মর্মরশিলা। বসন্তকে ঢেকে ফেলছে এমন-এক কুয়াশা যেটা ঘণ্টায়-ঘণ্টায় গাঢ় হচ্ছে। রাজকুমারীরা ডেকে পাঠালেন ডাক্তার আন্তোমার্চিকে—সান্তা এলেনায় তিনিই ছিলেন নাপোলিয়ঁর চিকিৎসক, অনেকে বলতো তাঁর নাকি অসাধারণ পেশাদারি নৈপুণ্য আছে, বিশেষ ক'রে হোমিওপ্যাথ হিশেবে। কিন্তু যে-বড়িগুলোর তিনি ব্যবস্থা করলেন সেগুলো কখনো কৌটো থেকে বেরুলো না। সকলের দিকে পেছন ফিরে, সবুজ জমির ওপর হলদে ফুল-ফুল ছবি আঁকা কাগজসাঁটা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, সলিমান খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন-এক দেবতাকে, যাঁর আবাস কোনো দূর-সুদূর দাহোমে, কোনো আঁধার চৌরাস্তায়, তাঁর লাল পুরুষাঙ্গ তিনি ব'য়ে চলেন একটা যষ্টির ওপর, সেই উদ্দেশ্যেই।

Papa Legba, l'ouvri barrié-a pou moin, agó yé,
Papa Legba, ouvri barrié-a pou moin, pou moin pussé.

২

রাজপ্রাসাদ

নির্ভার অর্থাৎ সান সুসির রাজপ্রাসাদের লুঠতরাজের চক্রিদলের একজন সর্দার ছিলো তি নোয়েল। তার ফলেই. লেনরমঁ দ্য মেজির গোলাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ এখন উদ্ভটভাবে আশবাবপত্রে সাজানো। কোনো কড়িবরগা. অথবা ছাত বসাবার জন্তে দুই কোণে দুই থামের অভাবে ইমারৎটায় এখন কোনো ছাত নেই। কিন্তু তার কাটারি দিয়ে ঘা মেরে-মেরে বুড়ো খুলে-খুলে সরিয়েছে ভাঙাচোরা সব পাথর, বুনিয়াদটার কোনো-কোনো অংশ বার ক'রে এনেছে আলোয়—জানলার গোবরাট, তিনধাপ সিঁড়ি, এখনো-চোখে-পড়ে এমনি-একটা দেয়ালের টুকরো ইটের গায়ে আঁকড়ে আছে, পুরোনো নর্ম্যান খাবারঘরের কাঠামোর ছাঁচ। যে-রাতে সমভূমি পুরুষ স্ত্রীলোক শিশুদের ভিড়ে গিশগিশ ক'রে উঠেছিলো. যারা মাথায় ক'রে নিয়ে এসেছিলো দোলক-লাগানো ঘড়ি. চেয়ার. ঝালর. সন্তদের চাঁদোয়া, দুই ডাল শামাদান. উপাসনাচৌকি. বাতি. কাপড় কাচার গামলা। তি নোয়েলও কয়েকবার গিয়েছিলো সান সুসিতে। এইভাবে সে মালিক হ'য়ে বসেছে মস্ত একটা টেবিলের, যেটাকে দাঁড় করানো হয়েছে খড়-বেছানো চুল্লির সামনে. যার ওপর সে এখন ঘুমোয়, টেবিলটা সে চোখের আড়ালে লুকিয়েছে করমণ্ডল পর্দা টাঙিয়ে যার গায়ে আঁকা ছিলো বিবর্ণ সোনালি পটে ছায়ার মতো কতগুলো মূর্তি। আর ঐ শেকড় গজানো মেঝের টালির ওপর প'ড়ে আছে মলম মাখানো একটা চাঁদমাছ—যুবরাজ ভিক্তরের প্রতি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির উপহার, তার পাশেই প'ড়ে আছে একটা ছোট্ট বাক্স—যার ডালা তুললেই সুর বেজে ওঠে, আর প'ড়ে আছে এক পানপাত্র. যার পুরু সবুজ কাচের মধ্যে রামধনু-রঙা বুদ্বুদ দেখা যায়। রাখাল মেয়ের সাজ পরানো একটা পুতুলও সে নিয়ে এসেছে, নিয়ে এসেছে এক আরাম-কেদারা. সেটা আবার কারুকাজ-করা কাপড় ঢাকা. আর তিন খণ্ড, 'গ্রাঁ এন্‌সিক্লো-পেদি', যার ওপর ব'সে আখ চেবানো তার অভ্যাস।

কিন্তু বুড়োর সব অহংকার অঁরি ক্রিস্তফের একটা পোশাকি ঝুলকুর্তা নিয়ে—সবুজ রেশমে তৈরি, হাতার কাছটায় স্যালমন-রঙা লেসের কাজ—সেটা সে সব-সময় প'রে থাকে ; তার রাজোচিত ভঙ্গিমাটা আরো-উগ্র হ'য়ে ওঠে একটা ফিতে লাগানো খড়ের টুপি প'রে, সেটাকে সে ভাঁজ ক'রে নিয়েছে দ্বিচূড় টুপির মতো,

মোরগঝুঁটির বদলে তাতে লাগিয়েছে লাল ফুল। কোনো অপরাহ্নে তাকে দেখা যায় রোদ-জলে প'ড়ে-থাকা ঐ আশবাবগুলোর মধ্যে ব'সে পুতুলটাকে নিয়ে খেলতে—পুতুলটা আবার তার চোখ খুলতে বা মুদতে পারে—অথবা দেখা যায় মিউজিক বাক্সটায় দম দিতে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সবসময়েই যেটা শোনায় একই আলেমান ল্যাণ্ডলার নাচের সুর। তি নোয়েল এখন অবিশ্রাম কথা বলে। সে কথা বলে, দুই হাত ছড়িয়ে, রাস্তার মাঝখানে; সে কথা বলে ঘোলাটে ঝরনার জলে হাঁটুগেড়ে-বসা খোলা-মাই ধোবানিদের সঙ্গে; সে কথা বলে গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে নাচতে-থাকা বাচ্চাদের সঙ্গে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সে কথা বলে যখন সে বসে তার টেবিলে, রাজদণ্ডের মতো ক'রে একটা পেয়ারার ডাল হাতে ধ'রে। তার মনে ঝাপশা-ঝাপশা উঁকি দেয় সেই একহাতওলা মাকান্দালের সব কথাবার্তা —এত বছর আগেকার কথা যে তার মনেও পড়ে না কখন সে শুনেছিলো সেইসব। যেদিন এ-সব তার মনে পড়ে, সেদিন তার মধ্যে কেমন-একটা বিশ্বাস, একটা আস্থা জাগতে শুরু ক'রে দেয়—এই মর্তধামে আসার একটা পবিত্র উদ্দেশ্য আছে তার, আর সেই কর্তব্য তাকে সম্পাদন করতেই হবে, যদিও কোনো ইঙ্গিত, কোনো চিহ্নই ঠিক বুঝিয়ে দেয়নি সেই কর্তব্যের প্রকৃতি কী। তবে নিশ্চয়ই মহান-কিছু, গরীয়ান-কিছু, এমন-কিছু যেটা এত দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকার ফলেই কারু স্বমানান অধিকারে এসে পড়েছে—সমুদ্রের এপারে-ওপারে তার নিজের ছেলে-পুলেরা যে যার নিজের ছেলেপুলে নিয়েই ব্যস্ত, তার কথা তাদের মনেও পড়ে না। উপরন্তু, এটাও তো স্পষ্ট যে সব মহান সব ঘটনা ঘটতে চলেছে। স্ত্রীলোকরা যখন তাকে আসতে দ্যাখে, সম্মান জানিয়ে জলজলে রংচঙা কাপড় নাড়ে, এক রোববারে যেমন ক'রে হেসু ক্রিস্তোর কাছে অনেক আগে তারা বিছিয়ে দিয়েছিলো তালপর্ণ। যখন সে কোনো ছোট্ট কাঠের বাড়ির পাশ দিয়ে যায়, বুড়িরা তাকে আমন্ত্রণ জানায় একটু ব'সে যেতে, লাউয়ের খোলে তাকে এনে দেয় নির্জলা একটু রাম, কিংবা সদ্যপাকানো চুরুট। ঢাকের উৎসবে, একবার আঙ্গোলার রাজার আত্মা ভর ক'রেছিলো তি নোয়েলের ওপর, আর সে উচ্চারণ করেছিলো এক দীর্ঘ ভাষণ, যেটা ভরা ছিলো হেঁয়ালিতে আর প্রতিশ্রুতিতে। ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে নতুন যে-সব জীবজন্তু ঘাসের ওপর চ'রে বেড়ায়, তারা নিঃসন্দেহে তার প্রজাদের ভেট। তার আরাম কেদারায় ব'সে, গায়ের কুর্তার বোতাম খোলা, খোড়ো টুপিটা কান অব্দি নামানো, আস্তে-আস্তে খোলা পেটটা চুলকোতে-চুলকোতে, তি নোয়েল বাতাসের কাছে সব হুকুম দেয়। কিন্তু সেগুলো সবই কোনো শান্তিকামী

সরকারের ঘোষণা ; তার স্বাধীনতায় কেউ বিঘ্ন ঘটাবার ভয় দেখায় না—না শাদারা, না নেগ্রোরা। বুড়ো তার ভাঙাচোরা দেয়ালের ফাঁক-ফোকর ফাটল বুজিয়েছে চমৎকার সব জিনিশে, যে-কোনো পথিককেই সে দিয়ে দেয় অমাত্যের পদ, যে-কোনো খড়কাটিয়েকে সেনাপতিত্ব, বিলি ক'রে দেয় ব্যারনত্ব, উপঢৌকন দেয় পুষ্পস্তবক, আশিস জানায় ছোট্ট মেয়েদের, আর সেবা করার জন্যে তাদের পারিতোষিক দেয় ফুলপল্লব। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিক্ত ঝাঁটার রত্নশ্রী, বড়োদিনের উপহারের ভূষণ, প্রশান্ত সাগরের খেতাব, বিষকাঁটালির পুষ্পশ্রী। কিন্তু সবচেয়ে দামি হ'লো সূর্যমুখির ভূষণ, সেটাই সবচেয়ে সুন্দর ও শোভাবর্ধক। টালি বসানো মেঝের আদ্ধেকটা যেহেতু তার আমদরবার, এবং নাচের পক্ষেও খুব ভালো, তার রাজপ্রাসাদ তাই ভ'রে যায় গাঁয়ের লোকে, তারা নিয়ে আসে তাদের নলখাগড়ার বাঁশি, তাদের চাচা, তাদের ঢাক। জলন্ত মশাল গুঁজে দেয়া হয় দোফলা ডালের গোঁজে, আর তি নোয়েল, তার সবুজ রেশমি কুর্তা গায়ে আরো রাজোচিত, উৎসবের সভাপতিত্ব করে সাভান্নার এক পুরোহিতের পাশে ব'সে, সে হ'লো সদ্য-গজানো এক দেশী গির্জের যাজক, আর এক বুড়ো যুদ্ধফেরৎ সৈনিক থাকে তার আরেক পাশে—সেই তাদেরই একজন যারা ভের্তিয়ের-এ রশাম্বুর বিরুদ্ধে যুঝেছিলো—বিশেষ উপলক্ষে যে বার ক'রে আনে তার রংচটা নীল-নীল অভিযান-উর্দিটা, যেটার রং এখন হ'য়ে উঠেছে ধনুকমণির মতো, যেহেতু তার বাড়িতে বর্ষাকালে চুঁইয়ে পড়ে বৃষ্টির জল।

৩

জরিপদল

কিন্তু একদিন সকালে এসে হাজির জরিপদল। কীটের কাজ বেছে নিয়েছে এরা, নিছক উপস্থিতি মারফৎ এরা কী-যে আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে, সেটা বোঝবার জন্যে জরিপদলকে কাজ করতে দেখা চাই কারু। মেঘের মতো পাহাড় পেরিয়ে সেই দূর পোর্-ও-ফ্রাঁস থেকে যে জরিপদল এসেছে তারা কথা বলে না, গোরা রং মানুষ তারা, প'রে থাকে—মানতেই হয়—মোটামুটি স্বাভাবিক পোশাক ; তারা লম্বা-লম্বা দড়ি টেনে বিছায় জমিতে, খুঁটি পুঁতে দেয়, ব'য়ে বেড়ায় ওলনদড়ি, দূরবিনে চোখ লাগিয়ে ছাখে, আর কত-যে মাপজোকের লাঠি আর চৌকো তাদের, তার

ইয়ত্তা নেই। তি নোয়েল যখন তার রাজত্বের চৌহদ্দিতে এই সন্দেহজনক চরিত্রদের আনাগোনা করতে দেখলে, সে কঠোর স্বরে তাদের সঙ্গে কথা বললে। কিন্তু জরিপদল তাকে কোনো পাত্তাই দিলে না। তারা, অবাধ্য সব, এদিক-ওদিক ঘুরলো-ফিরলো, মাপলো সবকিছু, ছুতোরদের পেটমোটা পেনসিলে কী-সব যেন লিখে নিলে তাদের ধূসর খাতায়। বুড়ো রেগে টং হ'য়ে দেখলো যে তারা ফরাশিদের ভাষায় কথা বলে, যে-ভাষা সে ভুলেই গিয়েছে, সেই অতীতে, যেদিন মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি তাশের জুয়োয় তাকে হেরেছিলেন সানৃতিয়াগো দে কুবায়। তি নোয়েল কুত্তির বাচ্চাগুলোকে তার জমি থেকে সটান কেটে পড়তে হুকুম দিলে; এমন ক্ষিপ্রভাবে সে চ্যাচাচ্ছিলো যে জরিপদলের একজন তার ঘেটিটা পাকড়ালে, দুরবিনের দৃষ্টিপথ থেকে সরাবার জন্যে তার মাপলাঠি দিয়ে পেল্লায় একটা ঘা কষালে তার পেটে। বুড়ো ফিরে গেলো তার চিমনির কাছে, করমণ্ডল পর্দার আড়াল থেকে উঁকি মেরে-মেরে দেখলো, অভিশাপ দিতে লাগলো তাদের। কিন্তু পরদিন, কিছু খাদ্যের খোঁজে, সে যখন সমভূমিতে লক্ষ্যহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে দেখতে পেলে চারপাশ গিশগিশ করছে জরিপদলে, আর ঐ ঘোড়ায়-চড়া মুলাটোগুলো—তাদের গলার কাছে জামা খোলা, রেশমের কোমরবন্ধপরা, পায়ে সামরিক জুতো—পরিচালনা করছে এক বিশাল কর্মকাণ্ড—হাল দিচ্ছে জমিতে, সাফ করাচ্ছে আশপাশ, আর খেটে মরছে শয়ে-শয়ে নেগ্রো বন্দী। তাদের গাধার পিঠে চ'ড়ে, রাশি-রাশি মুরগি-শুওর নিয়ে শয়ে-শয়ে চাষী বেরিয়ে আসছে তাদের কুঠুরি থেকে—স্ত্রীলোকদের কান্নাকাটি আর ডুকরে-ওঠা বিলাপের মধ্যে—তারা পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তি নোয়েল এক পলাতকের কাছে জানতে পেলে যে কাজ বাধ্যতামূলক ক'রে দেয়া হয়েছে, আর চাবুকগুলো এখন গণপ্রজাতন্ত্রী মুলাটোদের হাতে—উত্তরের সমভূমির এরা নতুন প্রভু।

মাকান্দাল এই বেগার শ্রমের ব্যাপারটা আগে থেকে দেখতে পায়নি। জ্যামেকার সেই বুকমানও না। মুলাটোদের এই উত্থান এমন-একটা নতুন জিনিশ যেটা হোসে আন্তোনিও আপোন্তেরও মাথায় আসেনি, যার মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলো সোমেরুলোর মার্কি, যার বিদ্রোহের প্রতিবেদন তি নোয়েল শুনেছিলো কুবায় তার দাস দিনগুলোয়। এমনকী অঁরি ক্রিস্তফও সন্দেহ করতে পারেনি যে সান্তো দোমিঙ্গো একদিন নিয়ে আসবে এই বেজন্মা হঠাৎ-নবাবদের, এই চৌআঁশলার জাতকে, যারা এখন দখল ক'রে নিচ্ছে পুরোনো সব খেতখামার, তাদের পদাধিকার ও বিশেষ সুবিধার বলে। বুড়ো তার ঘোলাটে চোখ মেলে তাকালে না ফেরেই-

এর নগরস্বর্গের দিকে। কিন্তু অদূরে আর তার চোখ চলে না আজকাল। ঋষি ক্রিস্তফের প্রথা পাথরে পরিণত—সে-সব কিছুই আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। তাঁর সেই অতিকায় জীবনের ঝরতি-পড়তি অংশটুকুই প'ড়ে আছে রোমে, একটা বেলোয়ারি শিশিতে ব্র্যাণ্ডির আরকের মধ্যে চোবানো একটা আঙুল। আর সেই দৃষ্টান্ত অনুযায়ীই রানী মারিয়া-লুইসা, কার্লসবাডের হামামে তাঁর মেয়েদের নিয়ে যাবার পর, তাঁর ইষ্টিপত্রে হুকুম করেছিলেন তাঁর ডান পা যেন কোহলে চুবিয়ে রাখা হয়, এবং তাঁর ধর্মপ্রাণ বদান্যতায় নির্মিত একটা গির্জেয় যেন পিসার কাপুচিনদের তা দিয়ে দেয়া হয়। যতই চেষ্টা করুক, তি নোয়েল কোনো পথ খুঁজে পেলে না—কেমন ক'রে সে তার প্রজাদের চাবুকের তলায় কুঁকড়ে-যাওয়া থেকে বাঁচাবে। শেকলের এই অবিশ্রাম প্রত্যাবর্তন, বেড়ির এই বিরামহীন পুনর্জন্ম, দুঃখবেদনার এই অনবরত বংশবৃদ্ধি—যা দেখে আরো-হালছাড়া লোকেরা অবশেষে সব বিদ্রোহের অপ্রয়োজনীয়তার প্রমাণ হিশেবে মানতে শুরু ক'রে দিয়েছে—এই বুড়োর বুকটা ভেঙে দিলে। তি নোয়েল ভয় পেয়ে গেলো : হয়তো তাকেও বলবে হাল চষতে, তার এত বয়েস হওয়া সত্ত্বেও। আর তারই ফল হিশেবে মাকান্দাল তার স্মৃতি দখল ক'রে বসলো। মানুষী বেশ যদি এক দুঃসহ সর্বনাশ নিয়ে আসে তার কাছে, তবে তো সাময়িকভাবে এটা ত্যাগ করাই ভালো, চোখে-না-পড়ার মতো অন্যকোনো বেশ ধ'রে সমভূমির ঘটনাগুলো লক্ষ করাই তবে উচিত। একবার এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুবামাত্র তি নোয়েল অবাক হ'য়ে দেখলে, কারু যদি বিশেষ ক্ষমতা থাকে তবে কত সহজে সে কোনো জন্তুতে রূপান্তরিত হ'য়ে যেতে পারে। এরই প্রমাণ হিশেবে সে একটা গাছে চ'ড়ে বসলো, সমস্ত ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করলো পাখি হ'য়ে যাবার জন্যে—আর, মুহূর্তে, সে পাখি হ'য়ে গেলো। মগডালে ব'সে লক্ষ করতে লাগলো জরিপদলকে, তার চঞ্চু ঠোকরালো মেদলার গাছের জীর্ণ বাকলে। পরদিন সে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলে টাট্টু ঘোড়া হ'য়ে যাবার জন্য, আর হ'য়ে গেলো একটা টাট্টু ঘোড়াই, কিন্তু মুলাটোরা তাকে ল্যাসো ছুঁড়ে পাকড়ে একটা মাংসকাটা ছুরি দিয়ে তাকে খোজা ক'রে দিতে চাচ্ছিলো ব'লে, গায়ের জোরে পাঁই-পাঁই ক'রে তাকে ছুটে পালাতে হ'লো। তারপর সে নিজেকে বদ্‌লে ফেললে একটা বোলতায়, কিন্তু মোম বানাবার এক-ঘেয়ে একটানা জ্যামিতিতে শিগগিরই সে ক্লান্তবিরক্ত হ'য়ে পড়লো। পিঁপড়ে হ'য়ে উঠে একটা মস্ত ভুলই ক'রে বসেছিলো সে, হ'য়েই দেখতে পেয়েছিলো অন্তহীন রাস্তা ধ'রে ভারি-ভারি মোট ব'য়ে তাকে চলতে হচ্ছে—বড়োমাথা পিঁপড়েদের

সজাগ প্রহরার, যারা তাকে বিশ্রীভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো লেনরমঁ দ্য মেজির উপদর্শকদের, অঁরি ক্রিস্তফের পাহারাদের আর আজকের দিনের এই মুলাটোদের। সময়-সময় ঘোড়ার খুর ধ্বংস ক'রে ফ্যালে শ্রমিকবাহিনী, শয়ে-শয়ে মজুর মেরে ফ্যালে। যখন এটা হয়, ডেঁয়ো পিঁপড়েরা আবার ছিমছাম ক'রে সাজিয়ে দেয় সার, এগিয়ে-পেছিয়ে খুঁজে বার ক'রে নেয় রাস্তা, আর আবার সব চলতে থাকে আগের মতো, সেই একই ব্যস্ত আসা-যাওয়া। তি নোয়েল যেহেতু সেখানে ছিলো ছদ্মবেশে, আর নিজেকে এক ঝলকও পিঁপড়েদের একজন ব'লে ভাবতে পারেনি, সে গিয়ে শেষটায় আশ্রয় নিলে তার টেবিলের তলায়, যেটা সে-রাতে তার শরীর বাঁচালে একটানা গুঁড়ি বৃষ্টি থেকে, যার পর সারা মাঠ ভ'রে গিয়েছিলো ভেজা শরবনের খোড়ো গন্ধে।

৪

Agnus Dei

[দে ব মে ষ]

মেঘলা দিন, গরম পড়বে বিষম। মাকড়শার জালগুলোয় শিশির তখনও পুরোপুরি শুকোয়নি, এমন সময় তি নোয়েলের রাজত্বের ওপর আকাশ থেকে নেমে পড়লো প্রচণ্ড এক নির্ঘোষ। ছুটে, ছুটোপাটি ক'রে, হোঁচট খেতে-খেতে, সান্ সুসির পুরোনো গোলাবাড়ি থেকে পড়ছে হাঁসেরা, ছুটে আসছে, তারা বস্তা থেকে পালিয়েছে দল বেঁধে, কারণ নেগ্রোদের ভালো লাগে না হাঁসের মাংস, আর তাই অ্যাদ্দিন যেমন খুশি খেয়াল মাফিক বাঁচছিলো তারা, পাহাড়-পর্বতের আখের খেতের মধ্যে। বুড়ো এদের গ্রহণ করলে সাদরে, পরমানন্দে। তাদের আগমনে সে দারুণ খুশি, কারণ খুব বেশি লোকে তো আর তার মতো অত ভালো ক'রে জানে না হাঁসেদের বুদ্ধিশুদ্ধি আর হাসিখুশির ধরনধারণ, কারণ সে তো কবেই লক্ষ ক'রে দেখেছিলো তাদের আদর্শ রীতিনীতি, সেই যখন মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি অনেক বছর আগে তাদের চেষ্টা করেছিলেন নতুন জলবায়ুতে খাপ খাইয়ে নিতে। তারা যেহেতু গরম জলবায়ুর জন্যে তৈরি ছিলো না, মাদিগুলো প্রতি দু-বছর অন্তর মাত্র পাঁচটা ক'রে ডিম পাড়তো। কিন্তু ছানা ফোটাবার জন্যে তাদের তা দেয়া উৎপন্ন করেছিলো এমন-সব রীতিনীতি যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হাত-

ফেরতা হ'য়ে চ'লে আসছিলো। একটা অগভীর ঝরনার ধারে মিলনক্রিয়া শুরু হ'তো পুরুষ আর মেয়ের, পুরো গোষ্ঠীটার সামনেই। এক তরুণ মরদ প্রেম করতো তার জীবনসাথীর সঙ্গে, তাকে ঢেকে দিতো নিজের পাখায়, উল্লসিত ভেঁপুর আওয়াজের মধ্যে, সেইসঙ্গে চারপাশে চলতো পার্বণী নাচ—ঘুরপাক, পা-ঠোকা আর গলার সব কতরকম উদ্ভট ডাকলাগানো ভঙ্গি। তারপর পুরো গোষ্ঠী শুরু করতো নীড় বানাতে। তা দেবার সময় বধূর ওপর নজর রাখতো সব পুরুষ, সারা রাত, সজাগ, সতর্ক, যদিও তাদের গোল-গোল চোখগুলো ঢাকা থাকতো পাখার আড়ালে। যখন কোনো বিপদ ভয় দেখায় অলবড্যে হলদে-পালক হাঁসের ছানাগুলোকে, সবচেয়ে বুড়ো হাঁসেরা তেরিয়া হ'য়ে শানায় বুক আর ঠোঁটের ঠোক্কর, তোয়াক্কাই করে না শত্রুকে—তা সে যে-ই হোক না কেন—মাস্‌টিফ, ঘোড়সোয়ার বা ঘোড়ার গাড়ি। হাঁসেরা সব নিয়মমানা জীব, রীতিশৃঙ্খলা জানে, তাদের আছে নীতিনিয়ম, ব্যবস্থাপদ্ধতি, একই প্রজাতির আরেক জনের ওপর কেউ এসে ফোঁপর দালালি করবে, এটা তারা মানে না। কর্তৃত্বের যেটুকু রীতিনীতি প্রকাশ পেতো বুড়ো হাঁসেদের মধ্যে, তার উদ্দেশ্য ছিলো গোষ্ঠীর মধ্যে যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে, আফ্রিকার পুরোনো খামারগুলোয় যে-ভূমিকা ছিলো রাজার বা দলনায়কের। তি নোয়েল তার ভেলকি খাটিয়ে নিজেকে বানিয়ে ফেললে একটা হাঁস, যারা তার বাড়িটাকে তাদের আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছে তাদের সঙ্গেই মিলে-মিশে জীবন কাটাবে ব'লে।

কিন্তু যখন সে চেষ্টা করলে গোষ্ঠীর মধ্যে নিজের জায়গা ক'রে নিতে, তাকে পেতে হ'লো ঠোঁটের ঠোক্কর আর গলার ধাক্কা—তারা তাকে দূরে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। তাকে দেয়া হ'লো চারণভূমির কিনার, আর উদাসীনা হাঁসীদের ঘিরে রাখলে শাদা পালকের একটা দেয়াল। এ-সব দেখে তি নোয়েল সতর্ক হবার চেষ্টা করলে, নিজের প্রতি সে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না, অন্যদের সিদ্ধান্তেই সায় দেয় সবসময়। বিনিময়ে তার পুরস্কার জুটলো ঘৃণা আর পাখার ঝাপটার তাচ্ছিল্য। মিথ্যেই সে হাঁসীদের দেখিয়ে দিলে কোথায় পাওয়া যায় রসালো সব গুগলি আর শামুক। তাদের ধূসর পুচ্ছ তবু বেঁকে যায় বিরক্তিতে, আর তাদের হলুদ চোখগুলো তাকে লক্ষ করে রাগি সন্দেহে, এমনকী ঘাড় ঘুরিয়েও তারা এভাবেই তাকায় তার দিকে। গোষ্ঠীকে এখন দেখায় অভিজাতদের একটা সমাবেশের মতো, অন্য জগতের কেউ যাতে ঢুকে পড়তে না-পারে সেইজন্যে নিবিড় আটকানো, রুদ্ধ। সান সুসির মহা-হাঁস দোন্দোর মহা-হাঁসের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। যদি তাদের দেখা হয় মুখোমুখি, শুরু হ'য়ে যায় শত্রুতা।

এইভাবেই তি নোয়েল টের পেয়ে গেলো সে যদি বছরের পর বছর অসীম ধৈর্য দিয়ে লেগে থাকে, তবু সে কিছুতেই, কোনোভাবেই, গোষ্ঠীর রীতিনীতি ও দায়-দায়িত্বের মধ্যে গৃহীত হবে না। এটা তার কাছে স্ফটিকস্বচ্ছ হ'য়ে গেছে যে হাঁস হ'য়ে-যাওয়ার মানে এই নয় যে সব হাঁসেরাই সমান। তি নোয়েলের বিয়ের দিন কোনো আনাচেনা হাঁস এসে নাচেনি বা গান গায়নি। এই যারা বেঁচে আছে, তারা কেউ কোনোদিন চোখে গ্যাখেনি কবে সে ডিম ফুটে বেরিয়েছিলো। সে নিজেকে উপস্থাপিত করেছে কোনো যোগ্য সুষ্ঠু মর্যাদাময় পারিবারিক পরিচয়পত্র ছাড়াই, এমন-সব হাঁসীদের কাছে, যারা চার-চার প্রজন্ম অব্দি পূর্বপুরুষদের নাম জানে। এক কথায়, সে এক উটকো হাঁস, নামগোত্রহীন, বহিরাগত, আগন্তুক।

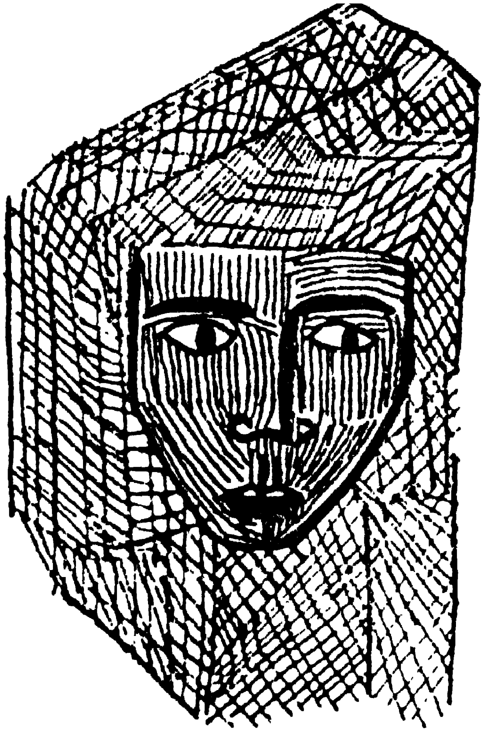
তি নোয়েল আবছা-আবছা বুঝতে পাবলে যে হাঁসেরা তাকে যে প্রত্যাখ্যান করেছে সে তার ভীরুতার শাস্তি হিশেবেই। মাকান্দাল তো কত বছর প'রে ছিলো জীবজন্তুর ছদ্মবেশ—মানুষেরই কাজে লাগার জন্যে, মানুষের জগৎকে ত্যাগ করার জন্যে নয়। এই সময়েই বুড়ো ফিরে ধরলে তার মানুষী রূপ—ঝলকের জন্যে এক চরম প্রাঞ্জলতায় ভ'রে গেলো তার বোধ। শুধু-একটা হৃদয়স্পন্দের প্রসরে সে বাঁচলে তার জীবনের সেরা সুন্দর মুহূর্তগুলো; আরো-একবার সে চোখে আভাস পেলে সেই বীরদের যারা তার কাছে উন্মোচিত করেছিলো তার সুদূর মুহূর্তগুলো: তার সুদূর আফ্রিকার পূর্বপুরুষদের শক্তি ও পূর্ণতা, তাকে তা বিশ্বাস করালে যে ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত আছে সম্ভাব্য সব নবজন্ম। নিজেকে তার মনে হ'লো অগুনতি শতাব্দীর সমবয়সী। এক বিশ্বজোড়া ক্লান্তি—যেন পাথরের ভারে নাজেহাল হ'য়ে আছে আস্ত একটা গ্রহই—পড়লো তার কাঁধের ওপর—অত মার, ঘাম, বিদ্রোহে যে-কাঁধ কুঁকড়ে গেছে, গুটিয়ে গেছে। তি নোয়েল অপচয় করেছে তার জন্মের অধিকার, আর দুঃসহ দারিদ্র্য সত্ত্বেও—যে-দারিদ্র্যে সে ডুবেছিলো সারা জীবন—সে রেখে যাচ্ছে সেই একই উত্তরাধিকার, যা সে নিজেও পেয়েছিলো: মাংসে-গড়া এক শরীর, যার গায়ে কত-কিছুই যে ঘটেছে। এখন সে বুঝতে পারলে যে কোনো মানুষ কখনোই সত্যি ক'রে জানে না কার জন্যে সে কষ্ট পায়, কার জন্যেই বা সে আশায় বুক বাঁধে। সে কষ্ট করে আশা করে কাজ করে সেই মানুষদেরই জন্যে যাদের সে কোনোদিনও জানবে না, আর যারা—তাদের নিজেদের যখন পালা আসবে—তাদেরই জন্যে কষ্ট পাবে আশা করবে যারাও আর সুখী হবে না কখনো, কারণ মানুষ সবসময়েই হাংড়ায় সেই সুখ তাকে দেয়া ছোট্ট পরিসরটির অনেক বাইরে যার অবস্থান। কিন্তু

মানুষের মহিমা তো এইখানেই যে, সে যা, সে চায় তার চেয়েও ভালো হ'তে। নিজের ওপর কর্তব্য আরোপ করাতেই তো মহিমা। স্বর্গের রাজত্বে তো জয় ক'রে নেবার মতো কোনো মহিমা নেই; সেখানে সবই তো আনুষ্ঠানিক, প্রতিষ্ঠিত, পারম্পর্যে-সাজানো, ওপর-থেকে-নিচে; যেখানে অজ্ঞাত মাত্রেই উন্মোচিত, অস্তিত্ব সীমাবিহীন, সেখানে তো আত্মবিসর্জনের কোনো সম্ভাবনাই নেই, সেখানে সবই তো বিশ্রাম আর আনন্দ। এই জন্যেই, ব্যথার ভারে কাজের ভারে নুয়ে-পড়া, দুর্দশার মধ্যেও রূপবান, দুঃখদুর্বিপাকের মধ্যে ভালোবাসতে সক্ষম, মানুষ খুঁজে পায় তার মহিমা, তার পূর্ণতা, শুধু এই মর্তের রাজত্বেই।

তি নোয়েল বেয়ে উঠে পড়লো তার টেবিলের ওপর, তার কড়া পড়া পায়ে পায়াটা পেঁচিয়ে। আগুনের ধোঁয়ায় এল্ কাবো-র দিকে আকাশ অন্ধকার হ'য়ে আছে—ঠিক সেইরাতের মতো যেদিন পাহাড়ের উপকূলের সব শঙ্খ একসঙ্গে গান ক'রে উঠেছিলো। বুড়ো তার যুদ্ধ ঘোষণা করলে নতুন প্রভুদের বিরুদ্ধে, আদেশ করলে তার প্রজাদের—ক্ষমতাসীন মুলাটোদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খলভাবে কুচকাওয়াজ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে। সেই মুহূর্তে, সমুদ্র থেকে উঠে এসে, এক বিশাল সবুজ হাওয়া ঝেঁটিয়ে গেলো উত্তরের সমভূমি, প্রচণ্ড গর্জন ক'রে ছড়িয়ে গেলো দোন্দোর উপত্যকায়। আর যখন ল্যা বনে দ্য লেভেকের শিখরে ডুকরে উঠলো গলাকাটা ষাঁড়গুলো, আরামকেদারা, পর্দা, 'গ্রাঁ এনসিক্লোপেদি'র খণ্ডগুলো, মিউজিক বাক্স, পুতুল আর চাঁদামাছ উঠে গেলো আকাশে, ঠিক যখন খামারের শেষ ধ্বংসাবশেষ নেমে এলো ধ্বসের মতো গড়িয়ে, অমনি গাছগুলো নুয়ে পড়লো অভিবাদনে, শিখরগুলো মুখ ফেরালো দক্ষিণে, মাটি থেকে সটান উপড়ে এলো শেকড়। আর সারা রাত ধ'রে, বৃষ্টির-দিকে-মুখ-ফিরিয়ে, সমুদ্র পাহাড়ের ঢালে রেখে গেলো লবণের দাগ।

সেই মুহূর্তে থেকে আর-কখনো কেউ দেখতে পায়নি তি নোয়েলকে, দেখতে পায়নি তার সবুজ রেশমি কুর্তা, স্যালমন ঝালরের আস্তিন—হয়তো সেই ভিজে-যাওয়া গৃধিনীটা ছাড়া, সব মৃত্যুকেই যে বদ্‌লে ফ্যালে নিজের উপকারে, যে বসে-ছিলো ডানা ছড়িয়ে, নিজেকে শুকোচ্ছিলো রোদ্দুরে, পালকের এক এলোপাথাড়ি সমাবেশ, যে শেষটায় গুটিয়ে তুললে নিজেকে আর উড়ে গেলো বোয়া কাইমাঁর ঘন ছায়ার মধ্যে।

কারাকাস, ১৬ মার্চ, ১৯৪৮





মৃগয়া

স্মর্তব্য :

টিকিটবিক্রেতা আর পলাতক—এরা পরস্পরের প্রতিবেশী, যদিও কেউ কাউকে চেনে না। টিকিটবিক্রেতা থাকে আধুনিক এক বহুতল ফ্ল্যাট-বাড়িতে, আর ঠিক তার মুখোমুখি উঠে গেছে মিনারওলা দরদালানটার চিলেকোঠা—পলাতক যেখানে এসে তার শৈশবের আয়া নেগ্রোবুড়ির কাছে আশ্রয় নিয়েছে। কনসার্টের সময় পলাতক বুঝতে পারে যে এই সিম্ফনির সুর সে আগেও শুনেছে ; টিকিটবিক্রেতা আসলে এক সংগীত-শিক্ষার্থী—পলাতক যখন ঐ মিনারে লুকিয়েছিলো, তখন সে তার 'এরোইকা' সিম্ফনির রেকর্ড বারে-বারে বাজিয়েছে।

আলেহো কার্পেন্তিয়ের

১

Sinfonia 'Eroica', composta per festeggiare il souvvenire di un grand 'uomo, ë dedicata a Sua Alteza Serenissima il Principe di Lobkowitz, de Luigi Van Beethoven, op. 53, No III delle Sinfonie.

[লুইজি (লুডভিগ) ফান বেটোফেনের 'এরোইকা' সিম্ফনি, রচনা ৫৩, সিম্ফনি-গুলোর মধ্যে তৃতীয়, রচিত হয়েছিলো এক মহান মানবের স্মৃতির উদ্‌যাপনে আর উৎসর্গীকৃত হয়েছিলো পরম ভট্টারক লোব্‌কোভিট্‌জের যুবরাজের উদ্দেশে।]

…এই টীকা প'ড়ে বুঝতে পেরে তার যে একটু ছেলেমানুষি গর্ব হচ্ছিলো, কোথায় এক দরজা বন্ধ হবার দড়াম আওয়াজ তাকে তা থেকে আঁৎকে বার ক'রে আনলো। লাল পর্দাটার কোণা তার মাথার ডগা ছুঁয়ে, বইয়ের কয়েকটা পাতা উল্‌টে দিয়ে, আবার যথাস্থানে ফিরে গেলো। বাধা প'ড়ে গেলো তার পড়ায়: মনে-মনে সে বধিরতার অনুষঙ্গ ভাবছিলো—সেই বধির জন, শিঙাগুলোর বোবা কলরোল—কিন্তু এবার সে চারপাশের কোলাহলকে আবার নতুন ক'রে টের পেলে। আচমকা বৃষ্টির ঝাপটায় শ্রোতাদের অনেকে হাসতে-হাসতে আবার বড়ো গেটটা থেকে উপ-প্রকোষ্ঠে ফিরে এলো, যেন সুতোয় বাঁধা; চাঁদোয়ার ঢালে জমা হয়েছে বৃষ্টির জল, অনর্গল উপচে পড়ছে, যেন বালতি-বালতি জল ঢালছে কেউ গ্র্যানাইট পাথরের সিঁড়িতে, আর তারই মধ্যে নগ্ন কাঁধের ওপর দিয়ে এ ওর দিকে তাকিয়ে ডাকাডাকি করছে। দ্বিতীয় ঘণ্টা প'ড়ে গেলে কী হবে, সব্বাই ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে উপপ্রকোষ্ঠে, গায়ে-গায়ে লেপটে; সোঁদা মাটি, সবুজ পপলার, ভিজে ঘাসের সুবাস ঘামেভরা মুখগুলোকে শীতল ক'রে গেলো—দীর্ঘ খরতাপের পর ফাটলগুলো সব বুজে যাচ্ছে আর দমকা ছড়িয়ে যাচ্ছে মাটি আর গাছের বাকলের নিশ্বাস। পার্কের চাতালগুলোর মধ্যে নতুন-সতেজ গাছপালায় স্বস্তিকে ভাগ ক'রে নিতে পেরে, অবশেষে, দমআটকানো সন্ধ্যাটির পর, তাদের শরীর এখন যেন অনেক সহজ আর স্বচ্ছন্দ। ফুলের কেয়ারিগুলোর ধারে-ধারে খুদে-খুদে চিরশ্যামল ঘাসের ঝোপ; তারা যেন কোনো নতুন-চষা জমির গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। 'মাথায় যে মৎলব খেলে গেছে, তার পক্ষে খুবই ভালো আবহাওয়া বলতে হয়,' টিকিটঘরের জানলার

জাফরির গায়ে হেলান দেয়া এক স্ত্রীলোকের দিকে তাকিয়ে একজন বললে মৃদু-স্বরে। স্ত্রীলোকটির মুখের একপাশ শেয়ালের লোমের স্কার্ফের তলায় ঢাকা, স্পষ্টই সে ভেতরের লোকটাকে মানুষ ব'লেই মনে করছিলো না, আর তার প্রমাণ এটাই, যেমন ক'রে সে এইমাত্র ক্ষিপ্রকুশল উদাসীন হাতে তার অন্তর্বাসের একটা বোতাম খুলে ফেললো—টিকিটঘরের লোকটা যদি ড্যাবড্যাব ক'রে তাকে তাকিয়ে ছাখেও, তাতে তার কিছুই এসে যায় না, এমনি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব তার। 'যেন একটা বাঁদর ব'সে আছে গরাদের ওপাশে,' টিকিটবিক্রেতাকে নিয়ে হাসাহাসি ক'রে বলতো আসন-নির্দেশকেরা : এ-লোকটা অন্য সকলের চেয়ে কেমন যেন আলাদা, যতক্ষণ-না কনসার্ট শেষ হয় ততক্ষণ সে থেকে যায় এখানে ; নিয়ম যদিও বলে যে 'অনুষ্ঠান শেষ হবার আধঘণ্টা আগে অব্দি থাকতে হবে,' তবুও রাত দশটার টিকিট-গুলোর হিশেব মিলিয়ে সে অনায়াসেই চ'লে যেতে পারতো। শেয়ালের লোমের স্কার্ফধারিণীকে সে লজ্জা দিতে চাইলো, তাকে জানাতে চাইলো যে তাকে সে দেখেছে, আর কোনো ব্যাঙ্ককেরানির মতো দক্ষ হাতে সে একমুঠো খুচরো গড়িয়ে দিলে জানলাটার মার্বেলে তৈরি সরু গোবরাটে। মেয়েটি তার মুখের পাশ তুলে তাকালে ঐ খুচরোর ওপর উদ্যত হাত দুটির দিকে—হাত ছাড়া আর-কিছুর দিকেই সে তাকায়নি—আর তারপর আবার অন্তর্বাসের বোতামে হাত দিলে। লজ্জা-সরমের এই অভাবই প্রমাণ যে অন্তত এই উপপ্রকোষ্ঠে জড়ো-হওয়া মেয়েদের কাছে তার কোনো অস্তিত্বই নেই, সে একজন কেউ-না ; এরা চায় যে-ক'রেই হোক চট ক'রে কোনো আয়নার কাছে চ'লে যেতে—যা তাদের কেশসজ্জা আর বেশভূষার প্রতিফলন ফিরিয়ে দেবে। এমন গরম সত্ত্বেও তারা যে-ফার পরেছে তা কাঁধ আর বুকের ওপর আঠার মতো লেপটে আছে—ভারটা হালকা করার জন্যে কেউ-কেউ কনুইয়ের ওপর নামিয়ে দিয়েছে আঁচল, আর সেখান থেকে তারা এমনভাবে ঝুলে আছে যেন কোনো মৃগয়ার পুরস্কার। টিকিটবিক্রেতার চোখ এই অনধিগম্য সমীপতা থেকে পালিয়ে গেলো। এই রক্তমাংসের শরীর ছাড়িয়ে ঐ-যে ঐখানে বৃষ্টির কাছে সমর্পিত স্তম্ভসারির পার্ক, আর পার্ক ছাড়িয়ে, ছায়ায় ঢাকা দরজাদেহলির পেছনে উঠেছে এক মিনারওলা অট্টালিকা—এককালে ছিলো বাগানবাড়ি, সাইপ্রেস আর সরল গাছে ঘেরা, কিন্তু এখন যাকে ঘিরে আছে কুৎসিত সব বহুতল আধুনিক বাড়ি, যার একটায়, ধোঁয়াওগরানো নলগুলোর তলায়, চাকরবাকরদের জন্যে বানানো ঘরে সে থাকে, বৃত্ত আর ত্রিভুজের নির্বস্তুক বিন্যাসের মধ্যে যার স্কাইলাইটগুলো বিষমকোণী সমভুজ সামান্তরিকের আরো-একটা জ্যামিতিক ঝঙ্কার। কিন্তু অট্টালিকা-

সব প্রাচীন জিনিশ—পায়ার ওপর বসানো কলস আর সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভের সার—সব এখন ধ্বংসে পড়লেও অন্তত একটু বজায় রেখেছে রুচির আভিজাত্য : ওরা নিশ্চয়ই কোনো মৃতের সঙ্গে রাত জাগছে, কারণ ছাতের যে-অলিন্দটা বড্ড কড়া রোদে পোড়ে অথবা বড্ড আঁধার থাকে ব'লে সবসময়েই থাকে পরিত্যক্ত, প্রথম বাজ পড়ার অট্টরোল অব্দি সেটা যেন চলন্ত ছায়াদের একটা মৌচাক হ'য়ে গিয়েছিলো। সে তার চোখ তুলে স্নেহের ভঙ্গিতে সেই হতশ্রী নোংরা ছাতের দিকে তাকালে, গরিবদের অযত্নের কাছে পড়েছে বাড়িটা : এ যেন তার গ্রামেরই আবছা আলো-জ্বলা ঘরবাড়ির মতো, যেখানে মৃতের জন্যে জ্বালানো মোমবাতি-গুলো যখন চলটা-ওঠা দেয়াল আর কাপড়ঢাকা পাখির খাঁচার ওপর থর্থর ক'রে কাঁপতো আর যেমনভাবে শস্তা কারুকাজ-করা শামাদানগুলোর দীপ্তি দারিদ্র্যজীর্ণ আশবাবগুলোর রূঢ়তাকে মোলায়েম ক'রে দিয়ে যেতো, তাতে মনে হ'তো এ যেন কোনো ক্যাথিড্রালের উচ্ছল দেয়ালিরই সমতুল। জল-চোঁয়ানো ফুটো ছাতের তলায়, অন্ত্যেষ্টির নিশিজাগার জাঁকজমকের সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন, রুপো আর ব্রনজের উপস্থিতি, শোকের বেশ পরা গণ্যমান্যদের গাম্ভীর্য—এ-সবের মধ্যে লম্বা-লম্বা মোমবাতিগুলো, মাঝে-মাঝে, স্পষ্ট আলোয় খুলে দেখাতো কড়িবরগার মধ্যকার ঝুলকালি আর মাকড়শার জাল কিংবা ঘুণপোকার অবদান—কাঠের গুঁড়োর রাশি। (পরবর্তীকালে, যারা তারই মতো কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখছিলো, প্রতিবেশীদের কাছে তাদের ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হয়েছিলো যে কোনো-কিছু বাজাবার চর্চা করার মানে কোনো মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাসম্মানের অভাব নয়, বরং 'ধ্রুপদী সংগীতে'র শিক্ষাটা আসলে কোনো নিকটআত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথার সঙ্গেই তুলনীয়।)···'তখন সে লোকজনদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতো তার সব ব্যামো, সে একা-একা প'ড়ে থাকতো তার দত্যিদানো রাক্ষসগুলোকে নিয়ে—তার আহত প্রেমে, দুর্মর আশা আর অবিরাম দুঃখকে নিয়ে।' এখন সে যদি ব'সে থাকে এখানে, একটা চৌকির ওপর, জীর্ণ বুটিদার পর্দাটার পাশে, এমন-একটা টিকিটঘরে যেটা কোনো দেরাজের খোপের চেয়েও বড়ো নয়, সে শুধু তার এই উৎকাঙ্ক্ষাতেই যে সে জানতে চায় তার দারিদ্র্যের কাছে দুয়ারবন্ধ সব মহান ব্যাপারগুলোকে, তাকেই সে প্রশংসা ও উপভোগ করতে চায় অন্যরা যা এত যুগ ধ'রে সাজিয়ে রেখেছে। মুখের কাছের এই নরম পিঠটার সামনে এই চেতনাই তাকে তার অহমিকা ফিরিয়ে দিলো : বুড়ো আঙুলের ডগার চাপে তার কাঁধের তলায় ডেবে গিয়েছে মাংস, পশুলোমের স্কার্ফটা নেমে এসেছে তার হাতের সহজ

নাগালে, আর মেয়েটি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে তার জানলার শক্ত গরাদগুলোর গায়ে। '"যে-শিখরস্পর্শী সাহস আমাকে বসন্তের দিনগুলোয় বারে-বারে, প্রেরণায় ভ'রে দিতো, সে এখন উধাও," তিনি লিখেছিলেন তাঁর জবানবন্দিতে, "এ যেন কবরের হিম আর না-হওয়ার গন্ধ।" হাইলিগেন স্টাটের নিঃঝুম বাড়িটায় সেইসব রৌদ্রহীন দিনগুলোয় বেটোফেন চেঁচিয়ে তাড়াচ্ছিলো মৃত্যুকে…।' হিরে-জহরত আর ইস্ত্রি-করা কাপড়ে ঝলমল ক'রে-ওঠা ঐ ওদের দিকে আর দৃক্‌পাত না-ক'রে সে ফিরে এলো তার বইয়ের কাছে। মায়েস্ত্রো [ওস্তাদ] বড্ড প্রলম্বিত করছেন বিরতিকে. মঞ্চের পেছন থেকে আওয়াজ আসছে শিঙার, জোরালো ফুর্তিবাজ আওয়াজ তুলছে তিনটে শিঙা, পরখ ক'রে দেখছেন তিনি শিকারের সোনাটাগুলো। আর এই উপপ্রকোষ্ঠে. মেয়েরা যাতায়াত করছে আয়না থেকে থামের পাশে, সিঁড়ির কাছে ভাস্করেরা বীণা আর তম্বুরা বাদকদের যে-মূর্তি গড়েছিলো, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কেউ-কেউ। 'গরাদের ওপাশে যেন একটা বাঁদর।' কিন্তু, তৎসত্ত্বেও *সে তো জানে কেমন ক'রে বধির জন একদিন এই মর্তধামের এক প্রতাপাদিত্যের বুক ভেঙে দিয়ে তার মুখের ওপরই চেঁচিয়ে ব'লে উঠেছিলেন : 'রাজকুমার, আপনি যা হয়েছেন সে শুধু জন্মায়ত্ত সুযোগে, কিন্তু, আমি যা হয়েছি সে শুধু হয়েছি আমার নিজের পুরুষকারেই।'* সে যদি রাতের বেলার এই কাজটা নিয়ে থাকে, সে শুধু তারই কাছে আসবার জন্যে হিরে-জহরতে মোড়া দামি পোশাকে সাজা এই এরা কখনো যার ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে না, মার্বেলের কাউন্টারে এই যাদের ব্যস্ত হাতগুলি একবারও এমনকী তার মুখের দিকেও তাকিয়ে দ্যাখে না। পশুলোমের স্কার্ফটা আবার তুলে নিয়ে মেয়েটি জানলা থেকে স'রে গেলো। কনসার্ট হলের মধ্যে আলো নিভে আসছে আর সবাই হুড়োহুড়ি ক'রে ভেতরে গিয়ে ঢুকছে ব'লে আলাপচারীদের শেষ কথাগুলো কেমন রিনরিনে হ'য়ে উঠেছে এখন। যন্ত্রীরা ফিরে এসেছে মঞ্চে. বাদ্যযন্ত্রগুলো তারা চেয়ারে রেখে গিয়েছিলো, যে যার যন্ত্র তারা হাতে তুলে নিচ্ছে এখন ; ট্রম্বোনগুলো আবার উত্তোলিত ; বাসুনরা বসেছে গুছিয়ে. এক তীক্ষ্ণ কম্পমান ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে সুর ; ওবোবাদকেরা প্রায় খাদ্যরসিকের ভঙ্গিতে পরীক্ষা ক'রে দেখছে বেণুবাঁশ, রাখালিয়া বিশ্রামের ওপর যাদের সুর রেশ রেখে গেলো। একটা ছাড়া সব দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে, যতক্ষণ-না নির্দেশক তাঁর নির্দেশদণ্ড তুলে নেন, ততক্ষণ যাতে পা টিপে-টিপে ভেতরে ঢুকতে পারে লেটলতিফরা। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়িটার পাশ দিয়ে সাইরেন বাজিয়ে গেলো এক অ্যাম্বুলেন্স, দ্রুত ঢুকে পড়লো পাশের গলিতে, তারপরেই ব্রেক কষার

একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ। 'একটা টিকিট,' হাঁফাতে-হাঁফাতে বললে একজন, 'যে-কোনো জায়গায়,' অধীর স্বরে সে যোগ করলে, জানলার শিকের মধ্য দিয়ে যখন তার আঙুল গলিয়ে দিলে একটা ব্যাঙ্কনোট। টিকিটগুলো তুলে রেখেছে ব'লে দেরাজ খোলার চাবিটা খোঁজায় একটু যা দেরি—কিন্তু লোকটা তার ফেরৎ পয়সা না-নিয়েই প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। কিন্তু এখন আরো দুজন লোক ঢুকে পড়েছে, আর তারা এমনকী টিকিটঘরের জানলার কাছেও আসেনি। শেষ দরজাটা যখন বন্ধ হচ্ছে, তখন তারা হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো ভেতরে, অর্কেস্ট্রার কাছে যারা আসন নিচ্ছিলো তাদের মধ্যে তারা হারিয়ে গেলো। 'আরে, শুনুন,' টিকিটঘরের লোকটা চেঁচিয়ে বললে। কিন্তু হাততালির আওয়াজের মধ্যে তার গলার স্বর ডুবে গেলো। তার সামনে প'ড়ে আছে আনকোরা ব্যাঙ্কনোটটা, অধীর লেটলতিফ যা ছুঁড়ে দিয়েছিলো। কোনো খ্যাপাটে গীতরসিক হবে হয়তো, যদিও লোকটাকে কিন্তু মোটেই কোনো বিদেশীর মতো দেখায়নি, অথচ সবচেয়ে দামি আসনেরও পাঁচগুণ বেশি টাকা দিয়েছে—তাও একটা সিম্ফনির শুধু শেষটুকু শুনবে ব'লে। এদিকে তার পোশাক-আশাক সব কুঁচকোনো, আপন-ভোলা ভাবুক লোকদের মতো, কোনো বুদ্ধিজীবীই হবে বোধহয়, নয়তো কোনো সংগীত-রচয়িতাই। কিন্তু অকস্মাৎ অরণ্যের গভীর থেকে তাঁর সব আকৃতির সাড়া এলো যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষটির কাছে—তাঁকে ঘিরে আছে বনানী, যেখানে অক্টোবরের বৃষ্টির তলায় এখনও অজ্ঞাত পান্তোরালে [রাখালিয়া] ঘুমিয়ে আছে—কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তাঁর সওয়ালের জবাব দিলে এরোইকার তূর্যনাদ। ব্যাঙ্কনোটটা মুচমুচে, আঁটসাঁট, উষ্ণ, চোষকাগজের মতো নুনোট তার—মনে হ'লো এখন সেটা তার দপদপ-করা মুঠোর মধ্যে ফেঁপে উঠছে। একটা সেতু যেন ঠেলে সরিয়ে দিলে তার সামনের গরাদ, আর দেয়াল বেয়ে উঠে গেলো—এগিয়ে গেলো সেই মেয়েটির কাছে যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে—আশ্চর্য, অপেক্ষা ছাড়া মেয়েটি সম্বন্ধে আর-কিছুই সে ভাবতে পারে না—সে ব'সে আছে টেবিলে, রেকাবিতে সাজানো তার খাবার, ঘরের অর্ধেক আলোয়, সেই একই রকম অলস ভঙ্গিতে, যে-ভঙ্গিতে এত তাকে মানায়, যা এত তার নিজের মতো, অলস হাতে সে পাখা নাড়ছে আর পাখার ফুটো-ফুটো ঢাল থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে চন্দনের সুবাস, কপাল থেকে স্তন পর্যন্ত, দু-পাশ থেকে গ্রীবা পর্যন্ত, তারপর আবার সে পাখাটা নামিয়ে রাখছে কোলের ওপর। বিরতির সময় সেই-যে মেয়েটা—যার ঘামেভেজা নরম চামড়ার ওপর লেপটানো ছিলো কালো পশুলোমের স্কার্ফ, যে একটু ঠাণ্ডা হবে ব'লে তার সব

চেঁচিয়ে-তোলা ভঙ্গি সমেত ধাতুর গরাদের ওপর নগ্ন কাঁধটা ঠেকিয়েছিলো—সে তাকে কেমন যেন দুর্বল ক'রে ফেলেছে। কিন্তু ঐ শশব্যস্ত শ্রোতা হয়তো ফিরে এসে ভাঙানি চাইবে, যেমন বড়োলোকি চালে সে মার্বেলের কাউন্টারে ব্যাঙ্কনোটটা ছুঁড়ে ফেলেছিলো, তাতে তাকে বিশ্বাস নেই : তার সামনে প'ড়ে-থাকা পাতা-খোলা 'জীবনচরিত'টাই তাকে শিখিয়েছে কেমন ক'রে অবিশ্বাস করতে হয় রাজকুমারদের আর বড়োলোকদের সব জমকালো চালকে। উদ্বিগ্ন অপেক্ষার পর, দীর্ঘ প্রস্তুতির পর উল্লসিত হবারই কথা ছিলো তার, অথচ তার ঠিক উলটোটাই হ'লো—কারু-কাজ করা যে-ভারি পর্দাটা কনসার্ট হল থেকে তাকে আলাদা ক'রে রেখেছিলো সেটাকে সে কেমন হালছাড়া ভঙ্গিতে টেনে তুললো, ভেতরে ঠিক কোনো হামলার আগের মুহূর্তের মতো স্তব্ধতা, যন্ত্রীরা ব'সে আসে নিশ্চল, উদ্যত। *Sinfonia 'Eroica' composta per festeggiare il souvvenire di un Grand 'uomo.* [কোনো মহান মানবের স্মৃতি উদ্‌যাপনের জন্য রচিত 'এরোইকা' সিম্ফনি।] তীক্ষ্ণ দুটি ছড় টানার শব্দ শোনা গেলো, আর চেলো ফেটে পড়লো কম্পমান আর থর্থর কেঁপে তূর্যনাদ। বই বলেছে, 'এই সূচনার স্বরলিপির তিনটি ভিন্ন-ভিন্ন রূপ সংগ্রহ করেছিলেন নোট্‌টেবোন।' কিন্তু ঝপ ক'রে বন্ধ করা হয়েছে বই। পাঠক নিশ্বেসে টেনে নিয়েছে মাটির গন্ধ, পাতার গন্ধ, পরিত্যক্ত উপপ্রকোষ্ঠে ভেসে-আসা মানুষের শরীরী গন্ধ ; বৃষ্টির পর তার মনে প'ড়ে গিয়েছিলো তার গ্রামের বাড়ি-গুলোর পেছন-উঠোন যেখানে কাপড কাচার বড়ো-বড়ো ডেকচিতে ফুলে উঠতো জল, আর নোংরা জলে থপথপ ক'রে চলতে-চলতে খুশিতে প্যাঁক-প্যাঁক ক'রে উঠতো হাঁস। আর তার মনে প'ডে গেছে সেই গন্ধ, বসন্তের হঠাৎবৃষ্টির পর জঞ্জালের স্তূপ জমিয়ে-রাখা আটচালাটা থেকে যে-গন্ধ উঠতো ; যেখানে একটা পরিত্যক্ত হাঁস-মুর্গি তা দেবার যন্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে একটা ইট-খ'শে-পড়া দেয়ালের ফোকর দিয়ে সে কতবার তাকিয়ে দেখেছে স্নানরতা সেই বিধবাটিকে, স্বামী মারা যাবার পর কেমন একটা শোকের আবেশ লেপটে ছিলো যার শরীরে, কোনোদিন যাকে সে আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি, যা তার শরীরটায় কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ছাপ ফেলে দিয়েছিলো—অথচ সাবানের ফেনার আড়ালে উদরের ওপর কী মসৃণ-চিক্কণ লাবণ্য ছিলো তার তখনো, আস্তে-আস্তে ফেনা তার দু-পাশ দিয়ে পিছলে নেমে আসতো পায়ের ওপর, হাঁটুর তলা থেকে যে-পা দুটি আচমকা হ'য়ে উঠতো কোনো বর্ষীয়সী রমণীর মতো। ঐ আঁটো স্তন দুটি, খিলেনের মতো বাঁকা পিঠের দাঁড়া—এদের গোপন কথা সে জেনেছিলো—এরা যেন এখনো পুরুষের বাহুর

মাপে-মাপে গড়া—অথচ এরা প'ড়ে আছে এক অম্লকষায় ঝগড়াটে স্বরের মধ্যে, পাড়া-পড়শির ছেলেমেয়েদের শিক্ষাসহবৎ শিখিয়ে-শিখিয়ে ক্লান্ত যে-স্বর, আর হেঁটে-হেঁটে শুকিয়ে-যাওয়া ক্লান্ত দুটি পায়ের গুল। খুব বেশি দিন হবে না, এই রমণী তাকে শিখিয়েছিলো গলা সাধতে—আর এখন সেই স্মৃতি ফিরে এলো তার কাছে; কালো রঙে ছোপানো তার সব পোশাক-আশাক কোন্-সে রহস্য ঢেকে রেখেছিলো, বাজনার সুরে তাল দিতে-দিতে তা তার মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠলো; এ ছাড়া ছিলো বৃষ্টিভেজা রাতের উশকানির যোগসাজস—আর এ দুয়ে মিলে শেষ অব্দি জয় ক'রে নিলো তার সব দ্বিধাসংকোচ। তার চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা নিয়ে এই সিম্ফনি শুনতে এসেছে, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না এখানে; সপ্তাহের পর সপ্তাহ খুঁটিয়ে পড়েছে সে এটা, হাতে স্বরলিপি, শুনেছে বহুব্যবহৃত সব রেকর্ড—পুরোনো, কিন্তু তবু ভালোই বাজে। আজকের এই নির্দেশক সম্প্রতি নাম কিনেছেন—কিন্তু এমনকী তিনিও রেকর্ডের বিখ্যাত মায়েস্ত্রোর চেয়ে ভালো নির্দেশ দিতে পারবেন না—যিনি, ছাত্রাবস্থায়, সমতান গায়কদের এক মহিলাকে চিনতেন, আশিরও ওপর ছিলো তাঁর বয়েস, নবম সিম্ফনিটির প্রথম অনুষ্ঠানের সময় যিনি গলা দিয়েছিলেন। কনসার্টে কী বাজানো হচ্ছে তা না-শোনার বিলাস সে তাই করতে পারে—বেটোফেনের পরম প্রতিভার স্মৃতির প্রতি আদৌ অবিশ্বস্ত না-হ'য়েও। 'ই নোট,' সে বললে, যখন বাঁশি আর প্রথম বেহালাগুলোর হালকা সুর স্বরগুলোকে ফুটিয়ে তুললো; আর সে ছুটে নেমে গেলো সিঁড়ি বেয়ে, রাস্তার বাতির ভারি লোহার থাম থেকে টপটপ-ক'রে-ঝরা বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে, তার গায়ের ভিজে পোশাকের পশমিনা ভারি গন্ধও তার মনে হ'লো স্বাদু, সুখাবেশে ভরা অন্তরঙ্গ, যখন তার মুঠোর এই হঠাৎ-পাওয়া ব্যাঙ্কনোট একটা আস্ত রাতের জন্যে তাকে সেই বাড়ির প্রভু ক'রে তুলবে যেখানে থাকবে না কোনো ঘড়ির তাড়া, যেখানে যে-ই কড়া নাড়ুক না কেন দরজায় লাগানো থাকবে শক্ত আগল। আর তার পর এক সঙ্গে জেগে উঠবে দুজনে, ক্যানারির শিশ শুনে, রান্নাঘরে তারপর হবে শেষ রতিবিলাস; প্রাতরাশের সসপ্যানের তলায় শিখা জ্বালানো, চন্দন পাখার গন্ধে আতুর হাওয়া, আর ডাকবাক্সের ফোকর দিয়ে গলিয়ে ফেলে-যাওয়া টাটকা মুচমুচে রুটি, উলটো দিকের বাড়িটার গায়ে ঝলমল করছে রোদ, যেখানে রুটিওলার দোকানের ওপর সাইনবোর্ডে পালক-পরা এক ইণ্ডিয়ান মেয়ের ছবি, আর তারা দুজন উষ্ণ, সান্দ্র, সুখস্বাদে লীন।

(··· এই দপদপে ব্যথা তার কনুই ঢুকিয়ে দেয় আমার মধ্যে, যেন কোনো নালি ঘায়ের মধ্যে ; এই তোলপাড় জঠর ; এই হৃৎপিণ্ড যেটা 'আমার মধ্যে ঐ ওখানে ঝুলে আছে, ঠাণ্ডা ছুঁচের মতো ফুড়ে যায় আমাকে ; যে একটানা নিস্তেজ ধুকধুক শব্দ আমার মাঝখান থেকে উঠে আসে কপালের শিরায়, আমার দুই বাহুতে, আমার উরুতে, সবখানে ; হাঁফাতে থাকি আমি ; আমার মুখ, আমার নাক—এরা কেউই আর যথেষ্ট নয় ; ছোটো-ছোটো দমকায় ঢোকে হাওয়া, ভ'রে দেয় আমায়, দম আটকে দেয় আমার, তারপর ভলকে-ভলকে বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে শুকনো, তপ্ত, আর ভেঙে ফেলে রেখে যায় আমায়, ধ্বংসস্তূপ, শুষ্ক, শূন্য, রিক্ত ; আর তারপর হাড়গোড় থেকে আসে দাঁতকপাটি, অবিরাম কাঁপুনি ; আমাকে মুচড়ে, নুইয়ে, দুমড়ে বেশামাল ক'রে যায়—যেন নিজের কাছ থেকেই আমি ঝুলে পড়েছি, দুলছি, খাবি খাচ্ছি, যতক্ষণ-না ধুক-ধুকিটা এক তুহিন লাফ দিয়ে আমার পাঁজর ছিঁড়ে বুকের মধ্যে থেকে উঠে আসতে চায় ; এই শুকনো কান্নার দমকা বেগটায় রাশ টানতে হবে আমার ; সাবধানে শ্বাস নিতে হবে অনেকক্ষণ ধ'রে ; যতটুকু হাওয়া টেনে নিতে পারি কোনোমতে, তাতেই শামাল দিতে হবে ; শ্বাস নাও এবার, ছাড়ো শ্বাস, আরো আস্তে : এক, দুই, এক, দুই···ফিরে আসে দপদপ, আড়াআড়ি, ওপর থেকে নিচে, সব শিরার মধ্য দিয়ে, যা-কিছু আমাকে ধ'রে রেখেছে তুলকালাম হামলা চালায় তার ওপর ; মেঝেটাও দপদপ করে আমার সঙ্গে-সঙ্গে, পেছনটাও, চেয়ারের আসনটাও, প্রত্যেকটা নাড়ির গতির তালে-তালে নিস্তেজ ধাক্কা মারে অবিশ্রাম ; দপদপটা নিশ্চয়ই আস্ত সারিটা থেকেই টের পাওয়া যায় ; যে-স্ত্রীলোকটি ব'সে আছে আমার পাশে, এক্ষুনি সে চোখ তুলে তাকাবে ; শেয়ালের লোমের স্কার্ফটা আরো আঁটো ক'রে জড়াবে গায়ে ; ওপাশের লোকটা মুখ তুলে তাকাবে আমার দিকে ; ওরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে ; আবারও একবার বুকটাকে চেপে নিশ্চল ক'রে রাখি আমি ; এতক্ষণ ধ'রে মুখে-আটকে-রাখা এই মুখভরা হাওয়া আমায় ছেড়ে দিতে হবে যে ক'রেই হোক, যে-হাওয়া আমার গাল ফুলিয়ে রেখেছে। যখন তা তার ঘাড়ের পেছনে গিয়ে ছোঁয়, সামনের লোকটা ফিরে তাকায় ; আমার দিকেই তাকায় সে, আমার মাথার চুল থেকে টপটপ ক'রে ঘাম ঝরছে—সে দ্যাখে ; আমি তার নজরে প'ড়ে গিয়েছি, আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি ; সব্বাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে ; মঞ্চের ওপর একটা সংঘর্ষের ঝঙ্কার, অমনি সবাই তাদের

মনোযোগ ফিরিয়ে নেয় ঐ কোলাহলের দিকে। ঐ ঘাড়ের দিকে তাকিয়ো না ; ব্রণের দাগ আছে ঘাড়টায়, বিষফোঁড়ার ঘা ; এখানেই কি থাকতে হবে তাকে, ঠিক এখানে—পুরো কনসার্টটার মধ্যে শুধু একজন যার ঘাড়ে ঘা, এত কাছে নিয়ে আসছে সেই ঘা যা কখনো দেখা ঠিক নয় আমার, এ হয়তো চিহ্ন, লক্ষণ, প্রতীক, দৈবের ইঙ্গিত ; ওপরে তাকিয়ে, নিচে তাকিয়ে, যতক্ষণ-না মাথা ঘুরতে থাকে আমার, চোখ তাকে এড়াবার চেষ্টা করে : দাঁতে দাঁত লাগাও, মুঠো ক'রে রাখো হাত, পেটের ভেতরটাকে ঠাণ্ডা করো—শান্ত ক'রে আনো পেট—থামিয়ে দাও নাড়িভুঁড়ির এই বিষম ঠেলাঠেলি, এই তুমুল তোলপাড় ; বুকের এই হ্যাঁচকা টান যা আমার বুকটা ঘামে ভিজিয়ে দেয় ; একটা সজোর ঠেলা, তারপর আরেকটা ; একটা ধাক্কার আওয়াজ, তারপর আরেকটা ; ভেতরকার এই মোচড়ের হাত থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে আঁটো ক'রে রাখো নিজের ওপর, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এসো মূত্রাশয়ের এই কানায়-কানায় ভরা ঢেউ থেকে, যা ঘুলিয়ে উঠছে আমার মধ্যে, ঝাঁঝরা ক'রে দিতে চাচ্ছে আমায় ; যা আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে জ্বালিয়ে দিচ্ছে তা থেকে গুটিয়ে আঁটো ক'রে আনো নিজেকে। এখানে, এই নিশ্চলতায়, যে-সাজা দেয়া হয়েছে আমায়, সেখানে আমার মাথা যেন অন্য-সব মাথার সঙ্গে একসারেই থাকে, এক তলে ; আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরে, সর্বশক্তিমান পরম পিতায়—স্বর্গমর্তের সৃষ্টিকর্তা, আর হেসুস ক্রিস্তোকে—যিনি তাঁর একমাত্র পুত্র ; যাঁকে জন্ম দিয়েছিলেন দিব্য আত্মা, যিনি জন্মেছিলেন কুমারী মারিয়ার গর্ভে, পোন্তিয়ুস পিলাতের হাতে যিনি যন্ত্রণা পেয়েছিলেন নিরবচ্ছিন্ন, যিনি বিদ্ধ হয়েছিলেন ক্রুশে, মারা গিয়েছিলেন, মাটি চাপা পড়েছিলেন কবরে ; যিনি নেমেছিলেন নরকের তলায় ; তৃতীয় দিনে যিনি আবার উঠেছিলেন মৃতদের মধ্য থেকে…আর বেশিক্ষণ যুঝতে পারবো না আমি, জ্বর এসেছে আমার, শীত-শীত করছে, কাঁপুনি লাগছে ; আমি কব্জি চেপে ধরি আমার, দেখি নাড়িগুলো এমনভাবে দপদপ করছে যেন রান্নাঘরের মেঝেয় দাপাচ্ছে গলাকাটা মুর্গির ছানারা ; পায়ের ওপর পা তুলে দাও ; তাতে অবস্থাটা আরো শোচনীয় হ'য়ে ওঠে, আরো-সঙিন ; যেন আমার ওপর-উরু ঢুকে পড়েছে পেটের মধ্যে ; সব ধ্বসে যাচ্ছে, পাক খাচ্ছে, টগবগ ক'রে ফুটছে ফেনিল—আর ফেনা আমায় ছেয়ে ফেলছে, দু-পাশ দিয়ে ছুটে নামছে, পাছা থেকে পাছায় ছুটে যাচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে। সংগীতের ঝঙ্কার যখন মিলিয়ে যাবে সবাই শুনতে পাবে আমার পেটের মধ্যে কেমন মোচড়

দিচ্ছে নাড়িভুঁড়ি, আর ফিরে তাকাবে আমার দিকে ; আমি আস্থা রাখি সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বরে, স্বর্গমর্তের সৃষ্টিকর্তায়, আস্থা রাখি, আ স্থা রা খি। হঠাৎ কেমন সহজ হ'য়ে আসে সব, একটু আরাম। 'ভালো হ'য়ে উঠছি, ভালো হ'য়ে উঠছি, ভালো হয়ে উঠছি ;' ওরা বলে একই কথা অনবরত জপ করলে শরীরও তা বিশ্বাস ক'রে বসে···ভেতরে যা ফুটছিলো, সব কেমন শান্ত হ'য়ে আসে, ওঠে একবার দপ ক'রে, থেমে যায় কোথাও ; এ নিশ্চয়ই এভাবেই বসার ফলে ; এভাবেই ব'সে থাকো, খবরদার, নড়াচড়া কোরো না, একটুও না, ভাঁজ ক'রে রাখো দু-হাত ; স্ত্রীলোকটা কেমন অধীর ভঙ্গি ক'রে, পশুলোমের স্কার্ফটা রাখে আমাদের দুজনের মাঝখানে ; তার বটুয়াটা হাত ফসকে প'ড়ে যায় মেঝেয় , সবাই ফিরে তাকায় ; স্ত্রীলোকটি ঝুঁকে তা কুড়িয়ে নেয় না ; ওরা ভাবে আমিই বুঝি আওয়াজটার জন্যে দায়ী ; সামনের সারি থেকে লোকে ঘাড় ফিরিয়ে দ্যাখে আমাকে ; পেছনের সার থেকেও সবাই আমাকে লক্ষ করছে ; ওরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে কেমন সবুজ দেখাচ্ছে আমায়—আর আমার গর্তে ঢোকা গাল ; গত কয়েক ঘণ্টায় আমার দাড়ি গজিয়ে উঠেছে, খোঁচা-খোঁচা ; আমার হাতের তালুতে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি আঁচড় দেয় ; আমাকে নিশ্চয়ই অদ্ভুত ঠেকছে ওদের, আমার পেছনটা ঘামে জবজবে, আবারও চুলের গোড়া থেকে ঘাম ঝরছে টপটপ, গাল বেয়ে ঝরছে, নাকের ডগার ওপর একটা ফোঁটা। তাছাড়া আমার এই পোশাকটাও এমন জাঁকজমকের সঙ্গে ভীষণ বেমানান। 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে,' ওরা আমায় বলবে, 'তুমি অসুস্থ, বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছো ;' মঞ্চে আবার এক তুমুল সংঘর্ষের টঙ্কার, সবাই আবার তার দিকে ফিরে তাকায়। ···চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে আমায়, শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ ; আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যাতে একটুও না-নড়ি ; কারু মনোযোগ কাড়া চলবে না, ভগবানের দোহাই, কারু দৃষ্টি আকর্ষণ করিস না ; লোকে ঘিরে আছে আমায় চারপাশে, শরীর দিয়ে সুরক্ষিত, শরীরের আড়ালে লুকোনো, অন্য-অনেক শরীরের মধ্যে মিশে-যাওয়া আমার এই শরীর ; এই শরীরগুলোর মধ্যেই থাকতে হবে আমায় ; তার পরে এদেরই সঙ্গে বেরিয়ে যেতে হবে আস্তে-আস্তে, যে-দরজা দিয়ে বেশির ভাগ লোক বেরুবে, সেই দরজা দিয়ে, অনুষ্ঠানসূচিটা দিয়ে মুখ আড়াল ক'রে, যেন কোনো চোখ-খারাপ লোক খুব কাছে নিয়ে পড়ছে ; সবচেয়ে ভালো হবে যেখানে অনেক মেয়ে থাকবে, মহিলাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, ঘেরাও, চারপাশ থেকে ছাওয়া···ওহ্, ঐ বাজনাগুলো, এখন যখন একটু ভালো

জগঝম্প—প্রত্যেকে যেন আমার বুকে মধ্যেটায় গিয়ে ঘা মারছে, তাদের কালো গভীরতা থেকে এমন সজোরে এসে আছড়ে পড়ছে তাদের আওয়াজ ; ঐ বেহালাগুলো—ওদের ছড়গুলো যেন করাতের মতো চলছে—আমার স্নায়ুগুলোকে ছিঁড়ে-চিরে, আমার স্নায়ুগুলোকে আঁৎকে কাঁপিয়ে ; আর বেড়েই চলে এই আওয়াজ, বেড়েই চলে, আমাকে কেবল কষ্ট দেয়, অবিরাম ; দুটো হাতুড়ির বাড়ি ; আরেকটা যদি পড়ে তো আমি চীৎকার ক'রে উঠবো ; কিন্তু এখন সব শেষ হ'য়ে গেছে ; এখন হাততালি দেবার সময়···সবাই ফিরে তাকায় আমার দিকে, লক্ষ করে আমায়, হিশহিশ করে, তর্জনী ওঠানো ঠোঁটের ডগায় ; শুধু আমিই হাততালি দিয়েছি, শুধু একা আমি ; চারপাশ থেকে ওরা আমায় খেয়াল করছে ; অলিন্দ থেকে, বক্স থেকে, সারা হলটার সব চোখ যেন আমার ওপর এসে পড়েছে। 'আকাট !' পশুলোমের স্কার্ফ-পরা স্ত্রীলোকটির বলে, 'নিরেট,' তার ওপাশের লোককে ; তারা সবাই ফিরে-ফিরে বলে, বারে-বারে : 'হাঁদা ! আকাট ! নিরেট !' সব্বাই আমার কথা বলছে, সব্বাই আমাকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে ; স্পষ্ট যেন টের পাই আঙুলগুলো খোঁচাচ্ছে আমায়, ঘাড়ে, পিঠে ; আমি তো জানতুম না যে হাততালি দেয়া বারণ ; ওরা এবার আসনপ্রদর্শককে ডেকে আনবে আর বলবে : 'একে এখান থেকে বার ক'রে নিয়ে যাও ; ও অসুস্থ, গায়ে গন্ধ, দ্যাখো, কেমন ঘামছে ও···' অর্কেস্ট্রা আবার আবার শুরু ক'রে দেয় বাজাতে ; কেমন আর্ত, গম্ভীর, আচ্ছন্ন সুর, কিন্তু লয়টা মন্থর। আর আমার কেমন অদ্ভুত, বিস্ময়কর, ব্যাখ্যাতীত এক রোমাঞ্চ হয় এটা বুঝে যে আমি জানি এরা কী বাজাচ্ছে। কেমন ক'রে জেনেছি এ-সুর, জানি না ; আমি কোনোদিনই এমন-কোনো অর্কেস্ট্রা শুনিনি, এও বুঝি না। এমনি ক'রে কায়-মন দিয়ে কেউ শোনে, এ কেমন সংগীত—ঠিক ঐ লোকটার মতো, চোখ দুটি বোজা, হুবহু অন্ধদের মতো—হাতে হাত চেপে ব'সে আছে—যেন কোনো তীর্থস্থানে এসেছে ; কিন্তু এই-যে সুর বাজাচ্ছে, সে তো আমি প্রায় গুনগুন ক'রে গাইতে পারি, তাল রাখতে পারি এ পা তুলে নামিয়ে তারপর ও পা, আস্তে, মন্থর লয়ে, যেন হাঁটছি আমি কোথাও ; আর সেই অংশটা যেখানে একটু কটু সুরের গান আস্তে-আস্তে জয়ী হ'য়ে ওঠে, আর তারপর বাঁশি, আর তারপর ঐ ভারি-ভারি ধুপধুপ শব্দ, যেন সবকিছু শেষ হ'য়ে গেলো আবার ফিরে শুরু হবে ব'লে। 'ঐ শবযাত্রার সুরটা কী সুন্দর,' পশুলোমের স্কার্ফওলা

আমি বুঝতে পারি না কেমন ক'রে কোনো শবযাত্রা আদৌ সুন্দর কিংবা উপভোগ্য হ'তে পারে ; হয়তো একটা শুনেছিলুম ওখানে, দরজির দোকানের কাছেই, যখন ওরা নেগ্রো বুড়োটিকে ঐ প্রাক্তন সৈন্যটিকে কবর দিয়েছিলো, আর বাজনদারেরা গিয়েছিলো গোলন্দাজ গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে, আর যে-সৈন্যটি ঢাক বাজাচ্ছিলো সে হাঁটছিলো পেছনমুখো। লোকে এত ভালো সাজপোশাক ক'রে, হিরে-জহরতে নিজেকে এভাবে সাজিয়ে শবযাত্রার গান শুনতে আসে ?... কিন্তু এতক্ষণে আমার মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, ম নে প ড়ে ছে ! দিনের পর দিন আমি এই শবযাত্রার সুরটাই শুনেছি এটা না-জেনেই যে এটা শবযাত্রার সুর ; দিনের পর দিন এ-সুর আমার পাশে-পাশে ছিলো, আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ছিলো, ঘুমের মধ্যে তুলেছিলো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, ভ'রে দিয়েছিলো আমার সব জাগ্রত মুহূর্ত, খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলো আমার আতঙ্ক ; দিনের পর দিন আমার ওপরে এ পাক খেয়েছে, কোনো অলুক্ষুণে ছায়ার মতো, যে-হাওয়ায় শ্বাস টেনেছি তাতে ঘূর্ণি তুলেছে, চেপে ধরেছে আমার শরীর, যখন আমি দেয়ালের পাশে প'ড়ে গিয়েছিলুম—যতটুকু জল খেয়েছিলুম সব বমি ক'রে দিচ্ছিলুম। এ তো কোনো দৈবাৎ-ঘটা কাকতাল নয় ; এ ছিলো পাশের বাড়িতেই, কারণ ঈশ্বর চেয়েছিলেন শেষকালে যেন এমনি হয় ; কোনো মানবিক হাত একে এখানে বসায়নি, এই শবযাত্রার সংগীতকে, ঢাকের এই চাপা শব্দ, ওড়নায় মুখ ঢাকা মূর্তিগুলো, এ ঈশ্বরই, "পরের দিনের," ঠিক যেমন জ'লে ওঠবার আগেও কাঠের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আগুন ; ঈশ্বর—যিনি ক্ষমাহীন, যিনি আমার কোনো প্রার্থনাতেই কর্ণপাত করেননি, যিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন আমার দিক থেকে যখন আমার ঠোঁট উচ্চারণ করেছে সেই শব্দগুলো কালাত্রাভাব ক্রুশের ছবিওলা বই থেকে যা আমি শিখেছিলুম ; ঈশ্বরই—যিনি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছেন আমায়, আর খোয়া-ওঠা রাস্তায় পাথরকুচির মধ্যে একটা ঘেউ-ঘেউ করা কুকুরকে লেলিয়ে দিয়েছেন আমার পেছনে ; ঈশ্বরই—যিনি বসিয়ে দিয়েছেন আমার মুখের এত কাছে, ঐ বিষফোঁড়ার ঘায়ে ভরা ঘাড়টাকে ; যে-ঘাড় আর-কারু কখনও দেখার কথা নয়। আর এখন তিনি হাওয়া থেকে তুড়ি মেরে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই বাজনাগুলো যা আমাকে তিনি বাধ্য করছেন শুনতে, এখন, এই রাতে, যা তাঁর রোষের বজ্রবিদ্যুৎ দিয়ে পরিচালিত। আমি ব'সে থাকি গানের মধ্যে মূর্তিমন্ত সদাপ্রভুর সামনে, যেমন একদিন তিনি

প্রতিভাস দেখি আমি, জলজলে, চোখধাঁধানো, সেই গনগনে অঙ্গারে বুড়িটা যেটা মুখের সামনে তুলে ধরেছিলো। এখন আমি জানি যে কোনো পাপীই এত খুঁটিয়ে পরিলক্ষিত হয়নি আগে কখনো, এমন নিখুঁতভাবে স্থাপিত হয়নি ঐশী বিচারের তুলাদণ্ডে, যেমন হয়েছি আমি, যে-আমি একটা বিশাল ফাঁদে প'ড়ে ছটফট করছে, আটকা পড়েছে কোনো মুক্তিবিহীন বেড়াজালে, প্রখর দুঃসহ ঐশী ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত, যেখানে কথাহীন কোনো ভাষা ঠিক এক্ষুনি আমার সামনে এই পাপীর সামনে প্রকাশ ক'রে দিলো এই শেষ দিন ক-টার প্রায়শ্চিত্তে ভরা তাৎপর্য। এই প্রেক্ষাগৃহে ভূমিকাগুলো আগে থেকেই চাপানো ছিলো সবার ওপর, আর পরবর্তীকালে সমাধানটা কী হবে তাও ঠিক ক'রে রাখা আছে আগে থেকেই—HOC ERAT IN VOTIS—[যা আমরা চেয়েছিলাম, তা তো এইই]—ঠিক যেমন আগুন না-ধরা কাঠের মধ্যে সুপ্ত থাকে ছাইভস্ম। …তাকিয়ো না ঐ ঘাড়ের দিকে ; তাকিয়ো না : চোখ বরং লেপটে রাখো মেঝের কোনো দাগের ওপর, ফরাশের ওপরকার কোনো ছবির ওপর ; মাথার ওপরকার ঐ তম্বুরার ওপর যেটা প্রসেনিয়াম ভূষণের একটা অঙ্গ হিশেবে বসানো ; স্বর্গস্থ পিতা, স্বর্গের স্রষ্টা, দয়া করো আমাকে, ক্ষমা করো ; মিথ্যেই তোমাকে স্মরণ করেছি, এ-কথা ভাবার দশা যেন না-হয় আমার ; তুমি তো জানো আমার আর্তি কেমন ক'রে গিয়েছে তোমার কাছে ; তোমার ক্ষমায় আমার আস্থা আছে, তোমার অসীম দয়ায় এখনও আমার অগাধ আস্থা ; তোমার কাছ থেকে বড্ড দূরে স'রে গিয়েছিলুম আমি, কিন্তু আমি তো জানি যে কখনো এমনকী মুহূর্তের অনুতাপই—তোমার নামটা বলতে যে-মুহূর্ত লাগে, ততটুকু সময়ই—যথেষ্ট, তোমার প্রসারিত দাক্ষিণ্যের স্পর্শ পেতে, তুমি তো ঝড়ের উপশম, বাহিনীর বিশৃঙ্খলার প্রশমন…শবযাত্রা আচমকা থেমে গিয়েছে, যেন কেউ কোনো প্রার্থনা শুনে, কোনো মিনতি শুনে, কোনো অনুনয় শুনে উত্তর দিয়েছে একটা সহজ সরল ছোট্ট 'আচ্ছা'য়, বাকি সব কথাকেই অনাবশ্যক ক'রে তুলে। আর তা-ই তো হ'লো এখন যখন আমি বললুম আমি তোমার দয়ায় আস্থা রাখি। স্তব্ধতা। উপশমের মুহূর্ত, প্রশমন। স্তব্ধতা—যাকে নির্দেশক প্রলম্বিত ক'রে তোলে, তার মাথা নোয়ানো, দু-বাহু ঝুলে আছে, যাতে, যা ঘ'টে গেলো তা যেন স্থায়ী হ'য়ে থাকে। আমার শিরাগুলো আর তেমন দপদপ করছে না, নিশ্বেসের কষ্টটাও আর নেই। এবার আর হাততালি দেবার

শেয়ালের লোমের স্কার্ফ-পরা স্ত্রীলোকটি বলে তার অনুষ্ঠানসূচির দিকে এক-বারও না তাকিয়েই। এমন-একটা কথা আমি যেটা ঠিক শুনতে পাইনি। এবার আমি জানি সার-বাঁধা এই লোকেরা কেন তাদের অনুষ্ঠানসূচির দিকে তাকায় না ; আমি জানি কেন তারা বিভিন্ন অংশের মধ্যে হাততালি দেয় না ; বাজানোর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো পারম্পর্য আছে, কীসের পর কী হবে সব ঠিক করা আছে, ঠিক যেমন কোনো মাস্‌-এ সুসমাচার আসে আত্মজ্ঞাপনের আগে, আর আত্মজ্ঞাপন আসে নৈবেদ্যগীতের আগে ; এখন নিশ্চয়ই নাচের মতো কিছু-একটা হবে ; তারপর এক ফুর্তিবাজ চপল লাফানে সুর, যার সমাপ্তি হবে দীর্ঘ তূরীভেরীর নাদে, ঠিক যেমন সেই ক্যাথিড্রালের অর্গানের দেবদূতেরা তূরী উঠিয়েছিলো তাদের মুখে, যখন প্রথম আধ্যাত্মিক আলাপন সভায় আমি গিয়েছিলুম আমার ছেলেবেলায় ; এ হয়তো নেবে পনেরো মিনিট, কিংবা হয়তো কুড়ি ; তারপর তারা সবাই হাততালি দেবে আর আলো জ্ব'লে উঠবে। সব আলো।)

...

বাড়িটা এখনো উষ্ণ হ'য়ে আছে কোনো সাম্প্রতিক উপস্থিতিতে, যার রেশ আছে বিছানার বিশৃঙ্খলায়, যার চারপাশে ছড়িয়ে আছে হাতে-পাকানো হলদে সিগারেটের পোড়া টুকরোগুলো। 'দাঁড়াও এক মিনিট,' বললে সে, বিছানার চাদরটা বদলে আর ডেবে-যাওয়া বালিশটাকে চাপড়ে-চাপড়ে সমান ক'রে দিয়ে। (ক্যানারিরা ঘুমিয়ে আছে তাদের খাঁচায় ; পালকের গন্ধ, রুটির গুঁড়োর গন্ধ, পাখিদের ভুক্তাবশেষ। কুকুরটা, তাকে শেখানো হয়েছে ঘেউ-ঘেউ ক'রে না-ডাকতে, সে অলসভাবে তুললো তার ঘুমে-ভরা মাথাটা। দেয়ালের গায়ে স্যাঁৎসেঁতে দাগটা, যেটাকে দেখায় কোনো ঝাপসা হ'য়ে-যাওয়া মানচিত্রের মতো। গাঢ়-লাল কড়িগুলো মাথার ওপর, দেশগাঁয়ের বৈঠকখানার নকল মেহগিনিরই আরেক নকল। উঠোনে বৃষ্টির জল ধরার জন্যে বালতিটা পেতে রাখা, কাল যে-জলে ও চুল ধোবে। আর গোলাপি, কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধওলা সাবান।) প্রতিবারই সে নতুন সুখে মুখোমুখি হয় এই সুবাসটার, কারণ সুবাসটাকে সে প্রতিবারই ভুলে যায়, আরো কারণ তার গন্ধের অনুভূতি আপনাআপনি অনুষঙ্গে এনে দেয় অপেক্ষারতা নগ্নতাকে। 'অভ্যাসের সাড়া,' নিজেকে সে বললে, সব বারের মতোই, এই দেখে

যে, যক্ষুনি সে দরজার কড়া নাড়ে, তখন থেকে তার চিন্তা, রোমাঞ্চ, ক্রিয়াকলাপ সব কেমন অনড় ও অপরিবর্তনীয় ক্রম ধ'রে চলে, যেমন সব ঘটেছিলো আগের বারে, যেমন সব ঘটবে পরের বারে। 'আজ' এই কথাটার পুনরাবৃত্তি হয় কোনো তারিখবিহীন কামনায়—গতকালকের 'আজ' হ'তে পারে এটা, অথবা আগামী কালেরও—যে ফিরে-ফিরে জন্মায় হুবহু একই কথায়, খাবার ঘরের থালাবাসন দেখে, অথবা ঘুমন্ত বেড়ালটাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ঝুড়িটায়, গলায় ছোট্ট ঘুন্টি বাঁধা, সবসময় এই একইভাবে শুরু হয় আলাপ : সম্প্রতি সে আসতে পারেনি তার কারণ লেখাপড়া নিয়ে তাকে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো ; মেয়েটি কখনো বেরোয়নি বাইরে, অথবা কারু প্রেমেও পড়েনি ; পাড়ার একটা দোকানে সে বাতি দেখেছে একটা ; ছেলেটি কথা দেয় পরের বার যখন আসবে মেয়েটির জন্যে নিয়ে আসবে সেটা (বাতি না-হ'য়ে সে হ'তে পারে কোনো মার্জিপানের বাক্স কিংবা কারুকাজ-করা কোনো ছোট্ট গদি)। মেয়েটি হেসে উঠবে খিলখিল, মোটেই বিশ্বাস করবে না তার প্রতিশ্রুতি, আর কয়েক মিনিট ব'সে থাকবে তার কোলে ; কথাবার্তা সব ফুরিয়ে যাবে, যতক্ষণ-না সে উঠে গিয়ে খাটের পাশের টেবিলটার বাতিটা জ্বালবে, তার আগে অবশ্য একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবে কুমারী দেবীর প্রতিমা। কিন্তু এবারে কিছু-একটা ঘটেছে : 'তুমি আমাকে আরেকটু হ'লেই আর এখানে পেতে না। কয়েক দিন আগে ওরা ভয় দেখাতে এসেছিলো, শাসিয়েছিলো যে পাড়া থেকে নাকি তাড়িয়ে দেবে আমায়, বলেছিলো আমাকে সোজা জেনানা ফাটকে নিয়ে পুরবে। আমাকে, যে কি না কারু সাতে-পাঁচে নেই, ভদ্রভাবে থাকে !' ছেলেটি তার উৎসুক আঙুলগুলো বোলালো তার গায়ে, তার নিতম্বের উষ্ণতাকে আদর করে। মেয়েটির কানে মুখ রেখে সে বললে : 'আমি এখানে রাত কাটাবো আজ,' যাতে সে উঠে গিয়ে বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে দেয়। কিন্তু ভারি অদ্ভুত লাগছে তাকে আজ, কেমন অদ্ভুতরকম কামনাহীন, উদাস, বিমনা, নিজের ভাবনাতেই বিভোর। 'আমি বাপু কোনো জেনানাফাটকে যাচ্ছি না, আমি এই পাড়া ছাড়তে চাই না ; সব্বাই জানে এখানে যে আমি নিরীহ ভালোমানুষ।' ছেলেটির মনে হ'লো সে ব্যাপারটাকে বড্ড বিরক্তিকর গুরুত্ব দিতে চাচ্ছে। তাকে তার একটানা কথার ঘোর থেকে বার ক'রে আনার জন্য, যা ঘটেছে তার গুরুত্ব উড়িয়ে দেবার জন্যে, যারা তাকে ভয় দেখিয়েছে, তাদের উদ্দেশ ক'রে ছেলেটি অধীরভাবে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালে। 'এ তো একেবারে মধ্যযুগের ধর্মসভার আচার-বিচারের মতো ; ইনকুইজিশনই, তা-ই ওরা চালিয়ে

যাচ্ছে এখন।' সে বিষয়টাকে ঘিরে পাক খেতে লাগলো অবিশ্রাম; জেনানা ফাটক, বাড়ি থেকে উৎখাত, মধ্যযুগের অন্ধবিচার—যেন এ ছাড়া আর-কিছুই সে ভাবতে পারছে না। আর প্রত্যেক পুনরাবৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে আরো বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে তার ত্রাস, কোনো নরক-ভ্রমণের বিভীষিকার ক্রমভীষণ স্তরপরম্পরার মতো। পৃথিবীতে যেন তাকেই একমাত্র ভয় দেখানো হয়েছে, যেন সে-ই একমাত্র অকারণ নির্যাতনের শিকার, যেন সে-ই কোনো অস্পষ্ট অধিকারের শহিদ, আর তার কষ্টের অতিকরণের মধ্যে যে-অপমান যে-লাঞ্ছনা তাকে সইতে হয়েছে তার জন্যে যেন আত্মকরুণার শপাং পড়ছিলো অবিরাম। 'এখন এরা জানতে চায় কাকে আমি জীবনসঙ্গী করার কথা ভাবছি. তাও।' অভিব্যক্তির এই অদ্ভুত প্রকাশ হঠাৎ তাকে মনে করিয়ে দিলে পিনার দেল রিয়োতে তার পাহাড়ঘেরা গ্রামের বাড়িঘর-গুলোর চাত আর দুয়ারগুলোর কথা। সেই যেখানে রক্তলাল আঠালো ড্র্যাগন-গাছ হাওয়ায় মড়মড় ক'রে উঠতো, সেই যেখানে কোনো সান্দ্র বেড়াজালে নিজেদের বুনে দিতো সতেজ মাংসল পাতা, দূষিত সংক্রামক কুসুম আর খোঁচাওলা কাঁটাভরা উদ্ভিদ আর ধ'রে থাকতো শিশিরের ফোঁটা, একদিন থেকে আরেক দিনে, সেখানে রাত্তিরে—দুরারোহ, ঘুলঘুলিওলা, রণপ্রাচীরের মধ্যে—দেখা যেতো বন্য নেকড়ের মতো কুক্কুরীদের প্রলম্বিত চোয়াল আর নাক, কয়েক শতাব্দী আগে পলাতক ক্রীতদাসদের পাকড়াবার জন্যে যে-কুকুরবাহিনী পোষা হ'তো এরা তাদেরই বংশধর। আর কামের তাপে গনগনে হ'য়ে-ওঠা কোলাহল ক'রে-ওঠা মাংসের ওপরে ঐ প্রলম্বিত চোয়ালের ডুকরে-ওঠা ডাক নিচের বাড়িগুলোর পোষা কুকুরদের মাথা তুলে কেঁউ-কেঁউ ক'রে উঠতে বাধ্য ক'রে যেতো—উঠোনের চৌহদ্দি ছেড়ে যারা তবু বেরুতে সাহস পেতো না। আর তাইতে, কুক্কুরীরা, অপেক্ষা ক'রে-ক'রে উষ্মায় অধীর, ছুটে নেমে আসতো গ্রামের মাথায়, আর হাওয়ায় ছুঁড়ে দিতো তাদের কামনার গন্ধ, যাতে পুরুষরা ছুটে আসতে পারে তাদের কাছে, দুমড়ে মুচড়ে তাদের বশে আনতে পারে, আঁচড়াতে পারে তাদের পা, টেনে নিতে পারে, কামড়াতে পারে, চোখা পাথরের ওপর গড়াগড়ি দিইয়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিতে পারে তাদের, যতক্ষণ-না ভোরবেলার দৌড় আবার তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে শিখরের গুহাগুলোয়, যেখানে তারা প্রসব করবে নতুন কুকুরশাবক। 'ওরা আসছে জীবনের খোঁজে, জীবনসঙ্গীর খোঁজে,' বলতো গাঁয়ের ছোকরারা। আশপাশের পথঘাটে কামাতুরা কুক্কুরীদের হাঁসফাঁস আর ডাক শুনে, ভোরের আলোয় যাদের দেখা যেতো, মাইগুলো ধুলোয় মাখামাখি: 'জীবনকে খুঁজতে এসেছে ওরা।'

'আর এখন,' মেয়েটি বলছে, 'ওরা জানতে চায় সে কার সঙ্গে থেকে ও জীবনকে খুঁজছে।' ছেলেটি অধীরভাবে চুমু খেলে মেয়েটিকে, কিন্তু কোথাও সেই কোমলতা, শরীরের সেই নরম ছাঁচ সে খুঁজে পেলে না, পুরুষের নাছোড় মিনতিতে যা সাড়া দেয়। 'এখন,' সে ব'লেই চললো, 'ওরা জানতে চায় এখানে যে-লোকটা ছিলো সে কোথায় গেলো। সে কি গেছে বাজারের কফিখানায়, ডিমের শাদা মিশিয়ে তার মাল টানতে?' ছেলেটি মেয়েটিকে আঁটো ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরলে, সদ্য-পাতা বিছানার দিকে তাকিয়ে। 'একেবারে মধ্যযুগের বিচার, অন্ধা কানুন,' মেয়েটি বললে, আরো জোর দিয়ে; কথাটা সে কেমন আস্তে তারিয়ে-তারিয়ে বললে, যেন কথাটা তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে অবিশ্রাম জেরা-জিজ্ঞাসা, শেকল, হাজতের বন্ধ ঘর, ধর্মধ্বজীদের নির্যাতন, যারা খ্রিষ্টান চিন্তাধারাকে গুলিয়ে ফ্যালে পৌত্তলিকদের লাঞ্ছনানিগ্রহের সঙ্গে, যা হয়তো সে দেখেছে জপমালা-ফিরিওলাদের প্রার্থনাপটের প্রদর্শনীতে, অথবা কোনো কনভেণ্টের বা ফাঁকা কোনো বাড়ির জানলার গোবরাটে বসানো ব্রতপালনের পটে। সেখানে শিক থেকে ঝুলছেন দুঃখবেদনার কুমারী দেবী, তাঁর বুক ছোরায়-ছোরায় ক্ষতবিক্ষত, সঙ্গে আছেন সান্তা ইউলালি, তাঁর স্তন দুটো কাটা, সান্তা লুসিয়া, তিনি তাঁর চোখ দুটো নিবেদন করছেন কোনো পানপাত্রে, আর সান্তা রোসা, এক কুকুরের মুখ থেকে বেরিয়ে-আসা গন্ধকজ্বলা আগুন তাঁকে ঝলসাচ্ছে, আর আনিমা সোলা, মণিবন্ধে হাতকড়া, মাটির তলার এক নারকীয় হাজতঘরে নিজের ঈর্ষার আগুনে পুড়ে মরছে—আর সবটাই কেমন মনে করিয়ে দিচ্ছে জেনানা ফাটকের কথা। বহুবর্ণ সব লিথোচিত্র বা মিনে-করা ছবিতে এঁকে-যাওয়া হয়েছে আত্মলাঞ্ছনার কাহিনী: নিজেকে বেত মারছে কেউ, চাবুক কশাচ্ছে শপাং, গায়ের চামড়া কেটে ছিন্নভিন্ন, কারু শরীর কেটে গেছে, কাউকে ছিঁড়ে খাচ্ছে বুনো জন্তু, সেই সঙ্গে আছে সান লোরেন্‌সোর জাফরি আর সান আন্দ্রেসের ক্রুশ। যেভাবে মেয়েটি কথাটি উচ্চারণ করলে, তাতে মনে হ'লো 'মধ্যযুগের বিচারসভা' কথাটি যেন তার কাছে এক রহস্যময় কুহেলিঘেরা তাৎপর্যে মণ্ডিত; ওরা ওকে শাসিয়ে যাবার পর তার যন্ত্রণা নিশ্চয়ই এই কথাটি থেকেই নিংড়ে নিয়েছে মর্যাদা আর সম্মান। সন্দেহ নেই, পুলিশই তাকে শাসিয়ে গেছে, তার কোনো বাঁধা খদ্দেরের হদিশ জানতে এসেছিলো। তার পোষা কুকুর, শাদা বেড়ালটা, হলদে ক্যানারি—এদের সঙ্গে-সঙ্গে তারও কোনো আস্তানা থাকবে না; সে রাস্তা বেয়ে চলেছে জেনানা ফাটকে, দু-পাশ থেকে লোকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে তাকে, টিটকিরি দিচ্ছে, রাস্তা গেছে সমুদ্রের ধার দিয়ে, নোঙর-ফেলা

চ্যাপটা সব নৌকো, ভেসে-আসা জঞ্জাল, পোড়া কয়লার স্তূপ—পুরো দৃশ্যটা কল্পনা ক'রে নিয়ে তার নিশ্চয়ই পরিষ্কার লাগছে নিজেকে, কলুষমুক্ত, শুদ্ধতর, অনেকটা যেন তারই মতো, যখন প্রতিবছর সে বড়োদিনের সময়, সাবধানে বাড়িতে তালা লাগিয়ে, যায় তীর্থে, ক্রুশের দফতর বানায়, দু-হাতে ভিক্ষে দেয়, আর বেদিতে জ্বালায় মোমবাতির সার। 'মধ্যযুগের বিচার,' আবারও সে বললে, তার চুলে উদাস, আনমনা হাত বুলিয়ে। 'যাও, কোনো-একটা মাল-টাল নিয়ে এসো,' ছেলেটি বললে; তার বিলাপে সে একেবারে নাজেহাল; মেয়েটির হাতে ব্যাঙ্ক-নোটটা তুলে দেবার সময় তার হাতটা পুড়ে যাচ্ছিলো। 'আর ছোটোহাজরির জন্যে মুচমুচে তোরতিইয়া দিতে ব'লে দিয়ো', সে যোগ করলে, মেয়েটি যখন তার শেমিজের ওপর একটা বর্ষাতি চাপিয়ে এলো। 'অচল টাকা,' মেয়েটি বললে, তাকে ব্যাঙ্কনোটটা ফিরিয়ে দিয়ে। 'জাল। যে-সব নোটে জেনারেলের চোখের পাতা খোজা, সেগুলো সব বাজে...' 'বাজে?' লোকটা বিরসভাবে কথাটা আওড়ালে, কাগজটা চোখের সামনে তুলে ধরলে—নোটটার সবুজ-কালো কোণগুলো হঠাৎ সব ক্ষমতা হারিয়ে বসেছে। 'বাজে...অচল...জাল...' সে কুঁকড়ে বসলো আরাম-কেদারাটায়, পকেটে হাত ভ'রে খুঁচরো সেন্‌তাভোগুলো গুনতে-গুনতে, যেন অনুনয় ক'রে ক্ষমা চাচ্ছে, এমনি তার সারা শরীরের ভঙ্গি। তো এই জন্যেই অধীর দর্শকটি নোটটা ছুঁড়ে ফেলেছিলো টিকিটঘরের জানলায়—জাল নোট ব'লেই অমন জমকালো হাম্বড়া ভঙ্গি ছিলো তার। 'আর-যে কিছুই নেই, এইই সব,' সে বললে, তার স্বর প্রত্যাশায় উৎসুক। 'আরেক দিন,' মেয়েটি মৃদু স্বরে গুনগুন করলে, দরজার দিকে একটা মৃদু ইঙ্গিত ক'রে, 'আজ রাত্তিরে আমি ভীষণ ক্লান্ত।' যে তাকে বাতিল ক'রে দিচ্ছে অমনভাবে, তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে তার নিঃসঙ্গতায়, তাকে জড়িয়ে ধ'রে ছেলেটি তার ঘাড়ে চুমু খেলে, ডানায়, যেন কোনো জড় নির্জীব প্রাণীর কাঁধে ডোবালো তার মুখ, যে কিনা তাকে এখন আরো মৃদু স্বরে ঠেলে বার ক'রে দিচ্ছে রাস্তায়। 'ভিজে যেয়ো না যেন,' মেয়েটি এমনকী এ-কথাও বললে, কারণ বাইরে এখন মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছে। লোকটা, ক্ষিপ্ত, ছুটে চ'লে গেলো বাজারের আটচালাটায়, যার ছাত থেকে ঝোলানো নোংরা খাঁচাগুলো থেকে তুকিমোরগরা মুখ তুলে তাকালে তার দিকে। ধানের গোলার গন্ধ, মুর্গিদের নোংরার গন্ধ, আর তারই সঙ্গে মেশানো চষা জমির গন্ধের ঝিলিক, কোনো শজিবাগানের ক্ষীণ সুবাস তাকে আচ্ছন্ন ক'রে তুললো, আপনা থেকেই বুজে গেলো তার চোখ, অজ্ঞাতসারেই, আর এই ঝিমধরা গন্ধ তাকে ব'য়ে নিয়ে

এলো সেই মস্ত নয়ানজুলিটায়, যার শরবনের বিছানা ছিলো তার অদৃশ্য মানুষ খেলাটার গোপন রাস্তা। বাড়ির পেছন দিক দিয়ে সে বেরিয়ে পড়তো, সত্যি যেন অদৃশ্যই, লাফিয়ে পেরিয়ে যেতো খানাখন্দ জলকাদা, পেরিয়ে যেতো পুরো তল্লাটটাই; সে জানতো যে সন্ধের মুখটায় রান্নাঘরগুলো ফাঁকা থাকে, ডেকচিতে যা সেদ্ধ হয় তাদের ওপর দিয়ে আবছা অন্ধকারে উড়ে বেড়ায় বাদুড়-চামচিকেরা; বেড়ার ঝোপঝাড়ের আড়ালে কারু গোপন অন্তরঙ্গ কথা শুনলে সে তাদের চমকে দিয়ে চুপ করিয়ে দিতো; সে শুনতে পেতো গির্জের পোশাকঘরে দোলকেদারার ক্যাঁচকেঁচ শব্দ, জপের জন্যে জড়ো-হওয়া বুড়িদের নিচু গলার কথাবার্তা, যখন তালগাছের চড়নদার জ্বালিয়ে দিতো মোম—না, গির্জের নয়, ছুরির ফলায় গেঁথে রাখতো লটারির টিকিট, যার বাঁটটায় ছিলো লাল ঝুঁটিওলা একটা মোরগের মাথা বসানো। কামারশালার চালাটা পেরিয়ে—যার গায়ে লেখা থাকতো খিস্তির ছড়া, সমিল, অশ্লীল—গেলেই দেখা যেতো সেই সমস্ত গাছটার গুঁড়ি, যার কোটরটা ছিলো ছেলেমানুষি প্রেম-প্রেম খেলার ডাকবাক্স, যেখানে লাল পিঁপড়েরা ব্যস্তসমস্ত ছোটাছুটি করতো খামগুলোর ওপর, কোনো মরা শুঁয়োপোকা অথবা কোনো গমের দানা ব'য়ে-ব'য়ে; সেই কোটরের মধ্যে সেও কতবার গলিয়ে দিয়েছে বই থেকে পেনসিলে টোকা কবিতা, চিরবিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি, চুলের গুচ্ছ, অথবা দীঘল ডাঁটি লাগানো মেঠাই, চোখ নামিয়ে চিনতো সে মেঠাইগুলো, কারণ দোকানি হয়তো তার চোখে তাকিয়ে টের পেয়ে যাবে আসল কথাটা আর ঠাট্টা করবে তার আনুগত্যকে। কিন্তু হঠাৎ-একদিন ছোট্ট মেয়েটি বড়ো হ'য়ে উঠতে থাকে, এত তাড়াতাড়ি বড়ো হ'য়ে যায় যে পরের দিন দেখলেও তাকে মনে হ'তো আগের চেয়ে আরো লম্বা হ'য়ে গেছে, চোখ আরো কোটরে বসা, পা দুটি আরো ছিপছপে, বাচ্চাদের মাথার ওপরে যেন কোনো মিনারের মতো। একদিন মেয়েটি তার সঙ্গে নয়ানজুলির মধ্যে লুকোতে যেতে চায় না আর—আগে তারা প্রায়ই যেতো নলখাগড়া দিয়ে বাঁশি বানাতে, পর-পর ফুঁ দিয়ে দেখতো কে বেশি জোরে আওয়াজ করতে পারে। যে-মেয়েটি হঠাৎ তার জগৎ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে তার কাছে সে যেন আরো-ছেলেমানুষ হ'য়ে গিয়েছিলো, আরো-ছোটো, সেই একদিন, যখন তারা শান্ত নিস্তরঙ্গ নদীটার পাশ দিয়ে হাঁটছিলো, আর ছেলেটিকে ঘাড় বেঁকিয়ে উঁচু ক'রে তুলতে হয়েছিলো যাতে তার মাথাটা গমখেতের সমান স্তরে আছে ব'লে মনে না-হয়। মেয়েটির উরু ফুলে উঠেছে সুগোল, বুকের জামা আঁটো হ'য়ে যাচ্ছে, আর সে তাকে এখন বগলের গন্ধ শুঁকতে দেয় না, যেমন আগে

দিতো, আদর ক'রে তাকে শুওরছানা ব'লে ডাকতো সে, আর মেয়েটিও নিজেই নাক কুঁচকে সায় দিতো যে সত্যি বগলটায় বেজায় ঘামের গন্ধ। একদিন একটা ঠেলাগাড়ি গ্রামে নিয়ে এলো একটা সারাই-করা পিয়ানো, যার চাবিতে হাত বুলিয়ে সেই চিরবিধবা শোকাতুরা স্ত্রীলোক মেয়েটিকে কানে ধ'রে শিখিয়েছিলো আলেহান্দ্রো ভাল্ৎজের গৎ বাজাতে। শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো বিকেলবেলার সব আসর, বাজনার সভা, অন্য কিশোরীদের সঙ্গে বড়ো রাস্তা ধ'রে হেঁটে বেড়ানো—এ-ওর কোমর জড়িয়ে তারা ফিশফিশ ক'রে বলাবলি করতো গোপন কথা। শুধু তখনই, তার ঈর্ষার জ্বালা নেভাতে, সে কোনো যন্ত্র বাজানো শিখতে থাকে, যাতে গাঁয়ের ব্যাণ্ডদলে যোগ দিতে পারে, যাদের কনসার্টে যারা একক বাজাতো কর্নেট বা ক্লারিওনেট, তারা দারুণ হাততালি পেতো, গানের আসরের প্রচারপত্রে যাদের নাম শোভা পেতো এত খাতির ছিলো তাদের···হারানো সরলতার এই ফিরে-পাওয়া রেশ তার বিরক্তিতে ইন্ধন জোগালে—এইমাত্র তাকে যে বাড়ি থেকে বার ক'রে দিয়েছে, তার প্রতি বিষম রাগ হ'লো তার। আকাট না-হ'লে সে কেমন ক'রে ভাবতে পেরেছিলো এমন মেয়ে কোনো সত্যিকার বন্ধু হ'তে পারে—জানাই তো এরা আসলে কী মাল : তাদের ডাক নাম বেশ্যা, পর্দবি পয়মাল। সাঁতসেঁতে তুকিমোরগ, গিনিমুর্গির দুর্গন্ধের মধ্যে বইটা কষ্ট দিচ্ছে তাকে, বাঁধাইটা কোনো ভর্ৎসনার মতো ধারালো; মোরগগুলোর মুখ খাঁচার তারের বেড়াজালের মধ্য থেকে উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে। একটা থ্যাৎলানো কাঁচকলা রাতের হাওয়ায় মিশিয়ে দিচ্ছে কটু গন্ধ। ***Sinfonia Heroica, composta per festeggiare il souvvenire di un grand 'uomo*** [কোনো মহান মানবের স্মৃতিউদ্‌যাপনের জন্য রচিত 'এরোইকা' সিম্ফনি]। তার ঘৃণার পেছন-পেছন এলো লজ্জা আর ধিক্কার। না, সে কোনোদিনই কিছু হ'তে পারবে না, সে কখনো ঝিমাগিদের শোবার ঘরের চৌহদ্দির বাইরে যাবে না, আয়নার ওপর রোজ তাকে রুমালটা টান ক'রে রাখতে হবে শুকোবার জন্যে, ছেঁড়া মোজাটা বুড়ো আঙুলের ডগার কাছে বাঁধতে হবে সুতো দিয়ে—যা সত্য আর মহান, তার কাছ থেকে যতদিন তাকে কোনো বেশ্যামাগির রূপজেল্লুশ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে, ততদিন এইই থাকবে তার চাল। সে বইটার পাতা খুললো, নিওন বাতির আলোয় পাতাগুলো কেমন যেন নীলচে দেখাচ্ছে : 'এই অবিশ্বাস্য-বিশাল ক্ষিপ্রচপল সবল রচনার পর, তার সব তূর্যনাদ আর সুপ্রসার প্রতিধ্বনির পর, আসে উপসংহার, ফিনালে—উল্লাস আর মুক্তির সংগীত, তার সব উৎসব আর নৃত্যধ্বনিসমেত, তার সব কুচকাওয়াজ-

আর হাস্যরোল আর একই স্বরের ভিন্ন-ভিন্ন বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যময় ধ্বনিশিল্পের ঘূর্ণিতোলা উত্থান। যখন, ঐ দ্যাখো, মৃত্যুর মধ্যে আবার ফিরে আসে…' উপসংহারের খানিকটা হয়তো এখনো গেলে শোনা যাবে। সে একটা ট্যাকসি ডাকলে। ঠিক যখন লাল ভারি পর্দাটার আড়াল থেকে উপসংহারের প্রথম স্বরগুলো বাজলো, গিয়ে হাজির হ'লো প্রেক্ষাগৃহে। কোনো দর্শকের তদারক করতে হচ্ছিলো না ব'লে দারোয়ান টিকিটঘরের তাকের গায়ে হেলান দিয়ে উঁচু টুলটায় ব'সে ঢুলছিলো। তাকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হ'য়ে শুধোলে : 'আর কতক্ষণ ?' 'মিনিট নয়েক,' তারপর তার জ্ঞান জাহির করবার জন্যে যোগ করলে, 'ভালোভাবে নির্দেশনা দিলে সবশুদ্ধু ছে-চল্লিশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়।' মুখ তুলে সে আবারও বৃষ্টির মধ্যে তাকিয়ে দেখলো ধ'সে-যাওয়া, কুয়াশা-ঢাকা পুরোনো দরদালানটার ঝাপশা রেখা, যার মিনারে মৃতের জন্যে নিশিজাগরের মোম জ্বলছে, যেখানে গাদাগাদি ক'রে লোক থাকে ভাড়াটে ঘরে। নেগ্রো বুড়িটার কথা মনে প'ড়ে গেলো তার, ও-বাড়িতেই থাকে তো : বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে, তার ঘরের ঘুলঘুলি, দিয়ে সে তাকে কতদিন দেখেছে, দু-হপ্তা আগেও সকৌতুকে সে লক্ষ করেছে কেমন ক'রে বাচ্চাদের ছোট্ট ঝাঁঝরি দিয়ে টবের ফুলপাতায় জল ঢালছে বুড়ি, ঠিক দু-হপ্তাই, কারণ সেটা ছিলো তার জন্মদিন, আর তার বাবা অল্প যে-কটা টাকা পাঠিয়েছিলেন মানি-অর্ডারে, তা দিয়ে 'এরোইকা'রই একসেট পুরোনো রেকর্ড কিনে নিয়ে সে নিজেকে উপহার দিয়েছিলো, পুরোনো রেকর্ড কিন্তু তবু বেশ ভালো। মাথায় একটা শাদা ফেট্টি বেঁধে বুড়ি তার পুদিনা আর রোজমেরির টবগুলোর ওপর ঝুঁকে আছে—এই ছবিটা তাকে খুব নাড়া দিয়েছিলো। পাহাড়ের ধারে তাদের গাঁয়ের সেই নেগ্রো বুড়ির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো, সান্ধ্য প্রার্থনার জন্যে রোজ ছায়া যখন দীর্ঘায়িত হচ্ছে সে গির্জেয় রেখে আসতো লাল বেগনিয়া, ঠিক যখন পাহাড়ের ওপর শুরু হ'তো 'জীবনের খোঁজে', 'জীবনসঙ্গীর খোঁজে' কুক্কুরীদের ডুকরে-ওঠা ডাক, আর নিচে বাড়ির পোষা কুকুরদের মধ্যে শুরু হ'য়ে যেতো পোষমানা হাঁসফাঁস। হঠাৎ তার মনে হ'লো, ঐ বুড়িই মারা যায়নি তো ! কিন্তু না, এই নেগ্রোবুড়িগুলো একশো বছরেরও বেশি বাঁচে। তাদের কাউকে-কাউকে আনা হয়েছিলো সে-ই কবে, দাসজাহাজের খোলের মধ্যে, হাঁটুতে শেকল বাঁধা। মাইনে পেলে সে একদিন এই বুড়িকে দেখতে যাবে—একে সে চেনে না যদিও—আর তার কাছে নিয়ে যাবে শাবেকি ধরনের কিছু মিষ্টি, দেবদূতদের গির্জের কাছে সেই-যে মেঠাইওলা গিটার

বাজিয়ে যা বিক্রি করতো, ঝালরলাগানো কাগজের রেকাবিতে সাজিয়ে রাখতো চুমু, ক্রীমরোল, ওপরে ক্রীমের ঝালর লাগানো কেক, আর সবুজ, লাল, শাদা সব হালকা লজঞ্চুশ, পুদিনা, যষ্টিমধু অথবা আখের রসে যেগুলো টৈটুম্বুর থাকতো। আজ রাতে বুড়ি যে বেঁচে আছে, এটা তাকে জানতে হবে—যাতে সে তার প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ পায়। দু-হপ্তা আগে সে কিনেছে 'এরোইকা'র রেকর্ডগুলো, যাতে সে নিজেকে তৈরি করতে পারে আজকের এই সজীব অনুষ্ঠানটার জন্যে, সেটা হবে য়োহান সেবাষ্টিয়ান বাখ্‌-এর প্রতি তার শ্রদ্ধার নিদর্শন, তিনি নাকি অর্গানবাদক বুক্সটেউডের বাজনা শোনবার জন্যে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন ল্যুবেক। অথচ সেই মহান রাত যখন এলো, 'এরোইকা'র এই সজীব অনুষ্ঠানের রাত, সে কিনা স্বর্গের মতো এই গানকে ফেলে রেখে চ'লে গিয়েছিলো একটা বেশ্যার আদর পাবে ব'লে। তাকে জানতেই হবে বুড়ি আজ রাতে বেঁচে আছে কি না। না-জানলে তার চলবে না, কিছুতেই না; ফিনালে শেষ হ'য়ে যাবার পর সে ছুটে যাবে পুরোনো দালানটায়, যাতে সে ঠিক ক'রে জেনে নিতে পারে যে যার মৃতদেহ শোয়ানো আছে ছাতে সে নিশ্চয়ই এই বুড়ি নয়।

২

তবু এ-সমস্তই মনোমধ্যে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছি, আমি জানি,
ইহা তোমার মনোরথ। —ইয়োব, দশম, ১৩

তার সরু লোহার খাটটার ওপরে ঈস্টারের আগের রোববারের স্মরণে দু-পাশ থেকে ঝুলছে তালপাতার ঝালর ; বুড়ি কুঁকড়ে শুয়ে আছে খাটে, দেয়ালের দিকে মুখ ফেরানো, যন্ত্রণায়-ছিঁড়ে-যাওয়া কোনো বোবা জন্তুর মতো করুণ, হালছাড়া ভঙ্গি তার। আর সেই দীর্ঘ রাতটায় লুকিয়ে-থাকা লোকটা তার পাশে ব'সে শুধু দেখেছে তার দশা, ডাক্তার-বদ্যি ডাকতে পারেনি কিছুতেই—আর সেই ডাক্তারকে আদৌ ডাকার উপায় নেই—সে তো মারা গেছে অনেক কাল আগেই, অথচ অন্ধকারে যাকে সে আনতে চেয়েছিলো, যখন কান্নায় দলাপাকানো নিশ্বেস কোনো কথার আকার নিয়েছিলো—আর তারপর থেকেই তার সত্যিকার বন্দীদশার শুরু। তার আগে অব্দি, দিন কেটেছে রাত কেটেছে, তখন পাশের ঘরে ঘাপটি মেরে থাকাটাই ছিলো যথেষ্ট কাছে-থাকা, ঘোরানো সিঁড়ির ওপর কোনো পায়ের আওয়াজ হয় কিনা তার জন্যে কানখাড়া, যেখানে কেউ পা ফেললেই নড়বোড়ে কাঠের সিঁড়িতে মড়মড় ক'রে আওয়াজ হয়। বুড়ি নিচের তলার দরজি-গিন্নির কাছ থেকে খবরকাগজ ধার ক'রে নিয়ে আসতো, সেটা পড়া যেতো তন্নতন্ন ; খিদে পেলে খেতো পেকে হেজে-যাওয়া ফলমূল, বেশি পাকা ব'লে ফিরিওলারা যা বিক্রি করতো জলের দরে। এমনকী কফি বা মদের জন্যে বেয়াড়া তৃষ্ণাটাকেও মেটানো যেতো, শেষ যে ক-টা খুচরো সেন্‌তাভো প'ড়ে ছিলো, খুব হিশেব ক'রে সেগুলো খরচ ক'রে গেলাশে ক'রে তার জন্যে আনিয়ে নিতো—কারণ কোমরের বেল্‌টের মধ্যে ভাঁজ-ক'রে-গুঁজে-রাখা ব্যাঙ্কনোটটা তখন খরচ করার কোনো উপায় ছিলো না, যতক্ষণ-না ভালো ক'রে জানা গিয়েছিলো প্রয়াসটার ফলাফল। কিন্তু এখন, বোনঝিটি গিয়ে ডেকে এনেছিলো এক তরুণ ডাক্তারকে, সে দ্রুত হাতে কী-সব আঁচড় কেটে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেবার পর—এত কম দর্শনীর বদলে বড্ড বেশি সিঁড়ি ভাঙতে হয়েছিলো ডাক্তারকে—রোগিনীর জন্যে খুবই কম খাবার আসে—এমন খাদ্য নয় যা দাঁতের পাটির মধ্যে মুচমুচ ক'রে ভাঙে, অথবা চামচে দিয়ে

ভালো ক'রে তোলা যায় রেকাবি থেকে, কাটা যায় বা ভাগ করা যায়, সত্যি-সত্যি চিবুনো যায়, অর্থাৎ ঘন পুরু সারপদার্থে ভরা কোনো খাদ্যদ্রব্য, যা উত্তরোত্তর বাড়তে-থাকা প্রায় অসহ্য-ক্ষুব্ধ সমস্ত চৈতন্যটাকেই একটা হা-করা মুখ বানিয়ে দিয়েছে, যে-খাবারকে তার ঐ বিশাল হা-য়ের মধ্যে ফেলে খিদেটাকে শামাল দেয়া যায়। বোনঝিটি যখন-খুশি আসে দিনের বেলায়, খবরকাগজ দিয়ে মুড়ে আনে দুধের বোতল কিংবা সুরুয়ায় ভরা ছোট্ট বাটি। সেইজন্যেই সে এখন বাধ্য হয়েছে মিনারের চিলেকোঠায় গিয়ে আশ্রয় নিতে, ছাতে যাবার দরজাটাকে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে। লোকে যখন থেকে রোগিণীকে দেখতে আসতে শুরু করেছে, অনেকেই চেষ্টা করেছে দরজাটা খুলে রোদে-জলা চৌখুপির ইট থেকে অসুখ-অসুখ গন্ধটা তাড়িয়ে দিতে : 'বুড়ি যে কোথায় চাবিটা রাখলো, তা সে নিজেই বলতে পারছে না,' একই লোকের গলা শোনা গেছে প্রতিবার, হুড়কো তুলে আটকানো দরজাটায় ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে দুটো দিন কেটে গেছে এর মধ্যেই, তার পেটে কিছুই পড়েনি, সে বন্দী হ'য়ে আছে তপ্ত নোংরা ঝুলকালি-মাখা চার দেয়ালের ঘেরাটোপে : একটা ঘড়ি আছে, তার দোলকটা ভাঙা, ঘণ্টা-মিনিটের কোনো কাঁটাও নেই, আর জং-ধরা ডালাবসানো একটা তোরঙ্গ, তার ওপর এখনও লেবেল সাঁটা, দাড়ি কামাবার বুরুশ দিয়ে কালো কালিতে লেখা : 'দ্রুতগামী ট্রেন মারফৎ'— আর এদের মধ্যেই সে পাক খেয়েছে সবসময়। সারাক্ষণ ভয় কে কখন তক্তপোশের ক্যাঁচকেঁচ শুনে ফ্যালে, আর হাতের কাছে টোটাভরা পিস্তল, সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে এই নোংরা, জীর্ণ, পুরোনো মিনারটার মেঝেয় শুয়ে—এককালে বাড়িটার জাঁকজমক নেহাৎ কম ছিলো না, কবরের পাথরের মতো দেখতে রোদে-পোড়া বৃষ্টিতে-ভেজা ধূসর মর্মরশিলা এখনো এক সুদূর শীতলতা বজায় রেখেছে সব গনগনে ইটের মধ্যে—পাথরের নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পুরোনো ছাত—এতই নিচু দেয়াল যে কোনো ছায়াও দেয় না। তবে, বাঁচোয়া, রাতগুলো এখন আর আগের মতো অত খারাপ নয়; শ্লথমন্থর অফুরন্ত সব রাত, যেগুলো সে কাটিয়েছে খোলা জানলার কাছে উপুড় হ'য়ে শুয়ে, তার নিজের ঘুমের ওপর সারাক্ষণ অতন্দ্র পাহারা রেখে, দু-চোখের পাতা বুজে গেলেই ধড়মড় ক'রে জাগিয়ে দিয়েছে নিজেকে, কারণ তার ভয় ঘুম আর মৃত্যুকে একাকার ক'রে মিশিয়ে ফেলেছিলো। তার খোলা চোখ সাক্ষী থেকেছে আকাশের তারার বাস্তবতার, কোনো বাতিঘরের ঘূর্ণ্যমান আলোক-

সংকেতের, আর দরজার আড়ালে কোনো পোকামাকড় ফরফর আওয়াজ করলেই তার চোখের তারা আতঙ্কে বিস্ফারিত হ'য়ে গিয়েছে ; তোরঙটার মধ্যে একটানা ডাকতে শুরু করেছে ঝিঁঝিপোকা ; হাওয়ার ঝাপটা নাড়িয়েছে ছাতের কোণায়-কোণায় জ'মে-থাকা ঝুলকালি ; সবকিছু, স ব কি ছু—যার মধ্যেই আছে কোনো সন্তর্পণ, অস্বাভাবিক, অচেনা মৃদু শব্দ—ঐ রাতগুলোয় অসহ্য যন্ত্রণায় গড়া এক অনিঃশেষ প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে উঠেছে তার কাছে। ভোর হবার একটু আগে, অবশ্য, বাতিঘরের আলো যখন তার অবিশ্রাম ঘুরপাকে একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, ওপর থেকে তার গায়ে ঝ'রে পড়েছে ক্ষমার মতো কিছু-একটা, নিজের ওপর পাহারা রাখা সে তুলে নিয়েছে ; সকালবেলায় যখন সমুদ্রের রঙ একটু ফিকে হ'য়ে এসেছে, সে ছেড়ে দিয়েছে চোখের পাতাদের, এমন-এক সম্ভাবনার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে যেটা তার বীভৎস প্রত্যক্ষতা না-হারিয়েও তার কাছে মনে হয়েছে অদ্ভুতভাবে সুদূর, আর এমনকী হয়তো বাঞ্ছনীয়ও, একবার যদি কোনোমতে তার নিজের রক্ত-মাংস জ্বালা অনুভব করার ভয় থেকে মুক্তি পায়, তবে তার বিনিময়ে সে আর-কখনো এমনকী জেগে উঠতেও চাইবে না। কারণ শারীরিক কষ্টের সম্ভাবনা-টাকেই সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সম্ভাবনাটা এমনই অসহনীয় যে সেটা যাতে তাকে সইতে না-হয়—সত্যিকার যন্ত্রণার ছোবল বা ছুরিকাঘাত নয়, ছোরাটা নেমে আসছে, এই প্রত্যাশাটাই—সেইজন্যেই আজ সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে এই জঘন্য দশাটায়—প্রয়াসটার ফলাফল জানবার জন্যে প্রতীক্ষায় অধীর। সেই প্রথম রাতগুলো থেকেই ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাসটা গ'ড়ে উঠেছে তার মধ্যে ; আধুনিক বহুতল বাড়িটার ছাতে যেখানে ধোবানিরা জড়ো হয় আর বাচ্চারা হল্লা ক'রে খেলে—বাচ্চারাই সবচেয়ে বিপজ্জনক—তাদের চোখে যাতে না-পড়ে, সেজন্যে দিনের বেলার বেশির ভাগ সময়ই তাকে থাকতে হয় মিনারে, ঘাপটি মেরে লুকিয়ে। বহুতল বাড়িটা উঠেছে ঔপনিবেশিক আমলের এ-বাড়িটার পাশেই। এ-বাড়িটা এখন পরিণত হয়েছে ভাড়াটে বাড়িতে, অনেক লোক থাকে ; বাড়িটার চওড়া জানলাহীন দেয়াল অর্থহীন সব ছবিতে ছাওয়া—লাল, সবুজ, কালো— ; এ-সব তাকে মনে পড়িয়ে দেয় রেলপথের সংকেত আর পতাকা নেড়ে নির্দেশ পাঠাবার কথা, যদিও, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিছু-কিছু মস্তান বুদ্ধিজীবী—তার দল এদের ঘৃণা করে—বলতো যে এই বিরাট-বিরাট চিত্রলিপিগুলো আসলে অলংকরণেরই

এক নতুন চেতনার প্রকাশ। সন্ধে এলে, বুড়ি নিচের তলার দরজিগিন্নির সঙ্গে জপমালা ঘোরাতে-ঘোরাতে সশব্দে বড়ো-বড়ো হাই তুলতো, সে-যে এখন শুতে যাচ্ছে, এটা জানান দিয়ে বুঝিয়ে, বিদায় নেবার পর, পলাতক নিঃশব্দে এগিয়ে আসতো দরজাটার কাছে, শক্ত-ক'রে-আঁটা হুড়কোগুলো খুলতো, তারপর পাশের ঘরে গিয়ে দেখতো বুড়ি তাকে কী খাওয়াতে পারে—মাংস, না ঘন স্টু—এমন-কিছু যাতে কেউ অন্তত একটু দাঁত বসাতে পারে, আর সকাল-বেলার কাগজগুলোয় বুভুক্ষুভাবে চোখ বোলাতো সে—যদি কোনো হদিশ মেলে তার ভবিতব্যের। অনেক সময়েই সবচেয়ে কৌতূহল-জাগানো পাতাটার শুধু ছেঁড়া টুকরোই থাকতো, কারণ দরজিগিন্নি সেখান থেকে কেটে নিতো পোশাক-আশাকের নতুন ডিজাইনগুলো—তার বয়ন ও সূচিশিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্যে—দরজিগিন্নি তার ঘরটাকে বিদ্যালয়ই বলতো. সেখানে সে রাখতো তার সব পোশাক পরাবার কাঠামো, আর পিনভর্তি লাল মখমলের গদি, আর মেয়েদের শেখাতো কেমন ক'রে বানায় সাধারণ জামা আর শাদা-সিধে ঘাঘরা। কিন্তু ছেঁড়া পাতাগুলোর যে-সব টুকরো থাকতো, তাতে পাওয়া যেতো মানুষের পৃথিবীতে যারা বেঁচে আছে, তাদের খবর—এত চনমনে সে-সব, যে তার সব মনোযোগ তারা কেড়ে নিতো ; এমনকী তুচ্ছ, আজেবাজে সব খবরও—এই যেমন, যারা বিদেশ গেছে তাদের সম্বন্ধে সব গুজব বা টিপ্পনী, —আর এ-সব সে পড়তো একবার, দু-বার, বার-বার, যতক্ষণ-না বুড়ি ঘুমিয়ে পড়তো, আর সিনেমাহলগুলোর বিজলিবাতির ইশারা নিভে যেতো. কোথায় কোন্ বাচ্চার একটানা নাকি কান্নাই প্রমাণ ক'রে দিতো তার আশপাশে অন্যরা কেমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তারপর, রাস্তার বাতির নাগালের বাইরে, ছাতে যেখানে অন্ধকারের একটা এলাকা তৈরি হ'তো, সেখানে সে পায়চারি ক'রে বেড়াতো, নিচে তাকাতো কখনো, নিচে যেখানে সুপুরি গাছ ফুটিয়েছে শাদা-শাদা ফুল, এক পুরোনো ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবলের খিলেনের তলায়, কোথায় একটা ঘরে দেশলাই জলতো ফশ ক'রে আর দেখাতো হয়তো কোনো মেয়ে বুকের জামাকাপড় খুলে হাওয়া করছে, কিংবা হেঁপো রুগীর কুঠুরিটা ঢেকে আছে জাভার গাছপালার রজন পোড়ানোর সুগন্ধি ধোঁয়া। তার ওপাশে জিনলাগাম নির্মাতার দোকানটা—যেখানে প'ড়ে ছিলো এক ধূলিমলিন ফিটনগাড়ির ধূসর কঙ্কাল, যার দু-পাশে শামাদানে মোম জলতো, যার ওপরে অর্ধেক-শুকনো চামড়ার পর্দাগুলো থাকতো টান ক'রে বিছোনো। আরো দূর

থেকে আসতো এক ছোট্ট ছাপাখানার কালির গন্ধ, যেখানে শুধু নামের চিরকুট বা নেমন্তন্ন চিঠিই ছাপা হয়। আর অন্যপাশ থেকে আসতো হা-ঘরে গরিব রান্নাঘরগুলোর ভ্যাপশা দুর্গন্ধ যেখানে তেলতেলে জলের মধ্যে চোবানো থাকতো বাসনকোশন ; আরেক দিক থেকে আসতো কোনো বড়োলোকের বাড়ির রান্নাঘরের সব অলস ঠুনঠুন শব্দ, যেখানে দুটি দাসী আধো-শেখা গানের সুরে-সুরে অবিশ্রাম ধুয়ে-মুছে চামচে-টামচে রাখতো টেবিলের ওপর। আধুনিক বাড়িটার অতীব বিপজ্জনক ছাত আর নিজের মধ্যে মিনারের আড়াল রেখে সে একটুক্ষণ উঁকি দিতো রাস্তায়—যেখানে একটা পুরোপুরি অন্য জগৎ—কত ধরনের বাড়িঘর,—হলিউডি, গথিক, মুররীতির বাড়ি থেকে শুরু ক'রে বামন পার্থেনন বা গ্রীক মন্দিরের মতো বাড়ি উঠেছে, যাদের জানলাগুলো আর গবাক্ষগুলো কুলোর মতো, অনেক রঙে ছোপানো, রেনেশাঁস কেতায় বানানো নড়বোড়ে বাগানবাড়ি—ক্যালাডিয়াম আর বুগনভিলিয়ায় প্রায় দমআটকানো, ঘাসের জমির ওপর ঝুলে-পড়া তাদের কার্নিশ। আছে দু-পাশে সারি-সারি থাম, মধ্যখান দিয়ে গেছে পায়ে-চলার রাস্তা—অ্যাভিনিউ, বীথিপথ, স্তম্ভসারিশোভিত সরণি, চোখধাঁধানো আলোয় ঝলমলে: এমন প্রাচুর্য অন্যকোনো শহরে নেই, শৃঙ্খলার এমন বিশৃঙ্খলা যা অন্য-কোথাও একেবারেই দুর্লভ, যাকে স্পষ্ট ক'রে দেখায় কোনো বাড়ির সামনের অঙ্গে দাঁড়ানো কোনো ডরিক স্তম্ভ, তার পাশেই কোনো দাম্ভিক, জমকালো করিন্থ স্তম্ভের মোচার মতো চূড়া বা বাসকপাতার মতো শিখর, রাস্তার অর্ধেকটা গেলেই ধোবিখানা, যার উঠোনে রোজ কাপড় শুকোয়, যেখানে নাকমুখ-খশা স্তম্ভমূর্তিকা ধ'রে রেখেছে কাঠের মাখাল। রোদে ফোস্‌কা-পড়া সব স্তম্ভশীর্ষ ; স্তম্ভ—যাদের লম্বা সরু চূড়ার পলেস্তারার তেলরঙ ফোস্‌কার মতো ফুলে উঠেছে ; এমন-সব অলংকরণ আর এষণা যাদের আসলে থাকার কথা নিচের অগুনতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে—সিঁড়ির পাশের থামের ওপর বসানো ডানাছড়ানো গোল কলস, হাতের নাগালের মধ্যে সিঁড়ির পাশের বেড়ার মধ্যকার দস্তিল বিন্যাস, আর রোমক কুঁজো বা ভস্মাধার সমেত কার্নিশগুলো সব বেদী বা ঢালের মতো দেখতে, আর, এও শেষ না, এরই ওপর দিয়ে গেছে টেলিফোনের তার, যার ওপর মখমলের মতো গজিয়েছে শ্যাওলার আস্তর, যাকে দেখায় ঠিক কোনো পাখির বাসার মতো। অলিন্দে আছে কাঁকড়ার মুখের মতো ঘুলঘুলি, ডরিক-রীতির নিদর্শন ; তীক্ষ্ণ ধনুকের মতো খিলেনের গবাক্ষ থেকে চাঁদমারি অব্দি

গেছে রঙ-করা ছোটো-ছোটো মূর্তির সার, একইভাবে পর-পর চারবার এক পাশ থেকে অন্য পাশে, এমন-সব ছাঁচে তৈরি যা বিক্রি হয় আয়তন অনুযায়ী, আর তার প্রসঙ্গ হ'লো, কোনো ওইদিপৌস হয়তো তার হেঁয়ালির জট খুলে উত্তর দিচ্ছে স্ফিংক্সকে। প্রতিটি দরজার কাঠামো সে-যুগের মনভোলানো আনকোরা সব ধ্রুপদী রীতির জন্মযন্ত্রণার সাক্ষ্য বহন করছে। আর যেখানে আরো-আধুনিক করার চেষ্টায় দরজার গায়ে কোনো কারুকাজ করা হয়নি, থামগুলো বসানো হয়েছে আড়ালে, দেয়ালের গায়ে বেমালুম লাগানো, এবং কোনো কাজেই লাগছে না তারা, স্তম্ভশীর্ষের ওপর এমন-কোনো চাঁদোয়াও নেই যে সেটা বসাবার জন্যে তারা জরুরি হবে. আর শেষটায় চারপাশের সিমেন্টের আস্তর তাদের গিলে খেয়েছে। পলাতক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় অস্পষ্টভাবে স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে যা-কিছু জেনেছিলো, তার কিছুর সঙ্গেই এদের কোনোটার কোনো মিল, বা সম্পর্ক, নেই। 'দ্রুতগামী ট্রেন মারফৎ। প্রেরণস্থল : সাংক্তি স্পিরিতুস।' আধো খ'য়ে-যাওয়া দাড়ি কামাবার বুরুশটা দিয়ে শিল্পীর হাত বিশদভাবে কালো কালিতে কথাগুলো লিখেছে। লুকিয়ে-থাকা লোকটা তার জীবনের সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে নিজের দিকে ফিরে তাকালে। যেন সে চোখের সামনে দেখতে পেলে নিজেকে, তাড়াহুড়ো ক'রে পুরোনো তোরঙ্গটায় জিনিশপত্র ঠাশছে, সে-যে কত বছর আগে তার দেশান্তরী ঠাকুরদা তোরঙ্গটাকে দ্বীপে নিয়ে এসেছিলো। যে-আত্মীয়বন্ধুরা তাকে ঘিরে ছিলো, যারা একটু পরেই স্টেশনে যাবে তার সঙ্গে, সেদিন সকালবেলার ব্যস্ত মুহূর্তটায় তাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। তাদের গলার স্বর ভেসে আসছিলো দূর থেকে, যেন কোনো গতকাল থেকে যাকে এখন পেছনে ফেলে রেখে আসছে সে। সে তাদের কথাবার্তা পরামর্শ শুনেছে, কিন্তু সারাক্ষণ তার মনে হয়েছে, সেই উঁকি-দিয়ে-দেখা ভবিষ্যৎটার মধ্যে তার অনির্ণেয় সুখটাকে তারিয়ে-তারিয়ে চাখাটাই ভালো বরং ; তা-ই হবে তার চারপাশের বাস্তবতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার সুখ। যাত্রার শেষে আসবে রাজধানী, শ্বেতপাথরে গড়া ইণ্ডিয়ান কুমারী হাবানার সব ফোয়ারাগুলো সমেত, দেয়ালে লাগানো ছবিটায় যেমন দেখা যাচ্ছে—ছবিটা বেরিয়েছিলো একটা পত্রিকায়, তলায় লেখা ছিলো এইমর্মে এক টীকা, অনেক বছর আগে এরেদিয়া নামে এক কবি নাকি এর ছায়ায় ব'সে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই মতো কোনো ঘিঞ্জি নোংরা দম-আটকানো মফস্বল শহরে জ'ন্মেও ফরাশি অকাদেমির সদস্য হ'তে যাঁর

আটকায়নি। রাজধানীতে পৌঁছে সে জানতে পাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে, জানতে পাবে তার স্টেডিয়াম আর থিয়েটারগুলো ; তার কাজকর্মের জন্যে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কাউকে ; স্বাধীনতা পাবে সে, সত্যিকার আজাদী, আর, হয়তো, অচিরেই তার জুটে যাবে কোনো প্রেমিকা বা রক্ষিতা, কেননা মফস্বলে যা বাগানো এত কঠিন রাজধানীতে তারই সহজ চল, যেখানে কোনো বন্ধ জানলা, ছিটকিনি বা কেচ্ছার টানে মুখিয়ে-থাকা পাড়াপড়শি নেই। এই ধারণাটার জন্যেই সে বিশেষ যত্ন ক'রে তার নতুন স্যুটটা ভাঁজ ক'রে তোরঙ্গে তুলেছিলো, সর্বশেষ ফ্যাশন অনুযায়ী তার বাবা নিজের হাতে কাপড়টা কেটে-ছিলেন, আর তারই সঙ্গে রঙ-মেলানো টাই, আর রুমাল ; সে ঠিক করেছিলো এটা প'রেই সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে যাবে। তারপর একটা কাফেতে গিয়ে বসবে, চাইবে এক পাত্তর মার্টিনি। শেষ অব্দি জানতে পাবে খেতে কেমন লাগে এই দুই পানীয়র মিশোল, যার সঙ্গে থাকে জলপাই। তারপর সে যাবে এস্ত্রেইয়া ব'লে এক মেয়ের বাড়ি, তার জলপানি-পাওয়া বন্ধু সম্প্রতি একটা চিঠিতে যার সম্বন্ধে একেবারে ডগমগভাবে লিখেছে। তার বাবা অবশ্য তাকে সেই মুহূর্তেই সাবধান ক'রে দিয়েছিলো, জলপানি পেলেও ও-ছোঁড়ার সঙ্গে যেন বেশি মাখামাখি না-করে সে, কারণ লোকে বলে সে নাকি সারাক্ষণ হুল্লোড়েই ব্যস্ত, জলপানির টাকা সব উড়িয়ে দিচ্ছে আমোদ-প্রমোদে, ফুর্তি-ফার্তায়, অসৎ-সঙ্গে, 'শেষ অব্দি এ-সব আত্মায় যা রেখে যায় সে শুধু ছাই-ভস্মই।' গলার স্বরগুলো ভেসে আসছিলো অনেক, অনেক দূর থেকে। আর স্টেশনে তাদের মনে হয়েছিলো আরো-সুদূর, গাঁইয়া লোকজন সব চারপাশে, এ-প্ল্যাটফর্ম থেকে ও-প্ল্যাটফর্ম লক্ষ ক'রে চ্যাঁচাচ্ছে, একটা গোরুমোষে ভরা ট্রেন হুশহুশ ক'রে প্রবল হাম্বাডাকের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেলো। শেষ মুহূর্তে তার বাবা তাকে গোটা কয় মধুতে টৈটুম্বুর মৌচাক কিনে দিয়েছিলেন, যে-বুড়ি তাকে তার বাড়িতে রাখবে, তার উদ্দেশে পাঠানো উপহার—জনশ্রুতি, যে, ও-বাড়িটায় নাকি ছাতের ওপর চিলেকোঠা সমেত একটা মিনার আছে, যেটা কোনো ছাত্রের পক্ষে আদর্শ—একা থাকার পক্ষে বেশ আরামপ্রদ, আর স্বস্তিরও, কেননা কেউ সেখানে তাকে অযথা বিরক্ত করবে না—তারপর এলো দ্রুতগামী ট্রেনটা, সব স্টেশনে থামে না, তার এনজিনের ঘণ্টা বাজছে ঢং-ঢং, বিদায়ের যত কোলাহল···আর সে এখানে এসে পৌঁছেছিলো গভীর রাতে, তোরঙ্গ সমেত, চোখ আটকে ছিলো এই মিনারের ওপর, তারপর তার বুড়ি

আয়া তাকে নিয়ে এলো ঐ ঘরে—আয়া অনেক বছর আগেই রাজধানীতে এসেছিলো, বড়োলোকদের এক পরিবারের সঙ্গে, তারাই ছিলো এই বাড়িটার মালিক, এখন তারা ছোটো-ছোটো খুপরি ক'রে-ক'রে বাড়িটাকে ভাড়া দিয়েছে অনেককে। প্রথম মুহূর্ত থেকেই নেগ্রো বুড়ির বড্ড মা-মা ভাব থেকেই সে বুঝে গিয়েছিলো যে তার সব স্বাধীন কাজ-কারবার সাধ-আহ্লাদের পক্ষে সে একটা মস্ত বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে, সবসময় নজর রাখবে তার আসা-যাওয়ায়, বকবে, ভৎর্সনা করবে, ঝামেলা পাকাবে, ত্যক্ত করবে—অন্তত আর যদি কিছু নাও হয়, তার কুঠুরিটায় কোনো মেয়েছেলে আনতে দেবে না। সেইজন্যেই সে মনস্থির ক'রে ফেলেছিলো যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'য়েই সে নতুন আস্তানার খোঁজ করবে। আর এখন, বুড়িটাকে অত মাস বেমালুম ভুলে থাকার পর—ও কি বুড়িটাই, ঘুমের মধ্যে অমন কঁকিয়ে উঠলো? না কি দরজিগিন্নির বাচ্চাটা, যে এতক্ষণ সমানে কাঁদছিলো?—এই ঘরটাকে অ্যাদ্দিন ছেড়ে থাকার পর, শেষকালে সে এখানেই পেয়েছে তার চূড়ান্ত আশ্রয়, একমাত্র যে-আশ্রয়টায় এসে লুকিয়ে-থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো; আর এখানে এসেই সে দেখতে পেলে তার ঐ গাঁইয়া-গাঁইয়া তোরঙ্গটা, ক্রিস্তোবাল কোলনেরও বাবার আমলের—এ-বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাবার সময় এটাকে সে ফেলেই গিয়েছিলো, কারণ তোরঙ্গটা ছিলো এমন-সব জিনিশপত্তরে ঠাশা, যার প্রতি তখন আর তার কোনো টানই ছিলো না।

কিন্তু আজ, যখন সে তোরঙ্গটার ডালা খুললো, সে আবারও খুঁজে পেলে তার পরিত্যক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে। আসার আগে তার বাবা তাকে যে জ্যামিতি-বাক্স কিনে দিয়েছিলেন, তার দিগ্‌দর্শিকা আর বিভাজিকায় মূর্তিমন্ত, স্লাইড-রুল, কম্পাসে-আঁটা কলম, আর ত্রিভুজগুলো—সব আছে এখনো বাক্সটায়, ইণ্ডিয়া কালির ফাঁকা বোতলটায় এখনো ফিটকিরির গন্ধ মিশে আছে। আর আছে ভিনিওলার গবেষণাসন্দর্ভ, তার পাঁচ-পাঁচটা পদ্ধতি সমেত, আর তার ছেলেবেলার স্কুলের একটা খাতা যাতে সে কাগজ কেটে-কেটে ছবি লাগিয়ে-ছিলো, পায়েস্তমের মন্দির, ব্রুনেল্লেশ্চির গম্বুজ, 'জলঝালর ভবন', আর উক্সমালের মন্দিরের এক দৃশ্য—স্থপতির দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা। পোকারা খেয়ে গেছে তার আঁকা নকশার প্রথম দিককার পাতাগুলো; নকশা-আঁকার ফিনফিনে স্বচ্ছ কাগজে পেন্সিল বুলিয়ে সে যে-সব স্তম্ভশীর্ষ আর ভিত্তিদেশ নকল করেছিলো, তার শুধু হলদে একটা ঝুরঝুরে ঝালরই প'ড়ে আছে ছুঁতেই যা গুঁড়ো-গুঁড়ো

হ'য়ে গেলো। আর আছে স্থাপত্যবিদ্যার ইতিহাস, বিবরণমূলক জ্যামিতি, আর তলায়—তার স্কুলপাশের শংসাপত্রের তলায়—তার দলীয় সদস্য কার্ড। ঐ মিহি কার্ডবোর্ডটা ছুঁতেই তার আঙুল সেই শেষ বাধাটার স্পর্শ পেলো, যা হয়তো তাকে এই জঘন্য দশা থেকে বাঁচাতে পারতো। কিন্তু সে-সময় সারাক্ষণ তার চারপাশ ঘিরে ছিলো উগ্র লড়াইবাজেরা। এই উগ্রপন্থীরাই তাকে বলেছিলো সে যেন গুপ্ত সমিতির বৈঠকে গিয়ে অথবা মার্কসবাদী পুঁথিগুলো প'ড়ে অযথা সময় নষ্ট না-করে, কিংবা সমবায় চাষের গুণগান পড়ারও তার কোনো দরকার নেই—ওতে তো শুধু আছে হাস্যমুখ ট্র্যাকটরচালকের ছবি আর অবিশ্বাস্য বাঁটওলা গোরুদের তৃপ্ত মুখ—যখন কি না তার প্রজন্মের সেরা-সেরা ছেলেরা পুলিশের গুলিতে অনবরত চারপাশে প্রাণ খোয়াচ্ছে। আর একদিন সকালে এক বিক্ষোভে জড়িয়ে গেলো সে; বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নামছিলো বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা, সংঘর্ষটা শুরু হয়েছিলো আরেকটু দূরে—ক্ষুব্ধ জনতা, ভয়, আতঙ্ক, চারপাশে শাঁ-শাঁ ছুটছে ইটপাটকেল, পায়ের তলায় প'ড়ে থেঁৎলে যাচ্ছে মেয়েরা, কত মাথার খুলি ফেটে চৌচির—আর যত বন্দুকের গুলি শরীরের মাংসে যারা খুঁজে পেয়েছে চাঁদমারি। যারা প'ড়ে গেলো তাদের দেখে তার মনে হয়েছিলো, সত্যি, এমন-একটা সময়ে তারা বাস করছে যখন যেনতেন প্রকারেণ কাজে ঝাঁপিয়ে না-পড়লেই নয়, যা জনতার অধীর হতাশার কোনো খোঁজ রাখে না তেমন-কোনো নিয়মমানা বিধিশৃঙ্খলার সতর্কতা বা বিলম্ব আর নয়। আর যখন সে অধীরদের অস্থিরদের উগ্রপন্থীদের দলে গিয়ে ভিড়েছিলো, তখনই শুরু হয়েছিলো সেই ভীষণ খেলাটা, যা তাকে, কয়েকদিন আগে, ঘাড়ে ধ'রে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে এই মিনারে, শেষ আশ্রয়ের খোঁজে, এমন-এক তাড়িত, হন্যে, উদ্‌ভ্রান্ত শরীরের ভার টেনে, যাকে যেমন ক'রেই লুকোতে হবে লোকের চোখ থেকে, যে-কোনোখানে। এখন, যখন, সে নিশ্বেসে টেনে নিলে পোকায়-কাটা কাগজের গন্ধ, শুকিয়ে-যাওয়া কালির কর্পূর সুবাস, সেই তোরঙ্গের মধ্যে সে খুঁজে পেলে এমন-এক মূর্ছনা, যাকে সে কেবল এই-ভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারে: পতনের আগেকার স্বর্গ। আর এক তাৎক্ষণিক অনভ্যস্ত প্রাঞ্জলতা লাভ করলে সে, বুঝতে পারলে যে আসলে এই বন্দিত্বের কাছে সে কতটা ঋণী—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তন্নতন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখেছে নিজেকে—তার বর্তমান দুর্দশা থেকে নিবৃত্ত এক অবিশ্রাম ঘটনাপরম্পরাকে তন্নতন্ন ক'রে সে খুঁজছিলো। কোথাও-একটা জায়গায় নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্নতা ঘ'টে

গিয়েছে ; নিশ্চয়ই ; কোনো নারকীয় বদল, কোনো ভয়ংকর পরিবর্তন। কিন্তু সেই সংক্রমণের পেছনকার ঘটনাগুলোর দিকে সে যখন ফিরে তাকালে, যখন সে এটাই মেনে নিলে যে যা-কিছু ঘটেছে সবই ছিলো জঘন্য, বীভৎস, কলুষময়, যখন সে মনে-মনে শপথ করলে যে আর-কখনোই সে অমনতর কোনো কাজ করবে না যা তাকে বাধ্য করবে বিষব্রণে ভরা কোনো ঘাড়ের দিকে এমনভাবে অপলকে তাকিয়ে থাকতে—যে-ঘাড়টা তাকে সেই ভয়ংকর মুহূর্তেও বিষম সব কোলাহলের মধ্যেও চীৎকৃত আর্ত মুখটার চেয়ে বেশি আবিষ্ট ক'রে রেখেছে, সে ভাবলে তার এই উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলোকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে এখনও হয়তো অন্য-কোথাও পালিয়ে গিয়ে তার পক্ষে বাঁচা সম্ভব। শব্দের জন্যে কাতরভাবে হাৎড়েহ যন্ত্রণায়-ছিন্নভিন্ন অপরাধী ধীরে-ধীরে এগোয় দিব্য বেদিটির দিকে অনুতাপ-ব্যাকুল, ক্রুশবিদ্ধ মানবপুত্রের নীরক্ত বলিদানের মাংস ও রক্ত হাত পেতে অঞ্জলি নিতে। বুড়ি তাকে দিয়েছিলো এক বই, যখন সে ছোটো ; প্রশ্নোত্তরে নীতিশিক্ষা শেখাবার পুঁথি সেটা, মলাটে শোভা পাচ্ছে কালাত্রাভার ক্রুশ, আর ভেতরে শোনা যায় স্বীকারোক্তির প্রার্থনার মধ্যে, কুমারী মাতার স্তবগানে, সাধুসন্তদের উদ্দেশে প্রার্থনায় অনুতাপীর এই করুণ বিলাপ। কান্নার দমকে কাঁপতে-কাঁপতে, তীব্র কাকুতি-মিনতির মধ্যে, অযোগ্য অধঃপতিত অনুতাপ-দগ্ধ মানুষ ডুকরে ডাকে ঐশী দয়ার মধ্যস্থদের, সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলতেও তারা লজ্জায় ধিক্কারে গুটিয়ে যায়, যিনি কিনা তিনদিনের জন্যে নেমেছিলেন নরকে। তাছাড়া, অপরাধটার জন্য সে তো পুরো-পুরি দায়ী নয়। এটা যুগেরই কারসাজি, পরিস্থিতির চক্রান্ত, বীরত্বের বিভ্রম : ঝলমলে সব কথার ফুলঝুরি দিয়ে তারা তাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করেছিলো একদিন বিকেলে এক দরদালানের দেয়ালের আড়ালে—সে, মফস্বলের এক কিশোর, তার বাবা দরজি, তাঁর নিজের হাতে কাটা বেঢপ সেকেলে স্যুট প'রে সে খানিকটা সংকুচিত—ঐ অট্টালিকার রাজকীয় মহিমামণ্ডিত স্তম্ভশীর্ষের সম্মুখভাগে ব্রন্‌জে কুঁদে লেখা ছিলো, এক বিখ্যাত নামের তলায়, দীর্ঘায়ত এল্‌জেভোরিয়ান অক্ষরে HOC ERAT IN VOTIS [এই ছিলো আমাদের প্রার্থিত]···এবার সে ফিরে তাকালে কনসার্ট হলটার দিকে ; তার এই এখনকার কদর্য দীক্ষাটির সঙ্গে যারা জড়িত, কনসার্ট হলটার স্তম্ভশীর্ষের গ্রীক লিপিচিত্রটাকে তার মনে হ'লো তাদেরই এই ব্যঙ্গচিত্র। তারাই প্রমাণ এই শৃঙ্খলার শহর কী ধকল পোহায় : গরমের দিন তাকে অধঃপতিত করিয়ে যায়,

ভরিয়ে দেয় চলটা-ওঠা পলেস্তারা-খশা ফোস্‌কা-পড়া সব দেয়ালে, যাদের অর্ধবৃত্তাকার স্তম্ভচূড় ভার বয় লনড্রির, সেলুনের, ঠাণ্ডা পানীয়ের দোকানের সাইনবোর্ডের, যখন স্তম্ভসারের ছায়ায় কড়াইগুলোয় চিড়বিড় শব্দ ক'রে না-ফেটে শুধু হিশহিশ করে চর্বি, আর চারপাশে ঘিরে থাকে টেবিল—ভাজা পিঠের, সরবতের, বা তেঁতুলগোলা জলের। 'এ নিয়ে কিছু-একটা লিখবো আমি,' জীবনে যে একটা বাক্যও লেখেনি কখনও, নিজের ওপর বড়ো-বড়ো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেবার তাড়ায়, নিজেকে সে-ই এ-কথা বলেছিলো। সে যখন ঐ মাসগুলোর অবিশ্রাম-মদ্যপান ত্যাগ করার চেষ্টা করছিলো—অনেকে যে-আতিশয্যের ঝুঁকি নেয় আর সেই সঙ্গে তাকে প্রবলভাবে ঠেকাবারও চেষ্টা করে, আর ভেবে বসে যে এতে তাদেরই একান্ত অধিকার আছে, অনেকটা তেমনভাবে—যেন কোনো সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে অবশেষে এক আলোর ঝিলিক চোখে পড়েছে। সে জানতো না তাকে সত্যি কোথায় পাঠানো হবে, পুরোটাই নির্ভর ক'রে ছিলো বড়ে-উস্তাদের ওপর, তিনিই ঠিক ক'রে দেবেন তার পক্ষে সেরা জায়গা কোনটা। প্রথম পরীক্ষার পরেই সে পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়েছিলো, স্থপতিবিদ্যাটা আর তার শেখা হবে না—লেখাপড়াই হবে না কোনো-রকম। কিন্তু সে নিঃশর্তভাবে মেনে নেবে সব পিঠভাঙা খাটুনি, জঘন্য, মাথার ওপর কড়া রোদ, মুখে দরদর ঘাম, তৃণশয্যা আর টিনের বাটি—প্রায়শ্চিত্তের জরুরি একটা ধাপ হিশেবে। 'আমি আস্থা রাখি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে, স্বর্গ-মর্তের সৃষ্টিকর্তায়, আর হেসুস ক্রিস্তোয়—যিনি তাঁর একমাত্র সন্তান, যাঁকে কল্পনা করেছিলো দিব্য আত্মা, যিনি জন্মেছিলেন কুমারী মারিয়ার গর্ভে…' তার শুধু মনে পড়লো প্রেরিতদের আস্থাজ্ঞাপনের সূচনাটুকু। সে ঠিক করলে ঐ ছোট্ট বইটা সে নিয়ে আসবে, কালাত্রাভার ক্রুশ-বসানো যে-বইটা সে জাজিমের ওপর ফেলে রেখে এসেছে—হঠাৎ যখন সে খেয়াল করলে যে তার আর কোনো খিদে নেই। সে মাছের কথা ভাবলে, মাছ—তার মনে হ'লো—যেন বমি-পাওয়ানো কোনো খাদ্য, ঐ চ্যাপটা জীব, কাচের মতো চোখ—যেগুলো কোনো চোখই নয়, বরং আঁশের দুর্গন্ধের মধ্যে আটকানো বোতাম যেন; মাংসের কথা ভাবলে সে, আর কদর্য মনে হ'লো তাকে, ঐ আকারহীন ডেলা, যার মধ্য থেকে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত; ফলমূলের কথা ভাবলে সে, আর তার মনে পড়লো ফলগুলো সব অম্ল, কষায়, আর শীতল; সে ভাবলে রুটির কথা, আর তার মুচমুচে আস্তর, তার সব দলা, তার সব গুঁড়ো, আর সবই তার বিষম

অসহ্য বোধ হ'লো। সে খেতে চায় না। প্রায়শ্চিত্তের পথে তার প্রথম পদক্ষেপ হিশেবে সে ঈশ্বরকে নিবেদন করবে তার জঠরের শূন্যতা। অমনি কেমন হালকা লাগলো নিজেকে, যেন পুরস্কৃত, উপলব্ধ। আর তার মনে হ'লো কোনো উজ্জ্বল উপলব্ধি তাকে এখন বস্তুর সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গ সম্পর্কে নিয়ে এসেছে, তার চারপাশের বস্তুর শাশ্বত ও ধ্রুব বাস্তবতার সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে উঠেছে তার। সে বুঝতে পারলে, রাত্রিকে বুঝতে পারলে, আকাশের তারাদের বাতিঘরের সন্ধানী আলোয় যে এগিয়ে আসছে তার দিকে সেই সমুদ্রকেও সে বুঝে ফেললে ; ঐ সন্ধানী আলো বার-বার ঘুরে-ঘুরে আসে, তীব্র আলোয় তার চোখমুখ ধাঁধিয়ে যায়, তাকে যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু তবু তার কোনো নালিশ নেই। কিন্তু সব বুঝে ফেলার এই-যে অনুভূতি, তা কিন্তু কোনো কথায় কিংবা কোনো ছবিতে ফোটানো যাবে না। তার আস্ত শরীরটাই যেন এই মুহূর্তে ধ্রুব সত্যের সঙ্গে ওতপ্রোত মিশে গিয়েছে। সে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লো ইটের ছাতে—এখনো ইট থেকে ঝলশে উঠছে দিনের তাপ। মিনারের তলায় ছায়ায় গা ঢেকে সে এমন প্রাঞ্জলতার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

চতুর্থ দিনে সে জেগে উঠলো দুপুরের আগে, মুখের মধ্যে কেমন-একটা কাদা-কাদা স্বাদ। সারা গায়ে ঘাম, মন্থর গতিতে বড়ো-বড়ো ফোঁটা বেরিয়ে আসছে তার শরীরের সব রন্ধ্র থেকে—তার চোখের তলা থেকে, ঘাড় থেকে, কপাল থেকে—এমন-একটা বোধ জন্মাচ্ছে তার মধ্যে যে সে যেন হলদে হ'য়ে গেছে, শুষ্ক ও শীর্ণ, সারা গা নোংরা। নিজেকে যাতে দেখতে পারে, এইজন্যে তার কাছে যে কোনো আয়না নেই, এটা একদিক থেকে ভালোই—কারণ তাহ'লে আরো-খারাপ হ'তো। খড়ের গাদার ওপর সে পাশ ফিরলো, মাথার চাপে খড়ের গাদার ওপর আংটার মতো যে-গর্তটা তৈরি হয়েছে, তা থেকে দূরে আসার জন্যে সে স'রে এলো। তাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে এরই মধ্যে তার পুরুষাঙ্গ চেতিয়ে উঠেছে বেদনাহতভাবে, তার বুক আর উদরের একটানা দপদপে ভাবটায় সে যেন উত্ত্যক্ত আর ক্রুদ্ধ। তার স্পর্শ তথ্যটাকে কঠিন সত্য ব'লেই প্রমাণ ক'রে দিলো, আর সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো তোরঙ্গের ওপর, কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না ক্ষুধার এমন বিপুল চাপের মধ্যেও তার শরীর এতখানি প্রচণ্ড শক্তি জমিয়ে রেখেছে। পাল্লা-আটকানো দরজার ওপাশে, খাবারঘর পেরিয়ে বোনঝিটি কথা বলছে দরজিগিন্নির সঙ্গে, কিন্তু সে-যে কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। বুড়ি নিশ্চয়ই আগের চেয়ে অনেক ভালো

বোধ করছে। আগেও অনেকবার এমনি সঙিন অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে বুড়ি, শেষে তার সব পাচন ও পথ্য তাকে সারিয়ে তুলেছে। কিন্তু এবার অসুখটা যেন বেশিদিন ধ'রে চলেছে। তাই খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে একটু ভাবনাচিন্তা এখন জরুরি হ'য়ে উঠেছে। গত ক-দিনের এই প্রাঞ্জলতাকে—উপবাসের এই উল্লাসকে—এবার খাদ্যগ্রহণের পায়ে সঁপে দিতে হবে। এখন যখন খাদ্যের জন্যে বুড়ির ওপর কিছুতেই নির্ভর করা যাচ্ছে না, তাকে ভাবতে হবে অন্য-কোনো উপায়ের কথা। কোনো বাড়িতে, কোনো ঘরে, নিশ্চয়ই এমন-কোনো খাবার আছে যার জন্যে আগুন লাগে না। বাচ্চা বয়েসে সে-মাঝে-মাঝেই ভাবতো আগাছার সুরুয়ার স্বাদ কেমন হবে কে জানে, অথবা পাতা সেদ্ধ বা কচি ঘাসের স্যালাদ। তৃণভোজী প্রাণীরা যদি ঘাসপাতা খেয়েই বেঁচে থাকতে পারে, তবে কোনো মানুষই বা পারবে না কেন? তাছাড়া, সবুজ কচি খড়ের শিষ চিবোতে কারই বা ভালো লাগেনি ছেলেবেলায়? সে তার চারপাশে তাকালে: কাঠ, মাটি, ঝুল। সেকালে অবরুদ্ধ আক্রান্ত নগরীতে লোকে জলে চামড়া ভিজিয়ে খেয়েছে। তারা চিবিয়ে খেয়েছে জিন, সেদ্ধ করেছে লাগাম, কোমরবন্ধ, চামড়ার চপ্পল। আর একবার কোন্-এক বানের জল ঢোকা খনির মধ্যে লোকে আবিষ্কার করেছিলো যে কাঠের যে-খুঁটিগুলো আছে ঠেকনো হিশেবে, তাদের বাকলগুলো বেশ টাটকা আর তুলনায় নরম···ছাতের বাইরের দেয়ালে যাতে তার কোনো ছায়া না-পড়ে, সেইজন্যে সে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো, জিনলাগামের দোকানটার উঠোনে তাকাবে ব'লে। ফিটনটার ওপর অ্যাদ্দিন ধ'রে যে আধশুকনো চামড়া টান ক'রে মেলে রাখা ছিলো, কেউ সেটা সরিয়ে দিয়েছে। এবার সে তাজ্জবই হ'লো নিজেকে নিয়ে। সে কিনা নাগালের বাইরের ঐ চামড়াগুলোর দিকে একবার শুধু তাকাতে চাচ্ছিলো, যেন কোনো কশাইখানার নুনমাখানো মাংসের সুদূর গন্ধ তাকে কোনো সান্ত্বনা বা উপশম দেবে। কাঠ, মাটি, ঝুল। 'বেজায় নিষ্ঠুর এস্পানি সেনাপতি যখন পাড়াগাঁয়ের লোকদের ঝেঁটিয়ে এনে তুলেছিলো শহরে,' বুড়ি তাকে বলেছিলো একদিন, 'লোকে তখন শুধু জল খেয়ে-খেয়ে ফুলে ঢোল হ'য়ে গিয়েছিলো।' সে কলের মুখটা খুললো, আঁজলা পেতে নিলে জল, ঢকঢক ক'রে পান করলে, জঠর ভরাবে ব'লে। রোদে-তাতা নলগুলো থেকে উষ্ণ জল বেরিয়ে চ'লে গেলো তার পেটে, ভারি, ফাঁকা, ভিজে কাঠের হিম গুঁড়োর মতো স্বাদ তার। একটা ধারালো উৎক্ষেপ খিল ধরিয়ে দিলো

তার মধ্যে, তাকে নুইয়ে ফেললো, আর দু-হাতের চেটোয় ভর দিয়ে সে উপুড় হ'য়ে পড়লো, বমি ক'রে দিলে সব জল, তারপর সব জল বেরিয়ে যাবার পর রইলো শুধু মোচড়—প্রত্যেকবারই যেন নাড়িভুঁড়ি সব উলটে উঠে আসতে চাইলো গলায়, ঘাড়ে যেন এক ভোঁতা রদ্দা পড়ছে অবিরাম, তার পিঠের দাঁড়া এমনভাবে বেঁকে গেছে যেন সে বিষে-জর্জর কাৎরে-ওঠা কোনো কুকুর। অবসন্ন, সে দেয়ালের তলায় প'ড়ে রইলো, শরীরটা এমনভাবে শিউরে-শিউরে উঠছে যেন চাবুকের ঘা পড়ছে, খাবার ভাবনাটা এমনভাবে হানা দিয়েছে তার মধ্যে যে তাছাড়া আর-কিছুই সে ভাবতে পারছে না—এই ভাবনাটা যেন এক বিষম আদেশ, এক প্রবল তাড়না—প্রায় বিমূর্ত ধরনের। তার উপোশের প্রথম দিনে যেমন ভেবেছিলো এখন আর সে তেমন ভাবছে না যে তার জিভ কোন্ খাবারের স্বাদ পছন্দ করবে, অথবা তার ছেলেবেলার স্মৃতি সাজিয়ে আঁকছে না বাড়ির সেই বড়ো রান্নাঘরটা—সদ্য গরম তেল থেকে তোলা মাছভাজা, কিংবা তুলতুলে মাখননরম কড়াইশুঁটির সবুজ, জাফরান-মেশানো হলদে ভাত, দাঁতের ফাঁকে ভেঙে-যাওয়া কোনো পিঠের মুচমুচে আস্তর—যা সেদিন তার উৎসুক লালায় ভরা মুখে অপ্রাপ্য সব স্বাদ আর গন্ধ এনে হাজির করেছিলো। কেউ যখন কোনো খাবারের কথাই শুধু ভাবছে এখন, তখন আর পঞ্চব্যঞ্জনের কোনো বৈচিত্র্য নেই—সে শুধুই খাবার, যা-ই হোক না কেন খাবারই, শুধু খেতে পারলেই হ'লো—যেন কোনো সদ্যোজাত শিশুকে কেউ ফেলে গেছে কবরখানার দেয়ালের পাশে, আর সে একটানা কাঁদছে কষ্টে, পাথরের মধ্যে খুঁজছে তার মাকে···সে গলার স্বর শুনতে পেলে। ঘোরানো সিঁড়িটার নিচে থেকে দরজিগিন্নি ডাকছে বোনঝিটিকে—তার নতুন জামাটা প'রে দেখবার জন্যে, ঠিক হয়েছে কি না। সে অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো জুতোর শব্দ কখন নিচে নেমে যায়; তুলনায় ঠাণ্ডা ব'লে শেলাইকলগুলো নিচের বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শেষটায় সেখান থেকে কথা শোনা গেলো। ঠেকনো আর খিল সরিয়ে সে দরজার পাল্লা খুললো, গত চারদিন ধ'রে যে-পাল্লাটা তাকে বাড়ির বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে। বুড়ি ঘুমোচ্ছে তার খাটের ওপর, ঈস্টারের পরবের তালপাতার ঢালের তলায়। হা-করা মুখ দিয়ে কষ্ট ক'রে-ক'রে শ্বাস নিচ্ছে। তার পাশেই একটা চেয়ারের ওপর একটা সুকুয়ারে বাটি ভর্তি ক'রে দুধে-চোবানো জই। সঙ্গে যে-চামচেটা আছে সেটা ছোটো ব'লে,

ওপরে গ'লে-যাওয়া চিনি ছড়ানো সেই জইয়ের দলার মধ্যে একটা থাবা ব'সে গেলো। আর তারপর সকলকে জিভ, লোলুপ, শশব্যস্ত, সাগ্রহ, চুরি-করা খাবার খাচ্ছে ব'লে একটু আবার ভীতও, বাটিটা নিঃশেষ ক'রে দিলে চেটেপুটে, যখন সব তলানি শেষ, চেয়ারের ওপর ছিটিয়ে-পড়া প্রতিটি দলা শেষ, তখন শুয়ারের মতো ঘোঁৎ একটা আওয়াজ জানান দিলে তার তৃপ্তি। শরীর উঠে দাঁড়ালো হাঁটুতে ভর দিয়ে, তারপর আবার হাত, কোয়েকার জইয়ের বাক্সের মধ্যে ঢোকানো, শুকনো জইয়ের দানা তুলে নিলে মুঠোয়। তারপর দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলো আবার। সন্ধে নেমে আসছে। একটা গুণটানা নৌকো চ'লে গেলো মিনারের সমান তল দিয়ে সমুদ্রে, পড়ন্ত সূর্যের আলোর পটে, কনসার্ট হলকে যা রাঙিয়ে দিয়েছে কমলা রঙে। পার্কের বীথিপথে, লতাঝোপের পাশে, একদল কুকুর ঘিরে ধরেছে এক যৌনতায় তেতে-ওঠা এক লালচে রঙের কুক্কুরীকে, আর পুরুষদের হানায় কাতর ডুকরে উঠছে সে। আধুনিক বাড়িটার ওপরতলা থেকে ভেসে আসছে বাজনার শব্দ—যা সে আগেও শুনেছে অনেক বার—প্রথমে দ্রুত লয়ে, তারপর করুণ, মন্থর, একটানা। সেই মুহূর্তে, মেঝেয়-প'ড়ে-থাকা সে, তন্দ্রাতুর, তার পেট ঠাশা, ব্যথাও করছে একটু, গুড়গুড় ক'রে ডাকছে, তৃপ্তির মধ্যে ফিরে আসছে বমি-বমি ভাব ; বাজনার এই চাপা স্বরগুলো ছাপাখানার বিরস ঘটাং-ঘটাং শব্দের সঙ্গে কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে তার মগজে। দরজার ওপাশ থেকে বুড়ি ডাকছে তার বোনঝিকে, একটু ত্যক্ত স্বরে, সে যে আগের চেয়ে ভালো বোধ করছে, তারই প্রমাণ। 'মাসি, অত ঠেসে খেয়ো না,' বললে দো-আঁশলা মুলাটো মেয়েটি, তার নতুন পোশাক গায়ে দিয়ে ফিরে এসে যখন দেখলে যে কোয়েকার জইয়ের ঠোঙা থেকে সব জইই উধাও। 'অত খাওয়া তোমার ঠিক হবে না।' আর তার ছেলেবন্ধু, সৈন্যটি, যেহেতু তার জন্যে অপেক্ষা করছে রাস্তার মোড়ে, সে ঘোরানো সিঁড়িতে জুতোর খটখট তুলে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলো।

চমকপ্রদ নতুন বিষয়টি হ'লো ঈশ্বর। ঈশ্বর যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বুড়ির জ্বালানো চুরুটটায়, বুড়ি যেদিন অসুখে পড়লো ঠিক তার আগের সন্ধ্যায়। আগুন থেকে জলন্ত অঙ্গার মুখের কাছে তুলে চুরুট ধরাচ্ছে—এই চেনা দৃশ্যটা আগে কতবার ঘটেছে তার ছেলেবেলার রান্নাঘরে—কিন্তু হঠাৎ এই দৃশ্য কূলছাপানো তাৎপর্যে গর্ভবতী হ'য়ে উঠলো। আংটাটা তুলে ধরেছে

হাত—হাতটি এমন আগুন তুলে ধরেছে যা এসেছে সুদূর অতীত থেকে—আগুন, বস্তুকে ভস্ম করার আগেকার এই আগুন, শিখায় রূপান্তরিত করার সময়কার—বস্তু, যা শুধু আসলে আগুনের একটা সম্ভাবনাই মাত্র থাকতো ঐ হাতটি যদি তাকে না-জ্বালতো। কিন্তু এই বর্তমান আগুন যদি হয় এমন-কিছু যে নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ, এই আগুনকে পেতে গেলে তবু চাই পূর্ববর্তী কোনো কাজ। আর এই কাজ মেনে নেয় তারও আগেকার আরেকটা কাজ, এবং তারও আগেকার অনেক কাজের পরম্পরা—যা শুধু আসতে পারে কোনো প্রথম ইচ্ছাশক্তি থেকে। কোনো-একটা উৎস তাই জরুরি, চাই এক আদি প্রস্থানভূমি, আগুনের এক অনর্গল ফোয়ারা, যা কল্পনাতীত অতীতে প্রদীপ্ত ক'রে দিয়েছিলো আদি মানুষের মুখশ্রী। আর এই প্রথম আগুন—সে নিশ্চয়ই আপনাআপনি জ্ব'লে ওঠেনি ফস ক'রে। তার মনে হ'লো সে যেন সবকিছুতেই দেখতে পাচ্ছে এমনি-এক পরম্পরা, অন্য-কিছু থেকে শক্তি আহরণ ক'রে নেবার এক অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়া এবং সেই একই কর্মকলাপের ক্রমোত্থান যদিও অসীম বা অনাদি হ'তে পারে না, আবশ্যিক ব'লেই সব সুতো গিয়ে মিলেছে কোনো আদি সঞ্চালকের হাতে, সবকিছুর যে আদি কারণ, প্রথম উৎস, চিরন্তনতায় স্থির বিন্যস্ত আর পরম দক্ষতায় আশ্চর্য সমৃদ্ধ। এমন-এক মূর্তি যা সবকিছু ব্যাখ্যা ক'রে যায়, তাই দেখে তার বাবার নিরীশ্বরবাদ এখন তার কাছে হাস্যকর ব'লে অর্থহীন ব'লে মনে হ'লো; আর সে অবাক হ'য়ে ভাবলে যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ যে এমনভাবে একটা নগণ্য অঙ্গারের জ্বলন্ত ভাবনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তা কেন তার আগে আর-কারু মাথায় খেলে যায়নি। আর কাল যখন রাস্তার ওপাশের বাড়ির বাচ্চারা গান করছিলো, 'তিন্দি! তান্দি! কাল কিনা রবিবার! বিল্লি ও টেকো তোতা—বিয়ে তারা করবেই—কালকে, কালকে,—কাল কিনা রবিবার!' আর গির্জের ঘণ্টা বাজছিলো ঢং-ঢং, সমবেত প্রার্থনার জন্যে, সে খুলেছিলো কালাব্রাভার ক্রুশবসানো কালো-সোনালি বইটা; এই বই তাকে এখন এক অন্তহীন বিস্ময় উপহার দেয়, তাকে—যে কিনা বড়ো হয়েছে, প্রশ্নোত্তরে ধর্মজ্ঞান লাভের কোনো বই না-প'ড়েই, মুক্তচিন্তার ধারক এক ডারুয়িনবাদী দরজির দোকানে। এ-বইয়ের প্রতিটি পাতা তার কাছে উদ্ঘাটন ক'রে দিলে প্রার্থনাসভার স্বপ্নেও-না-ভাবা সৌন্দর্য, তার মধ্যে সঞ্চারিত হ'লো কোনো গূঢ় রহস্যের জট খোলার উল্লাস, যেন সে এখন দীক্ষিতদেরই একজন, কোনো সংঘভ্রাতৃত্বের

গোপন কথার শরিক। আগে সে কখনো থমকে গিয়েও ভাবেনি যে এতকাল যাকে সে ভেবেছে বেদির ওপর ছড়ানো নিছক একটা কাপড়ের ফালি ব'লে, তা আসলে সেই চাদর যা তাঁর শরীর মুড়েছিলো; উপাসনার আলখাল্লা, তার কোমরবন্ধনী, লম্বা ঢোলা জোব্বা এ-সবও যে আসলে মানুষের সবচেয়ে মহৎ উত্তরণপ্রক্রিয়ার তিনটি অধ্যায়ের স্মারক, তা তো সে কখনো জানেনি আগে। রক্তিম আনুষ্ঠানিক পোশাক—যা তাকে পিলাতেভবনের থামগুলোর কথা মনে করিয়ে দিলে, তা থেকে সে চ'লে গেলো যেখানে হেসুস ক্রিস্তো ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন সেই কালভারিতে, আর সেখানে সে সসম্ভ্রমে থেমে পড়লো পানপাত্রের কানার কাছে; আর যত সে ভাবলে মনে-মনে, যত সে সব বুঝতে শুরু ক'রে দিলে, তত সে বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে গেলো, মহত্তম নাট্যটির সবচেয়ে মহার্ঘ উপাদানের ভেতর, সেই চির-উন্মুক্ত সমাধির অতীন্দ্রিয় স্থানবিনিময় তাকে অভিভূত ক'রে ফেললো; অন্ধকার—যা এই ধাতুকে রূপান্তরিত করলো কল্পনাতীত গভীরতায়—সেখানে কোন্-এক ছায়া দুর্লভ রত্নপাথর আর সোনার ঝিলিকের মধ্যে মিলিয়ে গেলো; এক পুনরাবর্তিত কিমিয়া যা এই ঝকমককে বানিয়ে দিলো আদিষ্ট, মানবজাতির মহাপ্রতীক্ষার বিশাল নিশায়। এমনকী জল—যার প্রার্থনানির্ভর তাৎপর্য সে এতদিন অবহেলা করেছিলো—সেও এখন পরিত্রাতার পঞ্জর ও জঙ্ঘার মধ্য থেকে কথা বলতে শুরু করলো। বিভিন্ন উপলক্ষেই সে গির্জেয় গিয়েছে, বাবা লা হাবানায় গেলেই তার এক ভক্তিমতী পিশি তাকে নিয়ে যেতো, যারা এখনও শক্ত খশখশে কাপড়ের বা আলপাকার পোশাক বানাতে নির্দেশ দিতো তাদের জন্যে কাপড় কিনে নিয়ে। গির্জের ধারোক ছাঁচ ও চিত্রময় বেদির সামনে সে নতজানু হয়েছে, উঠে দাঁড়িয়েছে, আসনে বসেছে, অন্য-সকলের মতোই; কখনো সন্দেহও করেনি যে যাজক যখন তাঁর নির্দিষ্ট আলখাল্লা প'রে নিতেন, তখন তিনি বস্তুত সংরাগে দীপ্যমান মানবপুত্রেরই ভূমিকা গ্রহণ করতেন। সে পুরো অনুষ্ঠানটা লক্ষ করেছে, গম্বুজের কড়িবরগার দিকে তাকিয়ে, যেখানে ঝুলে-ঝুলে ঘুমোতো বাদুড় আর চামচিকেরা—সমবেত প্রার্থনাটি ছাড়া আর-সবকিছুতেই ছিলো তার গভীর মনোযোগ—কখনো ভাবেনি যে এই সমবেত অনুষ্ঠান আসলে তাঁরই ব্যঞ্জনা, তাঁরই নিরাভরণ কিন্তু জরুরি প্রতীকে প্রবনমিত—সেই পরম রহস্য আসলে সরাসরি তাকেই, নিজেকেই, জড়িয়ে গ'ড়ে উঠেছে। আর এখন যখন সে-সম্বন্ধে অবহিত হ'লো, সে আবিষ্কার করলে

মহিমা গীতের সরল সব আন্দোলনে, সুসমাচারে, নৈবেদ্য গানে আদি উপাদান-গুলোর সেই সুবিশাল ভাবোল্লাস স্থপতিবিদ্যা যাকে রূপান্তরিত করেছে মৃগয়ার জয়স্মারক ভাস্কর্যে—বৃষমুণ্ডের এক আলংকারিক প্রকাশে; আদিম জিনলাগামের কাঠামোর ডালপালাগুচ্ছ বাঁধার দড়িতে পরিণত হয়েছে বিশুদ্ধ পাইথাগোরীয় অনুপাতে, স্তম্ভশীর্ষেরই অর্ধবৃত্তাকারে। উপলব্ধির এমন ক্ষমতার অধিকারী হ'য়েও, এমন-সব ধ্রুব সত্যকে সম্যক অনুভব করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও, এতকাল সে তাকে জানতে পারেনি, অপব্যয় করেছে তার সব ক্ষমতার, আর সব কিনা শুধু সেইসব ভাষণ শুনতেই যা ন্যায্য ব'লে প্রতিপন্ন করেছে মহৎ এবং কদর্য—দুইকেই। ওহ্., আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি; আমি বি শ্বা স ক রি যে পন্তিয়ুস পিলাতের হাতে তিনি লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন, তাঁকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়েছিলো, সমাধিস্থ করা হয়েছিলো; তিনি নেমেছিলেন নরকে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন মৃতদের মধ্য থেকে। আমি বিশ্বাস করি যে তিনি আরোহণ করেছেন স্বর্গে, উপবিষ্ট হয়েছেন পরম পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে। আমি বিশ্বাস করি যে তিনি ফিরে আসবেন একদিন, জীবিত ও মৃত সকলেরই বিচার করতে···আর ঐ শেষ বিচারের তূর্যনাদেরই মতো কিছু-একটা আবার শোনা যাবে আধুনিক বাড়িটার সর্বোচ্চ তলে, যেখানে কেউ-একজন হঠাৎ একটা শস্তা গ্রামোফোন কেনার আনন্দে মশগুল হ'য়ে—আওয়াজটা মোটেই ভালো না—একই সংগীত বাজায় দিনরাত, বার-বার, কখনো-কখনো ছুঁচটাকে আবার চট ক'রে ফিরে বসিয়ে দেয় একই জায়গায়। এ যেন পর-পর অনেকগুলো গান রেকর্ড করা—যদিও ভিন্ন-ভিন্ন, তবু পরস্পরকে তারা অনুসরণ করে এক অনড় অমোঘ পারম্পর্যে, একই ক্রম অনুযায়ী। প্রথমে আসে কিছু-একটা বিশৃঙ্খল, তালগোল-পাকানো, জটিল, যেখানে শোনা যায় ভেঁপু আর শিঙার শব্দ, একটা সামরিক কুচকাওয়াজের মতো সুর কিন্তু কখনো যা পুরোপুরি সমরসংগীত হ'য়ে ওঠে না। তারপর আসে এক করুণ, মন্থর, একঘেয়ে অংশ। তারপরেই এক সানন্দ নৃত্যচ্ছন্দ। কিন্তু আবার তা বাধা পায় এক নতুন সমর-আহ্বানে, যা তবু কিন্তু এবারও পুরোপুরি সামরিক হ'য়ে ওঠে না: অনেকটা যা সে শুনেছিলো ফরাশি অভিজাতদের নিয়ে তোলা বোকা-বোকা তথ্যচিত্রটায়, যাঁরা কোনো মৃগয়ায় বেরুবার আগে, সমবেত প্রার্থনা শুনতে যেতেন, যেখানে আশিস করা হ'তো তাঁদের শিকারি কুকুরদের, যেখানে ফ্রককোট-পরা খেদার দল কী-সব যন্ত্র বাজাচ্ছিলো যাদের দেখাচ্ছিলো তামার তৈরি বিশাল সব মোচার আকারের

বাজনার মতো। আর এ-সুর সবসময়েই থেমে যায় এক লঘু, চঞ্চল, লাফানে ছন্দে, যা সবসময়েই মনে করিয়ে দেয় বাচ্চাদের খেলনাকে—যা, দুটো সমান্তর কাঠির পরস্পরবিরোধী ওঠা-পড়ায়, দুটি পুতুলকে দিয়ে একান্তর হাতুড়ি মারায় এক ঘণ্টার ঢালে; তারপরেই আসে হাওয়ায় ভাসা ভাল্জ্ নাচের সুর, যা ঘুরে-ঘুরে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে রাজকীয়-কিছুতে, মহান-কিছুতে, তূর্যনাদে, পেতলের ঢাকের শব্দে, দামামার নাদে, ঠিক যেমন সে শুনেছিলো সাংক্তি-স্পিরিতুস্-এ, দরজির দোকানের কাছে, গাঁয়ের ব্যাণ্ডদলের অনুষ্ঠানের রাতগুলোয়। আর তারপর সেই শেষ, চরম-পরম কোলাহল, যেখানে আবারও ফিরে আসে মৃগয়ার শিঙার শব্দ…বোনঝি আবারও ঘোরানো সিঁড়ি-বেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে। এবার তার দরজা খোলার সময়, দেখার সময় বুড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে কি না, তুলে-আনা সেই সুরুয়ার বাটি, অন্যান্য বারের মতো এবারও যা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে বিছানার পাশে। কিন্তু এবার, যখন সে বাটিটা তুলে মুখে দেবে, তার হাত মধ্যপথে শূন্যে থেমে গেলো। সেই আশ্চর্য না-কোঁচকানো নেগ্রো বুড়ির মুখে দুটি চোখ খুলে গেছে, কী-রকম কাচের মতো সুদূর অভিব্যক্তিহীন তীব্রতায় তাকিয়ে আছে তার দিকে; সুরুয়ার মধ্যে লিকলিকে মুর্গির ঠ্যাঙের গায়ে তেলতেলে মাংসের ডেলা, ঠিক যেমন বিক্রি হয় কশাইখানায়, যেখানে কাটা মুর্গির মাংস বেচে; বাটিতে চুমুক না-দিয়েই সে সেটা নামিয়ে রাখলে ওষুধের বোতলগুলোর পাশে। এক বুড়ো মোরগের পায়ের নখ, তিনটে খোলশ-ঢাকা আঙুলে বসানো, তেড়াব্যাঁকা, তার কোঁচকানো চামড়ায় যেন মানুষের চামড়ারই প্রতিভাস, প'ড়ে আছে এক আদ্ধেক-খোশা-ছড়ানো মাংসখণ্ডর গায়ে। যা ঠেকানো যাবে না সেই বিষম ক্ষুধার ওপর বড্ড দেরিতে পড়েছে বুড়ির সেই স্থির অপলক চাউনি: এক মুহূর্তের দ্বিধার পর তার মুখ ডুবে গেলো ঐ রোববারের সুরুয়ার বাটিতে, নাক দিয়ে হাঁসফাঁস শব্দ বেরুচ্ছে, দাঁত চিবুচ্ছে প্রবল বেগে, কোয়েকার জইয়ের ঠোঙার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে। ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে লোকটা, তার মুখ কাঁচা জইয়ের গুঁড়োয় মাখামাখি, বুড়িকে ভালো ক'রে শুইয়ে দিলে বিছানায়, গলা অব্দি চাদর টেনে দিলে। বুড়ির কপাল ছুঁতেই তার মধ্য দিয়ে এক শিহরন খেলে গেলো, আর অমনি তার সারা শরীর টান-টান হ'য়ে উঠলো: বুড়ির গাল-কপাল আড়-ধরা, শক্ত, আর কপালের ওপর মুঠো-পাকানো হাতটা প'ড়ে গেলো কপালেরই ওপর, যখন সে সেই হিমশীতল

কব্জিতে নাড়ির শব্দ শোনবার চেষ্টা করলে। ঘোরানো সিঁড়িতে কার যেন পায়ের আওয়াজ উঠলো। বোনঝির উঁচু গোড়ালির জুতোর আওয়াজ, সে ফিরে আসছে, সঙ্গে লোকজন নিয়ে; তারা বিষম শোরগোল জুড়ে দিলে তক্ষুনি, যেই সে তার পেছনে দরজার পাল্লা বন্ধ ক'রে দিয়ে মিনারের আশ্রয় পুনর্দখল করলে। কী ঘটেছে, তার বিভীষিকা তাকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে, অভিভূত, সে জবুথবুভাবে উবু ব'সে আছে মেঝেয়, তোরঙ্গের গায়ে পিঠ ঠেকানো, তার সব মনোযোগ এসে জড়ো হয়েছে তার দুই কানে। স্যাংচাতে-স্যাংচাতে এসেছে দরজিগিন্নি; শোলার জুতো পায়ে হাঁপানির টানে-টানে যে উঠে এসেছে সে এ-বাড়ির তদারক করে; প্রতি পদক্ষেপে জুতোর ডগার খটখট তুলে যে যায়, সে ঐ সৈন্যটি—ঐ সে এখন আবার নিচে নেমে যাচ্ছে, মরা বুড়িকে ঠিকভাবে শুইয়ে দিয়ে, কবর দেবার জন্যে যা-যা চাই সব জোগাড় করতে। নিচের উঠোনে জানলা থেকে জানলায় উড়াল দিচ্ছে প্রশ্নের ঝাঁক। আর তারপর এলোমেলো পায়ের আওয়াজ তুলে এসেছে মুদ্দোফরাশের স্যাঙাৎরা, তাদের বরফ আর মোমবাতি নিয়ে। তারপর শুরু হয়েছে মৃতদেহের পাশে নিশিজাগর—দূর-দূর মহল্লা থেকে এসেছে আত্মীয়স্বজন—হেসুস দেল্ মোন্তে, কালভারিও, সান্তা মারিয়া দেল রোসারিও—নানা অঞ্চল থেকে, পরস্পরের অস্তিত্বের কথা শুধু তখনই যাদের মনে পড়ে যখন তারা শোনে যে তাদের সংখ্যা আরো হ্রাস পেয়েছে। মাঝে-মাঝে কেউ এসে ঠেলেছে বন্ধ দরজাটা, ছাতে যাবার চেষ্টা করেছে, আর প্রথম দিনগুলোর আতঙ্ক আবার পেড়ে ফেলছে তাকে। দরজাটা শক্ত ক'রে ঠেকনো আর খিল দিয়ে আটকানো, যারা খোলবার জন্যে ধাক্কাধাক্কি করছিলো, তারা একটু পরেই চেষ্টাটা ছেড়ে দিলে। কিন্তু নড়বড়ে কাঠের পাল্লার প্রতিরোধশক্তি এই ঠেলাঠেলিতে এক্ষুনি যাবে। কাল যখন ওরা কফিন নিয়ে যাবে, বাড়ির তদারককারী লোকটা—কারু কোনো চাবি হারালে চিরকালই তার বেজায় খারাপ লাগে—কোনো তালাওলাকে ডেকে আনবে, যার নিরীশ্বর কাঁধ থেকে ঝুলবে সবখোল চাবি। আর যখন ঐ সবখোল চাবিটা ঘুরে যাবে এই জংধরা তালায়, তক্ষুনি বোঝা যাবে দরজার নীল রং-করা পাল্লাগুলো চৌকাঠের বাজু থেকে এইজন্যেই নড়ছে না যেহেতু ওপাশ থেকে হুড়কো দিয়ে কেউ তাকে জোরে আটকে রেখেছে, আর তখন তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবেই। না, এই লোকগুলোর কাছে নয়, কারণ এরা তার কিছুই করতে পারবে না, তারা এমনকী পুলিশও

ডাকবে না এই জেনে সে ভয়ংকরের দলেরই একজন। তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে স্বাধীনতার কাছে—রাস্তা, ভিড়, সজাগ চোখগুলোর কাছে—আর তার মানেই তার দিনগুলো হাতে গোনা যাবে। সে আবার যন্ত্রণা পাবে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিগুলোর কাছে, প্রত্যেকবার খাওয়া শুরু করবামাত্র, প্রত্যেকবার খাওয়া শেষ করার পর, প্রত্যেকটি বিছানার চাদরের শুভ্রতায় হাড়ে-মজ্জায় অনুভব করবে হাসপাতালের বিছানার হিমশীতলতার অসহনীয় আবেশ। তার মানে হবে: ঘুম শেষ হবার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে, অন্ধকারে ঘুরঘুর করবে ছায়া গোপন খবর টেনে বার করবার জন্যে, ভয় পাবে নিজের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনিকেই; তার মানে হবে: হলঘরের বন্ধ খড়খড়িতে হাওয়া ধাক্কা দিলে, অথবা বেমক্কা কোনো পাকা ফল টুপ ক'রে খ'শে পড়লে উঠোনে, কুঁকড়োনো শরীরটা পালাতে চাইবে এমনকী নিজের কাচ থেকেও। যখন আর কেউ তার কাছ থেকে কোনোকিছু প্রত্যাশা করেনি, যখন আতঙ্কে সব আশ্রয় থেকে তাকে বার ক'রে দেয়া হয়েছে, তখনই তার মনে পড়েছে বুড়িকে; সে তো ভুলতে পারেনি কবে একদিন তাকে সে কোলে ক'রে বেড়িয়েছিলো, তাকে এমন-সব নাম ধ'রে ডাকতো সে তখন যে পরে যখন তারা তাকে সে-কথা সাত কাহন ক'রে শুনিয়েছিলো, তার ভারি মন-কেমন ক'রে উঠেছিলো। বুড়ি তাকে দেখলে, কৃশ, কঙ্কালসার, উশকোখুশকো, উদ্‌ভ্রান্ত, তার গাঢ়-নীল স্যুটের তলায় জামাটা ছেঁড়া, নোংরা—ঐ স্যুটটা সে পরেছিলো যাতে সহজে গা ঢাকা দিতে পারে অন্ধকারে—সে চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিলো, বলেছিলো তার বাড়িতে কোনো আপদ বা ঝামেলা চায় না, যার সূচনা খারাপ তার শেষটা আরো-অধম। প্রায় বিনি পয়সাতেই একদিন সে তাকে ভাড়া দিয়েছিলো মিনারের চিলেকোঠা, সাংক্তি স্পিরিতুস্‌ থেকে, যখন সে প্রথম এসেছিলো লা হাবানায়, তাকে উপদেশ পরামর্শ দিয়েছিলো ঠিক দ্বিতীয় মায়ের মতো। অথচ সে এই বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলো এইজন্যেই যে সে বুঝেছিলো ধর্ম আর নীতিবোধের ওপর চলা কোনো বাড়িতে এরা তাকে রাস্তার মেয়েছেলে এনে তুলতে দেবে না···কিন্তু সে-মুহূর্তে এমন ভাঙাচোরা, এমন দুর্দশাকাতর দেখাচ্ছিলো তাকে—একটা চৌকির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে হতাশ ব'সে-থাকা—দরদর ক'রে তার নোংরা নোখে ভরা হাতের ফাঁক দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে—যে বুড়ির কাছে তাকে মনে হয়েছিলো আবার সেই ছোট্ট ছেলেটি, যে একবার তার কোলে ঘুংরিকাশির দমকে প্রায় দমবন্ধ হ'য়ে

মরতে বসেছিলো : তেমনি নীল ফুলে উঠেছে শিরাগুলো, কাঁধটা তেমনি ফুলে-ফুলে উঠছে মোচড় মেরে, নিশ্বেসে টক গন্ধ, ফুঁপিয়ে কান্নার দমকের পর গভীর-থেকে-ওঠা এক গোঙানি। বুড়িকে স্পর্শ করেছিলো এই দৃশ্য ; সে তাকে নিয়ে গিয়েছিলো দীর্ঘ পরিত্যক্ত মিনারে, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ চিহ্ন সেই তোরণটার পাশে—যাতে সে সেখানে লুকিয়ে-লুকিয়ে অপেক্ষা করতে পারে—তার প্রয়াসটার ফলাফল জানবার জন্যে। হায়, দেবজননী, শুদ্ধতমা মাতা, অকলুষ মাতৃমূর্তি, পরমা কুমারী, আমাদের জন্য প্রার্থনা করো ; অতীন্দ্রিয় গোলাপ, দাউদের মিনার, শুকতারা, পাপীতাপীর আশ্রয়, শহিদদের সম্রাজ্ঞী, আমাদের জন্য প্রার্থনা করো···সে, যে আমার প্রথম ক্ষুধা মিটিয়েছিলো তার স্তনের দুধে ; সে, যে আমাকে প্রথম দিয়েছিলো পেটুকতার অভিজ্ঞতা, তার মাইয়ের নরম মাংসলতায় ; সে, যে আমার জিভে প্রথম দিয়েছিলো শরীরের স্বাদ পরে যাকে আমি খুঁজেছি তারই মতো আরো-অনেকের রক্তের তরুণ ঊর্ধ্বাঙ্গগুলোয় ; সে, যে আমাকে লালন করেছিলো তার শরীরের শুদ্ধতম নির্যাসে, দিয়েছিলো তার কোলের উষ্ণতা, তার দুই হাতের সুরক্ষা, যা আমাকে আদরে-আদরে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিলো, সে, যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, যখন অন্য-সবাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে : এখন সে শুয়ে আছে ঐখানে, সবচেয়ে শস্তা কাঠে বানানো একটা কালো বাক্সে, ছোট্ট, মিরকুট্টে, একরত্তি—কুঁচকে খুদে-হ'য়ে-যাওয়া তার মুখ, বরফ চাপা—ফোঁটা-ফোঁটা বরফগলা জল পড়ছে তোবড়ানো একটা গামলায়, কারণ আমি, যে-কিনা এই সম্ভাবনার কথাটা একবারও স্বপ্নেও ভাবিনি, একবারও ভাবিনি যে আমি এ-কাজ করতে পারতুম, আমি কি না তারই সব পথ্য আর খাদ্য খেয়েছি—তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যার দরকার ছিলো, গোগ্রাসে গিলেছি তার দুধে-চোবানো জই, হুড়মুড় চিবিয়েছি তার মুর্গির হাড়, লোলুপ শুয়োরের মতো ঢকঢক গিলেছি তার রোববারের সুরুয়া। প্রভু, আমাদের তুমি দয়া করো। হেসুস ক্রিস্তো, আমাদের তুমি দয়া করো···আর উলটো দিকের বাড়িটা থেকে এখনও কি না ভেসে আসছে সেই আর্ত সংগীত, এত একঘেয়ে এত মন্থর এত বিষণ্ণ যে এই নিশিজাগরণে তাকে মনে হচ্ছে কোনো অন্তহীন অন্ত্যেষ্টি গান।

তাকে নিশিজাগরে দেখে কেউ অবাক হয়নি, কারণ বুড়ি মাঝে-মাঝেই বড়োলোকদের বাড়িতে কাজ নিতো। 'ওরা ছাতে যাবার চাবিটা খুঁজে

পেয়েছে,' একটু উত্তেজিতভাবে বললে বোনঝি, যেই যে দেখলো এক অপ্রত্যাশিত হাওয়ার ঝাপটায় মোমবাতির আলো কাঁপছে। 'আপনার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে,' কেউ-কেউ বললে তাকে, এই ভেবেই যে এই শ্বেতাঙ্গটি এমন দারুণ গরমে যে গাঢ়-নীল রঙা স্যুট প'রে এসেছে মৃতের কাছে, কোন্-এক নেগ্রো বুড়ির নিশিজাগরে, সে নিশ্চয়ই শোক প্রকাশ করতেই। কুলুঙ্গির গা থেকে বেরিয়ে-আসা কাঠের টেবিলটার ওপর এক আয়না, সে তাতে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখলো। তার মুখ এখন শুষ্ক, কঠোর, রুক্ষ দেখাচ্ছে যে মনে হয় এককোঁটাও চর্বি নেই কোথাও—অথচ যখন সে ভুলে যেতে চাচ্ছিলো কোন দায়িত্ব সে পালন করেছে, তখন দিনের পর দিন নিষ্কর্মা অলস শুয়ে-ব'সে সে এত মদ খেয়েছিলো যে তার চামড়া ঝুলে পড়েছিলো, এখন সে নিজের চেহারাতেই এমন ছদ্মবেশ আবিষ্কার ক'রে খানিকটা আশ্বস্তই হ'লো। বারে-বারে সে তার প্রতিবিম্বের দিকে তাকালে, কিন্তু না, তরে চেহারার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই—এককোঁটাও না। তার গালে যেন হাল চ'ষে গিয়েছে কষ্টে-কাটানো রাতগুলো. তোবড়ানো, কোঁচকানো, ছুঁচলো ক'রে তুলেছে তার চিবুক, অদ্ভুত এক অপলক ভাব দিয়েছে তার চোখ দুটিকে—তার না-ছাঁটা চুলের ছায়ায় কেমন যেন ঢাকা প'ড়ে গেছে তারা, আর তার লম্বা চুল অন্যরকম একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে তার মধ্যে। তার অভিব্যক্তিতে একটা-কিছু এমনভাবে বদ্‌লে গিয়েছে যে কেউ যদি তাকে দ্যাখে—আর খুব আলো যদি না-থাকে—তবে সে আসলে সে-ই কি না এই ভেবে গোলে পড়বে। তাছাড়া, কালো চশমা, যেটা সম্প্রতি তাদের দলের একটা অভিজ্ঞান হ'য়ে উঠেছে, তাও সাহায্য করবে। যে ক-দিন সে চিলে-কোঠায় বন্ধ হ'য়ে ছিলো, সে ক-দিন সে এত কষ্ট পেয়েছে—তাছাড়া গোড়ার দিকে ঐ-যে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাকে সইতে হয়েছে—এইজন্যে সে ধন্যবাদ দিলে তাঁকে, যাঁর সঙ্গে ক্রমেই তার সম্পর্ক যেন সুনিবিড় হ'য়ে উঠছে ব'লে মনে হয়—যেন মিনারের নিচু অলিন্দ থেকে ঝুঁকে প'ড়ে তিনি দেখছেন সবাইকে, তাঁর মহিমায় সার্বভৌম, মানুষের প্রতি দয়ায় সমাকুল। যে-আয়নাটা তাকে তার নতুন প্রতিবিম্ব ফিরিয়ে দিচ্ছিলো, তাতে সে সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ করলে আত্মীয়স্বজনরা সব ছাতে চ'লে যাচ্ছে, একের পর এক। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা নিচু ঝোলামেঘে ঢাকা রাত্রিটার ক্ষীণ হাওয়া বুক ভ'রে টেনে নিলে, পাহাড়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের আলো প'ড়ে মেঘের গায়ে গেরিমাটির ছোপ—হয়

স্টেডিয়ামের আর নয়তো কলেজের সামনেকার চৌকো চত্বরটার স্তম্ভের বাতির আলো পড়েছে মেঘে ; সেখানে দাঁড়িয়ে তারা উলটো দিকের বাড়ির লোকটা সম্বন্ধে মন্তব্য করলে, এত কাছে একজন মারা গেলো, অথচ সে কি না এখনও রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে। সত্যি-যে এ-কোনো হালকা নাচের বাজনা নয়, কিন্তু, যে বাজাচ্ছে সে-যে খুশি, সংগীতে তো তারই চিহ্ন চিরকাল। কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিশেবে একবার সৈন্যটিকে পাঠাবার কথা উঠলো, মৃতের প্রতি লোকটা যাতে অন্তত আরেকটু শ্রদ্ধা দেখায় ; কিন্তু ঠিক তক্ষুনি একটা জাহাজের ভোঁ তাদের ভুলিয়ে দিলো বাজনাটার কথা—তাছাড়া বাজনাটা বোধহয় ততক্ষণে থেমেও গিয়েছে। কথাবার্তা স'রে এলো সারেং, বয়া, জোয়ারভাঁটা ইত্যাদি প্রসঙ্গে, আর যখন একজন বললে যে বাতিঘরের সংকেত-আলো বড্ড আস্তে ঘুরছে, সবাই তাকিয়ে দেখলে ঘড়ি মিনিটের কাটাটা—এমন তো হবার কথা নয়। আয়নার মধ্য থেকে সফর শেষ ক'রে ফিরে এসে উশকো-খুশকো শীর্ণ-বিশীর্ণ লোকটা দরজার দিকে ফিরলো ; যাতে খোলা থাকে, এই জন্যে পাল্লার গায়ে তক্তা আর লাঠির ঠেকনো, কারণ এতদিন একটানা বন্ধ থেকে এখন তার ভারি, পেরেক-তোলা কব্জার তলায় পাল্লাগুলো তড়াক ক'রে বন্ধ হ'য়ে যেতে চাচ্ছে। ঘরের মধ্যে তখনো আছে দুই বুড়ি, মাথায় শাদা রুমাল জড়ানো, বীজমালা ঘোরাতে-ঘোরাতে তারা একই কথা জপ ক'রে চলেছে। সে তার পিস্তলটা পাৎলুনের পেছনের পকেটে ঢোকালো—পিস্তলটা ওখানেই রাখা তার অভ্যাস, তারপর রেলিং ধ'রে-ধ'রে আস্তে-আস্তে বেয়ে নামলো ঘোরানো সিঁড়িটা, যার কাঁচকেঁচ শব্দ এমন ভাষায় কথা বলে সে তা এখন স্পষ্টই বুঝতে পারে! সে পেরিয়ে এলো বয়নশিল্পের বিদ্যালয়ের ঢাকা-বারান্দাটা, পাশের ঘরেই কেউ ম'রে প'ড়ে আছে, অথচ এখনো এখানে ছাত্রীরা কাগজ-কাটা নকশা অনুযায়ী কাপড় কেটে সরু-মোটা নানারকম পিন গুঁজে রাখতে ব্যস্ত। অ্যাভিনিউটা এখন চোখের সমান উঁচু—রাস্তাটাকে এমন নতুন ঠেকলো যে বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পা দেবে কি না এই নিয়ে সে একটু দোনোমনা করলে। ওপরে, ঐখানে মিনার, ঐ তার চার-কোণার স্তম্ভগুলো—তাতে গোলাপ খোদাই করা। রুক্ষ কর্কশ আলোয় পায়ে-চলার রাস্তার পাশে গজানো পপলারের বড়ো-বড়ো ছায়া ছড়িয়েছে, প্রত্যেকটা ছায়া আলাদা। রোদ-চশমা যদিও, তবুও রাতের বেলায় চোখে কালো চশমাটা আঁটতেই তার মনে হ'লো সে যেন আরো লুকিয়ে পড়েছে ; তার পর

ছায়া থেকে ছায়ায় হনহন ক'রে চলতে লাগলো সে, কোনো আলোর নিচে এলেই মুখ নোয়ায়, পায়ের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। একমাত্র ঐ ব্যাঙ্ক-নোটটা ছাড়া তার কাছে আর-কোনো টাকা নেই; শেষ যে-বাড়িটা থেকে ওরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেখানেই ওরা প্রায় কাঙাল বিদেয়ের মতো ভিক্ষে হিশেবে নোটটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলো—সেই বিকেলে, যেদিন একটা বুলেটে-ঝাঁঝরা স্তম্ভ তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো। তার বাবার দরজির দোকানে ফিরে যেতে এ-টাকা মোটেই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া সাংক্তি-স্পিরিতুস ছোট্ট জায়গা, সেখানে সব্বাই জেনে যাবে যে সে ফিরে এসেছে। যুদ্ধফেরৎ যে-বুড়ো সৈনিকটি জাতীয় বীরদের স্মৃতিফলকের সামনে ফলমূল বেচে, সে জেনে যাবে; ভেতরে-মদের-কৌটা-ভরা কেক বেচে যে মেঠাইওলা, সে জেনে যাবে; হাতের কাঁচিগুলো যখন ব্যস্তমুখর তখনো নাপিতদের চোখ প'ড়ে থাকে রাস্তায়—কে গেলো, কে এলো, সব লক্ষ করে। খেতে পারলে হ'তো, তার মনে হ'লো। কিন্তু এই সন্ধে-রাতে রেস্তোরাঁগুলো লোকের ভিড়ে ঠাশা, আর তারা তার দিকে তাকিয়ে দেখবে—আর, এখন যখন সে নিজেকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে শহরের রাস্তায়, কারু চাউনির চেয়ে বেশি ভয় আর কিছুতে নেই। ছায়ার পর ছায়া পেরিয়ে সে পপলার গাছের সারের একেবারে শেষে পৌঁছুলো; এবার স্তম্ভসারের জগৎ। স্তম্ভগুলো নীলে-শাদায় ডোরা-কাটা, এক স্তম্ভ থেকে আরেক স্তম্ভ অব্দি মাঝারি-উঁচু রেলিং; বড়ো রাস্তার দু-পাশে তোরণশোভিত পথ—দোকানে-দোকানে ভরা—; বড়ো রাস্তায় নেপচুনের ফোয়ারা শোভিত ট্রাইটনে—গ্রীকদের সিন্ধুদেবতা, পুচ্ছটা যাদের শিশুমারের—কিন্তু যাদের দেখাচ্ছে বুনো কুকুরের মতো, পিঠে নির্বাচনের পোস্টার আঁটা। সে হনহন ক'রে এগুলো, বাড়ির দেয়ালগুলোর পলেস্তারার রং দেখতে-দেখতে—গেরুয়া থেকে ছাইরঙা, সবুজ থেকে লাল—একটা দরজা, তার গায়ে এককালে ছিলো বংশমর্যাদার অভিজ্ঞান, এখন সেটা ভেঙে পড়ছে; তার পাশেই আরেকটা দরজা, যাতে প্রাচুর্যের জঞ্জালচিহ্ন। মোড়ের মাথায় রাস্তা বেঁকে গিয়েছে সমকোণে, নব্বুই ডিগ্রিতে, রাস্তার আলো প'ড়ে শান-বাঁধানো পায়েচলার পথকে দেখাচ্ছে ফিকে-নীল, অগুনতি শ্যামা পোকায় আলো কাঁপছে ঝাপশাভাবে। সেখানে ঢুলছে পাড়ার গির্জেটা, পলেস্তারা গথিক, এতবার রং করা হয়েছে যে কলসগুলোর রং যেন তুষারঝুরি দিয়ে আঁকা—ছাতে গজাচ্ছে ঘাস আর শ্যাওলা, পাঁচিলের বেরিয়ে-আসা অংশে

পড়িয়েছে পরগাছা, উলটো দিকে এক ঝাড়ফুঁক তুকতাকের দোকান, তাবিজ-কবচ-মাদুলি ইত্যাদিতে বোঝাই, উল্কার পাথরখণ্ড, কালো জেটপাথরে তৈরি হাত—বাচ্চাদের যাতে কু-নজর আর অসুখবিসুখ থেকে বাঁচানো যায়। আরো সামনে, লতাপাতার ঝোপ গুঁড়ি মেরে হানা দিয়েছে ভাঙা এক পাথরের দেয়ালের গায়ে, তার পাশে তামাকপাতার এক বিশাল গুদোম, কটু অন্ধকারে ঘুমন্ত। একটা পুরোনো কোনৃকিস্তাদোরদের অট্টালিকার তোরণের তলায় ভিখিরিরা শুয়ে আছে খবরকাগজে গা মুড়ে, টিনের বাটি আর আবর্জনাস্তূপের মধ্যে, কষ্টেসৃষ্টে প'ড়ে আছে পেচ্ছাবে আর নোংরায়। দ্রুত পা চালিয়ে লোকটা একটা স্তম্ভের ছায়া থেকে আরেকটা স্তম্ভের ছায়ায় সাঁৎ করে স'রে আসছিলো; জানে যে এবার বাজারের কাছে এসে পড়েছে, এ-সময় যেখানে স্তূপ হ'য়ে থাকে থ্যাংলানো দলামোচা সব আবর্জনা—কাঁচকলা, ভুট্টার হলদে-সবুজ শিষ; পাশের খাঁচার মধ্য থেকে তুর্কিমোরগরা তাদের ছুঁচলো গলা বাড়িয়ে দেয়। পাশের রাস্তাটায় সারি-সারি বন্ধকি দোকান, সেখানে সব-সময়েই আলো জ্বলে, যেন কোনো উৎসবেরই অভ্যর্থনায়: কড়িবরগা থেকে ঝুলছে বেতের মোড়া, চেয়ার, তলায় দেয়ালে যত রাজ্যের দেয়ালঘড়ির এক বিশৃঙ্খল সংগ্রহ, আলমারি আর দেয়ালতাক প'ড়ে আছে এলোমেলো, মাঝে-মাঝে হয়তো কোনো পেতলের ভায়োল—কেউ কবে বাজাতো কোন্ মধ্যযুগে, অথবা নানারঙের মিনের কাজ-করা পুরোনো ফুলদানি, আর নববধূ বা নব-দীক্ষিতের পোশাক পরানো কাঠামো ছাড়িয়ে, সৎকারগৃহের ব্রনৃজ মূর্তি ছাড়িয়ে —যেখানে একটা কফিনে মাথা ঠেকিয়ে ঢুলছে এক রাতপাহারা—আসে মার্বেলে তৈরি কাউন্টার, মাছের আঁশে বোঝাই, তার পেছনে ঝলশায় নাপিতের দোকান তার গিলটি-করা ফ্রেমের আয়নায়, টিনের বাটি, নাড়িভুঁড়ি আর ঝুড়ি-টুড়ির মধ্যে। কফিখানার আলো এড়াবার জন্যে একটু ঘুরে, পাশ কাটিয়ে, সে চললো; কফিখানার কফির মেশিন থেকে ধোঁয়া উঠছে, এখান থেকে বেরুবার সময়েই ওরা তাকে গ্রেফতার করেছিলো সে-রাতে। শুকনো গোমাংসের ফালি আর বার্লি আর গমের রুক্ষ গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে থিকথিকে আঁশটে লোনা গন্ধ আর শুঁটকি কড মাছের গা-গুলোনো গন্ধ। সেই গন্ধের রাজত্ব পেরিয়ে সে একটা অন্ধকার গলির মোড়ে পৌঁছুলো, অবশেষে, যার জানলাগুলো যেন নরম সুরে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে কড়া নাড়লে—তার শেষ আশা। দরজার পেছন থেকে এস্ত্রেইয়ার পায়ের শব্দ সাড়া দিলে।

'আমি তো ভেবেছি তুমি বুঝি হারিয়েই গিয়েছো,' দরজা খুলে একটু বিদ্রূপেভরা কৌতূহলের ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে এস্ত্রেইয়া বললে। ঘুমে ঢুলু-ঢুলু কুকুরটা, তাকে শেখানো হয়েছে অচেনা লোক দেখলে যেন ঘেউ-ঘেউ ন-করে, শুঁকতে শুরু করলো তাকে। 'বাইরে গিয়েছিলুম, সবে ফিরেছি,' সে বললে। তার জামাটা কোঁচকানো, ছাতের ওপর কলের জলে সেটা সে কেচে দিয়েছিলো; তাছাড়া বছরের এ-সময়টায় এমন বেমানান কোনো স্যুট কেউ পরে না; অথচ এস্ত্রেইয়া এই সেদিনও তার জমকালো দামি শৌখিন পোশাকের তারিফ করেছে। তাই কৈফিয়ৎ হিশেবেই সে বললে, 'এইমাত্র ফিরেছি।' 'রোদ-চশমা?' এস্ত্রেইয়া শুধোলে, একটা আঙুলে তার নাকের ডগা থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে কৌতুকের ভঙ্গিতে নিজেই সে প'রে নিলে। 'সব কালো দেখাচ্ছে। এটাই কি হালফ্যাশান নাকি—সবচেয়ে নতুন কেতা?'

ডালিমগাছের নিচু ডালপালার ওপাশে, অন্ধকার রান্নাঘরটার দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'আমি এখনো কিছু খাইনি।' কুকুরটা ঢাকা-বারান্দার পেছন কোণায় শুয়ে পড়েছে, পাশে এত-সব খাবারের টুকরো ছড়ানো যে হাঁড়িকুড়িতে কিচ্ছু আর বাকি নেই নিশ্চয়ই। এস্ত্রেইয়া একটা বোতল বার ক'রে আনলে, তাতে তখনও বেশ-একটু তলানি আছে। একমাত্র যে তাকে আজ রাতে সাহায্য করতে পারবে, পৌঁছুবামাত্র তাকে লোকটা নিশ্চয়ই সব হড়বড় ক'রে ব'লেই দিতো। কিন্তু এখন মদ, এক ঢোঁকে সে গলায় ঢেলে দিলে অনেকটা, পরিস্থিতিটা আরেকটু শান্তভাবে তলিয়ে দেখতে বাধ্য করলো। আবার তো সে লুকিয়ে পড়েছে। তাকে বেমালুম লুকিয়ে ফেলে তার পেছনে বন্ধ হ'য়ে গেছে বাড়ির দরজা। ভোর আসতে অনেক দেরি। সামনে অনেকটা সময় এখন তারই পক্ষে। সে জানে যে সে এস্ত্রেইয়ার ওপর নির্ভর করতে পারে। কিন্তু কিছু ব'লে ফেলার আগে বরং আবারও অন্তরঙ্গতার আবহাওয়াটা ঝালিয়ে নেয়া ভালো—তার দু-হপ্তার অনুপস্থিতি যে ঘনিষ্ঠতায় একটা হ্যাঁচকা টান দিয়েছে! তার মন্থর, বিলম্বিত রতিক্রীড়া ভালোবাসে এস্ত্রেইয়া। সে মেয়েটির হাত ধরলে তাকে বিছানার দিকে ঠেলে নিয়ে এলো। 'এক মিনিট সবুর করো,' এস্ত্রেইয়া বললে, তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে তার পাশে এসে শুয়ে পড়লো—অবশ্য তার আগে কাগজের রুমালে মুছে নিলে তার ঠোঁটের রং আর একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে কুমারী মাতার মূর্তিটা। কিন্তু লোকটা যেন একটা তলহীন বিছানায় পড়েছে। মিনারের চিলেকোঠার বড়ো-বড়ো জাজিমটায় এত গর্ত

ছিলো যে তার কাঁধ সেখানে আস্ত ঢুকে যেতো, সেখানে এপাশ-ওপাশ করার পর এখন এই বালিশের নরম তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো ; মদ তার শরীরের হাড়গুলোকে যেন গলিয়ে দিয়েছে একেবারে, যেন তার শরীরটা তুলতুলে এক-ডেলা মোমে তৈরি ; পিস্তলের ভারটাও নেই, সেটাকে সে তুলে রেখেছে তার জামাকাপড়ের ওপর ; বড়ো-বড়ো উষ্ণ স্তন দুটি তার গালে ঠেকানো, মেয়েটির বাহু উত্তেজক নয় বরং যেন প্রগাঢ় সান্ত্বনা, আর, সব তাকে আস্তে-আস্তে ডুবিয়ে দিলো ইন্দ্রিয়বিলাসের গভীরে, তার সারা গা আরামে এলিয়ে পড়েছে—ঢিলে, আলগা, শিথিল, এতদিনে-সম্ভব ঘুমটার বিশাল কোলে। ···যখন সে চোখ খুললো, দেখতে পেলে আলো জ্বালানো। এস্ত্রেইয়া তার দিকে পেছন ফিরে একটা ঢিলেঢালা রাতের জামা প'রে নিচ্ছে, গোল বোতামগুটির কাছে সবুজ ফিতে। আয়নার কাচ থেকে ওর চোখে তাকিয়ে দেখলো—বিরক্তির চেয়েও সে-চোখে ঔদাসীন্য বেশি। 'এসো,' সে ডাক দিলে। 'তুমি পারবে না,' মুখে রং ঘষতে-ঘষতে এস্ত্রেইয়া বললে। লোকটা বুঝলো যে আবার ঠোঁটের রং মোছার চাইতে তার জামা খোলাটাই অনেক বেশি সহজ হবে ; সে ধড়মড় ক'রে বিছানায় পাশে উঠে বসলো, তার ভঙ্গিটা রাগের। যে-মেয়েটির সঙ্গে সে এতবার প্রেম করেছে, যে-মেয়েটির পেশাদারি ঠাণ্ডা ভাবকে জিতে নিয়েছে তার পৌরুষের তৃপ্তি, যাকে সে শুনেছে তার নিজের ভারের তলায় সুখে গোঙাতে—সে কিনা এখন অমন উদাসীন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে, তাও আবার তার পাশে শোবার পর, যেমন ক'রে কেউ কোনো আশাহীন উদ্যোগে ইস্তফা দেয়, তেমনিভাবে। এটা তার কিছুতেই সহ্য হ'লো না। এবার মেয়েটি রাস্তার দিকের দরজাটা খুলেছে, ডাকছে তার মিনি বেড়ালকে, আর বেড়ালটা অমনি এক নিঃশব্দ লাফে নেমে পড়লো ছাতের কার্নিশ থেকে। ল্যাজটা কাঁপছে থিরথির, একটু যেন ভয়ের ভাব। অ্যাদ্দিন যে তাকে প্রথম-বার রতিক্রীড়ার পর সারা রাত থেকে যাবার জন্যে মিনতি করতো, তার সঙ্গে এই ব্যর্থতার পর লোকটা হঠাৎ ফেটে পড়লো। কেমন ক'রে সে কামের তাড়া বোধ করবে, যখন সে ক্ষুধা আর ভয়ের একটা বিশাল তালগোলপাকানো শোরগোলের একটা পিণ্ড ছাড়া আর-কিছুই নয় ? আর এবার সে শুরু করলে কথা বলতে, হড়বড়, তড়বড়, কথারা যেন অনর্গল উপচে পড়ছে ভেতর থেকে, ফোয়ারার মতো, কীসের যেন এক বিষম তাড়া তার কথা বলবার জন্যে, অ্যাদ্দিন একটা কথাও না-বলবার পর সব না-ব'লে তার যেন আর স্বস্তি নেই।

এক্সেইয়া আবার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে। সে বিছানার অন্য পাশে বসলো কুঁকড়ে, প্রগাঢ় তীব্রতায় সব কথা সে শুনলো আতঙ্কিত। হঠাৎ যেন একঝলক চোখধাঁধানো আলো এসে পড়লো কোত্থেকে, সে বুঝতে পারলো ঘটনা পরম্পরার অপ্রতিরোধ্য গতিটাকে। কাগজে সে ভয়ংকর ছবিগুলো দেখেছে, তবে পড়েনি কিছুই; সবকিছুর সূচনা সে তখন বোঝেনি তার হাঁদার মতো ভীরুতায়। এখন এর সব কথা তাকে ব'য়ে নিয়ে গেলো ঐ দিনগুলোর ভয়, নিঃসঙ্গতা আর ক্ষুধার কাছে—কোন্-এক সুদূর বাড়িতে, সেখানে তারা ব'সে ছিলো এক বুড়ির কাছে—যাকে শোয়ানো হচ্ছিলো কফিনে, এ-লোকটা যা চুরি ক'রে খেয়েছে, তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে-ক'রে যে মারা গেছে। মধ্য-যুগের অন্ধবিচার ব'লে যাকে মনে হচ্ছিলো, তার প্রতিনিধিদের তাড়াবার জন্যে সে নিজে কী বলেছিলো তার তাৎপর্য খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে, সে সেই কথাটাই শুনতে পেলে, বাস্তবতার এক দুর্বিনীত উদ্ধত স্বীকরণে, যা সে নিজের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করে সাধারণত, যা কোনো গভীর-কূপ-থেকে-ওঠা প্রতিধ্বনির মতো তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো। এখন তার মনেও নেই সেই কবে থেকে লোকজনের কোলে বসতে তার ভালো লাগতে শুরু করেছিলো; যখন দুই বলিষ্ঠ বাহু তার কোমর জড়িয়ে তাকে নিবিড়ভাবে চেপে ধরে, তখন ঘাম আর তামাকের গন্ধে মাখামাখি তাদের জামা শুঁকে এটাই সে ভাবতো যে অন্তত কালকের খাওয়া-পরার ভাবনাটা ঘুচলো। নিজের শরীর সম্বন্ধে সে এমনভাবে কথা বলে, যেন সেটা কোনো তৃতীয় ব্যক্তির, যেন তার কাঁধের হাড় থেকে নিচে অব্দি এক সক্রিয় অচেনা উপস্থিতি আছে, নিজে থেকেই যা এমন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ যা পুরুষের আগ্রহ আর বদান্যতাকে চেতিয়ে তোলে। এই উপস্থিতি অকস্মাৎ, যেন জাদুবলে, কাজে লেগে গিয়েছিলো, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের প্রলম্বিত মনোযোগকে তা উশকে দিতো, উৎসাহিত করতো, আর তার পুরো অস্তিত্বটাই নিয়ে বসেছিলো এক ভিন্ন ছন্দ, ভিন্ন উদ্দেশ্য। সে কখনো বোঝেনি এ-লোকটা কী করে, অন্য লোকটা কার শাগরেদি করে, তৃতীয় লোকটা কীসের উৎকাঙ্ক্ষায় জর্জর। সে ছিলো যুগপৎ স্থাণু আর অস্থির প্রত্যাশা: এত পুরুষের সে ঘনিষ্ঠ ক্ষেত্র, অথচ যাদের বাড়ি পরিবার পশ্চাৎপট কিছুই তার জানা নেই, যারা শুধু শরীরী হ'য়ে উঠতো সেই মুহূর্তে, যখন তার কাছে আসবার জন্যে তারা পা দিতো গলির মোড়ে, পরে যারা আবার মিলিয়ে যেতো নগরের জটিলতায়, পরবর্তী আগমনের আগে অব্দি যাদের আর-কোনো

অস্তিত্বই থাকতো না। শরীরের এই ভাকলাগানো জীবনটায় তার মনের ছিলো নিতান্তই একটা গৌণ ভূমিকা—তার এই শরীর, সবাই যার স্তুতি করে একইভাবে, তাদের হাবভাবে খিদেয় যৌনতায় সবাই যারা একই রকম, নিজের বেদিটায় উঠে ব'সে তাদের দিকে তাকিয়ে সে এই দেমাকটাই দেখাতো যে নিজেকে সে কখনোই কারু কাছে সঁপে দেয়নি, বিকিয়ে দেয়নি, কেউ তাকে দখল করেনি কোনোদিন সত্যিকারভাবে, পাশ কাটিয়ে পেছনে গিয়ে পুরুষকেই আরোপ ক'রে দিতো স্ত্রী-ভূমিকা। কেননা সেটা ছিলো একান্তই কঠিন, ঔদাসীন্য নিঃসাড়তা ঘৃণার ভাব এতটাই ছিলো তার দ্বারা সংরক্ষিত, সবসময়েই দাবিতে উন্মুখ। শুধু এই লোকটার বেলায় সে নিজেকে পুরোপুরি বিলিয়ে দিতো নিঃশব্দে—কেমন ক'রে যেন এই লোকটা, বা তার বিশেষ ক্ষমতা, উলটে দিতো পরিস্থিতি, দখল ক'রে নিতো তার সব অনুভূতি। পাপের ধারণা সম্বন্ধে তার শরীর সবসময়েই উদাসীন থেকেছে। শরীরকে সে উল্লেখ করে কোনো-একটা জিনিশ ব'লে, বস্তু ব'লে, নিজের কাছ থেকে শরীরকে সে একেবারে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়, তার নারীত্ব যে-জায়গাটায় কেন্দ্রীভূত তার কথা উল্লেখ করার সময় তার ওপর সে আরোপ ক'রে দিতো স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, যেমন হয়তো সে উল্লেখ করতো কোনো বহুমূল্য সামগ্রীর কথা, পাশের ঘরে যেটা সুরক্ষিত। 'লোকে পাপ করে মনের ভেতর,' 'মনের অগোচর কোনো পাপ নেই,' এমনিতর কথা সে একবার শুনেছিলো এক পুরুতের নীতি-উপদেশে—ভালো ক'রে ঠিকমতো শোনেইনি কথাগুলো, যখন দেখেছিলো, পুণ্যজলের সিঞ্চন তার কালো ঝালরকে একটা সুতো-খোলা খোঁপা বাঁধার জালে পরিণত ক'রে ফেলেছে—অথচ যে-লোকটা এটা উপহার দিয়েছিলো সে বলেছিলো এটা আসল লেস। কিন্তু তার মনকে তিরস্কার করার বিশেষ-কোনো হেতু নেই, যেহেতু জীবিকার জন্যে একমাত্র যা তার পক্ষে করা সম্ভব ছিলো, সেটাই সে করতো, কেননা অন্যের চাহিদা বা অসহায়তার প্রতি বদান্য, তার সব লেনদেনই ছিলো সৎ, সে তার দায় সামলাতো ঘড়ি ধ'রে, কাঁটায়-কাঁটায়। উলটো দিকের বাড়ির পড়শিরা, যে-সব মেয়েরা গির্জেয় গিয়ে বিয়ে করেছে তারাও তার সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলে যেন সে কোনো অভিজাত তরুণী; যখন তারা কটুকাটব্যে পরস্পরের পাছার ছাল ছাড়ায়, ভদ্র ও শালীন ভাষার বদলে ব্যবহার করে জলুনি-ছেটানো খিস্তি, তখন তারা তার কথাই তুলে ধরে আদর্শ হিশেবে, দৃষ্টান্ত হিশেবে।

নিজের খোলামেলা ভাবটার জন্যে তার অহংকার কম নেই, সেইজন্যেই যে-ছোট্ট কথাটি দিয়ে নিজেকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তাই দিয়ে নিজের সংজ্ঞার্থ রচনা করতে তার কখনো আটকায় না। কিন্তু এখন, এই আতঙ্ক, এই ক্ষুধা, এই নিঃসঙ্গতার কথা শুনে, এই তীব্র যন্ত্রণার কথা জেনে, সেই ছোট্ট কথাটি যেন অপার কলঙ্কে তুমুল অসাধুতায় বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো। এখন যা তার মুখে এলো তা তার মোটেই নয়, সেই দুটো অক্ষর, যার শেষেরটায় আছে য-ফলা আর আ-কার ; এটা হ'য়ে উঠলো একটা জঘন্য শব্দ, অধঃপাতে বিস্ফোরক, পাপে পঙ্কিল, ঢিল-ছুঁড়ে-মেরে-ফেলার যোগ্য ; অপমান সবসময়েই উগ্রভাবে ঘোষিত হয় জেলখানার, পায়খানার, অনাথ আশ্রমের আর কোনো কানাগলির দেয়াল থেকে। যেটা ছিলো নগণ্য একটা গুরুত্বের ভয়কে একপাশে সরিয়ে-রাখা, যে-ভয়টা দেখিয়েছিলো সেটা সত্যি-সত্যি ঘটালে যা তার জীবনটাকে নয়, সামান্য একটু স্বাচ্ছন্দ্যেরই শুধু ক্ষতি করতো, এখন সেটাই হ'য়ে উঠলো এমন-একটা সূত্র যা তাকে বেশ্যা বানিয়ে গেলো : বেশ্যা—সে শুধু তার শরীরের ক্রিয়াকলাপের জন্যেই নয়, বরং বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্যে ; যে-স্ত্রীলোকরা শুধু একজন পুরুষের সঙ্গেই শোয়, সমাজের সেই মান্যগণ্যরা যে-অভিধা বার-বার আরোপ করে তার মতো মেয়েদের ওপর, সেটাই এখন সত্যি হ'য়ে উঠলো। এবার সে পাপ করেছে মন দিয়ে, আর তার এই পাপ এমন-এক অমঙ্গলকে বার ক'রে এনেছে তা এতই বিশাল যে শব্দটা যেন তার কানে নারকীয় গলায় চীৎকার ক'রে উঠলো, আর তার শরীরের নিষ্পাপ থর্থর ক'রে উঠলো বীভৎস আতঙ্কে। সে যখন স্বেদাক্ত, খাবি-খাওয়া গলায় তাকে তার আর্তিময় প্রার্থনার কথা শোনালে, বার-বার তার নিখাদ অকৃত্রিমতার জোর দেবার জন্যে উত্তরোত্তর গলার স্বর তুলে সে যখন তার জীবনের সেই তাক-লাগানো নতুন জিনিশের কথা বললে, যাকে সে বলে ঈশ্বর, এস্ত্রেইয়া তখন কান্নায় ভেঙে পড়লো। এখন পুরুষ তাকে নিলে তার দুই বাহুতে, পাশে টেনে আনলে তাকে। আলো নিবিয়ে দেবার আগে পুরুষই এবার কাগজের রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিলে তার ঠোঁটের রং।

এস্ত্রেইয়া এবার আর রং লাগালো না ঠোঁটে। কোহলে ভেজানো একটা রুমাল দিয়ে মুছলো নিজের মুখ—পিঠটা ওর দিকে ফিরিয়ে। প্রসাধন ছাড়া তার শামলা মেটে রঙের বিবর্ণ মুখটায় তার চোখ দুটোকে মনে হ'লো কোটরে বসা ; তার গায়ের রং সেই-তাদের মতো যারা বড়ো হ'য়ে উঠেছে কাঠকয়লার

ধোঁয়ায়; তার পুরু চুলের গুচ্ছ কাঁকই দিয়ে বাঁধা। জামা রাখার ছোট্ট কুঠুরিটা থেকে সে বার ক'রে আনলে কালো পোশাকটা, যা সে পরে বড়োদিনের সময়, ক্রুশের কাছে প্রার্থনা করতে গিয়ে, আর পায়ে গলালে কালো রঙের চপ্পল, যা সে পরে মৃতের জন্যে নিশিজাগরে গেলে অথবা কারু শোকে সান্ত্বনা জানাবার সময়। একটা ডেকচির ঠাণ্ডা ঝোলের তলানিতে রুটির একটা শুকনো শক্ত টুকরো চুবিয়ে চিবোতে-চিবোতে—বাড়তি খাবার সব গেছে কুকুরের কাছে, আগেই—পুরুষটি তার সঙ্গে শোবার পর অপ্রত্যাশিতভাবে সহজ বোধ করলে। 'খাবারের চেয়েও এটাই আমার বেশি দরকার ছিলো,' আপন মনে সে ভাবলে। আর আবারও সে এস্তেইয়ার কাছে বর্ণনা করলে বাড়িটা, সব খুঁটিনাটি বিশদ ক'রে। মেয়েটি শহরের দূর প্রান্তটা চেনে না, যদিও মাঝে-মাঝে তার মধ্য দিয়ে সে গেছে চিড়িয়াখানায় যাবার সময়, যেখানে গিয়ে সে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখতো অদ্ভুত-অদ্ভুত সব জীবজন্তু। তাছাড়া, তার গির্জের চৌহদ্দির বাইরে সবকিছুই তার কাছে এত আশ্চর্য ঠেকে যে মনে হয় জায়গাগুলো সব যেন উপসাগরের ওপারকার কিংবা পুরোনো কেল্লাটারও ওপাশের। নানান মহল্লার কথা বলতো সে; নাসারেন, পালাতিনে, যেন দূর-সুদূর কতগুলো শহরের কথা বলছে, যেখানে কেউ দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ালেও বুঝতে পারবে না সত্যি কোথায় আছে। তার চেনা রাস্তাগুলো গেছে গির্জে থেকে গির্জেয়, যখন ঈস্টারের সময় সে তীর্থে বেরোয়। লোকে 'তার কাছে আসে,' সে প্রায় কারু কাছেই যায় না। সেইজন্যেই প্রতিচ্ছবিটা মনে গেঁথে নেয়া উচিত: একটা বাগানবাড়ি, যার চার কোণায় উঁচু-উঁচু জাফরি-কাটা জানলা বসানো। দোতলা; ফটকের সামনে আছে একটা সবুজ চন্দ্রাতপ, আর বাচ্চাদের দোলনকেদারা। আছে গ্ল্যাডিওলা আর ডেইজি ফুলের ঝোপের মধ্যে শাদা-শাদা পাথরমূর্তি, রাস্তা থেকেই দেখা যায় তাদের: ওড়না গায়ে এক স্ত্রীলোক, হাতে আপেল; ('হবা?' 'এভা?' সে জিগেশ করলে।) অন্যটির মাথায় উষ্ণীষ, হাতে বর্শা, ঠিক কোনো সৈন্যের মতো (প্রাচীনকালে মেয়েরাও পুরুষের মতো লড়তো; তার দাদু তাকে এ-সম্বন্ধে বলেছিলো)। আর দুটি সিংহ—ফটকের দু-পাশে দুজন—মুখে কালো আংটা ঝোলানো (ঠিক সমুদ্রতীরের স্মৃতিস্তম্ভের মতো, সেই যে-স্তম্ভটার ওপর আছে ঈগলপাখা)। এখানকার মতো দরজায় ঘা দেবার মস্ত কড়া কেউ ব্যবহার করে না সেখানে, বরং একটা ছোট্ট শেকল টানে, দরজার ডান পাশে সেটা

ঝুলছে। কেউ সেটা ঝনঝন ক'রে বাজিয়েই চলে না (এখানকার মতো), একেকবার বাজিয়ে একটু-একটু অপেক্ষা করে। (কী ভাবে ও? তার কোনো সহবৎ-বোধ নেই?) তাকে বড়ে-উস্তাদের কাছে চিঠিটা পোঁছে দিতে হবে— দলের পাণ্ডা সে-ই। উত্তর চাইতে হবে, কোনো ওজর শুনলে চলবে না। এমন ভাব দেখাতে যেন 'প্রয়াসটার' সব কথা সে জানে—উস্তাদের ওপর আরো চাপ দেবার জন্যে; ভদ্র কিন্তু দৃঢ় যেন হয় ভঙ্গি—যেন বোঝা যায় এ-মেয়ে দরকার হ'লে সারা রাতও অপেক্ষা করবে। উস্তাদ যদি চ'টে যায়, তবে কোনো দোরোখা ভাব কোরো, ঠাট্টায় ভরা, আবার একটু ভয়ও দেখানো, উচিত যেন সব তোমার জানা। যদি ওরা তোমাকে যেতেই না-দেয়, বাধা তোলে, যদি শাদা উর্দিপরা দারোয়ান বলে পরদিন আসতে, তাহ'লে তুমি যেন ভয়ংকর কোনো দুর্ঘটনার কথা ইঙ্গিত কোরো—কোনো খুঁটিনাটি না-ব'লেই। উস্তাদ যদি বাড়ি না-থাকে, সে যেন এস্পানি কেতায় সাজানো বৈঠকখানাটায় অপেক্ষা করার চেষ্টা করে (সে কি বুঝতে পেরেছে বাঁকানো সিন্দুক আর তলোয়ারের বাঁটে বসানো দুটো কব্জিঢাকা লোহার দস্তানার কথা?)। আর ওরা যদি তাকে ও-ঘরে অপেক্ষা করতে না-দেয়, সে যেন অপেক্ষা করে বাইরে, বেড়ার ধারে, পপলার গাছের তলায়, সেখানে একটা বেঞ্চি পাতা—যারা ওখানে অনুগ্রহ চাইতে যায়, তারা সেটাকে ভালো ক'রেই জানে। ওখানে শুধু এ-বাড়িটাতেই বাগান আছে, চার কোণায় উঁচু জাফরি-কাটা জানলা··· যখন এস্ত্রেইয়া তার দিকে ফিরলো, তার মুখে প্রসাধন নেই, গায়ে যেন শোকপালনের পোশাক, গলায় একমাত্র অলংকার একটা সরু চেনে ঝোলানো একটা ধর্মের পদক; হঠাৎ এস্ত্রেইয়ার সঙ্গে বয়ন ও সূচিশিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের এমন বেদম মিল দেখে লোকটার হো-হো ক'রে হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো। বেল্টে-গোঁজা আনকোরা ব্যাঙ্কনোটটা তার হাতে তুলে দিতে-দিতে সে বললে, 'তোমাকে দেখে মাইরি বড়োঘরের মহিলা ব'লে মনে হচ্ছে।' তারপর খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে নজর ক'রে দেখলো এস্ত্রেইয়া একটা ট্যাকসি ডাকছে। আটটা বাজে, ও-লোকগুলো দেরি ক'রে ফেরে রাতে। এখানে, বাড়ির মধ্যে একা, সে অনেকটা নিরাপদ বোধ করলে; এখন সে রাতটার মালিক, যার প্রহরগুলো ক্রমেই তাকে তার অগ্নিপরীক্ষার সমাপ্তিতে নিয়ে আসছে। হাতে হ্যাটটা চাপড়ে-চাপড়ে, সেটাকে খানিকটা ভদ্র চেহারা দেবার চেষ্টা ক'রে, আস্তে-আস্তে সে পোশাক প'রে নিলে। বারান্দার ওপর মেঘ

ঘনাচ্ছে, শহরের আলো প'ড়ে মেঘকে কেমন লালচে ঠেকছে। ডালিম গাছটার ওপাশে খাবার ঘর, তার তাকগুলো সব ফাঁকা, টেবিলে চৌখুপি-কাটা অয়েল ক্লথের ঢাকা, আর দেয়ালে রেকাবিগুলোর গায়ে গন্দোলা আর কেল্লার ছবি, কোনোটায় আছে পশমের গোলা নিয়ে ছোট্ট বেড়ালের খেলা, কোনোটায়-বা নাপোলির উপসাগর, গোলাপের ওপরে ঘোড়ার নাল; বোতলের শেষ তলানিটুকু সে গলায় ঢেলে দিলে; নিজের কাছেই আওড়ালে চিঠিটার বয়ান—হাতের কাছে ভালো কাগজ ছিলো না ব'লে সে চিঠিটা লিখেছে নীল রুলটানা কাগজে—একেক তা ক'রে যেগুলো কেনা যায়, সঙ্গে দুটো ক'রে লেফাফা—যদি একটায় কালি চুপশে বিতিকিচ্ছি হ'য়ে যায়। সে এমন-কিছু করতে চাইলো, যাতে পরিস্থিতি তার প্রতি সদয় হয়, ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়; মনে-মনে প্রার্থনা করলে যার উদ্দেশে চিঠিটা লেখা, সে যেন বাড়ি থাকে, যেন তার দূতীকে অবিলম্বে যেতে দেয়া হয় তার কাছে, আর সে যেন ফিরে আসে সুসংবাদটা নিয়ে যা এই বেড়াজাল থেকে তাকে মুক্তি দেবে। সে কালাত্রাভার ক্রুশবসানো ছোট্ট বইটা বার ক'রে নিলে, সৌভাগ্যের পূর্বলক্ষণ হিশেবে এটাকে সে পকেটে ক'রে নিয়ে এসেছিলো; সে নতজানু হ'য়ে বসলো সান হোসের মূর্তির কাছে, পেছনের ঘরে জপমালার সঙ্গে দেয়াল থেকে ঝুলছিলো মূর্তিটা, একটা মোমবাতির আলোয় অস্ফুটভাবে আলোকিত, গুনগুন ক'রে সে আওড়ালে তার প্রার্থনা, ঈশ্বর আর তাঁর দুর্দশামলিন পাপী-তাপীদের মধ্যস্থের উদ্দেশে: সর্বশক্তিমান পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা, ঈশ্বর যাঁকে নির্বাচিত করেছিলেন যেমন একদিন নির্বাচিত করেছিলেন মুশাকে, কোনো পার্থিব তরণী নয়, বরং সংবিদার সত্যিকার তরণীর ওপর পাহারা দেবার জন্য, আর মারিয়া, যাঁর শুদ্ধতম গর্ভে পরম প্রণেতা হেসুস ক্রিস্তো মানবরূপ ধারণ করেছিলেন⋯যখন সে শেষ করলে, তখন তার ঠিক মনে পড়লো না কতবার প্রর্থনা করেছে, ন-বার না দশবার, তাই সে আবার তার প্রার্থনা আওড়ালে আরো এগারো বার। কিন্তু কেউ-একজন ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়, এস্ত্রেইয়ার কোনো মক্কেল নিশ্চয়ই—সে সব আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে কুঁকড়ে বসলো, উৎকর্ণ শুনতে লাগলো রাস্তার সব শব্দ, যেখানে বাজারের জন্যে রসদ আসছে ক্রমাগত, মিনিটে-মিনিটে; সে ঢুলে পড়েছিলো একটু, কিংবা হয়তো নয়; কিন্তু যাকে তার হাত হাৎড়ালে সেই ত্রিভুজ শুধু আসতে পারে দেয়ালে হেলান-দেয়া তার শরীর একটু ঘুম ছিনিয়ে নিলেই। দীর্ঘ প্রতীক্ষার

পর অস্থিরতায় যখন তার আত্মবিশ্বাস জেরবার, বাড়ির সামনে এক ভীষণ তর্কাতর্কির আওয়াজ তাকে আতঙ্কে তড়াক ক'রে লাফিয়ে ওঠালো। এস্ত্রেইয়া একটা লোককে চুপ করাতে চাইছে, আর লোকটা ক্রমেই গলা চড়িয়ে লোকদের ডেকে বলছে ব্যাপারটার সাক্ষী হ'তে। তালার মধ্যে চাবি ঘুরলো, আর মেয়েটি ছুটে এলো সেই কড়কড়ে নোটটা নাড়তে-নাড়তে, ট্যাক্সি ভাড়া দেবার জন্যে যেটা সে তাকে দিয়েছিলো। 'ড্রাইভার বলছে এটা চলবে না। আমার কাছে আর-কিছু নেই···' পেছনের ঘরটায় সজোর প্রতিধ্বনি তুলে, দরজায় ক্রমাগত বাড়ছে কড়া নাড়ার আওয়াজ; 'ও বলছে, যে-সব ব্যাঙ্কনোটে জেনারেলের চোখের পাতা বোজা, সেগুলো অচল। আমার কাছে একটা পেসোও নেই—একটা সেন্‌তাভোও না, আমি আজই বাড়িভাড়া দিয়েছি।' অভিভূতের মতো পলাতক লোকটা নোটটা আলোয় তুলে ধ'রে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো, উল্‌টেপাল্‌টে, বার-বার, চারপাশ থেকে; আর দরজার ওপাশ থেকে একটানা আছড়ে পড়লো গালাগাল আর টিটকিরি। 'ককখনো কোনো ঝুট-ঝামেলায় নেই আমি,' এস্ত্রেইয়া ফুঁপিয়ে উঠলো, 'আমি ভদ্র আচরণ করি।' দরজায় কড়া নাড়ার তুলকালাম শব্দ শুনে এক পুলিশ এগিয়ে এলো। 'তুমি স'রে পড়ো। আমি ব্যাপারটা সামলে নিচ্ছি।' পেছনের ঘরটার দিকে আঙুল তুলে দেখালে এস্ত্রেইয়া, যেখানে তার জপমালা আর সান হোসের মূর্তির পাশে একটা ফাঁকা চত্বরের ওপর একটা জানলা খোলা। লোকটা যখন অন্ধকারে ফিরে এলো, আবার খুলে গেলো সামনের দরজা, আর নিচু গলার আলাপ ভেসে এলো ও-ঘর থেকে। ট্যাকসি-ড্রাইভার কিঞ্চিৎ শান্ত হ'য়ে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে এখন, অত হৈ-চৈ করার জন্যে মাফ চাইছে, রাত্তিরে কত-যে অচল টাকা চালিয়ে দেয় লোকে আর তার জন্যে কত-যে ঝামেলা বাঁধে, সে-সব কাহিনী শোনাচ্ছে সাত কাহন ক'রে, তারপর এলো ফিশফিশ কথা আর হাসির শব্দ। আর তার পর, হঠাৎ, এস্ত্রেইয়ার গলা, এতটাই জোরে বলা যে যেন ও-পাশের উঠোন থেকেও শোনা যায়, 'বলছি তো তোমাকে, প্রেমিকমশাই, আমরা দুজনই শুধু বাড়িতে আছি—তোমার ইচ্ছে হ'লে তুমি চক্কর মেরে দেখতে পারো।' সাবধানবাণীর তাড়া খেয়ে লোকটা একটা পা তুলে দিলে জানলার গোবরাটে, তার পর অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে প'ড়ে গেলো, পা হড়কে, আবর্জনার স্তূপের ওপর—ভিজে কাগজ, পচা ফলমূল, পাখির পালক, ঝিনুকের খোলে মাখামাখি—বাজারের সব আবর্জনা,

যেখানে, আগুয়ান কুকুররা একদফা ফুর্তি লোটার পর, শকুনরা ছোঁ মেরে নামবে ওপর থেকে। হঠাৎ এত ক্লান্ত লাগলো নিজেকে, এমন জীর্ণ, যে সে সেখানে চুপ ক'রে প'ড়ে রইলো কিছুক্ষণ, সেই ঠাণ্ডা ফলের খোশা আর মাছের আঁশের মধ্যে নিশ্চল, স'রে পড়বে কিনা সে-বিষয়ে সে তখনো মনস্থির করতে পারেনি। ওপর থেকে ড্রাইভারের ছুঁড়ে-ফেলা একটা আধপোড়া সিগারেটের টুকরো—তখনো জ্বলছে—ছ্যাঁক ক'রে তার হাতটা পুড়িয়ে দিলে। সিগারেটটা অদ্ভুত একটু, কালো কাগজে পাকানো, এমন সিগারেট আজকাল খুব বেশি লোকে খায় না। জড়তা থেকে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে জাগিয়ে দিলে ব্যথাটা, সে উঠে দাঁড়ালে, কোন্‌দিকে যাবে কিচ্ছু জানা নেই। কালো চশমা জোড়া সে হাৎড়ালে পকেটে, তার পরেই মনে পড়লো যে সেটা সে ফেলে এসেছে এস্ত্রেইয়ার খাটের কাছে পর্দাঢাকা বেতের টেবিলটার ওপর। মোড়ের মাথায় একটা গাড়ি ঘুরলো, তার হেডলাইটের আলো তার ছায়াটা ছিটিয়ে দিলে দেয়ালের গায়ে; পুরোনো ফোয়ারাগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে সে তার নীল স্যুটের গা থেকে নোংরা দাগগুলো ধোবার চেষ্টা করলে—সেই যেখানে এক-কালে গাধার ঘুন্টির ক্লান্ত ঠুনঠুন আওয়াজ তুলে ভোরবেলার শহরে আসতো ঘোড়া আর খচ্চরে টানা মালের গাড়ি—এসে যেখানে বাহনগুলো জল খেতো। কোনো ফেসো বা ছোবড়া নেই ব'লে সে একমুঠো খড় তুলে জলে ভিজিয়ে নিয়ে কাপড়টা ঘষতে লাগলো, এখনো জলের মধ্যে দিনের কড়া রোদের রেশ লেগে আছে, বেশ উষ্ণ। হঠাৎ তার মনে হ'লো ট্রাক-ড্রাইভাররা তাকে বড্ড বেশি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে—যদিও ওদের মতো কারু কাছ থেকে তার ভয় পাবার কিছু নেই, তবু সে একটা নোংরা গলি দিয়ে হনহন ক'রে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলে—পাশে নর্দমার ধারে প'ড়ে আছে বাঁধাকপির পাতা আর থ্যাঁৎলানো নষ্ট ফল। বেশি না-ঘুরে সরাসরি গেলেও 'প্রয়াসের' বাড়ি যাবার রাস্তাটা বড্ড দীর্ঘ।—কোন রাস্তায় গাছপালা বেশি সে-কথা মনে করবার চেষ্টা করলে সে; তার চাই ছায়া আর অন্ধকার, আর ফাঁকা জমি; তাকে উৎরাই বেয়ে উঠতে হবে এই ভাবনায় তার বুক একটু দ'মে গেলো, যেন এটা এক অন্তহীন পোড়ো জমি পেরিয়ে যাবার প্রশ্ন। এস্ত্রেইয়ার ঘরের দরজায় আরেকটু হ'লেই কড়া নেড়ে বসেছিলো সে, যাতে তাকে পাঠিয়ে আশপাশটার খবর নেয়া যায়, কিন্তু তার মনে পড়লো এস্ত্রেইয়ার কাছে কোনো খদ্দের এলে ও সামনের সব আলো নিবিয়ে দেয় আর কক্ষনো সাড়া দেয় না—এটা সে

জানে যে অনেক লোক আছে এমনিতে যাদের অন্ত কারু শরীরের ওমে গরম বিছানায় শুতে দারুণ আপত্তি. কিন্তু যদি ভাবে যে সে কোথাও জরুরি কাজে বেরিয়েছে, একটু পরেই ফিরে আসবে. তবে তারা পরে আবার ফিরে আসবে। তাছাড়া সে যে ট্যাকসি-ড্রাইভারকে চট ক'রে বিদেয় ক'রে দিতে পারবে, তারও কোনো ঠিক নেই. কারণ ড্রাইভার হয়তো ভাড়ার বদলে যা দেয়া হচ্ছে তার সুযোগ নেবে বেশি-বেশি. একেবারে নিশুত রাত অব্দি থেকে যাবে। কাজেই 'ওখানে' যত শিগগির-সম্ভব তাকে গিয়ে পৌঁছুতে হবে. এটাই সব-চেয়ে জরুরি ; আর এটাও তার জানা উচিত. শেষবারের মতো. চিরকালের মতো. কোনো অহেতুক বিলম্ব বা গাঁইগুঁই ছাড়াই. এই-যে রাতটা তার জীবনে এত দীর্ঘ হ'য়ে উঠছে, কালকের দিনের আলো তাতে কোনো সমাপ্তি টানবে কি না অবশেষে। যা সে চায়. তা অতি তুচ্ছই : একটা ভিসা. কিছু টাকা. আর লোকজন—সবচেয়ে জরুরি. লোকজন—যারা তাকে শেষ মুহূর্ত অব্দি বাঁচাবে। এখন সে যার সঙ্গে কথা বলবে. সে রাষ্ট্রপতিভবনেরই একজন লোক। একবার তাকে সে এক ভয়ংকর শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলো—একটা বই পাঠিয়েছিলো ডাকে. খুলতে গেলেই যেটা ফেটে যায়। মোটা একটা বই বাছতে হয়েছিলো তাকে. শক্ত বাঁধাই, যাতে তার পাতার মধ্যে এক ধরনের কবর খোঁড়া যায় : 'জগতের সেরা বাগ্মীরা : ডেমোস্থিনিস থেকে কাস্তেলার.' এমন-এক সংস্করণ যেটা ছাপা হয়েছিলো মাদ্রিদে. এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে. বাছুরের নরম চামড়ায় বাঁধানো। বোমাটা রাখা হয়েছিলো অতীব সাবধানে খুব মেপেজুকে—সিসেরো আর গাম্বেত্তার মাঝখানে। যে-লোকটা বইটা বাঁধাই করেছিলো, সে কিছু ফাঁস ক'রে দেয়নি. মানে 'গান করেনি', যদিও অন্যদের সঙ্গে সেও খতম হ'য়ে গেছে। একমাত্র সে-ই শুধু টিঁকে আছে, ঘুরঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে এখনো বন্ধ দোকানপাটে ভরা বাঁকা গলির লোহার পর্দাগুলোর মধ্যে—শুধু সে-ই জানে এই গোপন কথা। প্রমাণ হিশেবে, বইটা রেজিস্টারি করার রশিদ এখনো তার কাছে র'য়ে গেছে. লুকোনো—প্যাকেটটা একটা মিথ্যে নামঠিকানা থেকে পাঠানো হয়েছিলো। যদি দরকার হয়, তাহ'লে তা-ই বলবে সে—একটা লম্বা চিঠিতে সব ব্যাখ্যা ক'রে রশিদটা পাঠিয়ে দেবে খবর-কাগজে, রাষ্ট্রপতিভবনের লোকটাকে বাধ্য করবে চটপট কোনো সুরাহা করতে তার। 'যেখানে আছো, সেখানেই থাকো—সবুর করো,' এই নির্দেশই ওরা তাকে পাঠিয়েছিলো। কিন্তু অপেক্ষার বছর বড্ড দীর্ঘ

হ'য়ে গেছে, আর এক অপ্রত্যাশিত মৃত্যু তাকে এখন মিনার থেকে রাস্তায় এনে নামিয়েছে। তার মনে প'ড়ে গেলো প্রবচনটা—'কুবাতাস যখন বয়, তখন কারুই ভালো হয় না'। একদিন যে তাকে নিজের বুকের দুধে লালন করেছে, সেই বুড়ির মৃত্যু, হয়তো, তার শেষ দয়ারই চিহ্ন···দ্রুত পা চালালে সে, আবার তার সাহস ফিরে এসেছে, ভাবলে যে এস্তেইয়াকে পাঠানোটাই তার ভুল হয়েছে—বিশেষ ক'রে এমন-কিছু চাইতে, সে নিজে ছাড়া আর-কারু যা দাবি করার কোনো অধিকার নেই। সে বেরিয়ে এলো চওড়া অ্যাভিনিউ-টায়, তার দু-ধারে গাছের সার, মর্মরশিলার পরচুল, মখমল আর সোনালি মেষলোমের পদক সমেত এস্পানিয়ার রাজার পাথরের মূর্তি, স্তম্ভগুলোর মধ্যে দারুণ প্রতাপে, রাজার মতো যেটা টি'কে আছে কোনো প্রাচীন বিজয়মুহূর্তের স্মরণে, কমলা আর নীল রঙে ছোপানো কাচের ফটকগুলোর স্তম্ভসারের পাশে, চারপাশের সূর্যমুখি আর বিয়ের মিষ্টির দামের সারণির বেজন্মা স্থাপত্যের মাঝ-খানে। গথিক মিনারটার বিশাল বিসর্পিল আকার, আর তার পাথরের বেদির গায়ে গা লাগিয়ে একটা দোকান—কালা আদমিদের পালাপরবের জন্যে সেখানে সোনার তাগাতাবিজমাদুলি বিক্রি হয়; সেটার পাশ কাটিয়ে, 'আশ্চর্য কুঠির' প্রবেশপথ পেরিয়ে, সে পার্টির কাস্তেটাকে এড়িয়ে গেলো—দলের প্রধান দফতরে এখনো আলো জ্বলছে—কোনো গুপ্তসভার পুনর্মিলন হচ্ছে বোধহয়। দ্রুত পা চালিয়ে যেতে-যেতে তার মনে পড়লো, সাংক্তি-স্পিরিতুস থেকে আসার অল্পদিন পরেই সে এদেরও ত্যাগ করেছিলো, আর একটা বাড়ির হলঘরের মধ্যে কুমারী মাতার সামনে ক্রুশ এঁকে তার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎও সে খাড়া করেছিলো। আরো এগুতেই উদ্ভিদবিদ্যার উদ্যানের কাঠের বেড়া, লতাপাতাজড়ানো দমবন্ধ-করা গাছগুলোর তলায় লাতিনে লেখা নাম, ঘুমন্ত জলের ওপর ফুটেছে কুমুদ-কহ্লার, বিশাল পাতাবাহারের পাতায় ফুটফুট করছে রাস্তার বাতির ঠাণ্ডা আলো। লালচে মেঘের পটে, পেছনে, একটা কালো ছায়ার মতো উঠেছে জেলখানা, তার খাড়াই পাহাড়, নিচে পুরোনো এস্পানি কেল্লার মতো ঢাল, এ-সব দ্বীপে সবখানেই যেমন বানানো হয়েছিলো কোনৃকিস্তাদোরদের আমলে: ক্যাথলিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকদের হুকুমে এক ইতালীয় এনজিনিয়ার বানিয়েছিলো এ-সব: পাথরের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে, মাটির তলায় চোরকুঠুরি, ঢাকা-বারান্দা, গুপ্ত হাজত বানাতে তার মতো ওস্তাদ আর কেউ ছিলো না সেকালে। যেই তার মনে পড়লো যে এখানেই, চতুর্থ

প্রহরা-তোরণের আর্তনাদের ঘুলঘুলিটার কাছে—না, খুব বেশি দিন আগে নয়, তার একান্ত অপূরণীয় শরীরটা নির্যাতনের আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়েছিলো, অমনি পলাতক শিউরে উঠলো। সেই নারকীয় স্মৃতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে এখানকার নিবিড়-বোনা গাছপালার ছায়ার আশ্রয় খুঁজলো। হাঁফাতে-হাঁফাতে অবশেষে সে এসে থামলো বিশ্ববিদ্যালয়ের টিলার তলায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোগুলোর মধ্যে লাউডস্পীকাররা বিকট সব শব্দ ওগরাচ্ছে। দেয়ালিটা এত রাতে খানিকটা অস্বাভাবিক—কিন্তু হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেলো যে স্তম্ভঘেরা চত্বরটায় সাহিত্যের ছাত্ররা মাঝে-মাঝে নাটক করতো। শয়ে-শয়ে দর্শক আসতো দেখতে, কোনো ট্র্যাজেডি—ছাত্ররাই তার ব্যাখ্যা করতো, তারাই অভিনয় করতো দূত, প্রহরী বা নায়কের ভূমিকায়। পলাতক তক্ষুনি খতিয়ে দেখলো সেই বাড়ি থেকে কত দ্রুত হয়েছিলো তার অপসারণ, তার চারপাশে উঁচু স্তম্ভ, তার সেই HOC ERAT IN VOTIS [এইই ছিলো আমাদের প্রার্থিত] যা দূর থেকেও পড়া যেতো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের রূপকপ্রতীকের তলায়;—তাকে কিনা এখান থেকে যেতে হয়েছে সেই প্রায়শ্চিত্ত-করানো দুঃসহ, বিমর্ষ ও আর্ত আঁধারকেল্লাটায়, যেখানে তার বিপন্ন নিয়তি হয়েছিলো সব জঘন্যভাবে ফাঁস ক'রে দেয়া—'গেয়ে-ওঠা'—বিশ্ববিদ্যালয়ে কার সঙ্গে তার মেলামেশা ছিলো, কী সে জেনেছে তাদের কাছ থেকে, সব তাকে ব'লে দিতে হয়েছিলো। ফিউরিদের রুষ্ট স্বরে গাঁকগাঁক ক'রে উঠছে লাউডস্পীকার আর কোরাস এমন-একটা স্তবক ব'লে উঠলো যে পলাতক একটা কাঁটাঝোপেভরা রুক্ষ ঊষর ঢালের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো : 'সব অভিশাপ গেলো ফ'লে; মাটির তলায়, যারা মৃত তারা সব বেঁচে ওঠে; গত কাল যারা ছিলো বলি, আজ তারা আততায়ীদের রক্তে শুধে দেবে সব দেনা···' ঘূর্ণিহাওয়ার দমকা কথাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। লোকটা ব'সে পড়লো ফুটপাতের ধারে, এক সুপর্ণ পপলারের ছায়ায়—শেকড় থেকে ছিটকে-বেরুনো পপলার গাছটা কালো-কালো বিচি ছিটিয়েছে শানের ওপর।···গোড়ায় সবকিছুই ছিলো ন্যায়নিষ্ঠ, বীর্যময় আর সুমহান : রাত্তিরে ডাইনামাইট দিয়ে বাড়িগুলো উড়িয়ে দেয়া; অ্যাভিনিউগুলিতে নামজাদা লোকদের গুলিতে-গুলিতে ঝাঁঝরা ক'রে দেয়া; মোটরগাড়িগুলোকে বোমা মেরে মিলিয়ে দেয়া—যেন মাটি তাদের হঠাৎ গিলে খেয়েছে; বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখা সব বোমা আর বিস্ফোরক, তুলসী পাতার সুগন্ধ মাখা জামাকাপড়ের ভাঁজের মধ্যে; সেই সঙ্গে রুটিওলাদের

ঝুড়িতে ক'রে আনা সব প্রচারপত্র ; কিংবা বিয়ারের কেস পৌঁছে দেয়া কারু কাছে, যার বোতলগুলোর ওপর দিকটা গলার কাছে কেটে নেয়া। সেইসব ছিলো দিন, যখন দণ্ডাজ্ঞা আসতো দূর-থেকে-নিয়ন্ত্রিত ; সেইসব ছিলো দিন—সরলসোজা বীরত্বের ; সেইসব ছিলো দিন—এমন খেলার, যেখানে বাজি ধরা হয়েছে জীবন অথবা মৃত্যু। সেইসব ছিলো দিন, ক্ষিপ্র হত্যার : প্রখর বাঁকা হাসির সঙ্গে দণ্ডাজ্ঞা পালন করতো দূত, মৃত্যুকে মুখোমুখি দেখা যেতো বইয়ের পাতা ওল্টাতেই, অথবা বড়োদিনের উপহারের মোড়ক খোলার সময়—চিরশ্যামল পাতা আর ঘণ্টার ছবি আঁকা কাগজে বাঁধা সব মোড়ক। সেইসব ছিলো দিন—অমোঘ বিচারের···

(···যদিও আমি তাকে চেয়েছি চাপা দিয়ে রাখতে, চুপ করাতে, তবু তা এইখানেই, সবসময়েই এইখানে ওৎ পেতে আছে—মাসের পর মাস চেষ্টা-ক'রে-ভুলে-যাওয়া অথচ ভুলে-যাওয়াও নয়—যখন আমি সেই বিকেলবেলাটায় আবার নতুন ক'রে আবিষ্কার করলাম নিজেকে ; ছবিটাকে আমার মধ্য থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে সে-যে কেমন প্রবলভাবে মাথা নেড়েছি অনবরত, যেমন চেষ্টা করে কোনো বাচ্চা ছেলে যখন যে দ্যাখে কোনো নোংরা ভাবনা লেপটে আছে তার বাবা-মার গায়ে ; প্রবাল-লাল ফুলদানিগুলোয় অনেকদিন কেটে যাবার পরেও রজনীগন্ধার ডাঁটিচোবানো পচা জলের গন্ধ ; সূর্যাস্তের আলোয় জলন্ত রং-করা কাচের জানলা, বন্ধ ক'রে রেখেছিলো এই দীর্ঘ, অতি-দীর্ঘ, খড়খড়ি-লাগানো লম্বা ঢাকা-বারান্দার তোরণপথ ; ছাতের উত্তাপ, চওড়া ভিনিসীয় আয়না, ঝাড়লণ্ঠনের চারপাশে তুষারের ঝালরের মতো স্ফটিকের হারগুলো যখন ঝমঝম ক'রে ওঠে, যেন কোনো স্প্রিং-ভাঙা মিউজিকবাক্সের স্বর। আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্রের সুইস সন্ন্যাসী তার পাটাতনের ওপরে উঠে প্রার্থনা করছে, তার আলখাল্লার মাথা-ঢাকাটা মাথার ওপর অর্ধেক বেছানো, কারণ আমরা যখন ঢুকলাম তখন সবে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে। কী বলা হবে এখানে, আমরা সবাই তা জানি, আমরা সবাই জানি যে গুলিভরা বন্দুক-গুলো সব পর্দার আড়ালে গাদা ক'রে রাখা, আর সেগুলো ব্যবহার করা হবে। যাদের হাত কাঁপে না, তাদের দিয়ে কাজটা শেষ করানো মনে হ'তো আবশ্যিক। অমোঘ বিচারের দিন ছিলো সেইসব। আমি এখনো শুনতে পাই তাদের সোনার খাঁচার মধ্যে কিচিরমিচির করছে পাখিরা, তাদের খাঁচার কাচের দরজা আর সোনারুপোর ঝালর-লাগানো গম্বুজ ; এখনো দেখতে পাই

কাচের চৌবাচ্চার কাছিমগুলোকে, ঘোলা জলের মধ্য থেকে অলস ভঙ্গিতে মাথা বার ক'রে হাই তুলছে। সেই মুহূর্তে সময়ের স্রোত যেন থেমে গিয়েছিলো, যেন কোনো বিশাল তাৎপর্যে তা ভ'রে গিয়েছিলো—যেন একটা স্থগিত মুহূর্ত, যেন তারপরে যা-যা ঘটবে, সব আসলে অনেক আগেই ঘ'টে গিয়েছে। বিচারে যারা বসবে একে-একে এসেছে সেই আইনের ছাত্ররা আর টেবিলের ওপাশে গিয়ে তাদের আসনে বসেছে; অভিযুক্ত প্রবেশ করে, সরু একটা চুরুট ফুঁকতে-ফুঁকতে, চুরুটের ছাই যাতে প'ড়ে না-যায় তার চেষ্টা করে সে, যাতে সে প্রমাণ করতে পারে সে এখনো কতটা শান্ত, যদিও তার মুখের পাণ্ডুর রং আর কম্পিত পদক্ষেপ ঠিক তার উলটো কথাই বলছিলো। বাদী পক্ষের উকিল—তার পরনে কালো গলবন্ধ, অথচ অন্য-সবাই বসেছিলো জামার হাতা গুটিয়ে—এবার প্রধান বিচারপতিকে হত্যা করার চেষ্টার ইঙ্গিত করে: খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করা হয়েছিলো তাঁর ভ্রমণসূচি; সযত্নে বেছে নেয়া হয়েছিলো জায়গাটা ঠিক যেখানে তাঁর ওপর হামলা করা হবে; লোকজন দাঁড় করানো হয়েছিলো খোলা বা গোটানো খবরকাগজ হাতে, যাতে পালাবার সেরা পথটা কোন্ দিকে তার ইশারা মেলে; ব্লো-পাইপ, রঙের পিচকিরি, চট ক'রে যাতে শুকিয়ে যায় এমন রং এ-সব নিয়ে তৈরি ছিলো যারা গাড়ি রং করে—সেই রাতেই তারা এমন-একটা গাড়িকে ফিরিয়ে দেবে, কেউই যাকে চিনতে পারবে না। ঠিক সেইসময়েই কেউ-একজন, তুখোড় তার কল্পনাশক্তি, বাৎলেছিলো শুঁড়িপথটির কথা। আর কাজটাকে একেবারে সর্বাঙ্গসুঠাম সম্পন্ন করার উৎকাঙ্ক্ষা এতই প্রচণ্ড ছিলো যে তারা নদীর পাড় থেকে বাড়ির মণিকোঠা অব্দি একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে শুরু ক'রে দেয়—আস্ত বাড়িটাই উড়িয়ে দেয়া হবে তার সব সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত, কোনো স্যাঙাৎই আর বেঁচে থাকবে না, এই ইচ্ছেটাই তাদের বাধ্য করেছিলো পরিকল্পনাটাকে লুফে নিতে; মণিকোঠার দরজায় ছিলো শুভ্র দেবদূতের মূর্তি, তার ডানা দুটি ছড়ানো, আর হাত দুটি অঞ্জলির ভঙ্গিতে জড়ো; শেষ ফাঁকা কুলুঙ্গিটায় ঐখানে বসিয়ে দেয়া হবে বিজলি তার, আর কেউ যখন প্রশস্তি আওড়াবে, তখনি টিপে দেয়া হবে বোতাম। আমরা কাজ করতুম রাতে; মাটির তলার নর্দমার কাদামাটি ছিলো চটচটে, দুর্গন্ধে ভরা; প্রতিরাতে আমরা একটু-একটু ক'রে এগোতুম মাটির তলায়। যখন একরাশ কঠিন পাথরের গায়ে আমাদের শাবলের ঘা পড়লো, আমরা আবিষ্কার করলুম যে আমরা গোরস্থানের দেয়ালের তলায় বেদিগুলোর

বুনিয়াদের কাছে এসে পৌঁছেছি : সেখানটায় বীভৎস দুর্গন্ধ পেঁচিয়ে ধরেছিলো সবাইকে, যারা খুঁড়ছিলো তাদের কেউ-কেউ অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলো ; ডাক্তারি ছাত্ররা ফার্মেসিতে যে-ওষুধ বানিয়েছিলো তা-ই দিয়ে তাদের জ্ঞান ফেরানো হ'লো। পালা-ক'রে-কাজ-করার সেই বীভৎস পরম্পরা চলতো ভোর অব্দি, যখন জেলেপাড়ার প্রথম মোরগগুলো সেই অন্ধকারের কাজে ইতি টানতো— যে-কাজ ক্রমেই দীর্ঘ ক'রে তুলছে পথটাকে, আর পথটা তার ধ্রুবতারা ব'লে মেনে নিয়েছে মণিকোঠার দরজার ক্রুশ আর শুভ্র দেবদূতকে, একটু-একটু ক'রে এগুচ্ছে তারই দিকে। ···'কী বলার আছে তোমার নিজের তরফে,' বাদী-পক্ষের উকিল সেই খোচরের দিকে আঙুল তুলতেই আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম, সে সব কথা ফাঁস ক'রে দিতেই ঐ বিরাট কাজটা পুরোপুরি ভেস্তে গিয়েছিলো, কয়েকজনকে প্রাণ দিয়ে তার মাশুল দিতে হয়। 'কী বলার আছে, বলো' — সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, কোন্-সে অজ্ঞাত কারণ, কোন্-সে অসহনীয় নির্যাতন, কোন্-সে অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সে উদ্‌ঘাটিত করবে যা পর্দা ঢাকা ঘরটার গাদা-ক'রে-রাখা বন্দুকগুলোকে আর ব্যবহার করতে বাধ্য করবে না, বাধ্য করবে না সবচেয়ে মোটা গাছের গুঁড়িটায় গাদা-ক'রে-রাখা শাবলগুলোকে ব্যবহার করতে। কিন্তু হতচ্ছাড়া কেবল তার কাঁধ ঝাঁকিয়েছিলো ; আর তার পিঠ— আগে থেকেই হেরে-যাওয়া—মেনে নিয়েছিলো রায়টাকে, আমরা সবাই যা আগে থেকেই জানতুম···'মৃত্যু' কথাটা উচ্চারণ করা হ'লো : 'মুয়ের্তে'। আর, যে-কথাটা সবকিছুরই সমাপ্তি, যে-কথাটা চিহ্নিত ক'রে দেয় সৃষ্টির পতন, সংহার, সেই কথাটা ব'লে ফেলবার পর নেমে এসেছিলো এক দীর্ঘ স্তব্ধতা, আগেই যেটা 'উত্তরকালের' ; যা আর থাকবে না পরে, তার স্তব্ধতা ; এর মধ্যেই যে পূর্বস্বাদ পেয়েছে চাঁদমারি-ভাগ-ক'রে ছোঁড়া শিশের, সেইসব কম্পন আর আন্দোলন, যা আর বেঁচে থাকবে না, সেই এখনো-উষ্ণ নিশ্চলতার গায়ে ঝুরে-ঝুরে পড়বে মাটি। শরীরটা উপস্থিত—উপস্থিত, অথচ, একই সঙ্গে অনুপস্থিত— ; সে খুলে নেয় তার কব্জিঘড়ি, কোনো তাড়া করে না, কারণ সে জানে যে সে এখন সময়ের পরপারে চ'লে গিয়েছে ; সে ঘড়িটায় দম দেয়, অভ্যাসবশে, যে-অভ্যাসটা তখনো বজায় রেখেছিলো তার ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল, তারপর সেটা বিছিয়ে রাখে টেবিলে, সম্ভবত আর-কারু কাছে উত্তরাধিকার, আর শেষ বারের মতো তাকায় মিনিটের কাঁটার দিকে, যে এমন-একটি ঘণ্টার আবর্তন শুরু করেছে, যার সমাপ্তিটা সে আর চোখে দেখবে না। এই শরীরটাই

স্টেডিয়ামের স্নানঘরে ঝাঁঝরির তলায় আমায় একদিন মুগ্ধ করেছিলো, যখন সে ফিরে এসেছিলে সকলের হাততালির পর, ঘামে ভরা, ক্লেদেমলিন, কোনো জন্তুর মতো একটা বোঁটকা গন্ধে ভরপুর, আর তার রোমশ পিঠ থেকে সে খুলেছিলো তুলোর পুরু আংরাখাটা। তার পিঠের ঐ পেশীগুলো আমি কামনা করেছিলুম আমার নিজের শরীরের জন্যে; পেশীগুলো সব কেমন ক্ষিপ্রচপল নেচে বেড়াচ্ছিলো হাড়ের ওপর; মসৃণ চিক্কণ এক ভঙ্গিতে; উদরটা সরু হ'য়ে নেমেছে উরুসন্ধির কাছে তারপর মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে; ঐ পাগুলো, ছুটে যাচ্ছিলো জলের দিকে—এমন-এক বুকের তলায় তারা জন্মেছে যে-বুকটা তার সব উদ্বৃত্ত শক্তি নিঃশেষ ক'রে ফেলছিলো চেঁচিয়ে গান ক'রে। আর ছিলো অশ্লীল সব খিস্তি, জঘন্য সব শব্দ, যখন সে মাথায় ঘসছিলো সাবান, চেঁচিয়ে জানাচ্ছিলো যে তার বেজায় খিদে পেয়েছে নাচগান, মাল, আর মেয়েছেলের জন্যে। আমার মফস্বল শহরের বুদ্ধিজীবীরা—তারা ছিলো বাবার দরজির দোকানটার অক্লান্ত খদ্দের—যে-ফোয়ারাটার তলায় এরেদিয়া ধ্যান ক'রে চলেছেন, উদাস চোখে তারা তাকাতো তার দিকে; তারা হয়তো লিখে জানাতো যে পেশী হচ্ছে উজবুক, কেবল মগজটাই হচ্ছে আসল। কিন্তু আমি সেদিন ভ'রে গিয়েছিলুম সেই মাংসের ঈর্ষায় যা ঘিরে রেখেছিলো তার পুরুষালি কাঠামোটাকে; সে তার নিজের আতিশয্যেও নিষ্কলুষ, অকুণ্ঠিত, অনায়াস; পোলভল্টের লাঠির ডগায় একটু আগেই সে ছিলো শূন্যে উৎক্ষিপ্ত—পেরিয়ে যাচ্ছিলো সকল বাধা; একটু আগেও সে ছুঁড়েছিলো জ্যাভেলিন সেই সেকালের কোনো যোদ্ধার মতো। আর, এখন, এই পিঠটাই বিচারপতিদের সামনে দুর্দশায় বঙ্কিম, ন্যুব্জ, কুঁকড়ে-যাওয়া, যেন শুনতে চাইছে বুকের শেষ ধুকপুকগুলো। আর এবার, রায় দেবার সময়, হাতগুলো তুলতে হবে। দুই, পাঁচ, এখন মনেও নেই সে-কতগুলো হাত ছিলো সব শুদ্ধু। আমার হাত পড়েছিলো নিস্তেজ, নির্জীব, অসাড়; আমার চেয়ারের পাশে যে-কুকুরটা ল্যাজ নাড়ছিলো, তার ঘাড় চুলকে দেয়াটা ছিলো নিছকই ওজর। 'নিজের সমর্থনে যদি কিছু বলার থাকে তো বলো,' আমি তখনও বলি আবার, এমন নিচু গলায় যে কেউ শুনতে পায় না। আর সবাই যখন অপেক্ষা করে তখন অবশেষে ন'ড়ে ওঠে আমার কনুই, তুলে ধরে আমার কাপুরুষ আঙুলগুলো, অন্য-আরো অনেকের সমান তলে। সবাই আলিঙ্গন করে দণ্ডিতকে, একবারও তার মুখের দিকে না-তাকিয়ে। আর একটু পরেই, সবচেয়ে মোটা গাছটার তলায় এক-

সঙ্গে গ'র্জে ওঠে একঝাঁক বন্দুক। এবার, কী প'ড়ে আছে গাছতলায়, দেখে আমি স্তম্ভিত : কী সহজ একটা জীবন ছিনিয়ে নেয়া! সব মনে হচ্ছিলো স্বাভাবিক : একদিন যা নড়তো, এখন সে থামিয়ে দিয়েছে তার সব নড়াচড়া; যখন ভলকে-ভলকে বেরিয়ে এলো রক্ত, থেমে গেলো সব কথা; পুরু মিনের মতো লেপটে আছে রক্তের দাগ; দাড়ি না-কামানো গাল; যা-কিছু অনুভব করার ছিলো, সব অনুভূত; আর নিশ্চলতা বাধা দিয়েছে শুধু-তো এক পুনরাবৃত্তির বৃত্তকেই। 'এ না-ক'রে উপায় ছিলো না,' বললে সবাই, তাদের বিবেকের সঙ্গে বৈতালাপে, ইতিহাসের ন্যায্যতাকে খুঁজে বেড়িয়ে। আর তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলো রাতের মধ্যে, আর তাদের লুকিয়ে থাকতে হবে না. আর ভয় পেতে হবে না ছায়াকে, কারণ সময় পালটে গেছে. গতিক খারাপ নয় আর; 'এ না-ক'রে উপায় ছিলো না,' বারে-বারে এই কথা আরো জোরে চেঁচিয়ে ব'লে পরিবর্তমান সময়ের মধ্যে তারা আরো-নিষ্কলুষভাবে গা ঢাকা দিলে। আর তাদের গলার তীক্ষ্ণতা ততই বাড়তে থাকে যত তারা পেছনে ফেলে আসে মৃতদেহ…পাখিরা ঘুমোচ্ছে তাদের খাঁচায়, সোনারুপোর ঝালর দেয়া গম্বুজের তলায়; কাছিমগুলো তখনো নিশ্চল, তাদের মুখগুলো ঘোলা জলের ওপরে বাড়ানো। হাওয়ার আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র ছিলো যে স্বইস সন্ন্যাসীর হাতে, সে ততক্ষণে মাথার ওপর থেকে টেনে নামিয়েছে আলখাল্লার মাথাঢাকাটা —আমার মনে আছে—কারণ বৃষ্টির যে-কয়েকটা ফোঁটা পড়েছিলো শুকনো টালিগুলো ততক্ষণে তা শুষে নিয়েছে। সবচেয়ে মোটা গাছটার আশপাশে মাছি ওড়ে ভনভন ক'রে, ঝাঁঝরা-করা শিশেগুলোকে খোঁজে বোধহয়। তার একটা ডালের গায়ে ব্যাঙ ডাকে, কোনো রাতচরা পাখির মতো শুকনো কর্কশ গলায়। সেইসব ছিলো দিন, ন্যায়বিচারের…) দু-তিন বছর আগে হ'লে দিনের আলোতেও নিশ্চয়ই ন্যায়বিচারের দিনগুলো প্রতিহিংসা লেলিয়ে দিতো প্রবল ঘৃণায়; অপ্রশম্য রোষে ক্ষিপ্ত হ'য়ে দণ্ড দিতো দুর্বলদের গুপ্তচরদের, খতম করতো সবাইকেই। কিন্তু যা জরুরি, যা ন্যায্য. যা বীর্যময়, সে-সব ঘ'টে যাবার পর, ন্যায়বিচারের দিনগুলোর পর, এসেছিলো লুঠতরাজ আর পারিতোষিকের দিন; বদলার কোনো ভয় নেই ব'লে রাজনৈতিক অসন্তুষ্টেরা অনায়াসেই বিপদকে কাজে খাটাতে শুরু করলে, ছোটো-ছোটো সশস্ত্র দল বেঁধে ব্যাবসা করলে হিংসা ও হিংস্রতার, পারিতোষিকের বিনিময়ে রক্তারক্তির কাজ, এর-ওর ব্যক্তিগত সুখসুবিধের জন্যে প্রকাশ্য দিবালোকে লেলিয়ে দেয়া

হ'লো বলগা-ছেঁড়া ভয়ংকরকে। এই ভয়ংকরের দলকে ভয় করতো এমনকী পুলিশও, কেননা এদের আছে শক্তিশালী মুরুব্বি, যাদের কাছ থেকে এরা নিয়মিত মাইনে পায়, যাদের কাছে জেলখানার দেয়ালেও দুয়ার খুলে যেতো সবসময়। তখনও বলা হ'তো যে এটাই ঠিক, এটাই ন্যায়, এটাই দরকার ; কিন্তু যখন এই মিনারের পলাতকটি—এখন যার ওপর ঝুলছে দণ্ডাজ্ঞার ছায়া—ফিরে এলো একদিন কোনো দায়িত্ব সম্পাদন ক'রে, তাকে অজ্ঞান না-হ'য়ে-যাওয়া অব্দি পান করতে হ'লো মদ, অবিশ্রাম, শুধু এটাই বোঝাতে নিজেকে, যে যা সে করেছে সেটাই ঠিক, সেটাই ন্যায়, সেটাই দরকার। রক্তারক্তির একটা দাম ছিলো বৈ কি, যদিও তার দামটা খতিয়ে দেখা হ'তো বিপ্লবেরই শর্তে। আর রাস্তার পাশে-বসা লোকটার এখন যখন মনে পড়লো গুপ্তচর কথাটাকে কেমন ক'রে কাজ লাগানো হ'তো তখন, তার যে-হাত সেদিন মৃত্যু ছিটোতো, এখন সেটা মুঠো হ'য়ে উঠলো। পপলার গাছের ছায়ায় এখন যেটা দুমড়ে যাচ্ছে সেটা তারই পিঠ, রাতের অন্ধকারে জল্লাদের চোখ ঝলশে উঠছে—এই মুহূর্তটার ভয়ে এখন সেটা কুঁকড়ে যাচ্ছে। (অস্ত্র আছে কোথাও, গুলিভরা, যেমন তা ছিলো পর্দার আড়ালে, ঐ টেবিলে—রায় বেরুবার আগেই গুলিপোরা, পিস্তলের ঘোড়া, নল, নলের মুখ—সব লাগানো, তৈরি। 'রক্ষা করো নিজেকে,' আমি বলেছিলুম। কিন্তু কেউ এ-কথা শুনুক, তা তো আমি চাইনি। আমি কথাটা বলেছিলুম নিজেকে, যাতে নিজেকে বোঝাতে পারি যে কথাটা তো আমি বলেছিলুম। এখন আমি এমনকী নিজেকেও শুধোই, বলেছিলুম তো ঠিক, না কি অন্যরা যা বলছিলো তা-ই আমার মধ্যে প্রতিধ্বনির মতো বেজে উঠেছিলো। আর তার ভার সেই পথ-হাঁটা, তার চোখে যাতে চোখ না-পড়ে, এইজন্যে কী সাবধানে হাঁটতে হয়েছিলো আমায় ; বাকল খ'শে-পড়া সবচেয়ে মোটা গাছটার দিকে,—আমার স্পষ্ট মনে আছে—ঠিক এটারই মতো, যার পাতা আমার ওপর ভেতো বাদামের গন্ধ রেখে যাচ্ছে। একটা ব্যাঙ গান গাইছে, ডালের তলায়, অন্ধকারে—ঠিক সেদিন বিকেলে যেমন ; ঠিক সেদিন বিকেলে যেমন, আমি যখন ভেবেছিলুম ঈশ্বরের ডান পাশে বসার অধিকার আছে আমার···) বমি-বমি পেলো তার, সেই মুহূর্ত থেকে যতটা সময় সে বেঁচেছে সব যেন বমি হ'য়ে তার দম আটকে দিলে ; সেখান থেকে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করলো তার কোনো গির্জের স্বীকারোক্তির কুঠুরিতে, এই কথাই আর্ত স্বরে ব'লে উঠতে, যে, এমন

গ্লানি, এমন পাপবোধ বমি ক'রে দেয়া যায় সে-রকম গ্লানি, পাপবোধ তৈরি ক'রে দেবার জন্যে কিছুই জরুরি ছিলো না, দরকারি ছিলো না ; তার ওপর এমন অসাধারণ প্রায়শ্চিত্ত করার দায় ব'র্তে দেয়, সে-রকম কোনো কাজই থাকতে পারে না ; এতকাল গির্জে কারু ওপর সবচেয়ে কঠোর যে-প্রায়শ্চিত্তের ভার চাপিয়ে দিয়েছে, এ-যে তার চেয়েও কঠিন ; আর এই ভেবে খানিকটা সন্তোষও তার হ'লো যে এমন শাস্তি শুধু তাদের জন্যেই তোলা থাকে, যারা গলগল ক'রে তার মতোই বার ক'রে দিতে পারে সব পাপ আর গ্লানি। যখন সে দেখতে পেলে যে ফুটপাথের ঢাল বেয়ে দুটো লোক আস্তে নেমে আসছে, যেখানে ছায়ারা তাকে ঢেকে রেখেছে, সে পপলার গাছের শেকড়ের ওপর হ'য়ে আছড়ে পড়লো, এত জোরে পড়লো, যে তার দাঁত, কোনো শক্ত-কিছুর ঘা লেগে, রক্তের নোনা স্বাদে ভ'রে দিলো তার মুখ। 'মাতাল কেউ,' বললে বয়স্কজন, একটু ঝুঁকে প'ড়ে। 'হয়তো হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেছে,' বললে অন্য-জন, যে দেখতে চায়নি মৃতদেহ। 'ওরা সকালে এসে ওকে তুলে নেবে।' পথচারী দুজন অ্যাভিনিউ-এর দিকে চ'লে গেলো। মৃত্যু এদের কাছে কেমন সহজ অনায়াস ব্যাপার। একটা আড়-ধরা লাশ—সে শুধু তুলে ধ'রে সরিয়ে নিয়ে যাবার জিনিশ, বিরক্তিকরও, কেননা লাশটা ভারি আর ধরাধরি ক'রে নেবার পক্ষেও বড্ড অস্বস্তিকর, যদিও, স্বভাবতই, রাস্তায় একে প'চে যেতে দিলে চলে না, কারণ সেটা খুব-একটা ভালো দেখাবে না। আর-কিছু না-ই হোক, মানুষ ছিলো তো একজন, আর তার দেহরেখায় সে মনে করিয়ে দেয় এমন-একটা বৃত্তপথকে যেটা শেষ হ'য়ে গেছে শেকড়ের তলায়, তার ওপরে নয়! 'ওরা ওকে তুলে নিয়ে যাবে সকালবেলায়,' বয়স্কজন আবারও বললে, দূরে, যেন কর্তৃপক্ষকে জানাবার দায় থেকে রেহাই পাবারই তাগিদে। পলাতক উঠে দাঁড়ালো, আস্তিন থেকে ঝেড়ে ফেললো লাল পিঁপড়েগুলো—আর এদের কামড় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো। এক মুহূর্ত থেমে সে নিশ্চিত হ'য়ে নিলে ও-পাশের ফুটপাথে যে-পায়ের আওয়াজ উঠছে সেটা তারই চলার প্রতিধ্বনি কি না। দক্ষিণ থেকে উত্তরে বইছে হাওয়া, আর হাওয়ার ঝাপটায় আবারও একবার ভেসে এলো লাউডস্পীকারের গাঁকগাঁক, মেয়েদের কোরাস—তার মধ্যে ফার্মেসি বিভাগের একটি মেয়ের রিনরিনে গলাটা অব্দি সে চিনতে পারলে : 'আবার, সত্বর, তুমি ফিরে এসো এই হলঘরে, / দ্বিতীয় যে-পরম্পরা তুমি নিজে শুরু করেছিলে / ছেদ টেনে যাও তাতে, ঠিক ঐ প্রথমের মতো।'

আর এক পুরুষকণ্ঠ উত্তর দিলে : 'ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। / আমরা তো জানি, সে কেমন ক'রে কেউ / সারে এই কাজ; তবে, যে-পন্থাই বেছে নাও / চটপট করো।' আর অমনি কোনো ইলেকট্রা আর্ত কেঁদে উঠলো প্রচণ্ড। পুরুষকণ্ঠ ঠিকই বলেছে : চটপট করতে হবে তাকে, যত তাড়াতাড়ি পারে যেতে হবে সেখানে, যে-কোনো রাস্তা ধ'রে। 'আমরা তো জানি, সে কেমন ক'রে কেউ সারে এই কাজ।' সেই অন্য স্বরটাও কোনো অলুক্ষুণে কথা আওড়ায়নি। সমুদ্র অব্দি, তার সামনে খুলে গেছে উৎরাই-বেয়ে-নামা অ্যাভিনিউ দূরের বিদ্যুৎঝলকের সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল-ধাওয়া মেঘের সারের দিগন্তরেখায়, যেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির বিশাল-বিশাল সব মূর্তি, ব্রনৃজের ফ্রককোট গায়ে, নায়কের মতো দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানাইট পাথরের বেদিতে, আইসক্রিমের আর ঠাণ্ডা পানীয়ের ফিরিওলাদের ওপর মিনারের মতো বিশাল; ফিরিওলাদের ঠুনঠুন ছোটো ঘুন্টিগুলো ঠিক তেমন শোনালো, কারু শেষ দশায় শাস্ত্রাচার সারার সময় পুরুৎরা যেমন-সব ছোটো ঘণ্টা নাড়ে। এখানে তাকে বাড়িঘর-গুলোর পাশ কাটিয়ে যেতে হবে, কারণ তালগাছের সার—রাস্তার বাতিগুলোর চেয়েও তাদের চূড়া উঁচু—কোনো ছায়া দেয় না। পলাতক পৌঁছুলো করুণ কফিখানার অন্ধকার গলিটায়—তার সবুজ কাঠের থামগুলো কোনো নোংরা যা-দশায় তাস্কানির নকল। তার লম্বা-লম্বা পদক্ষেপ পৌঁছে যায় দূরের মোড় অব্দি, যেখানে 'প্রয়াসভবন', দেয়ালবিহীন তাকিয়ে আছে হতভম্ব। একটা মর্মরশিলার মেঝের ওপর ভাঙাচোরা একসার স্তম্ভ ছাড়া আর-কিছুই না সে; কড়িকাঠ থেকে খ'শে-পড়া পাথর, কড়িবরগা আর পলেস্তারার রাশির মধ্যে শুধু থামগুলোই দাঁড়িয়ে আছে কোনোমতে; জানলার জাফরিগুলো উধাও, নেই সেই সিংহগুলোও যাদের মুখ থেকে ঝুলতো আংটা; একটা ঠেলাগাড়ি যাবার বাঁকাচোরা দাগ পেরিয়ে গেছে বিশাল বৈঠকখানাটা; দাগটা শেষ হয়েছে চাকরদের কুঠুরিগুলোর কাছে—যেখানে এক আবর্জনাস্তূপের ওপর কয়েকটা শাবল প'ড়ে আছে কাটাকুটি ক'রে, আড়াআড়ি। আন্দালুসীয় চিত্র-লিপি খোদাই-করা লোহার বেড়ার পাশে প'ড়ে আছে উদ্যানের দেবী পোমোনার মূর্তি, বেদি আর তলার ভিৎটা আর সব পলেস্তারা প'ড়ে আছে ফুলপাতার এক ঝোপের ওপর। কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে একটা কুকুর, আর তার ওপরে বড়ো-বড়ো হরফে ভাঙা পোড়া কাঠ দিয়ে কে লিখে গেছে :

পেছনের ঘরের একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে তখনও; আগে যেখানে ছিলো সিন্দুক, এখন সেখানে প'ড়ে আছে একটা ওলটানো ঠেলাগাড়ি; সিন্দুকটার গায়ের কারুকাজ তাকে সেবার বেজায় আমোদ দিয়েছিলো: তার এষণা ছিলো, শূন্যে ঘুরপাক-খাওয়া একটা খড়পোরা মানুষ, আর লাঠি হাতে ষাঁড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে-যাওয়া শৌখিন বিলাসীর দল। এটাকে ছাড়া, মনে-মনে দপ্তর ঘরের আশবাবপত্রের ছবিটা দাঁড় করানো কঠিন: একটা টেবিলে ছিলো ব্রন্‌জের ঈগলের গায়ে বসানো একটা ফাঁকা দোয়াতদান, অলংকার-করা চামড়ার গায়ে লাগানো চোষকাগজ। কাছের রাস্তার বাতির আলো সেখানটায় পৌঁছোয় না, সেই কোণায় ব'সে—বসাটাই যথেষ্ট—ভাঙনের মুহূর্তটাকে স্পষ্ট বিশদভাবে কল্পনা ক'রে নিতে তার দেরি হ'লো না। সেই মুহূর্তটার আগে অব্দি সব ছিলো বেপরোয়া, ডাকাবুকো, দুঃসাহস, আত্মবিস্মরণ, পবিত্র রোষদীপ্যতা—সবকিছু বাহিনীর ভয়ংকর কাজগুলোর পেছনে লাগানো। ওরা তাকে শিখিয়েছিলো কেমন ক'রে জাল করতে হয় গাড়ির নম্বর, ফাটিয়ে দিতে হয় ডায়নামাইট, কেটে ফেলতে হয় শটগানের নল, আর কেমন ক'রে তাতে পুরে দিতে হয় দুটি ছররা আর একটা ভারি শিশের গুলি; সে জানে সংকেতলিপিগুলো, সে জানে কেমন ক'রে পাঠোদ্ধার করে গুপ্তলিপির—**HYPOTENUSA**—অতিভুজ—সে-কাকে বোঝায় এই শব্দ, এটাই ছিলো গুপ্তলিপির চাবি, কেননা কোনো বর্ণই দু-বার ব্যবহৃত হয়নি এ-শব্দে, এবং তারপর বর্ণগুলোকে আবার বিশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে নিলেই পাওয়া যেতো কোনো গোপন নির্দেশ; সে জানে খোলা কিংবা বন্ধ খবরকাগজের ইঙ্গিত; আর সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সময় সে একটা শাবল চুবিয়েছিলো কাদায়, নোংরা নর্দমার দুর্গন্ধের সঙ্গে যেখানে ঠেশে মিশেছিলো কফিন থেকে চুঁইয়ে-পড়া গলা মাংস—কুমোরদের মাঠের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গটার আসবার কথা ছিলো প্রধান বিচারপতির বাড়ির মণিকোঠার ঠিক তলায়—আর তার অন্ত্যেষ্টিতে তামাম জিনিশপত্তরের দিকে তারা তাকিয়েছিলো ঘৃণার চোখে। 'আপদ বিদেয়,' : যখন তারা বলতো প্রতিহিংসার রূঢ় স্বরে, যখন কোনো শবযাত্রা তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে যেতো তাদের, যখন রুদাইরা অস্বস্তিভরে চলতো কবরের মধ্য দিয়ে, অস্বস্তিভরে সাইপ্রেস গাছের সারের দিকে তাকাতে-

ডাকাতে। 'আপদ বিদেয়,' : যখন তারা খবরকাগজে পড়তো মৃত্যুসংবাদ, কালো রেখার চৌখুপির মধ্যে কারু সৎকারের বার্তা, যার 'রেকুইয়েস্কাৎ ইন পাসে' [শান্তিতে বিশ্রাম করুক] তার কাছে মনে হ'তো অসংযমের বাড়াবাড়ি··· আর, একদিন এলো তারও গুলি ছোঁড়ার পালা ; রাষ্ট্রপতিদের ব্রনৃজে-গড়া মূর্তি বসানো চওড়া অ্যাভিনিউটায়। বলিকে মনে হচ্ছিলো সকালের ঠাণ্ডায় সুখী, হাসিখুশি ; সে বেড়াচ্ছিলো সমুদ্রের ধারে, গাড়ি ক'রে, সকালের হাওয়া তারিয়ে-তারিয়ে চাখবে ব'লে ; সবুজ দরজাটার ধাতুর তৈরি কাঠামোর গায়ে আঙুল দিয়ে সে তাল দিচ্ছিলো কোনো গুনগুন গানের সুরে, আর তার অনামিকায় জলজল করছিলো একটা চুনি। তার পশ্চাদ্ধাবকেরা নিক্তি-মাপা গতিতে এগিয়ে এলো, গাড়ির মেঝে থেকে তুলে নিলো বন্দুকগুলো, কারু বন্দুকের বাঁট যেন অন্য কারুর বাঁটের গায়ে ধাক্কা না-লাগায়, এই জন্যে সাবধান। 'সেফটিটা খুলে নাও,' বলেছিলো একজন, তার ডান পাশ থেকে, সে-যে নবিশ, এটা জেনেই। বলির ঘাড়টা শিগগিরই এত কাছে এগিয়ে এলো যে সে ইচ্ছে করলে বিষব্রণের দাগগুলোও সব গুনতে পারতো। তারপরে এক পাশ থেকে এলো মুখটা, তারপর আতঙ্কে বিস্ফারিত মুখচোখ, মিনতিতে ভরা দুটি কাতর চোখ, একটা আর্ত চীৎকার, আর গুলির আওয়াজ। নৌবাহিনীর বীরদের স্মৃতিস্তম্ভের রণতরীটার গলুইয়ের গায়ে ঝাঁঝরা-হ'য়ে-যাওয়া গাড়িটা দেশলাইয়ের খোলের মতো গুঁড়িয়ে গেলো, আর আততায়ীদের গাড়ি ছুটে পালালো পাশের রাস্তা দিয়ে। 'আপদ বিদেয়।' কিন্তু সে-রাতে তাকে মাল টানতে হয়েছিলো অজ্ঞান না-হ'য়ে যাওয়া অব্দি, অবিশ্রাম, অভিভূতের মতো আছড়ে পড়েছিলো এস্ত্রেইয়ার খাটে, সেই বিষব্রণের দাগে ভরা ঘাড়টাকে ভুলে যাবার জন্যে কেবল সে মাল টেনেছিলো, আর ঘাড়টা সারাক্ষণ ছিলো তার সঙ্গে, তার হাতের নাগালে, প্রায় আঙুলের ছোঁয়ার মধ্যে। পরে যখন শিগগিরই জানতে পেলে যে এই মৃত্যুতে কোনো-একজনের ব্যক্তিগতভাবে বিস্তর লাভ হয়েছে, সন্দেহ হানা দিয়েছিলো তার ওপর, যদিও তার আশপাশে যারা থাকতো তারা তাকে কথা দিয়ে ভোলাতে চাচ্ছিলো— এমন-সব কথা, যা দিয়ে ন্যায্য ব'লে প্রমাণ করা যায় যে-কোনো কাজকেই। 'বিপ্লব,' তারা বলেছিলো, 'এখনও শেষ হয়নি।' আর ধাপে-ধাপে, তার আরো-সক্রিয় হাত দুটির নাছোড় হ্যাঁচকা টানে, সে হ'য়ে উঠেছিলো বিভীষিকার আমলাবাজিরই অংশ। প্রাথমিক সেই পবিত্র রোষ, দণ্ডিতদের

মৃতদেহ যেটা জাগিয়ে তুলতো, পতিত, নিপীড়িতদের হ'য়ে প্রতিশোধ নেবার শপথ করতো যা, সেই HOC ERAT IN VOTIS [যা আমরা চেয়েছিলাম, তা তো এই-ই] হ'য়ে উঠেছিলো ওপর-মহলের লোকদের দ্রুত মুনাফা আর সুরক্ষার ব্যাবস্থা। আর একদিন সকালে, গোইয়ার ছবির মতো কারুকাজ-করা সিন্দুকটার পাশে ব'সে, 'জগতের সেরা বাগ্মীরা' বইটার প্রস্তুতি তদারক করেছিলো সে, তারপর সেটা ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। এস্ত্রেইয়ার আস্তানা থেকে বেরিয়ে বাজারের যে-কফিখানাটায় সে যেতো সবসময়, পরদিন যখন সে গ্রেফতার হ'লো সেখানে, সে বুঝতে পেরেছিলো পুলিশ তাকে শুধু সন্দেহের বশেই পাকড়েছে, সত্যিকার কোনো প্রমাণ নেই তাদের হাতে, অন্তত রেজিস্টারি ডাকে পাঠাবার রশিদটা সে লুকিয়ে রেখেছিলো, আর মারণপুঁথি যে বানিয়েছিলো, সে যখন জানতে পেরেছিলো যে যার উদ্দেশে পাঠানো ঠিক তার হাতেই বইটা ফেটে পড়েছে, শহর থেকে চম্পট দিতে গিয়ে সে প্রাণ খুইয়েছিলো, আর বড়ে উস্তাদ—চুপ ক'রে থাকাটা তো তার নিজের পক্ষেই ছিলো বিষম জরুরি··· তার মনে প'ড়ে গেলো কেল্লার অপসার-সেতুটা অতিক্রম করার কথা; কালো-কালো সব ঘুলঘুলি, যেগুলো থেকে তখনও ঝুলছে মরচে-পড়া জং-ধরা সব শেকল; তারপর ঢাকা-বারান্দা আর ছোটো-ছোটো কুঠুরি, যেগুলির আলো কখনো নেভে না, যাতে নেয়ারের বা লোহার খাটে প'ড়ে-থাকা লোকগুলো জানোয়ারের মতো সংগম না-করে। তারপর এসেছিলো তার ঘর। দু-দিন একা বন্দীদশায় কাটাবার পর—কোনো খাদ্য নেই, কোনো মাল নেই, বিশেষ ক'রে মাল, মাসের পর মাস রোজ অতখানি মাল টানার পর তার শরীর যার জন্যে হন্যে হ'য়ে উঠেছিলো—হঠাৎ তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো আলো; চাবুক-উঁচনো হাত; কাদের গলা বলাবলি করছে দাঁতের ডাক্তারের তুরপুন দিয়ে দাঁত ছ্যাঁদা ক'রে দেবার কথা, আর অন্যরা বেধড়ক পেটাচ্ছে তার অণ্ডকোষ। তার যৌনাঙ্গের ওপর এমন হামলাটা তার সইছিলো না; কারু সে-অধিকার নেই, কারু সে-ক্ষমতা থাকতে পারে না। সে খুন করেছে বটে লোককে, কিন্তু কাউকে খাশি ক'রে দেয়নি। আর এখন এরা তাকে এমনভাবে ছিঁড়বে যে নিজের কাছ থেকেই সে নিজে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে; এরা তার জীবনটাকে শুকিয়ে ফেলতে চাচ্ছে, শুষ্ক, রসহীন একটা ছিঁবড়ে বানিয়ে দিচ্ছে তাকে; অস্তিত্বের সেই কেন্দ্র, যেখানে শরীর তার মোহর বসিয়ে দিয়েছে, বসিয়ে দিয়েছে তার নিবিড়তম অহমিকা, নিজে-নিজেই

চেতিয়ে ওঠে যে-শক্তি, যেটা তার অদম্যতার গর্ব—সব তার কাছ থেকে এরা ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার পা বার্ধক্যের পথে পা দেবে; তার সব ভাবী রতি-উল্লাস, তার অগুনতি না-ঘটা সংগম—সব হারিয়ে যাবে; অন্ত শরীরের কাছে সে বেঁচে থেকেও হ'য়ে উঠবে নিঃসাড়, ব্যর্থ, মৃত। তার অস্তিত্বটাই যে তবে ভেঙে চৌচির হ'য়ে যাবে! চোখের ওপর ধমক দেয়া আলো তাকে টেনে ছিঁড়ছে, ঠিক যেমনটা হয় কোনো ব্যবচ্ছেদ টেবিলে, গলার স্বরগুলো ক্রমে এগিয়ে আসছে আরো কাছে—সেই নিচু ছাতের হাজতটায় স্বরগুলো কেমন বীভৎসভাবে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠছে—আর তারা বলাবলি করছে তার অস্তিত্বের পূর্ণতায় আঘাত হানবার কথা—তার পৌরুষ ছিনিয়ে নেবার কথা—তার সত্য নাশ ক'রে দেবার কথা—তার পুরুষাঙ্গ ছিনিয়ে নেবার কথা। তার শিউরে-ওঠা শরীরের কাঠামোর দিকে এগিয়ে আসছে হাতগুলো, তার সারা গা ঘামে নাওয়া; তার শরীরের অন্য-কোনো অংশ ছিঁড়ে নিলে যত যন্ত্রণা পেতো, তার চেয়েও হয়তো কম হবে এই ব্যথা, কিন্তু তার পূর্বভয় তবু বাড়িয়ে দিলে না-ঘটা ব্যথাটাকে। এবার আসবে তার পুরো জগৎটারই সমূহ ধ্বংস: মৃত্যুর আগে সে-যে আরেকরকম মৃত্যু, এরপর থেকে তাকে মেনে নিতে হবে সীমাহীন সব আলিঙ্গনহারা দিন, তার নিজের লাশটার ভারে কুঁজো, নুয়ে-পড়া, দুমড়ে-যাওয়া। সাঁড়াশির প্রথম কামড়টা তার মধ্য থেকে মুচড়ে বার ক'রে নিয়ে এলো এক জান্তব আর্তনাদ, এত দীর্ঘ আর এমন শোচনীয় যে ওরা তাকে কাপুরুষ ব'লে টিটকিরি দিয়ে এক ঘায়ে তাকে চুপ করিয়ে দিলে; আর তার কুঁকড়ে-যাওয়া চামড়ায় আবার যখন সে পেলে ধাতুর তুহিন স্পর্শ, সে চেঁচিয়ে ডাকলো তার মাকে, এক গলাভাঙা আর্তনাদ যেটা পরক্ষণেই হ'য়ে উঠলো খাবি খাওয়ার শব্দ, তার টনটন-ক'রে-ওঠা গলাটার অনেক তলায় গুমরে উঠলো এক ভীষণ কান্না। আর তার চোখ দুটি—বিস্ফারিত—তাকিয়ে আছে আলোর দিকে, কী-একটা আবছা বৃত্তে তার চোখের তারা দুটোকে ভ'রে দিলে আলো, যা তার ছিলো তার ওপর তার হাত বেছানো, কাতর, আর্ত, যেন তাকে পুনরুদ্ধার করার ভঙ্গিতেই, যেন তাকে আঁকড়ে ধ'রে শরীরের মধ্যে তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে সে কোনোমতে। আর, সে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলে। যা ওরা জানতে চাচ্ছিলো, সব, সব ব'লে দিলে: সাম্প্রতিক দুষ্কর্মগুলোর বিশদ বিস্তৃত বিবরণ দিলে, আর নিজের ভূমিকাটাকে খর্ব ক'রে দেখাবার জন্যেই নিজেকে সে

আঁকলো নেহাৎই একজন নগণ্য শাগরেদ ব'লে, নিছকই একজন ফালতু লোক, অনেক স্যাঙাৎদের একজন, নাম ব'লে দিলে তাদের, যারা এখন শহরতলির কোনো বাড়ির সোফায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে, অথবা খাবারঘরের লম্বা টেবিলটাকে ঘিরে ব'সে মাল খাচ্ছে বা তাশ খেলছে, আর তাদের বন্দুকগুলো ঝুলছে তাদের চেয়ার থেকে, পেছনে। এইসব তথ্য ও উদ্‌ঘাটনে খুশমেজাজ তার প্রশ্নকর্তারা তার এই এজাহারটাও মেনে নিলে যে বইটার প্রস্তুতি কিংবা প্রেরণ — কোনোটাতেই তার হাত ছিলো না, যে-মারণপুঁথি দুটি লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে, তার দায়টা সে চাপালে দলটার সমবেত কাজের ওপর। আর যখন ন্যাংটো লোকটা, তার যৌনাঙ্গ চেপে ধ'রে, হলফ ক'রে বললে যে সে শুধু এইটুকুই জানে, ওরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো তার কুঠুরিটায়, পুরস্কার হিশেবে দিলে একটা সিগারেট। আর তারপর আবার শুরু হ'লো আগের মতো বন্দিদশা, বাইরে ঢাকা-বারান্দায় খটখট পায়ের আওয়াজ, আর চেপে ব'সে রইলো এই শঙ্কা যে সবকিছু আবার ফিরে শুরু হবে আগের মতোই। ভোর-বেলায় চৌকিদারের কাছে পাঠানো এক খবরে সে প্রার্থনা করলে যে রাষ্ট্রপতি-ভবনের অমুককে যেন তার গ্রেফতারের খবর পাঠানো হয়। আধ ঘণ্টা পরে রাষ্ট্রপতির সচিবের নির্দেশে তাকে ছেড়ে দেয়া হ'লো···সে পেরিয়ে এলো পরিখার ওপরকার অপসার-সেতু, আস্তে বেয়ে নামলে কেল্লার ঢাল, নরকে এক ঋতু কাটিয়ে আসার পর রাস্তায় প্রাণের সাড়া ফিরে আসছে দেখে সে কি-রকম অভিভূত হ'য়ে পড়লো। কোনো রোগশয্যা থেকে ধীরে-ধীরে কেউ ভালো হ'য়ে উঠতে থাকে যে-রকম; মানুষের জগতে আবার ফিরে-আসা যে-রকম। তার এমনকী খিদেও পাচ্ছিলো না; সে এমনকী ঐ চওড়া মেহগিনির কাউন্টারগুলোয় গিয়ে দাঁড়াবার কোনো তাড়া বোধ করলে না যেখানে সকালবেলার মাতালরা এর মধ্যেই গেলাশে প্রথম ফোঁটাগুলো ঢালতে শুরু করেছে, যেন কোনো মৃতের মঙ্গলকামনায় চেখে দেখছে গেলাশের মদ। নরম ফিনফিনে কুয়াশার তলায় পপলারগুলো সব পালকে-পালকে কিচিরমিচির ক'রে উঠেছে। দিব্য হৃদয়ের গির্জেটির মোচার মতো গম্বুজটা কেমন-একরকম শুভ্রতায় বিকীর্ণ, জ্যোতির্ময়; সান নিকোলাসের গ্রাম্য গম্বুজের ওপরে সে তুলে ধরেছে মর্মরকুমারীকে, যেখানে এই মুহূর্তে নেগ্রো বুড়িরা অনেক পাকা চুল আরো-অনেক পাকা চুল সমেত, হলদে কোমরবন্ধ দিয়ে বাঁধা আরক্তিম ঢিলে জামা প'রে এসেছে নাসারেনের কাছে ব্রতপালনে, শুনছে

সমবেত প্রার্থনার সুগম্ভীর ধ্বনি। আর সকালবেলার সূর্যের তলায় লাল কাচে আর মর্মরে-গড়া সব গম্বুজ ঝকমক ক'রে উঠেছে—সেই কারমেন, সান্ ফ্রানসিস্কো, আর মের্সেদেসের তামার ঘণ্টামিনারের সব গম্বুজ। রেলিং-ঘেরা জেগে-ওঠা ছাতগুলোয় ধোবানিরা মেলে দিচ্ছে কাচা কাপড়—চারপাশ-ঘেরা এমন-এক উঁচু সমুদ্রতটের পশ্চাৎপটে যে মনে হচ্ছে জেলেডিঙিগুলোও যেন ছাতের ওপর দিয়েই চলেছে। ছাড়া-পাওয়া লোকটা চ'লে গেলো তার আস্তানায়, ভাড়াটে ঘরটায়, বুক ভ'রে টেনে নিলে উপপ্রকোষ্ঠের ঠাণ্ডা হাওয়া ; হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে-আসা কারু মতো সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলে দাড়িপাল্লায় চাপানো ফলমূলের গন্ধ, টাটকা রুটির মুচমুচে শব্দ, কফি জ্বাল দেবার সুবাস, মাখনের স্নেহমসৃণতা আর মধুর নম্র দীপ্তি। দুপুর অব্দি ঘুমিয়ে থাকলো সে, ঘুম ভাঙলো হরকরার ডাকে, খবরকাগজের বিশেষ সংস্করণ বেরিয়েছে। খবরকাগজে ছবি বেরিয়েছে ফুটপাতের ওপর গড়াগড়ি-যাওয়া তার এত-চেনা মৃতদেহগুলোর, ওলটানো আশবাবপত্রের মধ্যে রক্তের বন্যা, ব্যবচ্ছেদ-টেবিলের ওপর মুমূর্ষু মানুষ, আর জানলা—রান্নাঘরের জানলা, ভাঁড়ার ঘরের জানলা—যার মধ্য দিয়ে পালিয়েছে কয়েকজন, নয়ানজুলিতে লাফিয়ে প'ড়ে। সেই বিকেলেই, যখন সে বড়ো উস্তাদের বাড়ি যাচ্ছে—যে-বাড়িটার দেয়াল এখন নিছক একটা হাওয়ার ঢেউ—সে ঠিক শেষ মুহূর্তে আশ্রয় পেয়েছিলো একটা থামের আড়ালে, কোনোমতে বেঁচে গিয়েছিলো একটা চলন্ত কালো গাড়ি ঝাঁকে-ঝাঁকে বেরিয়ে-আসা গুলি থেকে, যার নম্বর-প্লেটের ওপর উড়ছিলো ফুরফুরে রঙিন কাগজের হালকা ঝালর, কারণ এ-যে এখন কার্নিভালের সময়।

কুকুরটা জেগে উঠেছে। সে ডেকে উঠছে মাথার ওপর জমাট অন্ধকার দেখে, কোনো রাগ নেই, শুধু একঘেয়ে একটানা ডাক, একটা ঘেউয়ের পর আরেকটা, কেবল তার ঘায়ে-ভরা ল্যাজটাকে মাছির খপ্পর থেকে বাঁচাবার জন্যে যখন তেড়ে পাক খাচ্ছে, তখনই যা একটু থামছে। আস্তে উঠে দাঁড়ালে পলাতক, ঠেলাগাড়ির পথ ধ'রে নেমে এলো, ঢুকে পড়লো বৈঠকখানার খোলা আকাশের তলায়, যেখানে কোনো পম্পেঈয়ের রূপকের তম্বুরা আর প্যানের বাঁশিটাকেই দেখা যাচ্ছে এখন, রং-চটা, আধভাঙা, নোংরা। দুয়ারহীন প্রবেশপথের

থাকলো নেহাৎই একজন নগণ্য শাগরেদ ব'লে, নিছকই একজন ফালতু লোক, অনেক হ্যাঙাৎদের একজন, নাম ব'লে দিলে তাদের, যারা এখন শহরতলির কোনো বাড়ির সোফায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে, অথবা খাবারঘরের লম্বা টেবিলটাকে ঘিরে ব'সে মাল খাচ্ছে বা তাশ খেলছে, আর তাদের বন্দুকগুলো ঝুলছে তাদের চেয়ার থেকে, পেছনে। এইসব তথ্য ও উদ্‌ঘাটনে খুশমেজাজ তার প্রশ্নকর্তারা তার এই এজাহারটাও মেনে নিলে যে বইটার প্রস্তুতি কিংবা প্রেরণ—কোনোটাতেই তার হাত ছিলো না, যে-মারণপুঁথি দুটি লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে, তার দায়টা সে চাপালে দলটার সমবেত কাজের ওপর। আর যখন হ্যাংটো লোকটা, তার যৌনাঙ্গ চেপে ধ'রে, হলফ ক'রে বললে যে সে শুধু এইটুকুই জানে, ওরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো তার কুঠুরিটায়, পুরস্কার হিশেবে দিলে একটা সিগারেট। আর তারপর আবার শুরু হ'লো আগের মতো বন্দিত্ব, বাইরে ঢাকা-বারান্দায় খটখট পায়ের আওয়াজ, আর চেপে ব'সে রইলো এই শঙ্কা যে সবকিছু আবার ফিরে শুরু হবে আগের মতোই। ভোর-বেলায় চৌকিদারের কাছে পাঠানো এক খবরে সে প্রার্থনা করলে যে রাষ্ট্রপতি-ভবনের অমুককে যেন তার গ্রেফতারের খবর পাঠানো হয়। আধ ঘণ্টা পরে রাষ্ট্রপতির সচিবের নির্দেশে তাকে ছেড়ে দেয়া হ'লো···সে পেরিয়ে এলো পরিখার ওপরকার অপসার-সেতু, আস্তে বেয়ে নামলে কেল্লার ঢাল, নরকে এক ঋতু কাটিয়ে আসার পর রাস্তায় প্রাণের সাড়া ফিরে আসছে দেখে সে কি-রকম অভিভূত হ'য়ে পড়লো। কোনো রোগশয্যা থেকে ধীরে-ধীরে কেউ ভালো হ'য়ে উঠতে থাকে যে-রকম; মানুষের জগতে আবার ফিরে-আসা যে-রকম। তার এমনকী খিদেও পাচ্ছিলো না; সে এমনকী ঐ চওড়া মেহগিনির কাউন্টারগুলোয় গিয়ে দাঁড়াবার কোনো তাড়া বোধ করলে না যেখানে সকালবেলার মাতালরা এর মধ্যেই গেলাশে প্রথম ফোঁটাগুলো ঢালতে শুরু করেছে, যেন কোনো মৃতের মঙ্গলকামনায় চেখে দেখছে গেলাশের মদ। নরম ফিনফিনে কুয়াশার তলায় পপলারগুলো সব পালকে-পালকে কিচিরমিচির ক'রে উঠেছে। দিব্য হৃদয়ের গির্জেটির মোচার মতো গম্বুজটা কেমন-একরকম শুভ্রতায় বিকীর্ণ, জ্যোতির্ময়; সান নিকোলাসের গ্রাম্য গম্বুজের ওপরে সে তুলে ধরেছে মর্মরকুমারীকে, যেখানে এই মুহূর্তে নেগ্রো বুড়িরা অনেক পাকা চুল আরো-অনেক পাকা চুল সমেত, হলদে কোমরবন্ধ দিয়ে বাঁধা আরক্তিম ঢিলে জামা প'রে এসেছে নাসারেনের কাছে ব্রতপালনে, শুনছে

সমবেত প্রার্থনার সুগম্ভীর ধ্বনি। আর সকালবেলার সূর্যের তলায় লাল কাচে আর মর্মরে-গড়া সব গম্বুজ ঝকমক ক'রে উঠেছে—সেই কারমেন, সান্ ফ্রানসিস্কো, আর মের্সেদেসের তামার ঘণ্টামিনারের সব গম্বুজ। রেলিং-ঘেরা জেগে-ওঠা ছাতগুলোয় ধোবানিরা মেলে দিচ্ছে কাচা কাপড়—চারপাশ-ঘেরা এমন-এক উঁচু সমুদ্রতটের পশ্চাৎপটে যে মনে হচ্ছে জেলেডিঙিগুলোও যেন ছাতের ওপর দিয়েই চলেছে। ছাড়া-পাওয়া লোকটা চ'লে গেলো তার আস্তানায়, ভাড়াটে ঘরটায়, বুক ভ'রে টেনে নিলে উপপ্রকোষ্ঠের ঠাণ্ডা হাওয়া ; হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে-আসা কারু মতো সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলে দাড়িপাল্লায় চাপানো ফলমূলের গন্ধ, টাটকা রুটির মুচমুচে শব্দ, কফি জ্বাল দেবার সুবাস, মাখনের স্নেহমসৃণতা আর মধুর নম্র দীপ্তি। দুপুর অব্দি ঘুমিয়ে থাকলো সে, ঘুম ভাঙলো হরকরার ডাকে, খবরকাগজের বিশেষ সংস্করণ বেরিয়েছে। খবরকাগজে ছবি বেরিয়েছে ফুটপাতের ওপর গড়াগড়ি-যাওয়া তার এত-চেনা মৃতদেহগুলোর, ওলটানো আশবাবপত্রের মধ্যে রক্তের বন্যা, ব্যবচ্ছেদ-টেবিলের ওপর মুমূর্ষু মানুষ, আর জানলা—রান্নাঘরের জানলা, ভাঁড়ার ঘরের জানলা—যার মধ্য দিয়ে পালিয়েছে কয়েকজন, নয়ানজুলিতে লাফিয়ে প'ড়ে। সেই বিকেলেই, যখন সে বড়ো উস্তাদের বাড়ি যাচ্ছে—যে-বাড়িটার দেয়াল এখন নিছক একটা হাওয়ার ঢেউ—সে ঠিক শেষ মুহূর্তে আশ্রয় পেয়েছিলো একটা থামের আড়ালে, কোনোমতে বেঁচে গিয়েছিলো একটা চলন্ত কালো গাড়ি ঝাঁকে-ঝাঁকে বেরিয়ে-আসা গুলি থেকে, যার নম্বর-প্লেটের ওপর উড়ছিলো ফুরফুরে রঙিন কাগজের হালকা ঝালর, কারণ এ-যে এখন কার্নিভালের সময়।

...

কুকুরটা জেগে উঠেছে। সে ডেকে উঠছে মাথার ওপর জমাট অন্ধকার দেখে, কোনো রাগ নেই, শুধু একঘেয়ে একটানা ডাক, একটা ঘেউয়ের পর আরেকটা, কেবল তার ঘায়ে-ভরা ল্যাজটাকে মাছির খপ্পর থেকে বাঁচাবার জন্যে যখন ভেড়ে পাক খাচ্ছে, তখনই যা একটু থামছে। আস্তে উঠে দাঁড়ালে পলাতক, ঠেলাগাড়ির পথ ধ'রে নেমে এলো, ঢুকে পড়লো বৈঠকখানার খোলা আকাশের তলায়, যেখানে কোনো পম্পেঈয়ের রূপকের তম্বুরা আর প্যানের বাঁশিটাকেই দেখা যাচ্ছে এখন, রং-চটা, আধভাঙা, নোংরা। দুয়ারহীন প্রবেশপথের

চৌকাঠে কুকুরটা অপেক্ষা করছিলো তার জন্যে, তাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডাকলো, কিন্তু তেজ নেই তেমন। 'আমাকে কামড়েও কোনো ফায়দা নেই,' ভাবলে লোকটা, বাগানে শুধু খুঁটিগুলোই খাড়া হ'য়ে আছে। ঝরা পলেস্তারার তলায় কাদা, গোড়ালি অব্দি তাতে ডুবে গেলো তার পা, সে অবশেষে পৌঁছুলো রাস্তায়। এস্তেইয়ার দূর আস্তানা অব্দি আবার আস্ত শহরটা গাছ,-পালা স্তস্তসারের আড়াল দিয়ে বেরুবার কথাটা তার কাছে অভাবনীয় ঠেকলো। তার অবসাদ আসলে নিছক অবসাদের চাইতেও আরো-বেশিকিছু। তার শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর যেন একটা ভারি নিঃসাড়তা চেপে ব'সে আছে—এমনভাবে তারা নড়াচড়া করছে যেন, নিজের নয়, অন্য-কারু ইচ্ছার চাপে। লড়াইটায় ইস্তফা দিতে ইচ্ছে করলো তার, থেমে যাক না কেন এবার, চিরকালের মতো, ব'সে অপেক্ষা করুক তার ভবিতব্যের ; অথচ তবুও সে হেঁটে চললো, পথের শেষ কোথায় জানা নেই, কোনো স্থির লক্ষ্যও নেই তার সামনে, হেঁটে চললো এ-ফুটপাতে, থেকে ও-ফুটপাতে, যে-রাস্তাটা তার এত-চেনা তাতেই পথ হারালো। সে হয়তো ঐ গাছটার তলাতেই ধপ ক'রে ব'সে পড়তো যদি-না তার পেছন-পেছন আসতো ঐ একটানা একগুঁয়ে ঘেউ-ঘেউ ডাক। তার মনে প'ড়ে গেলো কতগুলো ফাঁকা জমির কথা, যেখানে ঝোপের মধ্যে শুয়ে পড়তে পারতো সে, ঘুমোতে পারতো। কিন্তু এত ক্লান্ত লাগছে, এই জীর্ণমতো, যে সেগুলোকে মনে হ'লো বড্ড দূরে। সঙ্গে টাকা বলতে আছে শুধু ঐ অচল ব্যাঙ্কনোটটা, এস্তেইয়া যেটা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে—আর সবখানেই তো লোকে সেটা ফেরৎ দেবে, শুধু তা-ই নয়, বিপজ্জনক সব কথাবার্তাও উশকে দেবে। তার আগেকার ডেরার ওপর এখন নজর রাখছে ওরা, 'অন্যরা'। শস্তা হোটেলগুলোয় তার চেহারাটাই বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে—যা-হোক, কাল তবু তারই একটায় লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকে যেতে পারবে। কেন আজকাল আর সেই প্রাচীন রীতি নেই, যার কথা সে পড়েছিলো গথিক বিষয়ে লেখা একটা বইতে, যখন কেউ আত্মসমর্পণ ক'রে শরণ চাইলে নিস্তার পেতে পারতো ? ওহ্, হেসুস ক্রিস্তো, অন্তত তোমার বাড়িগুলো যদি উন্মুক্ত থাকতো তার এই অনিঃশেষ রাতটায় ! যদি গির্জের পাথরের মেঝেয় সাষ্টাঙ্গে পড়া যেতো শান্তিতে, আর আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠা যেতো, আর বুকে যে-ভার ব'য়ে চলেছি তা থেকে মুক্ত করা যেতো নিজেকে ! ওহ্, যে-পাথরের বোঝা আমি ব'য়ে চলেছি সারাক্ষণ, সব সময়েই—ঠাণ্ডা পাথরের ওপর আমার গাল, ঠাণ্ডা

পাথরের গায়ে আমার দু'-হাত, আমার সব জরতাপ, আর এই নিদারুণ পিপাসা, আর এই ভীষণ জ্বালা যা আমার কপালের রগগুলো ছিঁড়ে ফেলছে, ওহ্, তাকে যদি একবার জুড়োনো যেতো পাথরের ঠাণ্ডায়!...

রাত্রির মধ্যে জলজল ক'রে উঠেছে এক গির্জে, ডুমুর আর তালগাছে ঘেরা; সবুজ ঘাসের ওপর আলো প'ড়ে ঝিলকোচ্ছে, আর তারই মধ্যে ঝলমল শূন্যে উঠে গেছে তার পঙ্খের কাজ-করা শাদা প্রহর-জানানো মিনার। তার রং-করা কাচের জানলায় যেন আগুন ধ'রে গিয়েছে; তার গোলাপ-আঁকা জানলার লাল আর সবুজ যেন শিখার মতো ঝলশাচ্ছে। আর হঠাৎ খুলে গেলো গির্জের ভেতরের দরজা, তার মধ্য দিয়ে মোমবাতি-জ্বলা বেদির দিকে চ'লে গেছে লাল ফরাশের এক পথ। পলাতক আস্তে এগিয়ে এলো এই উপহৃত আশ্রয়ের দিকে; সে এগিয়ে এলো তার পাশের দরজার ধনুকখিলানের তলা দিয়ে, তারপর একটা স্তম্ভের তলায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তার আলোয়, আর তাকে ঘিরে ধরলো স্তম্ভের পাথর থেকে চুঁইয়ে-পড়া ধুপের গন্ধ। তার দু-হাত খুঁজে নিলে দিব্য জলের শীতলতা, কপালে বুলোলো, ঠোঁটে স্পর্শ করলো। ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে এক অর্গানের স্বর, যেন কেউ তার স্বরগুলো যাচাই ক'রে দেখছে। সেখানে, ঝালরে-সাজানো, এক বেদির ওপরে, দাঁড়িয়ে আছে ক্রুশবিদ্ধ হেসুস ক্রিস্তোর মূর্তি। এমনভাবে যে তার মিনতিতে ঈশ্বর সাড়া দেবেন, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি—এই বাস্তবের মুখে প'ড়ে তার বিস্ময় এতটাই প্রখর আর বিশাল হ'য়ে উঠলো—যে, ঐ ছোট্ট বইটা থেকে শেখা প্রার্থনা-মন্ত্র আওড়াতে পর্যন্ত তার ক্ষমতা হ'লো না। সে শুধু একদৃষ্টে তাকিয়েই থাকতে পারলো অভিভূত, এই বিভীষিকার মধ্যে তার জন্যে কোন্ আলো জ্বলছিলো সর্বক্ষণ। স্তম্ভ থেকে স্তম্ভ পেরিয়ে সে এগিয়ে এলো আস্তে, অভিভূত পায়ে, ধাপে-ধাপে, যেমন সে আগে গাছের আড়াল থেকে গিয়েছিলো গাছের আড়ালে, ঐ দীক্ষামিলনের টেবিলের কাছে। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি অগ্রসর, তার গা থেকে ভয়ের একটা ক'রে পরত সরিয়ে দিলো। তারপর সে থামলে, স্বস্তিময়, আতঙ্কবিহীন, কোনো চাপ নেই আর বুকের ওপর, সোল্লাসে শ্বাসে-প্রশ্বাসে টেনে নিলো গলা মোমের-গন্ধে-মেশা হাওয়া, সে-হাওয়ায় আরো মিশে আছে শেষ ভোজের সাম্প্রতিক পুনরুদ্ধারের জন্যে যে-বার্নিশ ব্যবহার করা হয়েছিলো তারও গন্ধ। সে তার আঙুল বোলালে প্রচারমঞ্চের রেলিঙের ওপর, স্বীকারোক্তি-কুঠুরির

কাঠের ওপর, আর তার মনে হ'লো সে যেন কোনো সুদুর্লভ মহামূল্য কিছুকে স্পর্শ ক'রে ফেলেছে। একটা গির্জে যে সত্যি কী হ'তে পারে, এই প্রথম সে তা বুঝতে পারলে, অনুভব করলে ; তার এই দোমড়ানো শরীরটাকে বহন ক'রে যত সে এগুচ্ছে, ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে তার সহ্যশক্তি ; কোনো অতীন্দ্রিয় খিলানের তলা দিয়ে সে এগুলো তাঁরই দিকে, যাঁর পেরেকের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে অবিশ্রাম, রক্ত ঝরছে কাঁটার মুকুট থেকে, ফুলে-পাতায় ছাওয়া বসনের ওপর।... 'অতিথিদের কেউ নাকি আপনি,' নিচু স্বরে তার পেছন থেকে কার গলা জানতে চাইলো। 'অতিথিদেরই একজন,' পেছন না-ফিরেই সে বললে, আর পায়ের চাপা দূরে স'রে গেলো। কিন্তু তার পেছনে একটা কোলাহল উঠেছে তখন, সদর দরজার কাছ থেকে তার সূচনা, আর নিচু খিলেনের তলার পথ ধ'রে আসতে-আসতে ক্রমেই শব্দটা বেড়ে উঠছে। এই আওয়াজ যখন তার কানে এলো, সে দাঁড়িয়েছিলো বেশ-ভূষণ রাখার ঘরের গা ঘেঁষে, আর হঠাৎ যেন বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়ায় ঘূর্ণিময় উত্থানের পর আচমকা ফিরে এসেছে তার শ্রবণশক্তি। হালকা পোশাক গায়ে স্ত্রীলোকেরা ঢুকছে, পুরুষদের পরনে পোশাকি জামা, ছোটো মেয়েদের হাতে ফুলের তোড়া : এরা সব যেন কোনো এলোমেলো মাখানোয়ানো রামধনুর রং ; এরা তার দিকে তাকালোও না একবারও, তাকে যেন দেখতেই পেলো না তারা. আলো প'ড়ে এরা-সব ঝলমল ক'রে উঠেছে। পলাতক বুঝতে পারলে, কেন এত রাতে, এখন, গির্জের ভেতরটা আলোয় আলোময় : এখন এসে পৌঁছুবে নববধূ, বেজে উঠবে পদ-ছন্দের তাল, দেয়া হবে বরের হিরণ যৌতুক. বদল হবে আংটি, আর তারপর এই আশ্রয় আবার ফাঁকা হ'য়ে যাবে, আবার সে ফিরে যাবে অন্ধকারের কাছে। সব যখন শেষ হ'য়ে যাবে, অবশেষে সে পাবে এমন-একজনকে যিনি আগ্রহভরে শুনবেন তার সব কথা। এ-যে শরণার্থীর অবলম্বন। পুরুৎ নিশ্চয়ই তাকে জানেন, গির্জের এত কাছে যার বাড়িটা বিস্ফোরণে ধ্বংসে পড়েছে। জ্বলন্ত-সব সত্যকথা গলগল ক'রে বেরিয়ে আসবে তার মুখ থেকে—সে খুলে বলবে সবকিছু, সব, কিছুই যাঁর অগোচর নেই তাঁকে তো সব কথাই খুলে ব'লে দিতে হয়, আর সব ব'লে ফেলার পর যাঁর কাছে সে স্বীকারোক্তি করেছে তিনি নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন তাঁকে। অর্গান শুরু করলো পরিণয়ের পদছন্দের সুর, বেদির দিকে যে-শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে তাতে এক তুমুল আলোড়নের তাল। ছোট্ট-এক ভজনালয়ের ছায়ায় লুকিয়ে পলাতক তাকিয়ে-তাকিয়ে

দেখলো শাস্ত্রাচারগুলো, লক্ষ করলো আধিকারিকের সব মুদ্রা ও ভঙ্গি, যেন সবকিছু ঘ'টে যাচ্ছে কোনো-একটা স্বপ্নের মধ্যে। শাস্ত্রাচার ও পাঠগুলো তার মনে হ'লো অন্তহীন—যদিও নিজেকে সে বারে-বারে বোঝালে যে তার এই অস্থিরতা ধর্মদ্রোহী, আর, সত্যি-তো, ক্রুশের পেরেকের তলায় এখন যা ঘটছে তার বিচার করার অবস্থা বা অধিকার—কোনোটাই তো তার নেই। অর্গানের নলগুলো আবার ফুলে উঠলো তুমুল জয়োল্লাসে। আর তারপর এলো প্রস্থান-কাল, দলে-দলে বিদায় নিচ্ছে অভ্যাগতরা, বড্ড দেরি করছে। দূরের দরজাগুলো যখন বন্ধ হ'য়ে গেলো, আলো নিভে গেলো; বেদির কাছে ফিরে এলো ছায়ারা। কাদের ব্যস্ত ছায়া ঝুঁকে পড়লো ফরাশ গোটাতে, অন্যরা খুলে ফেললো সব ভূষণ, কেউ-কেউ সোজা ক'রে সাজালে বেঞ্চিগুলো। অবশেষে যখন এই লোকগুলো চ'লে গেলো, সব চুপচাপ হ'য়ে গেলো: জলন্ত মোমবাতির শিখা ক্ষীণভাবে আলো ক'রে দিলে দিব্য মূর্তিগুলো আর বিশাল স্তব্ধতা: হেসুস ক্রিস্তো আর প্রাজ্ঞজনেরা, রক্তাপ্লুত হেসুস মূর্তি, শেষ ভোজে উপবিষ্ট হেসুস, প্রতিবিম্ব প'ড়ে যার টাটকা বার্নিশ ঝলমল ক'রে উঠেছে।··· লোকটা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে, ভূষণকক্ষে না-ঢুকেই, সেখানে যে কেউ-একজন এখনও আছে তা বোঝা যাচ্ছে দেরাজ বন্ধ-করার শব্দে আর ধাতুপাত্রের ঠুনঠুন আওয়াজে। কিন্তু হঠাৎ পুরুতের নাদুশনুদুশ ছায়ামূর্তি দেখা দিলো দরজায়, গায়ে ঢোলা আলখাল্লা। 'কে ওখানে,' চেঁচিয়ে জিগেশ করলেন তিনি, হাতে তুলে নিলেন একটা ভারি শামাদান। পলাতক বেরিয়ে এলো ছায়া থেকে, তাকে যে চোর ব'লে ভেবেছেন—এইজন্যে একটু বিমর্ষ। কেন সে এখানে এসেছে, যেন সে-কথা বোঝাবার জন্যেই সে তুলে ধরলে কালাত্রাভার ক্রুশওলা বইটা। পুরুৎ তার দিকে, তবু, সন্দেহের চোখেই তাকিয়ে রইলেন, ভঙ্গিটা আত্মরক্ষার। কে যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছে এখন, কে যেন ব'সে প'ড়েছে তাঁর পায়ের কাছে, তার টানটান হাতে ছোট্ট কালো বইটা ধ'রে। কিন্তু কান্নার তোড় বাধা দিচ্ছে কথার স্রোতকে—যে-কথাগুলোর কোনো মানে খুঁজে পাওয়াই দায়, সবসময়েই যা পাক খাচ্ছে পাপ, গ্লানিবোধ আর আত্মধিক্কারে। স্তম্ভিত হ'য়ে পুরুৎ শুনলেন সেই ভাঙা গলাটা যেটা কান্নায় আর গোঙানিতে চিরে-চিরে যাচ্ছে, নিজেকে অভিযুক্ত করছে বীভৎস-সব দুষ্কর্মের হোতা ব'লে, নারকীয় যত ক্রিয়াকলাপের হোতা ব'লে—কিন্তু কিছুই তিনি বোঝবার চেষ্টা করলেন না। তাঁর পেশাদার

অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন এদের—এরা সারা দিন প'ড়ে থাকবে দুঃখ-তাপের কুমারী দেবীর পায়ের তলায়, আকুল ভিক্ষা করবে তাঁর শরীরের ছুরিকাঘাতগুলো যেন তিনি সঞ্চার ক'রে দেন তাদের গায়ে, কিংবা কেউ হয়তো তাদের আবেশের কথা এমনভাবে ব'লে যাবে যেন তারা সত্যি-সত্যি করেছে সে-সব ; আর এদের পাপমোচন করার পর আবার এরা শুরু করবে গোড়া থেকে, প্রত্যেক সকালে যাবে স্বীকারোক্তিতে, ভিন্ন-ভিন্ন পাড়ার গির্জেয় গিয়ে সেই একই কাওয়ালি গাইবে ; আরো কেউ-কেউ আছে যারা বুকে হাঁটবে গির্জের মেঝেয়, গলায় ফাঁস দেবে অংসফলকের পট্টিতে, শোভাযাত্রায় মরীয়া হ'য়ে বহন করতে চাইবে মঞ্চটা, কাঁধে বইতে চাইবে নাসারেনের ভার, অত্যুৎসাহের আধিক্যে। এরা সেই একই লোক যারা ব্যামো বাধালে চ'লে যায় মিথ্যাকুমারীদের কাছে, ডাইনিদের কাছে, কালোমুখ-সব মিথ্যা সন্তদের কাছে, বর্বর সব নামে আরতি করে। এইসব গির্জেযাত্রীদের কথা ভেবেই তিনি বললেন, 'কাল। কাল এসো স্বীকারকক্ষে।' আর লোকটা যতই পেড়া-পিড়ি করতে লাগলো, তিনি ততই অধীর স্বরে, প্রায় রাগি সুরেই আওড়াতে লাগলেন একই কথা, 'কাল, কাল, কাল—।' হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো কালাত্রাভার ক্রুশওলা ছোট্ট বইটার ওপর, যা নতজানু চোখ লোকটার অঞ্জলি থেকে প'ড়ে গিয়েছে মেঝেয় ; যথাবিহিতভাবে তার ওপর অনুমোদন-করা মোহর করা সত্ত্বেও এ-ধরনের বই পাওয়া যায় শস্তা সব দোকানে, লাল কাপড়ে মোড়া পুতুলের পাশে, বিধর্মীদের মতো ঘণ্টার গায়ে খোদাই করা : HS [গ্রীক মনোগ্রাম : ত্রাণকর্তা জিশুর নামের আদ্যক্ষর], আর তার পাশেই থাকে মাটির মূর্তি, শামুকের চোখ, তাগা-তাবিজ-মাদুলি আর বশীকরণের উপকরণ। প্রার্থনা-গুলো ভালোই, কিন্তু সে-সব তো উৎসারিত হয় কোনো পুতুলপূজারী মন থেকে, বিধর্মী-সব আচার-অনুষ্ঠানে-কথায় যে-মন হাবুডুবু খাচ্ছে ; এমন জিনিশ চাইবে অনুনয় ক'রে, গির্জেয় যা ভিক্ষে করা যায় না। পুরুতের মুখ রাগে লাল হ'য়ে উঠলো। কথা ব'লেই চলেছে লোকটা। কঠিন হাতে তাকে তিনি তুললেন মেঝে থেকে, দু-পাশের দেরাজের সারির মধ্য দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন ভূষণকক্ষের পাশে। 'কাল,' তিনি বললেন, গলার স্বর নরম ক'রে। 'আর মনে রেখো, উপোশ করতে হবে তোমায়, রাত বারোটার পর থেকে এক ফোঁটা খাবারও খেতে পাবে না।' দরজার ওপাশে শোনা গেলো চাবির কয়েকটা মোচড়। তারপর হুড়কো লাগানো হ'লো। সদর দরজার সব আলো

নিভে গেলো, গোলাপ-আঁকা জানলাগুলো হঠাৎ মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে, আর গির্জে মিশে গেলো ডুমুর আর তালগাছের ছায়ায়, হঠাৎ যাকে কাঁপিয়ে দিয়ে এলো হাওয়া, বৃষ্টির গন্ধে ভরা। 'রাত বারোটার পরে এককোঁটা খাবারও নয়।'

আবারও ছুটেছে, ঘোরের মধ্যে, হোঁচট খেতে-খেতে, সবকিছুর ওপর দিয়ে লাফিয়ে, ঠোক্কর খেয়ে, ফুটপাথের ফাটল, গাছের শেকড়, একটা পাথর এমনভাবে পড়েছিলো যাতে তার পায়ের আঙুলে বেদম মার লাগাতে পারে, শুধু একটা ভাবনাতেই তন্ময়, আবিষ্ট : মোমবাতিগুলো নিশ্চয়ই এখনো জলছে সেখানে, নেগ্রো বুড়ির কফিনের পাশে। আর তারা জলবে ভোর অব্দি, কারা সেখানে এসেছে তাদের সে দেখেছে আগেই, আর নিশ্চয়ই কোনো নতুন মুখের আবির্ভাব হবে না সেখানে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে-যাওয়া, আত্মীয়স্বজনের হাত চেপে ধরা আবার, আবার বলা, 'এই বিশাল ব্যথায় আমার গভীর সহানুভূতি রইলো,' আর তারপর মিনারের সেই একরত্তি চিলেকোঠার বিছানায় আছড়ে-পড়া—ও-সব রূঢ় কর্কশ অপমান-টিটকিরিগুলোর কথা আর কে ভাবে! অন্ত্যেষ্টি শেষ হ'য়ে-যাওয়া অব্দি কেউ তাকে ওখানে উত্ত্যক্ত করবে না। বাড়িটা খুব দূরে নয় ; এর মধ্যেই তো এসে পড়েছে চামড়াপট্টিতে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ভাঙাচোরা ফিটনটা, কাছেই নেমন্তন্ন-চিঠি ছাপার ছাপাখানা। পুনরর্জিত চেষ্টায় সে পায়ের গতি বাড়াতে যাচ্ছে, এমন সময় দুটি কাঁপা-কাঁপা হাত পেছন থেকে তার কনুই চেপে ধরলে। চেনা গলার স্বর শুনে তার ঘাড়-পিঠ আঘাতটার জন্যে টানটান হ'য়ে গেলো। 'একজন সত্যিকার পুরুষের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রে নিই,' বললে জলপানিপাওয়া ছাত্রটি, তাকে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে টলতে-টলতে এগিয়ে। বেহেড মাতাল, মুখচোখের অদ্ভুত ভঙ্গি ক'রে সে তারিফের ভাব ফোটাবার চেষ্টা করছে, বলছে, এই দুঃসময়েও যারা বীরত্বের ঐতিহ্য রক্ষা ক'রে চলেছে তাদের উদ্দেশে এক স্মরণস্তম্ভ স্থাপন করা উচিত। 'রক্তের ছাপ দেয়া ভ্রাতৃত্বের বোধ চাই আমাদের,' চেঁচিয়ে সে ব'লে উঠলো ; তাকে চুপ করাবার জন্যে অন্যজনের কাতর চেষ্টাটাকে সে কোনো আমলই দিলে না—চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে শুধু বলতে লাগলো মৃত্যু আর প্রতিহিংসার কথা। পরের চেষ্টাটায় তাকেও যেন সঙ্গে নেয়া হয়, এই মর্মে

অনুনয় করলে সে, দু-হাত তুলে বন্দুক চালাবার ভঙ্গি ক'রে। পলাতককে সে আলোয়-ধাঁধানো রেস্তোরাঁটায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, লোকের ভিড়ে যেটা থিকথিক করছে। 'আমাকে কিছু-একটা খাবার এনে দাও, যা-খুশি,' একটা পাইন গাছের ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে মিনতি ক'রে বললে অন্যজন। (বারোটার ঘণ্টা পড়তে এখনো একটু দেরি আছে; যাঁর রক্তপাতহীন আত্মবিসর্জনে অংশ নেবার উৎকাঙ্ক্ষায় সে উন্মুখ হ'য়ে আছে, যাঁর চোখ সব ঘড়ির ওপর প'ড়ে আছে সবসময়, সেই-তাঁকে সে দেখাতে চায় যে সে কোনো নিয়ম ভাঙেনি।) জলপানিওলা বেমালুম তার মিনতিটাকে ভুলে গিয়ে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এলো। দুজনে স'রে এলো সমুদ্রের দিকে, তট যেখানে সমাপ্তি টেনেছে অ্যাভিনিউটার, উপকূলের পাহাড়ে যেখানে ঢেউয়ের নিস্তেজ আঘাত পড়ছে অবিরাম।··· আর এখন তারা ব'সে আছে, পাশাপাশি, সেই পুরোনো গণহামামটার মধ্যে, যার বড়ো-বড়ো চৌকো চৌবাচ্চাগুলো পাথরের গা খুঁড়ে বসানো, একটা খালের মধ্য দিয়ে যেখানে এসে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, গুগুকে-গুগুকে কালো, তারপর নেতিয়ে গিয়ে জল যেখানে বিশ্রাম করছে। শাদা পাইনকাঠের কাঠামো, থামগুলো যেদিকটায় ভেঙে পড়েছে ছাতটাও সেখানে নুয়ে নেমে এসেছে, হাওয়ার দমকা ঝাপটায় প্রত্যেকটা চিড় থেকে ক্যাঁচকেঁচ আওয়াজ উঠছে। হঠাৎ প্রধান চৌবাচ্চাটায় ঢুকে পড়লো এক ফসফরের ডেলা, যেন ভেসে-আসা কোনো সবুজ আলোর ঝাপটা, আলো ক'রে দিলো খ'য়ে-যাওয়া দাঁতের পাটির মতো তলদেশটা, যেখানে শ্যাওলা-ঢাকা পাথরের আড়াল থেকে মাথা বাড়াচ্ছে ঘাপটি-মেরে-থাকা লিকলিকে বান মাছ। ভাসমান আলোর গোলটা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো, আবার সব ঢাকা প'ড়ে গেলো ছায়ায়। 'বলিদান চাই আমাদের, আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে সে-সব দিনে,' প্রলাপ বকতে লাগলো জলপানিওলা, 'যেখানে মন্দিরের মধ্যে পুরোহিত নিংড়ে নিতো টাটকা রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটাকে— অন্য-সব হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে তাকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলার আগে; আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই আতঙ্কের আমলে, সেই শাস্ত্রসম্মত উৎসর্গের দিনগুলোয়, যখন পাথরের ছুরি কেঁড়ে ফেলতো। জীবন্ত মাংস আর বার ক'রে আনতো অস্থি আর পাঁজর···' পলাতক সেই দূর অতীত থেকে জলপানিওলার রংদার বাতেলার কথা জানে, যখন বড়ো-বড়ো সব পরিকল্পনা করতো তারা। সে ব'কেই চললো, 'আমরা এই মর্তেরই বাসিন্দা—এবং আমাদের ফিরে যেতে

হবে সেই আদিম ঐতিহ্যেই,' তার জিভ ক্রমেই ভারি হ'য়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, 'আমাদের চাই একনায়ক আর শহিদ, বাজপাখির মতো বীর, চিতাবাঘের মতো বীর, ঠিক তোমার মতো লোক।' বিদ্যুতের কয়েকটা দ্রুত ঝলক আলো ক'রে দিলো আটচালাটা—শ্যাওলা-সবুজ, ঘুণে ধরা, ধ্বসে পড়া; পচা বদ্ধ সমুদ্রশ্যাওলা, মরা গলা ঝিনুক শামুক, আর শহরের আবর্জনায় দূষিত পচা জলের চৌবাচ্চার ভারি গন্ধে চারপাশটা আচ্ছন্ন; আর সেখানে শুয়ে আছে তারা দুজন, পাশাপাশি। পলাতক মেঝের ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে বললে, 'ভীষণ খিদে পেয়েছে।' 'ক্ষুধার্তরাই ধন্য,' বললে জলপানিওলা, 'এই উদর-পূজারীদের নগরে, এই গাণ্ডেপিণ্ডে খাবার-ঠাশার নগরে, ক্ষুধার্তরাই ধন্য।' আর তারপর এলো তাদের স্তব, যারা অনাহারে উপবাসে শুদ্ধ ক'রে নেয় নিজেদের, তারপর সব বিচার-বিবেচনার পর, একদিন যারা সত্যিকার বীর হ'য়ে ওঠে, সার্থক পুরুষ হ'য়ে ওঠে। অন্য-লোকটার খিদে এতই বিপুল এতই সর্বগ্রাসী যে সে কোনো প্রতিবাদ না-ক'রে মাতালের প্রলাপ শুনেই চললো, তার আবোলতাবোল কথার কোনো মানে করবার চেষ্টাটাও সে করছিলো না; তার এই চরম দুর্দশার মধ্যে শেষ অব্দি তার একটা অন্তত সান্ত্বনা আছে: তার পাশে এমন-একটা স্বর শোনা যাচ্ছে যার মধ্যে বিপদের কোনো পূর্বলক্ষণ নেই। জলপানিওলা তার দিকে বোতলটা বাড়িয়ে ধরলে। কিন্তু সেই বুক-জ্বালানো তরল পদার্থকে গলায় ঢালার কথা ভাবতেই—তার শরীরে একটুও তাকৎ নেই এখন, খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, কিছু নেই—তার শরীর এমন গুলিয়ে উঠলো যে সে শুধু একটা ঢোঁক গলায় ঢালার ভান করলে, তারপর টাগরায় জিভ ছুঁইয়ে আহ্লাদের একটা শব্দ বার ক'রে দিলে—আসলে সে বোতলের মুখটা হাতের চেটো দিয়ে চেপে রেখেছিলো, যাতে গন্ধটা তাকে বমি না-করায়। 'অতিমানব,' অন্যজন বলছে তখনও, 'একনায়ক কোনো অতিমানব—ইচ্ছার জোরে প্রবল,' কিন্তু তার মাথায় তত্ত্বগুলো এমন তালগোল পাকিয়ে গেছে যে সে নিজেই বুঝতে পারছিলো না কোন খ্যাপা অসংলগ্ন অর্থহীন তত্ত্বটা সে আওড়াতে চাচ্ছে—নামহীন কোনো শত্রুদের বিরুদ্ধে শুধু কতগুলো কথার টুকরো, আর রাগি গমক আর বিশৃঙ্খল অভিশাপ ছোটাচ্ছিলো সে। পলাতক ঠিক করলে সে ঘুমিয়ে পড়বে; একবার বোতলটা সাবাড় হ'য়ে গেলে জলপানিওলাও নাক ডাকাবে—আর নয়তো কেটে পড়বে—তার মনেও পড়বে না রাতে সে কোথায় ছিলো, কার সঙ্গে ছিলো। সে তার বেল্টটা খুললো,

ঢিলে ক'রে দিলে গলবন্ধ, পিস্তলটা নামিয়ে রেখে দিলে পাশে, মেঝের ওপর—বড্ড ভারি লাগছে এখন পিস্তলটাকে ; তারপর চিৎপাত শুয়ে বুজিয়ে দিলে চোখ, আর তার কান আস্তে-আস্তে ভেসে চ'লে গেলো অন্ত্যজনের অসংলগ্ন প্রলাপ থেকে, যেমন ক'রে কোনো শিশু তলিয়ে যায় কোনো ঘুমপাড়ানি গান থেকে, যার কথাগুলো কেমন ঝাপশা হ'য়ে যায় ; অন্ত্যজন হঠাৎ তার হাত ধ'রে টান লাগাতেই সে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠলো। তাদের কাছেই ছায়ার মধ্যে এক পুরুষ আর এক মেয়ে এক হ'য়ে জুড়ে যাচ্ছে। ওপরের মাথাটা নেমে এসেছে তলারটার ওপর, উৎসুক দুটি হাত তাকে জড়িয়ে ধরেছে। বিদ্যুতের ঝলকে তাদের দুজনকেই নেগ্রোর মতো দেখালো। মেয়েটির ঘাঘরাটা উড়ে খুলে ছড়িয়ে পড়েছে, হাতা দুটো ছড়ানো, আর সেইসঙ্গে গন্ধঘাসের সুবাস। পুরুষটি মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরেছে, একটা বেঞ্চের ওপর নোয়াচ্ছে তাকে, আর বিদ্যুতের এক নতুন ঝলক আলো ক'রে দিলো রূপান্তরিত এক শরীর, ভাঙা গলার গোঙানির মধ্যে যার শীৎকার কোনো সুখোল্লাসের চাইতেও মনে হ'লো যেন কোনো রক্তে-রাঙানো শাস্ত্রাচার। হঠাৎ সেই জুড়ে-যাওয়া দু-জন চোপশানো ভিস্তির মতো বেঞ্চি থেকে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে—তবু বিচ্ছিন্ন হ'লো না, আলাদা হ'লো না। 'এরাই আমাদের বল,' গাঁকগাঁক ক'রে উঠলো জলপানিওলা, 'এরাই আমাদের প্রকৃত শক্তি।' ছায়ারা উঠে দাঁড়ালো। পুরুষটি কেমন ভয়ানক ভঙ্গিতে এগুলো চ্যাঁচাতে-থাকা লোকটার দিকে, আর মেয়েটি জবুথবু বসলো এককোণায়, হাৎড়াতে লাগলো তার ঘাঘরাটা। পলাতক শট্‌কে পড়লো রাস্তায় ; তুলতুলে মাংসের ওপর বেদম ঘুষির আওয়াজ এটাই বুঝিয়ে দিলে যে জলপানিওলাই একতরফা মার খাচ্ছে—প্রহার ফিরিয়ে দিচ্ছে না। হঠাৎ সেখানে গড়িয়ে গেলো বাজ, প্রচণ্ড, প্রলম্বিত, সুদীর্ঘ, আর বৃষ্টি নেমে এলো, সান্দ্র। এক উষ্ণ, নিবিড়, ভারি বৃষ্টি—যেমন বৃষ্টি ঝ'রে মুষলধারে, মাটিকে ছেয়ে দেয় কাদার পিণ্ডে। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে পলাতক মিনারের দিকে ছুট লাগালে। কিন্তু বৃষ্টি এখন আকাশ থেকে ঘরের ছাঁইচ থেকে, কার্নিশ থেকে এত জোরে ঝরছে যে ভাসিয়ে দিচ্ছে নর্দমা, ফুটপাতে তোড়ে নেমে আসছে ঢল ; কেমন-একটা ঝঞ্ঝা তাকে বোঝালে যে তার নীল স্যুটটাকে কিছুতেই পুরোপুরি নষ্ট হ'তে দেয়া চলবে না, আর অমনি সে ছুটে এলো কনসার্ট হলের পাশের কফিখানাটার দিকে। তাকে দেখে, আস্তে উঠে দাঁড়ালে দুটি লোক। একে-আরের দিকে

তারা যেমন ক'রে তাকালে, যেমন ক'রে তারা ধীরে-সুস্থে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে, কোটের ভেতর পকেটের দিকে তারা যেমন ক'রে হাত বাড়ালে যে পলাতক বুঝতে পারলে তাকে খতম ক'রে দিতেই তারা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতটা তার পিস্তলের দিকে এগিয়ে গেলো, সবেগে, কিন্তু মুঠি আঁকড়ে ধরলে অনুপস্থিতিকেই : সে ওটাকে গণহামামের মেঝেয় ফেলে রেখে এসেছে। একটা অ্যাম্বুলেন্স গর্জন ক'রে এলো রাস্তা দিয়ে, দ্রুত, তার সাইরেনটা তীব্র স্বরে চেল্লাচ্ছে ; অভিশপ্ত লোকটা লাফিয়ে পড়লো তার সামনে, অন্ধ-কোনো আতঙ্কে ছুটে এলো কনসার্ট হলের দিকে। অ্যাম্বুলেন্স সবেগে টেনেছিলো ব্রেক, ঢালের মতো আড়াল ক'রে দিয়েছিলো তার শরীর—তার আর কোটের ভেতর পকেটের কাছে উদ্যত হাত দুটির মধ্যে যেন একটা দেয়াল উঠিয়ে দিয়েছে।

৩

(··· আর মস্ত স্প্রিঙের মতো দেখতে যন্ত্রগুলো যারা বাজাচ্ছিলো, তারা এতক্ষণে শেষ করেছে আশিস-ধন্য মৃগয়ার সুর, শিকারিদের সমবেত প্রার্থনা-গান ; তারপর, এলো মিনারের ভয়ংকর নিঃশব্দতায় এতবার যে-স্তব্ধতাকে সে 'শুনেছে'—একবার যখন এমনকী সবুজ অপরিবাহীগুলোর ওপর উদ্যত টেলিফোন সারাই-করা লোকটার শাদাসিধে মূর্তিটাও, ছাতের সমান তলে, তার কাছে মৃত্যুদূতের চেহারা নিয়ে নিয়েছিলো ; আর, ক্ষণিক স্তব্ধতার পর আসে সেই অন্য বাজনা—সেই লাফানে উচ্ছল হাসিখুশি নাচের তাল, ঠিক যেন বাচ্চাদের খেলনার মতো কোনো যন্ত্রে সমান্তর দু-ফালি কাঠের একান্তর আন্দোলনে দুটি পুতুল দুটো নেহাইয়ের ওপর হাতুড়ির বাড়ি মেরে চলেছে ; এবার আসবে দ্রুত লয়ের ভাল্‌স্‌, চটপটে, চপল, হালকা ; বাঁশির মিড় গমক মূর্ছনা, তারপর ভেরীগুলো, দীর্ঘ সব তূরী—আমি যে-ক্যাথিড্রালে আমার প্রথম আধ্যাত্মিক আলাপনে গিয়েছিলুম, তার অর্গানের সোনায়-মোড়া দেবদূতদের মুখে যেমন-সব তূরী ছিলো ; কিছুক্ষণ পর, কয়েক মিনিট মাত্র বাকি, সবাই হাততালি দিয়ে উঠবে, আর আলো জ্ব'লে উঠবে, সমস্ত আলো, আর ঐ পাঁচটা দরজার একটা দিয়ে আমায় বেরিয়ে যেতে হবে ; আমার পেছনে তিনটে দরজা আছে—সেগুলো সব একই রকম ; দুটো গেছে পার্কের দিকে—সে-দুটোও একই রকম ; আর ওরা, ঐ দুজন, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে

ওৎ পেতে, চুরুট ফুঁকছে, হাত ছুটি উদ্যত। লোকের ভিড়ে মিশে গিয়ে বেরিয়ো ; তোমার শরীর যেন ঘিরে থাকে অন্তদের শরীর। কিন্তু সেই শরীরগুলোও স'রে যাবে একে-একে, আমার চারপাশের বেড়া দ্রুত ভেঙে যাবে বিশৃঙ্খল ; পশুলোমের স্কার্ফজড়ানো মেয়েটি মিলিয়ে যাবে ; তার ওপাশের লোকটা একা পেরুবে পার্কটা, আমার কোনো কাজেই লাগবে না, একা ব'লে ; সামনের লোকটা, যার ঘাড়ের দিকে আমি তাকাতে পারি না, সেও চ'লে যাবে ; আর বাঁ-পাশের জন, যে ফোঁশফোঁশ ক'রে নিশ্বেস ফেলছে, আর ঐ ঢ্যাঙা লোকটা, হাঁটু যার সবসময়েই অস্থির, আর প্রেমিক-প্রেমিকারা, যারা ভুরু কুঁচকে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে সব—একে-অন্যের হাত ধ'রে সবাই এরা চ'লে যাবে ; আর আমি প'ড়ে রইবো একা, ভিজে গ্র্যানাইটের অন্তহীন ফুটপাতের প্রসারে, যেখানে ছুটে পালানোও অসম্ভব ; আমি প'ড়ে রইবো একা, খোলামেলা, নিরস্ত্র, পিস্তলটাও ফেলে এসেছি, আর আমার মুখোমুখি থাকবে ওরা, এবার ওরা অনায়াসে হাত ঢোকাতে পারবে কোটের পকেটে, ধীরে-সুস্থে তাগ করতে পারবে, তারপর আস্তে চাপ দেবে ঘোড়ায়, একবারও না-থেমে পুরো উজাড় ক'রে দেবে সব গুলি। ওহ্, সেই আর্তনাদ, সে-বার যে-লোকটা সামনে ঘাড়-মুখ গুঁজড়ে পড়েছিলো তার মুখের ভাব, ফোঁড়ার ঘায়ে ভরা তার ঘাড়—সামনে যে-লোকটা আছে এখানে, হুবহু তার মতো ছিলো যার ঘাড়—এ-লোকটার চেয়েও কাছে ছিলো আমার, যখন আমি খাটো শটগানের কাচের মধ্য দিয়ে তাগ করেছিলুম···ঐ দুজন, যারা বাইরে আছে, যারা আবার জন্য ওৎ পেতে আছে, তারাও তাকিয়েছিলো ফোঁড়ার দাগে ভরা ঐ ঘাড়ের দিকে—আমারই সঙ্গে-সঙ্গে। তাকিয়ো না ওদিকে, ঐ ঘাড়ের দিকে তাকিয়ো না। ঢ্যাঙা বলেছিলো, 'সেফ্‌টি খুলে নাও,' এ-রকম মুহূর্তে কী করা উচিত ও তা কখনো ভোলে না, এমনকী পালাবার পথটাও বাৎলে দিচ্ছিলো ও-ই : 'সোজা সামনে,' 'ঐ ট্রাকটার পাশ দিয়ে,' 'বাঁয়ে,' 'এবার সুড়ঙ্গ,' 'এই, সাবধানে,'—একবারও কোনো বাধা পড়েনি পথে ; কোনো থামা না, কিংবা রেলোয়ে ক্রসিঙের কোনো বন্ধ গেট অব্দি না ; ঢ্যাঙাটা আছে বাইরে, হাততালি কখন থেমে যায়, আলো কখন জ্ব'লে ওঠে, তারই অপেক্ষা করছে, ঐ তিনটে দরজার দিকে নজর রাখছে—দরজার সংখ্যা তিন, কিন্তু আসলে একই রকম, বিশেষ ক'রে মোড় থেকে, যেখান থেকে পাঁচটা দরজার ওপরেই সমান নজর রাখা যায়। 'সেফটি খুলে নাও,' সে বলবে,

যখন তুমুল হাততালির মধ্যে জ্ব'লে উঠবে আলো, আর আসননির্দেশকেরা টেনে নামাবে ভারি লাল পর্দা, আর আড়াআড়ি কাঠটায় আংটার শব্দ উঠবে ঝুমঝুম ঠিক জুয়োর টেবিলের খুচরোর মতো···বক্সগুলো সব অন্ধকারে লাল, চেয়ারগুলোর লাল সাটিন, রেলিঙগুলোর লাল মখমল, ফরাশের মদিরাবর্ণ, কোনো-একটা বাড়ির মতো একটা বক্স, কোনো শোবার ঘরের মতো, উঁচু পাশওলা একটা খাটের মতো ; মেঝেয় শুয়ে পড়া যায়, ধুলোবালির গন্ধের মধ্যে, কোণার জোড়ের শেলাইতে আমার গাল, আমার মাথা অন্ধকারে ঢাকা, আমার পা-দুটো চেয়ারের তলায়, ঠিক যেন একটা ছাতের তলায়, একটা নিচু ছাতের তলায়, বাবার দরজির দোকানের টালিগুলোর মতো লাল ; ঠিক একটা কুকুরের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে-পড়া, মেঝের জাজিমের মতো ফরাশটিতে ;— যেটা মেঝের রূঢ়তাকে মোলায়েম ক'রে আনবে। ঠিক যেন আমার ছেলেবেলার খেলাঘরে ফিরে-যাওয়া : কার্ডবোর্ড, টুকিটাকি বাতিল জিনিশ, ফেলে-দেয়া মালের বাক্স, যেখানে আমি কুঁকড়ে গুটিশুঁটি বসতুম বৃষ্টিবাদলার দিনে, ভিজে মুর্গিগুলোর মধ্যে, যেখানে সব থাকতো ভেজা, স্যাৎসেঁতে, বুড়বুড়-তোলা, চুঁইয়ে-পড়া—ঠিক এখনকার মতো—কেউ ডাকলে সাড়া দিতুম না, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে পড়তে যেন দেদার মজা ছিলো, বিশেষ ক'রে এই জেনে যে ওরা আমাকে খুঁজছে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না।···এবার আমরা এসে পড়েছি চটপটে ভাল্‌জগুলোয়, যা কিন্তু পুরোপুরি ভাল্‌জ হ'য়ে ওঠে না কখনও, বাঁশি থেকে ঝ'রে পড়ছে মিড় আর গমক আর মূর্ছনা ; তূরীগুলো এলো ব'লে, দীর্ঘ সব তূর্যনাদ, আর শেয়ালের লোমের স্কার্ফটা কুড়িয়ে নেয় স্ত্রীলোকটি, তার স্কার্টের তলায় কী-একটা যেন জ্বালাচ্ছিলো, সেটা হাত ঢুকিয়ে ঠিক করে, এই ভেবে যে সবাই বুঝি অর্কেস্ট্রার দিকেই তাকিয়ে আছে ; প্রায় অলক্ষিত নড়াচড়া হাতের আঙুলের, উঠে দাঁড়াবার আগটায়, সঙ্গের জিনিশ-পত্র সব ঠিক আছে কি না, খেয়াল ক'রে দেখা, গির্জেয় যা শুরু হয় *Ite misa est*-এর ['মাস শেষ হ'লো' অথবা 'খ্রিস্টযাগ সমাপ্ত হ'লো'] সঙ্গে। আমি মস্ত শ্বাস টানি ; শান্ত হ'য়ে আছি আমি, দারুণ শান্ত ; অবশেষে সহজ রাস্তাটা পেয়েছি আমি, বেজায় সহজ, একমাত্র যে-উপায়টাই সবচেয়ে সহজ। আমি বেরুবো না। এরা হাততালি দেবে ; আলো জ্ব'লে উঠবে ; সব কেমন তাল-গোল পাকিয়ে যাবে, বিশৃঙ্খলায় ভ'রে যাবে। এরা এদের জিনিশপত্র গোছাবে, কুড়োবে, গায়ে জড়াবে পশুলোমের ঢাকা ; সযত্নে লোককে দেখাবে গয়নাগাটি,

এ ওর কাছে গিয়ে বিদায় জানাবে ; এইদিক থেকে ঐদিকে ; বলবে যে চমৎকার অভিজ্ঞতা হ'লো ; ছোটো-ছোটো দল গড়বে, বেরুবার পথের দিকে তৈরি করবে মন্থর সার ; আর তখন কোনো বক্সের পর্দার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে-পড়া কত সহজ ; সবাই চ'লে না-যাওয়া অব্দি অপেক্ষা করতে হবে ; তারপর দারোয়ান এসে বক্সগুলোর দরজা বন্ধ ক'রে দেবে—একবার হয়তো উঁকি মেরে দেখবে আসনের তলায় কিছু প'ড়ে আছে কিনা। আর ঐ দুজন ভাববে যে আমিও নিশ্চয়ই চ'লে গেছি ভিড়ের মধ্যে মিশে, হারিয়ে গিয়েছি এই শ্রোতার ভিড়ে ; ভাববে যে এত-সব মুখের মধ্যে আমার মুখটা ঠিক চিনতে পারেনি, এত-সব শরীরের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া আমার শরীরটা চোখে পড়েনি তাদের ; তারা আমার খোঁজ করবে বাইরে, কফিখানায়, পার্কের লতায়-ছাওয়া বীথিপথে, গাছের আড়ালে, স্তম্ভের পেছনে, চামড়াপট্টির রাস্তায়, যে-রাস্তার ছোট্ট ছাপাখানাটায় ছাপা হয় কারু ভিজিটিং কার্ড ; হয়তো তারা ভাববে যে আমি বুঝি ঘরে চ'লে গেছি ; নিশিজাগরের ওখানে কালা আদমি-দের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছি ; হয়তো ওপরে উঠবে ওরা, আর ওরা তাকিয়ে দেখবে বুড়ির মৃতদেহটা, শস্তা কাঠের কফিনে কুঁচকে-যাওয়া ; হয়তো আমায় ওরা খুঁজে বেড়াবে ছাতের মিনারে, চিলেকোঠায়, ভুলেও একবারও সন্দেহ করবে না যে আমার সব শুদ্ধ জিনিশ, নিষ্কলুষ দিন প'ড়ে আছে ওখানে, আমার জ্যামিতিবাক্স, আমার প্রথম নকশাগুলো আছে তোরঙ্গে—আমি যে এখানেই থেকে গিয়েছি, তা ওরা ভাববে না। কেউ প'ড়ে থাকে না কোনো প্রেক্ষাগৃহে, অনুষ্ঠান যখন শেষ হ'য়ে যায় ; কেউ থাকে না কোনো ফাঁকা মঞ্চের সামনে, অন্ধকারে, যেখানে কিছুই আর দেখার নেই। ওরা পাঁচটা দরজায় ঝুলিয়ে দেবে তালা, লাগিয়ে দেবে কুলুপ ; আমি শুয়ে থাকবো ঐ বাক্সটার লাল ফরাশে—ঐ যেটা পেছনের সারে, যেখান থেকে এর মধ্যেই লোকজন উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে—আমি ওখানে শুয়ে থাকবো কুকুরের মতো কুণ্ডলিপাকানো। আমি ঘুমিয়ে থাকবো যতক্ষণ-না আলো ফোটে, বেলা দশটা অব্দি, দুপুর অব্দি, তারও পরে উঠবো। ঘুম, প্রথমে চাই ঘুম। তারপর শুরু হবে এক নতুন যুগ।)

'এই প্রচণ্ড চপল দ্রুত লয়ের পর, তার সব ঘূর্ণি আর বাহুবিস্তার সমেত আসে উপসংহার, আনন্দ আর মুক্তির বন্দনাগান, সব উৎসব আর নাচ, তার উল্লসিত

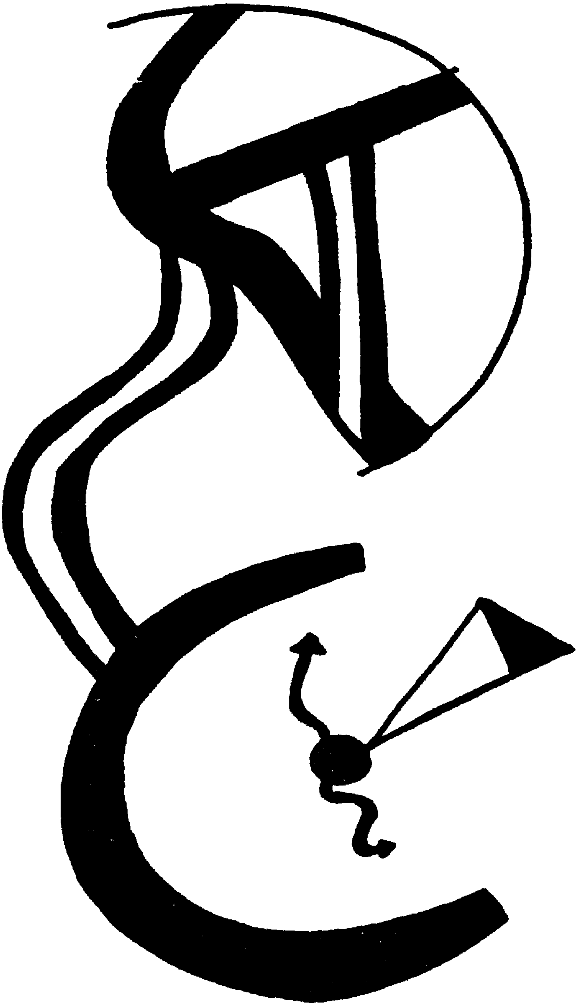
কুচকাওয়াজ আর হাস্যরোল, আর তার বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যময় শঙ্কুলতা। যখন হঠাৎ, এর মাঝখানে আবার দেখা দেয় মৃত্যু, যে দাঁড়িয়ে থাকে বিজয়োৎসবের পরপারে। কিন্তু আবারও একবার বিজয় ফিরে দাঁড়ায়। আর মৃত্যুর স্বর ডুবে যায় আনন্দে, উত্তেজনায়, কোলাহলে…' এবার সব তন্ত্রী আর বাঁশি ফেটে পড়ে উচ্চকিত তীব্র তানে, যেন পেতলের ঢাকগুলোর উল্লসিত মিছিলকে তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

'খুলবো এখন?' টিকিটবিক্রেতাকে একটু উত্যক্ত ভঙ্গিতে বইটা বন্ধ ক'রে দিতে দেখে জিগেশ করে আসননির্দেশক; ঐ ভারি কারুকাজ-করা পর্দার আড়ালে কী ঘটছে না-ঘটছে সেদিকে তার আর কোনো মন নেই এখন। সে রাতে সবকিছুই যেন তার স্নায়ুকে বিগড়ে দিতে চাচ্ছিলো; যে-সিম্ফনি সে শোনেনি, তার একমাত্র স্যুটটা থেকে যেভাবে বৃষ্টির গন্ধ বেরিয়ে আসছে, যে-শরীরের নরম ছাঁচটা সে ছুঁয়েছিলো এখনো তা যেভাবে উষ্ণ ক'রে রেখেছে তার হাত; যেভাবে দপদপ ক'রে উঠছে কামনা, অথচ যাকে মেটানো অসম্ভব; গরাদের আড়ালে তার বিরস জীবনটার একঘেয়েমি…আর তার বিশৃঙ্খল ঘরটার বিষণ্ণতা যা তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে, যা তার নিদ্রাহীনতাকে আরো-দুঃসহ ক'রে তুলবে। বিড়বিড় ক'রে সে এস্ত্রেইয়াকে লক্ষ্য ক'রে খিস্তি করতে লাগলো—আসলে মাগি যা, সেই নামেই তাকে ডাকলে বার-বার। তার কানে এখনো লেগে আছে ধর্মের নামে অন্ধবিচারের বিরুদ্ধে এস্ত্রেইয়ার ঘ্যানঘেনে নালিশ, আর ওরা ওকে শাসাতে, ভয় দেখাতে সে কী-সব কথা বলেছিলো; সন্দেহ নেই কোনো—এস্ত্রেইয়া কারু বিরুদ্ধে লাগিয়েছে, খবর পাচার করেছে,—এমন-কারু বিরুদ্ধে যে তাকে বিশ্বাস করেছিলো, যে ভুলে গিয়েছিলো এই সারসত্যটা যে-কোনো বেশ্যা হ'লো বেশ্যা হ'লো বেশ্যা, আর বিশ্বাস করেছিলো ব'লেই তার নামে গু মাখিয়ে দিয়েছে। স্বভাবতই, খবর পাচার করেছে ব'লে সে সেটা ঢাকতে চেয়েছে আর এইসব ব'লে কৈফিয়ৎ জুটিয়েছে যে, 'জেনানা ফাটকে যেতে চাই না; এ-পাড়া ছেড়ে সে কোথাও যাবে না, যে এখন কিনা ওরা জানতে চাচ্ছে কার সঙ্গে জুটে আমি জীবনের খোঁজ করছি!' আর সে ব'সে-ব'সে শুনেছে সব কথা, ঠিক বোঝেনি সত্যি কী বলতে চাচ্ছে এস্ত্রেইয়া, নিজের কামনাছাড়া অন্য-সবকিছু সম্বন্ধে সে তখন বধির হ'য়ে উঠেছিলো। সে তার মুঠো নামিয়ে আনলে টাকা রাখার দেরাজে, বারে-বারে খিস্তি ক'রে গায়ের ঝাল মেটালে—সেই যে-মুহূর্তে কোনো টাকা নেই ব'লে এস্ত্রেইয়া তাকে ঘরের বার ক'রে দিয়েছিলো, তখন থেকেই সে

খুঁচে বোম। তার বাঁদিকে, 'বেটোফেন : মহান সৃষ্টির কাল' বইয়ের পাশে, অলংকৃত বিজ্ঞপ্তি কোনো সংগীত-অনুষ্ঠানের সরকারি নিয়মকানুনগুলো জানিয়ে দিচ্ছে : 'কোনো ভুলভ্রান্তি হইয়াছে কি না, তাহা খতাইয়া দেখিবার জন্য টিকিটবিক্রেতা যেন যথাবিহিত সাবধানতার সহিত প্রমোদকরের মোহরআঁটা টিকিটগুলো লক্ষ করে ; এই হেতু তাহার কার্যকাল ফুরাইবার আধঘণ্টা আগেই যেন সে টিকিট ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দেয়।'… বাইরে, আবার বৃষ্টি পড়ছে, আর কাছের গাছগুলো থেকে গ্র্যানাইট পাথরের সিঁড়ির ওপর জল পড়ার শব্দ মিশে যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহে, সদ্য-শুরু-হওয়া হাততালির শব্দের সঙ্গে। তার ঘরের দরজায় চাবি লাগাতে-লাগাতে, 'খুলে দাও,' বললে টিকিটবিক্রেতা। 'কী বাজে এক নির্দেশক! এমনভাবে পরিচালনা করলো যে সিম্ফনিটা পুরো ছে-চল্লিশ মিনিটও চললো না।' সে মুখ তুলে তাকালে বুড়ির বাড়ির ছাতের দিকে ; চটপট সে যাবে ওখানে ; বুড়ি মারা গেছে কি না, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হ'য়ে আসবে। হল থেকে দর্শকরা পিল-পিল ক'রে বেরিয়ে এলো ; বৃষ্টি আরো বেড়ে না-যায়, এই ভেবে তারা ভয়ে সারা ; সমুদ্র থেকে যা হাওয়া দিচ্ছে, তা নাকি খারাপ আবহাওয়ারই পূর্বাভাস—অন্তত আবহাওয়া দফতর তা-ই জানিয়েছে। পাশের দরজাগুলো বন্ধ হ'য়ে গেলো ; কেবল কয়েকজন সমালোচকই গুলতানি করতে লাগলো উপপ্রকোষ্ঠে, সব আয়না আর রূপকগুলোর মধ্যে, নির্দেশকের ব্যাখ্যা নিয়ে তারা জোর গলায় আলোচনা করছে।

ঠিক শেষ সারির আগের সারিটায় তখনো তাদের আসনে বসেছিলো দুজন শ্রোতা, এবার তারা আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালে, তারপর পেরিয়ে এলো ফাঁকা অর্কেস্ট্রা, যেখানে তখন আলো নিভতে শুরু করেছে ; তারপর একটা বক্সের রেলিঙে ঝুঁকে প'ড়ে—বক্সটার ভেতর ততক্ষণে অন্ধকারে ঢাকা—মেঝে তাগ ক'রে পর-পর গুলি করলে। কয়েকজন যন্ত্রী উইংস থেকে বেরিয়ে এলো মঞ্চে, মাথায় টুপি, হাতে যার-যার বাদ্যযন্ত্র, একটু অবাক হ'য়ে ভাবলে এই আওয়াজগুলো ঝড়েরই কোনো অদ্ভুত কীর্তি কি না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা দীর্ঘ প্রলম্বিত বাজপড়ার আওয়াজ কাঁপিয়ে দিলো প্রেক্ষাগৃহের ছাদ।

'আপদ বিদেয়!' যে-পুলিশটিকে ডেকে-আনা হয়েছিলো, সে লাশটাকে জুতোর ডগা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললে, 'একজন কমলো।' 'তাছাড়া ও অচল টাকা চালাবার চেষ্টা করছিলো,' বললে টিকিটবিক্রেতা, জেনারেলের আধবোজা চোখের ছবিওলা কড়কড়ে ব্যাঙ্কনোটটা দেখিয়ে। 'ওটা আমাকে দিন,' বললে পুলিশ, নোটটা অচল নয় দেখে। 'ওটাও যাবে আমার প্রতিবেদনটার সঙ্গে।'



সময়ের যুদ্ধ

সান্তিয়াগোর রাস্তা

১

শেল্‌ড্‌ট্‌ নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো হুয়ান, তার নিজের ঢাকটা তার বাম উরুর কাছে ঝুলছে, আর অন্যটা (সেটা সে সন্ত জিতেছে প্রমারায়) তার কাঁধে ; এমন সময় তার মনোযোগ গিয়ে পড়লো একটা জাহাজের ওপর—এক্ষুনি সেটা তীরে এসে ভিড়েছে, আর নৌঘাটার খুঁটিগুলোর গায়ে দড়ি বাঁধবার জন্যে হুড়মুড় ক'রে এগুচ্ছে। তার টুপির কানাৎ দিয়ে ঢাকের যে-অংশটা সে ঢাকতে পারেনি তার ওপর ঝ'রে পড়ছে মিহি ফিনফিনে বৃষ্টি ; সন্ধে আর বৃষ্টি সবকিছুকেই কেমন একটু আবছা ক'রে দিয়েছে—একেই তার—ইয়ার, মদ ও খাবারের ফিরিওলার দৌলতে ব্রাণ্ডি আর বিয়ার মারফৎ—মাথাটা ঝাপশা হ'য়ে ছিলো, তবে এ যেন তার চেয়েও বেশি ঝাপশা ; লুটারীয় চার্চটার কাছে, আজকাল যেটাকে ব্যবহার করা হয় আস্তাবল হিশেবে একটু দূরে, পাহাড়ের ঢালে, এখনও ফিরিওলার ঠেলাগাড়িটার সবগুলো নল থেকে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে ; কিন্তু এই জাহাজটার ওপর এমন-একটা বিষাদ ঝুলে আছে যে মনে হচ্ছে খালের বাষ্পকুয়াশা যেন তারই ভেতর থেকে গলগল ক'রে বেরিয়ে আসছে, কোনো কুবাতাসের মতো। পুরোনো জং-রঙের কেম্বিস কাপড় দিয়ে তার পালগুলোয় তাপ্পিমারা ; জাহাজের দড়িদড়াগুলোর সুতো খুলে এসেছে ; তার আড়কাঠগুলোয় জ'মে আছে ছ্যাতা আর শ্যাওলা ; জাহাজের যে-দিকটা কাৎ হ'য়ে নেই সেদিকে ফিতের মতো পৎপৎ ক'রে ঝুলছে মরা সমুদ্রশ্যাওলা। এখানে-সেখানে লেগে আছে কড়ি আর ঝিনুক আর আরো-সব খোলা, কোনো তারার মতো—যেন কোনো রেডফিশ কিংবা দিনারের ছাঁচ দূরের সমুদ্রের এইসব উদ্ভিজ্জের মধ্যে বসানো ; শোকগম্ভীর দেয়ালগুলোর মধ্যে যে-জল প'ড়ে-প'ড়ে ঝিমুচ্ছে তার তুষারহিম স্পর্শে এখন সব প'চে গিয়ে খয়েরি বা গাঢ়-সবুজ হ'য়ে যাচ্ছে। চিমশে সব মাঝিমাল্লাকে দেখাচ্ছে যেন খাদ্যপ্রাণ গ-র অভাবে চামড়ার আর মাঢ়ির রোগে ভুগছে : তোবড়ানো ফাঁপা গাল, কোটরে-বসা চোখ, আর ফোগলা মুখ। যে-ল্যাংবোটটা তাদের ঘাটে নিয়ে এসেছিলো তা থেকে দড়িদড়া বাঁধা ও নোঙর ফেলার কাজ যখন তারা শেষ করলে, তাদের মুখে কিন্তু খুশির কোনো ছাপই পড়লো না, এমনকী শুঁড়িখানার আলোগুলো যখন জ্বালানো হ'লো, তখনও না। জাহাজ আর তার লোকজন সবাই যেন একই মনস্তাপে ডুবে গিয়েছে,

যেন মাঝিমাল্লারা ঝড়তুফানের মধ্যে ঈশ্বরকে ডেকেছিলো পাপকথা ব'লে; এখন তারা এমনভাবে ভাঁজ ক'রে দড়িদড়া গোটাচ্ছে আর এমনই অনিচ্ছুকভাবে পাল-গুলো নামিয়ে আনছে যে তাদের যেন দণ্ড দেয়া হয়েছে কোনোদিনও আর ডাঙায় পা দিতে পারবে না। তারপর হঠাৎ পাটাতনের একটা ঘুলঘুলি খুলে গেলো, খুলে গেলো আস্কেক দরজা, আর আচমকা যেন সূর্য আলো ক'রে দিলে অ্যান্টওয়ার্পের সন্ধে। ছোটো-ছোটো নারঙ্গগাছ, সবাই ফলে-ফলে ঝলশাচ্ছে, সব গাছ আধা-পিপেয় পোঁতা, খোলের অন্ধকার থেকে ধরাধরি ক'রে তাদের আনা হ'লো আর সুগন্ধি এক বীথিকার মতো সার ক'রে তাদের দাঁড় করিয়ে দেয়া হ'লো। ঝলমলে গোলকে সাজানো এই গাছগুলো সন্ধ্যাকে পুরোপুরি বদ্‌লে দিলে, আর ফলের রস, মরিচ আর দারচিনির মেশানো গন্ধের ঝাপটা হুয়ানকে এমনি অভিভূত ক'রে দিলে যে সে তার কাঁধ থেকে ঢাকটা নামিয়ে মাটিতে পেতে তার ওপর গ্যাঁট হ'য়ে বসলো। এতক্ষণে বোঝা গেলো যে ডিউকের প্রণয়লীলা সম্বন্ধে যে-গুজব রটেছে তার বেশ ভিত্তি আছে; মশলা দ্বীপ, ভারতের রাজ্য অথবা ওরমুথ নগরী থেকে এমন-সব উপহার আনিয়ে শুধু-কোনো আল্‌বাই তাঁর প্রণয়িনীর উদগ্র বাসনা ও ক্ষণমাত্র খেয়ালকে এমনভাবে প্রশ্রয় দিতে পারেন। তুফান বা শত্রুজাহাজের মুখোমুখি পড়ার দুঃসাহসিক কাজে বেরিয়ে-পড়ার আগে এ-সব ছোটো-ছোটো ফল-ভারানত নারঙ্গগাছগুলো নিশ্চয়ই কোনো খ্রিষ্টান মূরের বাগানে গজিয়েছিলো—এ-সব গাছ নিয়ে আর-কেউই নিশ্চয়ই এমন অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারতো না; তারপর এখন গাছগুলো এখানে এসেছে প্রাসাদের সারবাঁধা আয়না-বসানো দরদালানের শোভা বাড়াবার জন্যে, যেখানে থাকে এমন-এক স্ত্রীলোক, যে তার ফ্লেমিশ বরতনুতে লালিমা মাখায় পূর্ব-ভূমধ্য সাগরের সূক্ষ্মতম প্রবালচূর্ণে। কারণ সমুদ্রযাত্রা আর আবিষ্কারের এই গরীয়ান দিনগুলোয়, কোনো স্ত্রীলোক যখন আব্দার ধরতে শুরু ক'রে দেয়, তখন আর-কিছুতেই তাকে তুষ্ট করে না সেই-সব প্রসাধনসামগ্রী, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে লোকে যাদের মূল্যবান ব'লে গণ্য করেছে; দিনেমার দেশ থেকে তার চাই কোনো নতুন উদ্ভাবন, মস্কোভা থেকে চাই নতুন মলম আর দুর্লভ কুসুমসার, যদি সে পাখি পুষতে চায় তবে তাকে হ'তেই হবে ভারতীয় তোতা, অশ্লীল কথা বলতে যে শিখেছে; আর কুকুর—উঁহু, যে-কোনো পা-চাটা নেড়ি কুকুর হ'লে চলবে না, তার চাই গ্রিফনমার্কা আহ্লাদি ল্যাপডগ, কিংবা লম্বা পশমঢাকা কোনো জীব, যার লোম ছেঁটে ফেলে বিজাতীয় গুচ্ছে বাঁধা যাবে রঙিন ফিতে। কাজেই স্বভাবতই, সৈন্তরা যখন জামোরীয়

ফিরিওলার ব্র্যাণ্ডিতে চুর হ'য়ে যায়, তখন তাদের একজন-না-একজন বেমালুম সব কাণ্ডজ্ঞান ভুলে গিয়ে বকতে শুরু ক'রে দেয় যে, ডিউক যে অ্যাদ্দিন অ্যাণ্টওয়ার্পে আছেন, আর শীতের আশ্রয় যে ক্রমেই এক বসন্তকুঞ্জ হ'য়ে উঠছে, তার কারণ বীণার সঙ্গে সুর মিলিয়ে যে-কণ্ঠস্বর গান ক'রে ওঠে তার কাছ থেকে ডিউক কিছুতেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারেন না—প্রাচীনদের কথা-মতো, সেই দূর-আগে, যেমনভাবে মধুর স্বরে গাইতো সাইরেনরা, এও যেন তাই। 'সাইরেন?' যে-মেয়েটি থালাবাসন ধোয় সে আঁৎকে ব'লে ওঠে; মেয়েটি জালা-জালা মাল টানে, নাপোলি থেকে সারা রাস্তা সে সেনাবাহিনীর ল্যাজ ধ'রে পেছন-পেছন এসেছে। 'সাইরেন? মানে বলতে চাচ্ছো দুই ঠেলাগাড়ির চাইতেও ঐ চুচিদুটোর বেশি টান আছে!' হুয়ান আর বাকি কথা শোনেনি. খাবার বা পানীয়র দাম না-দিয়েই সৈন্যরা যে যেদিকে পারে হুড়মুড় ক'রে কেটে পড়েছিলো; ডিউকের কোনো ভৃত্য এসে আচমকা সব শুনে যদি এই তিড়িংবিড়িং বুলি নিয়ে লাগিয়ে দেয় কারু কানে! কিন্তু এখন, হুয়ান যখন দেখলে যে নবাগত নিম্নপদস্থ সৈন্যের তত্ত্বাবধানে নারঙ্গগাছগুলো তীরে নিয়ে-আসা হচ্ছে, বাসনমাজা মেয়েটির কথা তার মনে প'ড়ে গেলো, এই নবতম প্রমাণ তার কথাটাই আরো-স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে। সৈন্যদের রসদ-অধ্যক্ষের কতগুলো ঢাকা ঠেলাগাড়িতে এই ছোটো-ছোটো গাছগুলো ভরা হচ্ছে। আচমকাই হুয়ানের পেটের মধ্যেটা কেমন যেন ফাঁকা ঠেকলো, পাকস্থলির স্টু বা বাছুরের ঠ্যাঙের মাংস খাবার জন্যে কেমন-একটা উগ্র ইচ্ছে জাগছে যেন; প্রমারায় বাজিতে-জেতা ঢাকটা আবার তার কাঁধে তুলে নিলে হুয়ান। ঠিক তখনই সে দেখতে পেলে মস্ত-এক পেট-ফোলা ইঁদুর, গায়ে ফুসকুড়ি আর ভাঁজ, ল্যাজটায় লোম নেই, একটা দড়িকে ঝোলানো পুলের মতো আঁকড়ে ধ'রে তীরে আসতে চাচ্ছে। খালি হাতটা দিয়ে একটা ঢিল তুলে নিয়ে সে ইঁদুরটাকে তাগ ক'রে টিপ করলে। ইঁদুরটা ঘাটায় পৌঁছেই, কোনো অচেনা-শহরে-এসে-নামা কোনো আগন্তুকের মতো, চুপচাপ নিশ্চল দাঁড়ালো, যেন ভাবছে কোন্ সরাইতে গিয়ে উঠবে। যখন সে টের পেলে যে ঢিলটা তার গা ঘেঁষে গিয়ে খালের জলে ছিটকে প'ড়ে মিলিয়ে গেলো, সে ছুটে গেলো যেখানে ধর্মপ্রচারকদের খুঁটিতে বেঁধে জ্যান্ত পোড়ানো হয়েছে—এখন যেটা এক পশুখাদ্যের ভাঁড়ার। এ-ব্যাপারটা নিয়ে আর-কিছু না-ভেবেই হুয়ান জামোরীয় ফিরিওলার ঠেলাগাড়িতে ফিরে গেলো। তার বাহিনীর সৈন্যরা তখন বাসনমাজা ছুঁড়িটাকে তাতাচ্ছে, মুখে-মুখে রসালো সব গান বানাচ্ছে, আর গানের মধ্যে তার গাঁয়ের মেয়েদের বর্ণনা করছে কুমারী কলঙ্কিনী, কুটনী, আর

গেলো পাশ দিয়ে, আর সেখানে হঠাৎ এক স্তব্ধতা নেমে এলো—যে-স্তব্ধতাটা ভাঙলো বাসনমাজা ঝির তাচ্ছিল্যের ঘেঁাৎ আর একটি ঘোড়ার হ্রেষা; যেটা লুটারীয় গির্জের মূল প্রকোষ্ঠে গমগম ক'রে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো, স্বয়ং পতঙ্গদেব বেলজেবাবের অট্টহাসির মতো।

২

প্রথমে ভাবা হয়েছিলো আপদটা বুঝি নিছক ফোঁড়াই—ইতালি থেকে আসা লোকদের মধ্যে সেটা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু যখন তার সঙ্গে গা-পোড়ানো জ্বরও এলো যে-জ্বর মোটেই এই তরাইয়ের জ্বর নয়, আর যখন তার বাহিনীর পাঁচজন সৈন্যকে রক্তবমির জন্যে ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'লো, হুয়ান বেশ ভয় পেয়ে গেলো। আঙুল দিয়ে সে কেবলই ভয়ে-ভয়ে নিজের রগগুলো হাৎড়ায়, টিপে-টিপে ছাখে—রগ ফোলা থেকেই সাধারণত শুরু হয় এই ফরাশি রোগ—এই বুঝি খুঁজে পেলে কোনো বাদামের খোলা। দীর্ঘদিন ফ্ল্যাণ্ডার্সে যে-রোগটা, হাওয়ার আর্দ্রতার জন্যে, দেখা দেয়নি তার নামটা যদিও শল্যচিকিৎসক স্পষ্টতই মুখ ফুটে বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন, নাপোলি রাজ্যে তার বিভিন্ন ভ্রমণ তাকে এই অনুমান করতে বাধ্য করলো যে সত্যিই আসলে এ হ'লো প্লেগ, এবং রোগটার দুর্দান্ত ভয়ংকর রূপই। শিগগিরই সে এটাও জানতে পেলে যে বামন নারঙ্গগাছওলা পোতটার সব মাঝিমাল্লাই যে-যার নিজের-নিজের তাক-খাটিয়ায় শুয়ে-শুয়ে যেদিন তারা লাস্ পালমাস্-এর হাওয়ায় শ্বাস নিয়েছিলো সেদিনটাকে শাপশাপান্ত করছে, কারণ রোগটা সেখানে এনেছিলো আলজিয়ার্সের কয়েদীরা—যাদের জন্যে হাঁকা হয়েছিলো চড়া মুক্তিপণ, আর রাস্তায়-ঘাটে লোকজনকে পেড়ে ফেলেছিলো বিনা-মেঘেবজ্রপাতের মতোই। আর শুধু মহামারীর ভয়ই যেন যথেষ্ট নয়, শহরের যে-অংশে বাহিনী ছাউনি ফেলেছিলো সে-জায়গাটা ইঁদুরে-ইঁদুরে থিকথিক করছে। হুয়ানের মনে প'ড়ে গেলো সেই অলুক্ষুণে জীবটাকে, সেই লোমবিহীন ল্যাজের গা-ঘিনঘিনে ইঁদুরটাকে, প্রায় কয়েক ইঞ্চির জন্যে তার ঢিলটা যার গায়ে তাগমাফিক লাগেনি, উঠোনে এখন পালে-পালে যে-ইঁদুরগুলো ছুটোছুটি করছে, তাদের মধ্যে সে-ই নিশ্চয়ই ছিলো অগ্রবর্তী ঝাণ্ডাবাহক কিংবা কোনো ধর্মদ্রোহী যাজক। ইঁদুর-গুলো সাঁৎ ক'রে চুপিসাড়ে ঢুকে পড়ছে দোকানে-দোকানে, আর নদীর এই পাড়ে

সব পনীর খেয়ে সাফ ক'রে দিচ্ছে। হুয়ানের বাড়িওলা লুটারীয় দেখতে এক মৎস্যবিক্রেতা ; রোজ সকালে সে আধখাওয়া সব হেরিং, ল্যাজা-উধাও স্কেট আর শুধু কাঁটাকাঠামোটাই প'ড়ে-থাকা বান মাছ দেখে হতাশায় মাথা কোটে ; কিংবা, আরো যেটা খারাপ, লিকলিকে পাঁকাল মাছগুলোর চৌবাচ্চায় এক ঘিনঘিনে বদমায়েশ প'ড়ে ছিলো ডুবে-মরা, চিৎপাত, পেট ওপরে। কেবল কোনো কাঁকড়া বা মাসলিঝিনুকই পারে বিদঘুটে ঘায়ে-পুঁজে ভরা ইঁদুরগুলোর রাক্ষুসে লোভটাকে ঠেকাতে—ভগবান জানে সে-কোন মশলাদ্বীপ থেকে এসেছে এই নচ্ছারগুলো—যারা এমনকী বর্মের ফিতে বা চামড়ার জিনলাগামও দাঁতে কেটে এগোয়—এমনকী বাহিনীর যাজক তাকে পবিত্র ক'রে দেবার আগেই এরা কলুষিত ক'রে গিয়েছে স্বয়ং হিব্রু পুরাণের ভগবানকেও। বন্যায় ডোবা চারণভূমি থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে যখন সৈন্যটিকে তার চিলেকোঠার আশ্রয়ে হি-হি ক'রে কাঁপায়, সে নিজেকে আছড়ে ফ্যালে খাটিয়ায়, কাৎরে-কাৎরে বলে যে তার বুকটা যেন জ্ব'লে যাচ্ছে, গায়ের শিরাগুলো কেমন ফুলে গিয়েছে ব্যথা করছে, আর লোককে সদা-প্রভুর স্তব শেখানো বন্ধ ক'রে সৈন্যবাহিনীর ঢাক বাজাবার কাজ নেবার যোগ্য সাজা মৃত্যুই ; এইভাবেই সে মোতেৎ আর কুয়াদ্রিউমের শিল্পকে বদ্‌লে দিয়েছে জামবম্বা আর শুওর-খাশি করার বাঁশির সুরের সঙ্গে, গাঁয়ের যুবকরা যা বাজাতো কর্পুস ক্রিস্টির উৎসবে। তবে একটা ঢাক আর দুটো কাঠি নিয়ে কেউ তো ঘুরে বেড়াতে পারে সারা জগতেই, নাপোলি রাজ্য থেকে ফ্ল্যাণ্ডার্সে, তূরী আর বক্সউড বাদকের সঙ্গে-সঙ্গে ঢাকে কুচকাওয়াজের সুর তুলে। আর হুয়ান যেহেতু নিজেকে কোনোদিনই জন্মযাজক বা জন্মকান্তর ব'লে ভাবেনি, সে তাই একদিন আলফালায় মায়েস্ত্রো সিকুয়েলোর ইশকুলে ভর্তি হবার সম্ভাবিত সম্মান ত্যাগ ক'রে প্রথম রং-রুট-করা সৈন্যের পেছন-পেছন চ'লে এসেছে ; রং-রুট-করা সৈন্যটি তার হাতে আট অঙ্কের তিনটি রজতখণ্ড দিয়ে কথা দিয়েছিলো যে-কোনো সৈন্যের জীবন তাকে দেবে যত চাই তত মদ, মেয়েমানুষ আর প্রমারা। এখন যখন সে জগৎকে স্বচক্ষে দেখেছে, সে বুঝতে পেরেছে মানুষের সব কামনাবাসনার ফাঁপা অহমিকা ; আর সে নিজেই কেন তার মহীয়সী স্বর্গগতা মায়ের সব অশ্রুপাতের মূল কারণ। তিন-তিনটে যুদ্ধের তুলকালামের মধ্যে ঢাকে হামলার সুর বাজিয়ে অথবা ঢাকের আওয়াজের তলায় গোলাগুলির আওয়াজকে এমনভাবে তুচ্ছ ক'রে ঢেকে দিয়ে কী-ফায়দাই বা তার হ'লো, যদি এখন তাকে এই চিলেকোঠাতেই মরতে হয়, ঐসব বিয়ার টেনে পাঁড়মাতাল ফ্লেমিশগুলোর বেসুরো ঢাকের ছমছমে মৃদু আওয়াজ

শুনতে-শুনতে, যে-চিলেকোঠার জানলার সবুজ কাচগুলো এখন রাত-পাহারার মশালের মনখারাপ আলোয় মিটমিট করছে? হুয়ান চীৎকার ক'রে আর্তনাদ করছিলো, বুক জ'লে যাচ্ছে, শিরাগুলো ফুলে গিয়েছে—এই ভরসায় যে ঈশ্বর যদি তার ডুকরানি শুনে শেষটায় দয়া করেন তাকে, আর প্রচণ্ডভাবে রোগটা তার দিকে লেলিয়ে দেয়া থেকে যদি বিরত থাকেন। কিন্তু আচমকাই তার শরীর যেন হামলা ক'রে দখল করে নিলে এক তুমুল ঠাণ্ডার বোধ। বুটজোড়া না-খুলেই সে শুয়ে পড়লো বিছানায়, গায়ে টেনে নিলে এক কম্বল, আর কম্বলের ওপর একটা লেপ। কিন্তু মাত্র একটা লেপ আর মাত্র একটা কম্বলে কি কিছু হয়; তার সারা শরীরটায় সামান্য একটু তাপ দিতে সারা বাহিনীর সব কম্বল আর অ্যান্টওয়ার্পের সব লেপই তার লাগতো, যে-তাপ রাজা দায়ুদ বৃদ্ধ বয়েসে ভেবেছিলেন কোনো কিশোরীর শরীর থেকে পাবেন। তাকে শীতে ওভাবে প্রচণ্ড কাঁপতে দেখে মাছওলা—তার কাৎরানি শুনে সে ওপরে উঠেছিলো—আতঙ্কে পেছিয়ে গেলো, আর ইঁদুরে-ভরা সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় ক'রে নিচে নেমে এলো, চেঁচিয়ে বলতে লাগলো শেষটায় তারও বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে রোগ, আর ঘুষ-দিয়ে-পুরুৎ-হবার-জন্যে আর সব দলিল-দস্তাবেজ-নিয়ে-চোরাকারবার-চালাবার-জন্যে ক্যাথলিকরা অবশেষে সাজা পাচ্ছে। এক কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হুয়ান দেখতে পেলে শল্য-চিকিৎসকের মুখ, তার কোমরবন্ধ খুলে তিনি তার কুঁচকি আর তলপেট দেখলেন, আর আচমকা এক অতীব ছন্দোময় অথচ চাপাস্বরে বেজে-ওঠা ঢাকের শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে এলো আলবার ডিউকের অস্বাভাবিক আবির্ভাব।

তিনি ঢুকেছিলেন একা, পরিচয়বিহীন, কালো পোশাক গায়ে, গলায় আঁটো ক'রে বাঁধা তার শক্ত গলবন্ধ, সামনে উঁচনো ধূসর দাড়ি, আর তা দেখে মনে হ'লো তাঁর বুঝি শিরশ্ছেদ হয়েছে আর ছিন্নশিরটা ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোনো মর্মররেকাবিতে। হুয়ান বিছানা থেকে ওঠবার জন্যে একটা প্রচণ্ড চেষ্টা করলে, কোনো সৈন্যের যেমন উচিত সজাগ সাবধান সটান দাঁড়ানো; কিন্তু তার অতিথি লাফিয়ে পেরুলেন তার গায়ের লেপ—এপাশ থেকে ওপাশে, তারপর দূরে একটা এস্পার্তো ঘাসের এক মোড়ায় বসলেন—সেটাতে ছিলো গোটাকয় মদে ভরা মাটির ঘড়া। মাটির ঘড়াগুলো পড়লোও না, ভাঙলোও না, যদিও ঘরটায় ছড়িয়ে পড়লো কোনো সিনাগগের জ্বলন্ত ধূপের মতো ওলন্দাজ স্মৃতিকাপড় পোড়ার গন্ধ। বাইরে থেকে এলো অনেক তূরীভেরীর বিশৃঙ্খল বেসুরের কোলাহল, কোনো সুর-সুষমা ছাড়াই সেগুলো যেন ফুঁকছে কারা, যেন তাদের স্বরগুলোও এই একই

শীতে হি-হি কাঁপছে, যা এখন রোগীর দাঁতকপাটি লাগিয়ে দিচ্ছে। ভুরু এমন কোঁচকানো যে তা হয়তো লুটার-বাদীদের জ্যান্ত পোড়াবার হুকুম দিতো, এমনি-এক ভ্রূকুটি নিয়ে আলবার ডিউক তাঁর দু-ফেরতা কুর্তার ভেতর থেকে তিনটে দাগধরা কমলা বার ক'রে নিয়ে কোনো বাজিকরের মতো লোফালুফি খেলতে লাগলেন, রোমকদের মতো চুলছাঁটা তাঁর মাথার ওপর, এ-হাত থেকে ও-হাতে, তাকলাগানো ক্ষিপ্রতায় কমলাগুলো তিনি লোফালুফি করতে লাগলেন। এই খেলায় তাঁর এই অপ্রত্যাশিত দক্ষতা দেখে হুয়ান তাঁকে বাহবা দেবার চেষ্টা করলে, সেই সঙ্গে তাঁকে সে সম্ভাষণ করতে চাইলে এস্পানিওলের সিংহ, ইতালির হারকিউলিস আর ফ্রান্সের যম হিশেবে—কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো আওয়াজই বেরুলো না। হঠাৎ ছাতের টালিতে ঝমঝম ক'রে তোড়ে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। দমকা হাওয়ার ঝাপটায় রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে গিয়ে বাতিটা নিভে গেলো। আর হুয়ান দেখতে পেলে আলবার ডিউক বেরিয়ে গেলেন হাওয়ার দমকার সঙ্গে, তাঁর শরীরটা এমনই লম্বা হ'য়ে গেলো যে মখমলের ফিতের মতো তা কুণ্ডলি পাকিয়ে গেলো জানলার সরদলে, তাঁর পেছন-পেছন গেলো কমলাগুলো, এখন তাদের আছে চোঙার মতো টুপি আর ব্যাঙের ঠ্যাঙ, আর খোশার কোঁচকানো ভাঁজে-ভাঁজে তারা হেসে উঠছে। চিলেকোঠার জানলা পেরিয়ে, উঠোন থেকে রাস্তায়, এক স্ত্রীলোক এলো বীণার হাতলে চেপে, হাওয়ায় ভেসে; তার নিচুগলার জামা থেকে ঝুলে পড়েছে তার স্তনগুলো আর ঘাঘরা উঠে গেছে ওপরে, তার বীণার তারের তলায় উন্মোচিত হ'য়ে আছে তার নধর নিতম্ব; সারা বাড়িটা থরথর ক'রে কাঁপালো একটা ঝাপটা, উড়িয়ে নিয়ে গেলো এইসব ভয়াবহ মূর্তি, আর আতঙ্কে অর্ধমূর্ছিত, হুয়ান জানলার কাছে গেলো একঝলক টাটকা হাওয়ার জন্যে, আর দেখতে পেলে যে আকাশ নির্মেঘ আর প্রশান্ত। গত গ্রীষ্মের পর, এই প্রথম নভোমণ্ডল শাদা হ'য়ে আছে ছায়াপথে।

'এল্ কামিনো দে সান্তিয়াগো! সান্তিয়াগোর রাস্তা!' কাৎরে উঠলো হুয়ান, নতজানু বসলো তার তলোয়ারের সামনে, তলোয়ারের ডগাটা কাঠের মেঝেয় ঢোকানো, আর তাঁর হাতলটা সম্পূর্ণভাবে তৈরি ক'রে দিয়েছে ক্রুশচিহ্ন।

৩

তীর্থযাত্রী তার শুষ্ককুঞ্চিত হাতে লাঠি আঁকড়ে ধ'রে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ফ্রান্সের রাস্তায়-রাস্তায় ; সে প'রে আছে এক ঢোলা কুর্তা, চামড়ার গায়ে চমৎকার সব কড়ি আর ঝিনুক শেলাই ক'রে দিয়ে পবিত্র-করা, আর ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে শুদ্ধ ঝর্নার জলে ভরা একটা লাউয়ের খোল। তার টুপির নোয়ানো কানাতের তলায় ক্রমেই লম্বা হচ্ছে তার দাড়ি, আর তার পশমিনা আলখাল্লার খ'য়ে-যাওয়া আঁচল ঘষটে যাচ্ছে পায়ের জীর্ণ চপ্পল, যে-চপ্পল অতীব ধার্মিকভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে পারীর রাস্তায়, একবারও কোনো শুঁড়িখানার চৌকাঠ পেরোয়নি, কিংবা সান্তিয়াগোর সিধে রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়নি—একবার শুধু দূর থেকে ক্লুনির সন্ন্যাসীদের দিব্যধাম দেখার কথাটি বাদ দিলে। যেখানেই রাত তার নাগাল ধ'রে ফ্যালে, হয়ান সেখানেই শোয় ; আর অনেক বাড়িরই সদয় গেরস্থরা করুণার বশে তাকে ভেতরে ডাকে ; কিন্তু যখনই সে আশপাশে কোনো কনভেন্টের কথা শুনতে পায়, সে একটু দ্রুত করে তার পদক্ষেপ, যাতে আন্হেলুসের প্রহরে সেখানে গিয়ে হাজির হ'তে পারে—আর খুদে ফটকের মধ্যে থেকে যে-শিক্ষার্থী ভ্রাতাটি উঁকি দেয় তার কাছে আশ্রয় চায়। তীর্থযাত্রীর পরিচয়-জানানো শাঁখের খোলটায় সে চুমু খেতে দেয়, ধর্মশালার খিলেনের তলায় শুয়ে পড়ে—সেখানে শক্ত পাথরের বেঞ্চি পাতা, আর তার ক্লান্ত অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্যে শুধু এইটুকুই আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্য জোটায় সে, নইলে প্রথম শীতের বৃষ্টি ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে সেইন অব্দি সারা পথ ধ'রে তার পিঠ চাবকে গিয়েছে। পরের দিন সে বেরিয়ে পড়ে উষাকালে, অন্তত রনসেভফ্যালের গিরিসংকট অব্দি গিয়ে পৌঁছুবার জন্যে সে অধীর, কারণ তার মনে হয় একবার সে তার নিজের দেশের লোকজনের মধ্যে দিয়ে পৌঁছুতে পারলেই তার এই ভগ্ন শরীর আর অতটা ভগ্ন থাকবে না। তুর-এ তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আলেমান দেশের তীর্থযাত্রীরা, যাদের সঙ্গে সে কথা বলে ইঙ্গিতে। পোয়াতিয়েরের সাঁৎ-ইলোয়ার তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় আরো কুড়িজন তীর্থযাত্রীর—তাদের বেশ বড়ো-একটা দলই একসঙ্গে লান্দ্-এর দিকে বেরিয়েছিলো, টমার্টশে আঙুরলতার দেশের উদ্দেশে যাবার জন্যে পেছনে ফেলে রেখে এসেছিলো খোঁচা-খোঁচা উদ্ভিদে ভরা গমের খেত। এখানে এখনও গ্রীষ্মের রেশ থেকে গিয়েছে, যদিও এর মধ্যেই হেমন্তের কাজকর্ম শুরু হ'য়ে গেছে। পাইনবনগুলো আরো নিবিড়, কিন্তু

অনেকক্ষণ অলসভাবে রোদ শুয়ে থাকে তাদেয় মগডালে, আর পথে যেতে-যেতে কিছু আঙুর তুলে নিয়ে, তাদের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম ক্রমেই সুগন্ধি উদ্ভিজ্জে আর ঠাণ্ডা ছায়ায় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'তে শুরু করে, আর তীর্থযাত্রীরা গান জুড়ে দেয়। ফরাশিরা গান ক'রে বলে সাঁৎ জ্যাক-এর কাছে যে-মানৎ করেছিলো তার জন্যে কত আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে দিয়ে এসেছে; আলেমানরা টিউটনি লাতিনে কাঠখোট্টা স্বরে আওড়ায় কিছু কথা যার মধ্যে অন্যেরা যেটুকু বুঝতে পারে তা হ'লো 'হেরু সাংকৃটিয়াগু! গট্ সাংকৃটিয়াগু!' আর যখন আরো-সাংগীতিক ফ্লেমিশরা কোনো স্তবগান ধরে হুয়ান তাকে অলংকৃত ক'রে দেয় সঙ্গে-সঙ্গে তার নিজের উদ্ভাবন দিয়ে: 'খ্রিষ্টের সেনা, দিব্য উপাসনায়—রক্ষা করো আমাদের—দুর্ভাগ্য থেকে!'

আর এইভাবে, আশিজনেরও বেশি তীর্থযাত্রীর সঙ্গে শোভাযাত্রা ক'রে আস্তে হেঁটে তারা এসে পৌঁছোয় বেয়োন-এ, যার চমৎকার হাসপাতালে তারা গায়ের উকুন মারবার সুযোগ পায়, চটিতে লাগায় নতুন ফিতে, ভ্রাতৃসুলভ কেতায় পরস্পরের উকুন মারে, ওষুধ পায় চক্ষুপীড়ার, ধুলিধূসর পথে চলবার জন্যে অনেকেরই ফোলা-ফোলা রক্তরাঙা চোখে পিচুটি। দরদালানের উঠোন ভ'রে আছে সব ধরনেরই দুর্দশায় আর হাঘরেয়; লোকে ঘ্যাশ-ঘ্যাশ চুলকোচ্ছে তাদের খোশপাঁচড়া, খুলে দেখাচ্ছে তাদের ধ্বজভঙ্গ ধ্বস্ত লিঙ্গ, আর কূপের জলে ধুয়ে নিচ্ছে গায়ের ঘা। একজন ভুগছে গণ্ডমালায়, চেটো এমনকী ফরাশিরাজের পুণ্যস্পর্শও সারাতে পারেনি; আরেকজন ব'সে আছে একটা বেঞ্চে, দু-দিকে পা ঝুলিয়ে, একটু যদি আরাম পায় তার গুপ্ত অঙ্গ, এমন বিশাল ফুলে উঠেছে যে তাদের দেখাচ্ছে দৈত্যাকার আদামাস্তর-এর অণ্ডকোষের মতো। তীর্থযাত্রী হুয়ানই শুধু কোনো চিকিৎসার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করেনি। রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে আঙুরখেত দিয়ে হেঁটে যাবার সময় যে-ঘাম জবজবে ক'রে দিয়েছিলো তার পশমের পোশাক, তা তার দেহ থেকে নিংড়ে বার ক'রে এনেছে যাবতীয় অস্বাস্থ্যকর কৌতুক। পরে, তার ফুশফুশগুলো উৎফুল্ল উপভোগ করেছে পাইনবনের রজনমাখা সুঘ্রাণ আর মাঝে-মধ্যে সমুদ্র-থেকে-আসা সতেজ হাওয়ার ঝাপটা। অগুনতি তীর্থযাত্রীর তৃষ্ণা-নিবারণ ক'রে যে-কূপের জল পবিত্র হ'য়ে আছে যখন সেই কূপ থেকে বালতি-বালতি জল তুলে নিয়ে সে প্রথমবার স্নান করলে, সে এতই সতেজ আর সানন্দ বোধ করলে যে আদুর নদীর পাশে ব'সে আস্ত-একটা মদের কলস ঢকঢক ঢেলে দিলে গলায়, এই বিশ্বাসে যে অনেক সপ্তাহ বাদে যে-লোক ঠাণ্ডা লাগাবার ঝুঁকি নিয়ে তার হাত-মাথা ভিজিয়েছে, এই প্রতিষেধক সে দাবি করতে পারে; যখন সে হাসপাতালে ফিরে

এলো, তার লাউয়ের খোল তখন বিশুদ্ধ ঝর্নার জলের বদলে দুর্দান্ত-কড়া লাল মদে টাবুরটুবুর ভর্তি ; দাওয়ার একটা থামে ঠেশ দিয়ে দিয়ে সে জুৎ ক'রে বসলো শান্তিতে পান করবে ব'লে। আকাশে, ছায়াপথ এখনও দেখিয়ে দিচ্ছে সান্তিয়াগোর রাস্তা। কিন্তু হুয়ানের মনমেজাজ এখন মদের প্রভাবে লঘু হ'য়ে গিয়েছে ; তারকা-খচিত নভোমণ্ডল তার কাছে এখন আর সে-রকম ঠেকছে না যে-রকম ঠেকেছিলো সেই রাতে যখন প্লেগ তার কাছে এনেছিলো এই ভয়াবহ হুঁশিয়ারি যে বহুপাতকের জন্যে তার অদৃষ্টে আছে কঠোর নারকীয় শাস্তি। জেরুসালেমের গারদে যে-শেকল মহান দূতকে বেঁধে রেখেছিলো, তাকে গিয়ে চুমু খাবে ব'লে সে ঠিক সময়মতোই মানৎ করেছিলো। কিন্তু এখন যখন সে বিশ্রাম করছে, সুস্নাত, পরিষ্কার, উকুন আর তেমন নেই, ভেতরে আছে আরো মদ, সে ভেবে দেখতে লাগলো সত্যি-সত্যি প্লেগের জন্যেই তার জ্বর হয়েছিলো কিনা, আর সেই নারকীয় দৃশ্য ছিলো কিনা নিছকই তার জ্বরের বিকার। তার পাশে শুয়ে-থাকা এক বুড়োর গোঁ-গোঁ কাৎরানি—বিষফোঁড়া বুড়োর মুখের আদ্ধেকটাই খেয়ে ফেলেছে—তাকে মনে করিয়ে দিলে যে মানৎ হ'লো মানৎ হ'লো মানৎ, আর তার তীর্থযাত্রীর ঢিলে আংরাখার মাথাঢাকায় মাথা ডুবিয়ে, সে এই তথ্যটাতেই আনন্দ পেলে যে সে পুয়ের্তা ফ্রানসিনার মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছুবে দৈহিক সুস্বাস্থ্যেই, যখন অন্যরা হিঁচড়ে ব'য়ে নিয়ে যাবে তাদের পাঁচড়া আর ঘা, কোনোদিনও ঐশ্বরিক অনুগ্রহ পাবে কিনা সে-বিষয়ে তারা থাকবে সংশয়জীর্ণ। তার পুনর্সতেজ স্বাস্থ্য তাকে সানন্দে মনে করিয়ে দিলে অ্যান্টওয়ার্পের গণিকাদের নধর কান্তি, যারা বেশি সুখ পায় ছাগলের মতো লোমশ কোনো এস্পানিতেই, রতিকর্ম শুরু করার আগে মক্কেলকে তারা বসায় তাদের বিশাল ক্রোড়ে, তারপর খুলে দেয় তাদের কাঁচুলি এমন বাহুতে যা কাগজি বাদামের শাঁসের লেইয়ের মতোই শুভ্র। হুয়ানের লাঠির গায়ের গজালে ঝোলানো লাউয়ের খোল এখন জল না-মেশানো মদে ভর্তি।

৪

ফ্রান্সের রাস্তা থেকে বুর্গোস্-এ ঢুকে তীর্থযাত্রী হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলে এক মেলার হৈ-হৈ আমোদ ফুর্তি আর ব্যস্ততায়। সোজাসুজি ক্যাথিড্রালে যাবার ইচ্ছেটা হার মেনে গেলো টাটকা গরম-গরম চিতই পিঠের বাষ্পঘ্রাণে আর সেঁকা মাংসের গন্ধে, তার সঙ্গে আরো মিশে আছে পার্সলে আর পিমেণ্টো দেয়া ঘন

ঝোল মেশানো পাকস্থলি ভাজার গন্ধ—যে-সব সুখাদ্য সদয়ভাবে তাকে চেখে দেখ-বার জন্যে দুই মস্ত মিনারের মাঝখানে তার ঝুপড়ি থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানালে এক ফোগলা বুড়ি। তারপরে গাধার পিঠে-ঝোলানো ভিস্তি ভর্তি মদ এখানে শুঁড়িখানার চাইতে অনেক শস্তা—তাও খেতে হয়। তারপরে সে আটকে গেলো ভিড়ের ঘূর্ণিতে, হা ক'রে লোকে দেখছে দৈত্যকে আর দড়বাজিকরকে, এখানে এক ছড়াপাঁচালির ফিরিওলা, ওখানে একজন খুলে দেখাচ্ছে বিশাল রংচঙে পট, তার বিষয় আলুথেমায় এক মেয়ের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা, কী ক'রে শয়তান তাকে গর্ভবতী ক'রে দিয়েছে, কী ক'রে সে জন্ম দিয়েছে একরাশ শুওরছানার। আরো দূরে কে-একজন কথা দিচ্ছে ব্যথা না-দিয়েই সে পোকায়-খাওয়া দাঁত টেনে তুলবে—আর রুগীদের দিচ্ছে মস্ত এক লাল-রুমাল যাতে রক্ত কারু চোখে না-পড়ে, আর সারাক্ষণ কাঠের ছোটো হাতুড়ি দিয়ে একটা পেতলের ঢাক পেটাচ্ছে যাতে রুগীদের আর্তনাদ চাপা প'ড়ে যায়, আরো-একটা ঝুপড়িতে একজন বিক্রি করছে বোলোনা সাবান, হাতপায়ের হাজা-সারানো মলম, জড়িবুটি আর ড্র্যাগনের রক্ত; আর আছে নিয়মমাফিক শোরগোল, পিঠে ভাজার চিড়বিড় আওয়াজ, টিনের ভেঁপু বাজছে বেসুরো, বেচারা-এক নুলোঠুঁটোর জন্যে কুর্তাটুপি-পরা কুকুর এসে ভিক্ষে চাচ্ছে—পেছনের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে মানুষের মতো। ধাক্কাধাক্কির চোটে ক্লান্ত হ'য়ে তীর্থযাত্রী হুয়ান এখন এসে থামলে এক বেঞ্চিতে বসা কয়েকজন অন্ধের কাছে, যারা এইমাত্তর একটা গানের শেষ কলিগুলোয় এসে পৌঁছেছে, আমেরিকার আশ্চর্য হার্পিকে নিয়ে এক গান [হার্পি, অর্থাৎ পৌরাণিক সেই দানবী যার দেহের এক অর্ধেক পাখির আর অন্য-অর্ধেক মেয়ের], সিংহ বা কুমির দুইই যার ভয়ে আধমরা, যে থাকতো এক দুর্গন্ধভরা ডেরায় পরিত্যক্ত জঙ্গল আর বিশাল দুই পাহাড়ের মাঝখানে উপত্যকায় :

হার্পিকে যে কিনিয়াছিল, ইওরোপেরই আদমি সে—
খরিদ মূল্য দেদার দিয়ে, তাকলাগানো, পেল্লায়ই—
ভাবিয়াছিল, মলটা দ্বীপে শিখবে সহবৎ মিশে—
ফাউ জোটাবে একটু নাফা, দেখিয়ে তারই জেল্লা ও।

সেখানে লাভ হয় না কিছু, তাই সে গেলো গ্রীস দেশে,
দু-পায়ে জিন পরানো যেন, সয় না সবুর, স্বস্তিহীন,

কনস্টান্টিনোপল হ'য়ে চললো শেগে থ্রেইসে সে—
আর ওখানেই বিগড়ে গেলো হার্পি বেজায়, প্রথম দিন।
কে জানতো এই রাক্ষুসীটা নয় তো মোটেই বাধ্য যে—
মুখ গুঁজে সে রইলো ব'সে, কিছুই ট্যাঁ-ফোঁ না-ক'রেই—
এই-সে প্রথম ফিরিয়ে দিলে বরাদ্দ তার খাদ্যকে—
যে-সব তারা সাজায়েছিল সামনে তারই বিস্তরই।
খায় না কিছু, ঘাড়টা তেড়া, সাত চড়ে রা কাড়েই না—
অবাধ্য সে, খুব তেরিয়া, বেজায় জেদি, মরিয়া,
হাজার অনুনয়েও ফায়দা হয় না, একেবারেই না—
এমনিভাবেই হার্পি শেষে পেরোয় ভবদরিয়া।

সমস্বরে : ঠিক এভাবেই খতম হ'লো আমেরিকার সে হার্পি,
ধরার বুকে অধমতম ভয়দেখানোভয়ানক—
এমনতর রাক্ষুসীরা বাঁচুক মরুক, সে কার কী—
জনমকালেই না-হয় বরং সব ক-টারই মরণ হোক।

দ্বিতীয় সারিতে যারা দাঁড়িয়েছিলো তারা সব চটপট কেটে পড়লো যাতে কোনো ভিক্ষে দিতে না-হয়; তারা-অন্ধদের নিয়ে হাসাহাসি করলো, আর অন্ধরা মক্ষিচুষ কঞ্জুষদের ঝাড়ে-বংশের ওপর তাদের রাগ ঝাড়লো; কিন্তু অন্ধদের অন্য-একটা দল একটু দূরেই তাদের রাস্তা আটকালে, পুতুলনাচ দেখাচ্ছে তারা, পালার বিষয় কেমন ক'রে মূরেরা ভেড়ার ছদ্মবেশে কুয়েন্‌থায় ঢুকেছিলো। আমেরিকার হার্পির কাছ থেকে পালিয়ে এসে হুয়ান দেখলে সে সোজা কোকেনের দেশে চ'লে গিয়েছে, পেরু জয় ক'রে দেশে যার খবর পৌঁছে দিয়েছে পিথারুরো। এবার গায়কদের গলা অবশ্য তেমন ফাটা আর বেসুরো নয়; আর তাদের একজন যখন বন্ধ্যা নারীদের জন্যে প্রার্থনা করবে ব'লে বলছে, অন্যদের দলনায়ক—মস্ত তালঢ্যাঙা এক অন্ধ, মাথায় তার কালোটুপি,—লম্বা-লম্বা নখে গিটারের তারে ঝমঝম তুলে এক রমন্যাসের শেষ চরণগুলো গাইছে :

বাড়িতে-বাড়িতে গুলবাগিচা
সোনায়-রুপোয় সব বাঁধানো—

ফুলের শোভার সাথে অপিচ
হরচীজ দামি, চোখধাঁধানো।
বাহারে কে কার চেয়ে কম বা,
চারকোণা জুড়ে আছে দাঁড়িয়ে
সটান চারটে গাছই লম্বা
বাকি সব গাছপালা ছাড়িয়ে।
শতেক তিতির থাকে এ-গাছে,
তুর্কিমোরগে ভরা দ্বিতীয়,
তৃতীয়ের আনাচে ও কানাচে
খরগোশ ছানা পাড়ে চুটিয়ে—
খাশি মোরগের বাসা বাকিটা।
রাশি-রাশি প'ড়ে গাছতলাতে
সোনার দিনার, কোনো ফাঁকি না—
যত খুশি ভ'রে নাও ঝোলাতে।

আর এখন, বাজনা থামিয়ে, কোনো রংরুটবাজের গম্ভীর ভঙ্গি ক'রে গিটার-টাকে ঝাণ্ডার মতো শূন্যে তুলে, অন্ধ এইভাবে শেষ করলে আর তার গলার জোর এমনই যে মেলার চার কিনারে গিয়ে কথাগুলো পৌঁছুলো :

সুতরাং মহোদয়জনেরা,
সবে আজ হোন্ উৎফুল্ল,
হঠুক দুঃখ কায়মনেরও,
কেননা কপাল আজ খুললো।
শুনুন, তাহ'লে তোফা সন্দেশ—
স্বপ্ন ফলবে এক নিমেষে—
কষ্টের থাকবে না কোনো লেশ
সবপেয়েছির ঐ বিদেশে।
গরিব ? কষ্ট খুব ? তাতে কী ?
যত হোক আমাদের হামেলা—
ওদেশে নিছকই পদপাতে তো
দূরে যাবে যাবতীয় ঝামেলা।

স্বপ্নের দেশে যেতে, কী ?, রাজি ?
আসুন, তাহ'লে, চ'লে এ-ধারে—
একসাথে দশখানা জাহাজই
সেভিইয়ে থেকে যাবে এবারে !
সুযোগ এসেছে, মিছে কে ফিরে
থাকবে কাহিল প'ড়ে দুঃখে ?
সেখান জাহাজে নাম অচিরে
হেলায় ফেরায় সব সুখ কে ?
স্বপ্ন ফলবে এক নিমেষে
সবপেয়েছির ঐ বিদেশে !

আবারও একবার শ্রোতারা চুপি-চুপি কেটে পড়তে লাগলো আর গায়করা তাদের উদ্দেশ ক'রে ছুঁড়ে দিলে টেরচা কথা আর গালাগালি ; হুয়ান দেখলে তাকে ঠেলতে-ঠেলতে ভিড় একটা গলির মাথায় নিয়ে এসেছে, যেখানে খুব শস্তায় মাল বিক্রি করবার ভান ক'রে এক ফিরিওলা—সদ্য সে ফিরেছে পশ্চিম-ইণ্ডিস থেকে—সাতিশয় অঙ্গভঙ্গি ক'রে খড়পোড়া দুই অ্যালিগেটর বিক্রি করতে চাচ্ছে—তার কথা অনুযায়ী এ-দুটো নাকি কুস্‌কো থেকে এসেছে। তার কাঁধে ব'সে আছে এক বাঁদর, বামবাহুতে এক তোতা। সে এক মস্ত গোলাপি শাঁখে ফুঁ দিতেই, এক লাল সিন্দুক থেকে বেরিয়ে এলো এক কালো দাস, মিরাকল নাটকের পালায় যেমনভাবে অতর্কিতে বেরোয় লুসিফার, হাতে সে বাড়িয়ে আছে নানা আশ্চর্য সামগ্রী : মুগুরির দানার মতো মুক্তোর মালা, এমন ঝামা যা মাথাধরা সারায়, ভিকুনিয়ার পশমে তৈরি কোমরবন্ধ, চুমকি বসানো রংচঙে দুল আর পোতোসির আরো-সব অসার ও চটকদার সূক্ষ্ম কারুকাজ। যখন সে হাসে, নেগ্রোটি খুলে দেখায় এমন দাঁত যা অদ্ভুতভাবে উকো দিয়ে ঘ'ষে চোখা ক'রে দেয়া, আর তার গাল দুটি ছুরির দাগে কাটাছেঁড়ায় ভরা ; তারপর একটি তম্বুরা তুলে নিয়ে সে নাচতে শুরু ক'রে দিলে, অদ্ভুত, যতদূর-সম্ভব বন্য আর ক্ষিপ্র, এমন-ভাবে কোমর নাড়িয়ে বেঁকিয়ে সে নাচছে যেন দু-টুকরো হ'য়ে গেছে সে, আর এমন-সব অবিশ্বাস্য অঙ্গভঙ্গি করছে যে নাড়িভুঁড়ি বেচছিলো যে ফোগলা বুড়ি তাকে শুদ্ধু তার মাংসের ঝোলের ডেকচি ফেলে তাকে দেখতে চ'লে এলো। কিন্তু ঠিক তখনই শুরু হ'লো বৃষ্টি, আর সবাই যে যেদিকে পারে ছুটে গেলো ছাইচের

তলায়—পুতুলনাচিয়ে তার আলখাল্লার তলায় পুতুলগুলো নিয়ে, অন্ধরা তাদের লাঠি আঁকড়ে, আর যে-মেয়েটি একগাদা শুওরছানার জন্ম দিয়েছিলো তার নামে ছড়াকাটা কাগজগুলো বেজায় ভিজে গেলো। হুয়ান নিজেকে দেখতে পেলে এক সরাইয়ের বৈঠকখানায়, লোকে ব'সে-ব'সে তাশের বাজি খেলছে আর চুটিয়ে মাল টানছে। নেগ্রোটা তার রুমাল দিয়ে বাঁদরটার গা পুঁছলো, আর একটা পিপের কানায় ব'সে তোতাটি উদ্যোগ করলে এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবার। পশ্চিম-ইণ্ডিসের লোকটি মদ দিতে ব'লে তীর্থযাত্রীকে যতরাজ্যের আজগুবি গল্প শোনাতে লাগলো। অন্যসকলের মতো হুয়ান যদিও পশ্চিম-ইণ্ডিসের যাবতীয় রমন্যাস সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি পেয়েছিলো, এখন কিন্তু তার মনে হ'লো যে অনেক অবিশ্বাস্য গল্পও সত্যই ব'লেই জানা গেছে। সেই উৎকট আর ভয়ংকরী দানবী আমেরিকার হার্পি সত্যি মারা গেছে কনস্তান্তিনোপলে—রেগে, খেপে গিয়ে, গর্জাতে-গর্জাতে। কোকেনের দেশের সোনার দিনারে ভরা এক দিঘি সত্যি-সত্যি আবিষ্কার করেছে এক ভাগ্যবান কাপ্তেন—যার নাম লোঙ্গোরেস দে সেন্‌ৎলাম ই দে গোর্গাস। পেরুর সোনা কিংবা পোতোসির রুপোও মোটেই পশ্চিম-ইণ্ডিসের উদ্ভাবন নয়। এও কোনো গল্পগাথা নয় যে গন্‌থালো পিথারেরোর ঘোড়ারা খুরে সোনার নাল পরেছে। রাজার নৌ-বাহিনীর খাতাঞ্চি এ-সব কথা ভালোই জানতো, যখন ধনরত্নে কানায়-কানায় বোঝাই পালের জাহাজগুলো ফিরে এসেছিলো সেভিইয়েয়। মদের প্রভাবে মুখ খুলে যেতেই পশ্চিম-ইণ্ডিসী এখন তুলনায় কম-রটানো অনেক আশ্চর্য কাহিনী শোনাতে লাগলো: এমনই-অলৌকিক জলে ভরা ঝর্না আছে এক, যার-জলে একবার স্নান ক'রে নিলেই সবচেয়ে বক্র বিকৃত বিকলাঙ্গ বুড়োও জল থেকে ডুব দিয়ে ওঠবামাত্র দেখতে পাবে যে তার মাথা ভ'রে গেছে চকচকে কালো বা সোনালি চুলে, ভাঁজ-গুলো সব মসৃণ, উধাও, সুস্বাস্থ্য প্রত্যাবর্তিত, গায়ের জোড়গুলো আর ফোলা নয়, আর এমনই তেজ যে পুরো একটা আমাজোন বাহিনীকেও গর্ভবতী ক'রে দিতে পারে। সে বললে ফ্লরিডার অম্বরের কথা, পুয়ের্তো ভিয়েহোতে অন্য পিথারেরো কোন্-সব দানবমূর্তি দেখেছিলো, আর ইণ্ডিসে পাওয়া গেছে এমন করোটি যার দাঁতগুলো তিনআঙুল পুরু আর যার আছে একটাই কান—গর্দানের ওপর। আরো-এক নগরীও আছে কোকেনের, যেখানে সবকিছুই সোনার—এমনকী নাপিতদের বাটিগামলাও, থালাবাসনডেকচি, গাড়ির চাকার দাঁড় আর তেলের বাতি। অবাক তীর্থযাত্রী ব'লে উঠলো, 'বাসিন্দারা সবাই নিশ্চয়ই কিমিয়াবিদ—সোনা করতে পারে!' কিন্তু পশ্চিম-ইণ্ডিসী শুধু আরো মদ চেয়ে বিশদ ক'রে বললে যে ওই মহা

ভোজবাজি যারা সম্পাদন করেন তাঁদের সব রাতজাগা কঠোর অধ্যয়নেও ইণ্ডিসের সোনা ইতি টেনে দিয়েছে। হাওয়া নিরোধ-করা পারদ, দৈব মৃতসঞ্জীবনী, চাঁদের শেকড়, শিশুগাছের নির্যাস আর পেতল—সবকিছুই মোরিয়েনো, রাইমুন্দো আর আভিসেনার অনুরক্তরা ত্যাগ করেছে, যখন তারা নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছে অতগুলো জাহাজ কেমন তাল-তাল সেনা, সোনার কুঁজো ও কলস, আর গুঁড়ো, মূল্যবান রত্নপাথর, মূর্তি আর গয়না বোঝাই ক'রে ঘাটে এসে ভিড়েছে। এস্ত্রা-মাদুরার কোনো লোক নাগালে পেতে পারে এমন উঁচু ঘরবোঝাই সোনা যেখানে, সেখানে মিছেমিছি সোনাবানানো কিমিয়াবিদ হ'য়ে কোনো লাভ নেই।

পশ্চিম-ইণ্ডিসী যখন তার ঘরে গেলো, তখন রাত হ'য়ে গেছে ; এত মাল টেনে সে তখন অসংলগ্ন আবোলতাবোল বকছে ; নেগ্রো, বাঁদর আর তোতাটি গেলো আস্তাবলের ওপরকার কাড়ে। তীর্থযাত্রীর মগজটাও তার চেয়ে এমন-কিছু সাফ ছিলো না, লাঠির গায়ে ভর দিয়ে, সে এদিক-ওদিক টলছে, মাঝে-মাঝে লাঠি দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকছে হাওয়ায় ; এভাবে যেতে-যেতে শহরতলির এক গলিতে গিয়ে সে পৌছুলো, যেখানে এক বেশ্যা তাকে সকাল অব্দি নিজের বিছানায় থাকতে দিলে—তার আলখাল্লায় যে-পবিত্র কড়িঝিনুক এখনই শেলাই খুলে ঢলঢল করছে তাদের চুমু খাবার অধিকারের বদলে। সে-রাতে শহরের ওপর দিয়ে অনেক মেঘ গেলো, ছায়াপথকে ঢেকে দিয়ে।

৫

যে-ই শুনতে রাজি থাকে, তাকেই সে এবার ব'লে বেড়াতে লাগলো যে সে এমন-এক জায়গা থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে যেখানে সত্যি কোনোদিনই কিন্তু সে যায়নি। মহান সান্ তিয়াগো [সেণ্ট জেমস] আর তার বন্দীশালার বেড়ি-শিকল আর যে-কুঠার তাঁর শিরচ্ছেদ করেছিলো সব প'ড়ে রইলো পেছনে। যাতে সে এখনও কনভেণ্টের ধর্মশালা ব্যবহার করতে পারে, রাইরুটির সঙ্গে চাখতে পারে তাদের বাঁধাকপির সুরুয়া এবং আরো-সব এই জাতীয় সুবিধে পায়, এইজন্যে হুয়ান এখনও প'রে আছে তার তীর্থযাত্রীর আংরাখা আর ঢোলাকুর্তা, আর বহন করছে তার লাউয়ের খোল—যদিও তাতে এখন ব্র্যাণ্ডি ছাড়া আর-কিছু নেই। দূরে অনেক পেছনে প'ড়ে আছে সিউদাদ রেয়ালের মধ্য দিয়ে যে-রাস্তা গেছে ফ্রান্স থেকে সান্তিয়াগোর দিকে, সারা রাজত্বের সবচেয়ে

বিখ্যাত মদে ভরা চামড়ার বোতলে মুখ লাগিয়ে টানবার জন্যে যে-রাস্তা তাকে তিন-তিনদিন আটকে রেখেছিলো। পথ দিয়ে যত যাচ্ছে তত সে বাসিন্দাদের মধ্যে একটা বদল দেখতে পাচ্ছে। ফ্ল্যাণ্ডার্সে কী ঘটছে সে-সম্বন্ধে তাদের কোনো উচ্চবাচ্য নেই; তাদের কান খাড়া হ'য়ে আছে সেভিইয়ের দিকে, কোনো অনুপস্থিত নিরুদ্দেশ ছেলের জন্যে; কিংবা কারু এক মামা হয়তো তার কামারশালা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো কার্তাহেনায়; কিংবা কেউ হয়তো হারিয়েছে তার সব রুপো—সব সময়মতো নথিভুক্ত না-করার দরুন। কোনো-কোনো গাঁ থেকে আবার কারু গোটা পরিবারই চ'লে গিয়েছে: পাথরকাটিয়ে ও তার মজুররা, ঘোড়া আর দাসদাসী নিয়ে অবস্থাবিপাকে ভরা কোনো গরিব ভদ্রলোক। এখন ঢাক পেটানো হয় গ্রামের মাঝের চত্বরে, লোক রংরুট করবার জন্যে, যাতে সমুদ্র পেরিয়ে গিয়ে এরা জয় ক'রে নেয় নতুন-নতুন প্রদেশ, যাতে সেখানে বসাতে পারে উপনিবেশ: সব সরাই, শুঁড়িখানা, পান্থশালাই নতুন-নতুন যাত্রীতে ভর্তি। আর তাই, তার 'ধর্মের কড়ি' একটি দিগ্‌দর্শিকার সঙ্গে বদ্‌লে নিয়ে, হুয়ান এসে হাজির হ'লো কাসা দে লা কোন্‌ত্রাতাসিওনএ। এর মধ্যেই সে বেমালুম ভুলে গিয়েছে যে সে একজন তীর্থযাত্রী ছিলো, বরং তাকে এখন দেখাচ্ছে কোনো ছত্রভঙ্গ সঙের দলের অভিনেতার মতো, যে টাকাকড়ির অভাবে প'ড়ে পোশাকের বাক্স হাতিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষটায় মাঝখানের বিরতিতে সঙের কুর্তা প'রে এসেছে, বিস্কের যোধপুরী, পিলাতের বর্ম, আর আর্কাদিওর টুপি মাথায়, ইতালীয় শৈলীতে রচিত কোনো মিলনান্ত নাট্য যেটা দর্শককে আদপেই খুশি করতে পারেনি, তারই কোনো প্রেমার্ত রাখাল যেন। ক্রমে, এখানে একটা পুরো পা-ঢাকা মোজা, ওখানে একটা হাতাছাড়া আংরাখা বাগিয়ে নিয়ে, তার তীর্থযাত্রীর আলখাল্লা একজোড়া জুতোর জন্যে বদ্‌লে নিয়ে, পুরোনো জামার ফিরিওলার সঙ্গে দরাদরি ক'রে দাঁও মেরে, হুয়ান এমন-একটা কেতায় সেজেছে তাতে তাকে না মনে হয় কোনো তীর্থযাত্রী, না-বা কোনো ইতালীয় সৈন্য। তার অবশ্য রংরুট-করা সার্জেন্টের আবেদনে সাড়া দেবারও আদৌ কোনো অভিপ্রায় নেই, কারণ পশ্চিম-ইণ্ডিসী তাকে ভজিয়েছে যে কোর্তেস যে-ধরনের নৌসেনা নিয়ে বেরিয়েছিলো, সে-রকম কোনো বিজেতার বহরে বেরিয়ে পড়াটা মোটেই রাতারাতি বড়োলোক হবার সেরা উপায় নয়। এখন ইণ্ডিসে যাতে সবচেয়ে মুনাফা জোটে সেটা হ'লো দিগ্‌দর্শিকার কাঁটার মতো একটা মন থাকা, আর চাই স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি—এবং এক লাফে অন্যদের আগে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা; কোনো রাজকীয় ফরমান,

স্নাতকদের বিধিআপত্তি বা যাজকদের কোলাহলে পাত্তা দেবার কোনোই দরকার নেই। ওখানে, এমনকী ইনকুইজিশনও দিব্যি ফুর্তিবাজ ও প্রাণখোলা হ'য়ে উঠেছে, যেহেতু অত-সব নেগ্রো আর ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে খুব-কিছু করারই কোনো সুযোগ নেই—ওরা তো ধর্মটর্মের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। তাছাড়া এ তো সকলেরই জানা যে একবার যদি তারা আশীর্বাদী অর্থাৎ সান্ বেনিতো বিলি করতে শুরু ক'রে দেয়, তাহ'লে ওদের প্রায় সবাই পড়বে সেইসব যাজকদের খপ্পরে, যৌনাতিচারের পাপে যারা নিজেরাই ভরপুর, আর যেহেতু কোনো গরম দেশে প্রবৃত্তির হঠাৎ-তাড়নার কাছে বিকিয়ে-যাওয়া খুবই সম্ভব, আমেরিকার যাজকসংঘ গোড়া থেকেই স্বীকার করেছে যে তারা সব বহ্ন্যুৎসবই ব্যবহার করবে চকোলেটের পেয়ালা গরম করতে, খামকা মিছেমিছি পাপাচারের নানাবিধ সরকারি তারতম্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা না-ক'রেই—যে পাপগুলো হ'লো জেদ ও অবাধ্যতা, নঞর্থক কাজ, দুস্বীভবন, অনুতাপশূন্যতা, মিথ্যা হলফ, শপথভঙ্গ, অথবা আলোকপ্রাপ্তি। আর তাছাড়া, যে-দেশে কোনো লুটারবাদী চার্চ কিংবা সিনাগগ নেই, ইনকুইজিশন সেখানে অনায়াসেই চোখ বুজে ঢুলতে পারে। হয়তো নেগ্রোরা মাঝে-মাঝে কাঠের মূর্তির সামনে তাদের ঢাক বাজায়, যে-মূর্তিগুলো থেকে শয়তানের ফাটা পায়ের দুর্গন্ধ ছড়ায়। কিন্তু সে তাদের নিজেদের মামলা, যাজকরা শুধু তাদের কাঁধ ঝাঁকায়। তারা বরং আরো ভাবিত নানা ইশতেহার, পুথিপত্র, লেখা-রচনার মধ্য দিয়ে ধর্মদ্রোহ আর নাস্তিকতা ছড়িয়ে-পড়ার সমস্যায়। কাজেই, পুণ্য সলিলের ঝাঁঝরির তলায় মাথা নুইয়ে, নেগ্রো আর ইণ্ডিয়ানরা প্রায়ই ফিরে যায় তাদের চিরাচরিত মূর্তিপূজায়; কিন্তু তাদের না-হ'লে কিছুতেই চলে না খনিতে, আর তাদের সব রেপার্তিমিয়েন্তো বা মাশুলকে দেখতে হবে—চতুর্থ দূত যেমন বলেন—শুকনো আঙুরডালের মতো, কুড়িয়ে নিয়ে যা ছুঁড়ে ফেলতে হবে অগ্নিকুণ্ডে। পশ্চিম-ইণ্ডিসের এস্পানিটি হুয়ানকে তার অভিজ্ঞতার বখরা দিয়ে তাকে সুপারিশ সমেত সেভিইয়ের এক দড়িনির্মাতার জিম্মায় তুলে দিলে; দড়িনির্মাতার কারখানা ভর্তি নেয়ারের খাটিয়ায়, খড়ের জাজিমে, যেখানে তারই মতো অন্য অনেকেও সে-মাসে নয়া এস্পানিওলের দিকে যে-বহরের পাল তুলে সান্‌লুকার থেকে একদঙ্গল জ্যান্ত অভিযাত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার কথা সে-সব জাহাজে ওঠবার জন্যে অনুমতি-পত্রের অপেক্ষা করছে। কাসা দে লা কোন্‌ত্রাতাসিওনের খাতায় হুয়ানের নাম উঠেছে অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান হিশেবে—কারণ তার তো এটা ভোলা চলবে না যে একবার তার মানৎ পূর্ণ হ'লেই তাকে ফ্ল্যাণ্ডার্সে ফিরে যেতে হবে; তার আগে-

পরে যাদের নাম তাদের একজন হ'লো জনৈক হোর্হে, তাম্বরাহোনার বিশপের নেগ্রো গোলাম, আর এমন-এক লোক যে একটু বেশি জোর দিয়েই অস্বীকার করলে যে তার বাবা পুরোনো ধর্মমতেই ফিরে গেছেন—আর তার ঠাকুর্দাকে পোড়ানো হয়েছে ধর্মদ্রোহী হিশেবে। নথির পাতায় পরের নামগুলো সম্রাজ্ঞীর এক চর্মপোশাকনির্মাতার, জেনোয়ার এক সদাগরের—নাম জ্যাকোমো দে কাস্তেইয়োন, গির্জের গায়কদলের কয়েকজন প্রধান গায়েন, দুই হাউই-তুবড়ি নির্মাতা, তাঁর বালকভৃত্য ফ্রানসিস্‌কিও সমেত সান্তা মারিয়া দেল দারিয়েনের অধ্যক্ষ, ভাঙা হাত-পা জোড়া দিতে পারে এমন-এক অস্থিবিশেষজ্ঞ, যাজক, স্নাতক, নব্যদীক্ষিত খ্রিষ্টান আর সেদ্ধ নাশপাতির রঙের এক রমণী—নাম লুসিয়া। তবে গায়ের রঙের বেলায় সেদ্ধ নাশপাতির রং বা অন্য-কোনো রঙের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ করা ভালো হবে না, কেননা আন্দালুসিয়ার গোলকধাঁধার মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার সময় মানুষের গায়ের রঙের এমন রকমারি বৈচিত্র্য আর বাহার দেখে হুয়ান সত্যি তাজ্জব হ'য়ে গিয়েছিলো। সেখানে যে কেবল আলকাৎরার মতো কালো বা বেগুনের মতো চামড়া সদ্যদাসত্বমুক্ত নেগ্রোরা বহরের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারবে ব'লে হা ক'রে প্রতীক্ষা করেছিলো তাই-ই নয়, ছিলো সন্ধ্যার রঙের মতো কুবার পারাকুম্বে নাচিয়েরা, গুর্মারাঙানো গিনির মেয়েরা, আর থোফালার মুলাটো মেয়েরা। আর জাহাজে ওঠবার আগের শেষ ক-টা দিনে কোনো বড়ো যাজক বা কাপ্তেনের অনুগামীদের মধ্যে অনেক ইণ্ডিয়ানকেও দেখা গিয়েছিলো যারা তাদের স্বদেশে ফেরবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিলো। গুয়াতেমালার গির্জের গায়কদের যে প্রধান, তারও এই বহরের সঙ্গে পাল তুলে বেরিয়ে পড়ার কথা, তার ছিলো শুধু তারই সেবা করবার জন্যে তিন-তিনজন ভৃত্য, প্রত্যেকের গায়ের রং জলপাইরঙা, সূচিকর্মকরা জালি কাপড়ে বাঁধা তাদের ভুরু আর গায়ে পুরু পশমি কম্বল, ঢোলা আংরাখার মতো মাথার ওপর পরা, রামধনুর সব ক-টা রং তার। তিনজনেই গলায় পরেছে ক্রুশ, কিন্তু শুধু সদাপ্রভুই জানেন তাদের ঐ খাবি-খাওয়া ভাষায় সে-কোন্ পৌত্তলিকতার কথা তারা বলাবলি করে, যে-ভাষা শুনে মনে হয় মানুষের কথা নয়, এ বুঝি কোনো বোবা-কালার হাউ-হাউ কেঁউ-কেঁউ, ছিলো এস্পানিওলার ইণ্ডিয়ান, ইউকাতানের বাসিন্দা, পরনে শাদা ট্রাউসার, আর অন্যরা—গোল মাথা। পুরু-ফোলা ঠোঁট, আর কড়া ঘন চুল যা দেখে মনে হয় বুঝি কোনো পুডিঙের বাটি বসিয়ে ছাঁটা হয়েছে, যারা এসেছে মূল ভূখণ্ড থেকে; মাঝে-মাঝে খ্রিষ্টযাগে যোগ দেয়, মেদিনা সিদোনিয়ার পরিবারের এমন-তিনজন

মেহিকোবাসী—যারা সালামান্থার রাজকুমার ফেলিপে আর দোনিয়া মারিয়ার দেখা হবার সম্মানে ভোজপরবের দিন খুবই দক্ষতার সঙ্গে বাজিয়েছে খুদে-সব ভেঁপু। আছে আলজিয়ার্সের খোজা আর দাগানো মুখওলা মূর গোলাম। রকমারি চটকদার পশমিনা পুঁতি আর পালকের রঙে-রঙে বর্ণময় ও উজ্জ্বল এই কোলাহলমুখর উদ্ভট বিদেশীদের ভিড় হুয়ানের নাকের বাঁশিতে এনে দিলে রোমাঞ্চকর অভিযানের এক ঝাঁজালো গন্ধ। আর তারপর আছে লোনাজলের খাঁড়ি যার মধ্যে জারানো হচ্ছে পোতগুলোর ভাঁড়ারের জিনিশ; নৌকোর ফুটোয় তাপ্পি ঢোকাবার জন্যে দড়িদড়াগুলোর আলকাৎরা, শ্বেতসুরার দোকানগুলো থেকে কেনা সার্দিন, দিনরাত ধ'রে চলেছে পাশার দান আর বেশ্যাবাড়িগুলোয় চলেছে সারাবান্দের ঝমঝম, ধীর মন্থর নাচ চলেছে জরাতুর, যেখানে খালাশিরা হাজির করিয়েছে খয়েরি এক উদ্ভিজ্জ চিবোবার রীতি যেটা তাদের লালা ক'রে দেয় হলদে, আর তাদের দাড়িগোঁফ দিয়ে দেয় যষ্টিমধু, সির্কা আর মশলার এক জোরালো রেশ-ছড়ানো গন্ধ।

আর অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান এখন বারদরিয়ায়। ওরা ওকে মেহিকো যেতে দেবে না, কেননা পরিষদ শুধু সে-সব অঞ্চলেই ঔপনিবেশিক পাঠাতে চায়, যেগুলো ফরাশি বোম্বেটেদের নিরন্তর হানায় গরিব আর ঝাঁঝরা হ'য়ে গিয়েছে—তাছাড়া শ্রমিকদের অভাব মেটানো চাই, কমানো চাই খনিগুলোয় ইণ্ডিয়ানদের মৃত্যুর হার। এ-খবরে হুয়ান পা ঠুকেছিলো, খিস্তি করেছিলো, গালাগাল দিয়েছিলো। তারপর সে ভেবে দেখলে এ নিশ্চয়ই কোম্পোস্তেলা না-যাবার জন্যে ঈশ্বরপ্রেরিত সাজা। কিন্তু বুর্গোসের মেলার পশ্চিম-ইণ্ডিসী লাগসই মুহূর্তেই পান্থশালার ভাঁটিখানায় এসে হাজির হয়েছিলো আর তাকে বলেছিলো যে একবার সমুদ্র পেরুলেই পরিষদের কর্তাদের নিয়ে সে তোফা হাসাহাসি করতে পারবে, যেমন সব স্বাধীন ঔপনিবেশিকই করে সেও যেতে পারবে যেখানে খুশি। তো, হুয়ানের মেজাজ শরীফ হ'য়ে গেলো আবার আর সে জাহাজের পাটাতনে গিয়ে ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করলে যে তিনতল জাহাজের সবচেয়ে নিচের তলাটায় একটা শুওর দৌড়ের বাজি হবে, খানশামাদের শানদার ছুরির তলায় জন্তুগুলো জবাই হ'য়ে নুন মাখিয়ে রাখার আগে। অন্য-কোনো আমোদপ্রমোদের অভাবে, তারা এক মরা শান্তির একঘেয়েমিকে কাটাবার চেষ্টা করলে, ভুলে যেতে চাইলে এই তথ্য যে পিপেগুলোর পানীয় জল এর মধ্যেই দূষিত হ'য়ে গেছে; শুওর আর বাছুরগুলোকে তারা তাড়া লাগিয়ে ততক্ষণই ছোটালে যতক্ষণ-না তারা ক্লান্ত হ'য়ে ভির্মি খেয়ে পড়ে। তার-পর হ'লো পিচকিরিতে সমুদ্রের জল ভ'রে এক লড়াই; এক খ্যাপা কুকুরের ঘাড়ে

বেঁধে দেয়া হ'লো এক লাঠি, যেটা তার প্রচণ্ড ঘুরুনিতে একাধিক মাথা ফাটালো ; চোখে রুমাল বেঁধে একজন গিয়ে তাড়া করলে এক মোরগকে, দুই তক্তার ফালির মাঝখানে সেটা বাঁধা, আর মাশেতের এক কোপে উড়িয়ে দিলে তার মুণ্ডুটা ; কিন্তু যখন এইসবও বেজায় বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে হ'য়ে উঠলো আর কিনোলা কিংবা রেনটায়ের বাজিতে দশবার এ-হাত ও-হাত বদল হ'লো টাকা, জ্বর শুরু হ'য়ে গেলো, লোকে আছড়ে পড়লো গর্মি লেগে, কে-একজন আগেই ইঁদুরে আদ্ধেক খেয়ে-যাওয়া বিস্কুটে দাঁত রেখে এলো, এক মড়াকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হ'লো জলে, এক মিশেমিশে কালো নেগ্রো মাগি জন্ম দিলে যমজের, কেউ বমি করলে বার-বার, অন্যরা নিজেদের চুলকোলে সারাক্ষণ, বাকিরা খালাশ ক'রে দিলে তাদের অন্ত্র ; আর যখন মনে হ'লো নীলমাছি, উকুন, নোংরা আর দুর্গন্ধ সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেছে, দেখকোটরের পাহারা এক সকালে চেঁচিয়ে জানালে যে সে হাবানার সান্‌ক্রিস্তোবাল বন্দরের অন্তরীপ দেখতে পাচ্ছে। পৌঁছুনো ততদিনে উচিতই ছিলো। হুয়ান এর মধ্যেই ধনদৌলতের সন্ধানে এই অকৃতজ্ঞ যাত্রায় একেবারে কায়ে-মনে তিতিবিরক্ত হ'য়ে উঠেছে, যদিও ক-দিন আগে দেখা কতগুলো উড়ুক্কু মাছ তার কাছে মনে হয়েছিলো আমেরিকার হাপি আর কোকেনের দেশের নিকটবর্তিতার পূর্বলক্ষণ। জড়াজড়ি-করা ছাদ আর কুঠুরির সমাবেশ—শহরটা-থেকে ওঠা একটা ঢ্যাঙা ঘণ্টাঘর দেখে বেজায় খুশমেজাজে সে তুলে নিলে তার ঢাকের কাঠি আর বাজাতে শুরু ক'রে দিলে সেই কুচকাওয়াজের ছন্দ যার তালে-তালে বাহিনী ঢুকেছিলো অ্যান্টওয়ার্পে—আমাদের পবিত্র ধর্ম-বিশ্বাসের যারা শত্রু সেই জঘন্য ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার আগে, যেখানে গিয়ে তারা শীতের আশ্রয় নিয়েছিলো।

৬

কিন্তু কিছু গুজব আর কেচ্ছা ছাড়া সেখানে আর-কিছুই পাওয়া গেলো না, শুধু কুৎসা কেলেঙ্কারি আর ষড়যন্ত্র, চিঠি চালাচালি, মরণান্তিক ঘৃণা আর অপরিসীম ঈর্ষা, সারা বছর কাদায় ভরা আটটা নাড়িভুঁড়িওলটানো রাস্তা ভর্তি শুধু এইসব, যেখানে কিছু কালো-কালো নির্লোম শুওর নোংরার স্তূপের মধ্যে নাক ডুবিয়ে মাটি খুঁড়ছে। যতবারই নয়া স্পেনের বহর দেশের উদ্দেশে পাল খাটায়, জাহাজের

মনিবদের দেয়া হয় দায়দায়িত্ব, চিঠিপত্র, মিথ্যা ও নিন্দা, চরিত্রহনন—সব এস্পানিয়ায় নিয়ে যাবার জন্যে, নিয়ে গিয়ে সেখানে এমন কারু হাতে তুলে দিতে হবে যে অন্য-কাউকে বিপাকে ফেলতে সবচেয়ে ভালোভাবে এগুলোর সদ্ব্যবহার ও উশুল করতে পারবে। মেজাজের ওপর গরমের বিষাক্ত প্রভাবের জন্যেই হোক, আর্দ্রতা পচিয়ে দেয় সবকিছু : মশা, পায়ের নখের তলায় ডিম পাড়ে চামউকুন, নামমাত্র সুবিধের জন্যে মাৎসর্য আর গৃধ্নুতা (কারণ দেশটায় বড়োশড়ো কোনো সুবিধেই নেই) ক্ষয়রোগের জীবাণুর মতো মানুষের আত্মাকে কুরে-কুরে খায়। যে লিখতে জানে সে তার রচনাকে কোনো সুফলের জন্যে কাজে লাগায় না, যেমন রচনাশক্তিকে কাজে লাগাতেন প্রাচীনেরা কোনো রাখালিয়া নাটক কিংবা কোর্পুস ক্রিস্তি পরবের জন্যে কোনো প্রমোদনাট্য রচনা ক'রে, বরং পিত্তের মধ্যে লেখনী চুবিয়ে সে চিঠি লিখে রাজার কাছে নালিশ জানিয়ে, কিংবা পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘ ও প্রলম্বিত অসংলগ্ন বচসা চালিয়ে। রাজ্যপাল যখন আটপাতা লম্বা চিঠিতে রাজকর্মচারীদের কলঙ্ক রটায়, হারেমে একপাল মাগি নিয়ে থাকার জন্যে তখন বিশপ রাজ্যপালের নামে লাগায়, পরিদর্শক নালিশ করে তোলেদোর কার্দিনালের সম্মতি ছাড়াই বিশপ কীভাবে ধর্মবিচারসভার সব প্রাপ্য মেরে দিয়েছে; নির্ভুল শুল্ক না-দেবার জন্যে খাতাঞ্চির নামে লাগায় মুখ্য নথিলেখক আর খাতাঞ্চি (সে আবার পুরশাসকের জিগরি দোস্ত) অসাধুতা আর ফেরেব্বাজির জন্যে অভিযোগ করে মুখ্য নথিলেখকের নামে। আর এইভাবেই তৈরি হ'য়ে যায় এমন-এক শেকল, সবসময়েই যা দুর্বলতম অথবা সর্বাপেক্ষা অপ্রত্যাশিত জোড়ে ভেঙে পড়বার জন্যে তৈরি। কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াসে যে-নেগ্রো ডাইনিপুরুৎ চাবুক খেয়েছিলো, তার কাছে থেকে রতিবর্ধক ভেষজ কেনবার জন্যে একজনের নামে প্রকাশ্যে দোষারোপ করা হ'লো; নগরঘোষকের নামে অভিযোগ হ'লো সে নাকি জঘন্য ও অকথ্য এক পাপ কাজ করেছে, এক মুদি ও কশাইয়ের নামে নালিশ যে সে নাকি খাশ জমির সীমা নিয়ে কারচুপি করেছে; গির্জের মুখ্যগায়ক ব্যভিচারে লিপ্ত; মুখ্য গোলন্দাজ পাঁড় মাতাল, আর আসাবরদার বালকদের পায়ুকামী। নগরক্ষৌরকার—তার টেরা চোখ তো এমনিতেই এক অপরাধ—কলঙ্কারোপের শেকলের শেষ জোড়টা হাঁপরে নেহাইয়ে এই ঘোষণা ক'রে তৈরি করলে যে পূর্বতন রাজ্যপালের ধর্মপত্নী দোনিয়া ভিয়েলান্তে আসলে এক খানদানি বারবনিতা, নিজের গোলামগুলোর সঙ্গেই তাঁর সব ধিক্কারযোগ্য কাজকারবারমহব্বৎ। ফলে সান্ ক্রিস্তোবাল হ'য়ে উঠেছে আস্ত একটা নরক, যেখানে লোকে ধুঁকতে-ধুঁকতে

বহন করছে এই মাটিপৃথিবীর অন্যসবখানের চাইতেও এক দুর্দশাগ্রস্ত অস্তিত্ব, পচা তেলের দুর্গন্ধে ভরা ইণ্ডিয়ান ভৃত্য আর আমেরিকার ভুঁইভোঁদড়ের গন্ধওলা নেগ্রো গোলামগুলোর মাঝখানে! আহ্! ইণ্ডিস! ইণ্ডিস! অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ানের মেজাজকে যা একটু আমোদফুর্তি জোগালে তা মেহিকো বা এস্পানিওলার খালাশিরা। তারপর, দিনকয়েকের জন্যে, তার মনে প'ড়ে যায় যে সে একজন সৈন্য, আর হয়তো কশাইদের কাছ থেকে চুরি ক'রে নেয় গোমাংসের রাং, তাদের কয়েকজন মিলে সেটা রান্না ক'রে নেয় আনাত্তোর লেইয়ে অথবা ভেরাক্রুসের গুঁড়ো লঙ্কায়; কিংবা সে জেলেদের সাহায্য করে দরজা খুলে ঢোকবার সময় আর ঝুড়ি-ঝুড়ি পোরুজে মাছ অথবা টাটকা জলের কাছিম নিয়ে কেটে পড়ে। এইসব মাসেই, আরো মুখরোচক তরিবৎ খাদ্যের অভাবে, হুয়ান আস্তে-আস্তে টোম্যাটো, মিষ্টি আলু বা ফণিমনসার গুটির মতো নয়া খাবারের রুচি তৈরি ক'রে নিলে। তার নাকের বাঁশি সে ভরিয়ে নেয় তামাকে, আর যে-সব দিনে খাদ্যের বেশ অভাব—এই অভাব অবশ্য প্রায়ই লেগে থাকে—সে তার মানিওক রুটি চুবিয়ে নেয় আখের রসে, পরে বাটিতে মুখ ঢুকিয়ে চেটেপুটে সাফ ক'রে দেয়। আর জাহাজের মাল্লারা যখন তীরে আসে, সে দাসত্বমুক্ত নেগ্রো মেয়েদের সঙ্গে নাচে, যারা কাঠের বেড়া-দেয়া আস্তানায় ছারপোকা-থিকথিক জাজিম রাখে, জাহাজ মেরামতির ঘাটের কাছেই,—মহাপাতকের মতো কুৎসিত তারা, কিন্তু মেয়ে যে না-হ'লে একেবারেই দুর্লভ। কোনো জাহাজ চোখে পড়লে, অথবা কোনো শোভাযাত্রার সামনে হাঁটতে-হাঁটতে, কিংবা বড়োদিনের সময় মুলাটো মাগিগুলো যখন মারাকাস ঝমঝম করে, তাদের সঙ্গে তাল রেখে তার ঢাক পিটিয়ে সামান্য যা অর্থ সে উপার্জন করে, সব সে রুটির কারখানার পাশে রাজ্যপালের এক দোস্তের কাবাবের দোকানেই উড়িয়ে দেয়—যেখানে মাঝে-মধ্যে পাওয়া যায় জালা-জালা অতি অখাদ্য লাল মদ। সিউদাদ রেয়াল বা রিবাদাভিয়া বা কাথাইয়ার মদ চেয়ে ঘ্যানর-ঘ্যানর ক'রে কোনোই ফায়দা হয় না এখানে। যে-মাল সে ঢকঢক ক'রে গলায় ঢেলে দেয়, জিভে তার স্বাদ ঠেকে রুক্ষ, টোকো, বাজে—দ্বীপে যা-কিছু উৎপন্ন হয় তার মতোই অতীব দুর্মূল্যও। জামাকাপড় প'চে যায়, জং ধ'রে যায় অস্ত্রেশস্ত্রে, দলিল-দস্তাবেজের ওপর গজিয়ে ওঠে ছত্রাক, আর যখন রাস্তার মাঝখানে কোনো মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়, কালো-কালো নির্লোম-মুণ্ডু শকুন ঠুকরে ফ্যালে তাদের নাড়িভুঁড়ি যেন মে-দিবসের ফুলে সাজানো লাঠির ডগার ফিতে। খাঁড়ির জলে কেউ পড়বামাত্র ঝপ ক'রে তাকে আস্ত গিলে ফ্যালে এক রাক্ষুসে

মাছ, প্রায় জোনাহ্'র তিমির মতোই বিশাল, আর তার হাঁ-টা ঘাড় আর পেটের মাঝখানে কোথায় যেন তৈরি থাকে, দ্বীপে যাকে সবাই বলে হাঙর। খুদে-খুদে ঢালের মতো বৃহদাকার একেকটা মাকড়শা, আটবিঘৎ লম্বা সব সাপ, কাঁকড়া বিছে ও অন্য নানারকম নাছোড় পোকামাকড়। বস্তুত যখনই রুক্ষ লালমদ তার মগজে চ'ড়ে যায়, অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান সেই বেশ্যাপুত্র পশ্চিম-ইণ্ডিসীকে প্রাণখুলে খিস্তি করে, এই জঘন্য দেশটায় আসতে সে-ই তাকে উশকে দিয়েছিলো, যে-দেশটার যৎকিঞ্চিৎ সোনা কবেই কয়েকটা লোলুপ হাত বাগিয়ে নিয়েই উধাও হ'য়ে গিয়েছে। গরম যখন তার শরীরটায় আগুন ধরিয়ে দেয়, আর যখন মনে হয় গায়ের চামড়াটায় কেউ যেন গনগনে তপ্তলাল অঙ্গার মাখিয়ে দিয়েছে, সে তার দুঃখদুরবস্থা নিয়ে এতই মাথা ঘামায় যে তার রোগ-রোগ ভাব ওষুধ-খাই-খাই ভাব আরো ফুলে ওঠে, আর সে হ'য়ে ওঠে তার সেই পড়শিদের মতোই ঝগড়ুটে, যারা তাদের নিজেদের দুর্দশার ভাপেই সারাক্ষণ সেদ্ধ হচ্ছে; একরাত্রে, লাল মদ যখন তাকে বাড়াবাড়িরকম বেশামাল ক'রে তুলেছে, সে পাশায় ঠকাবার জন্যে জেনোয়ার জ্যাকোমো দে কাস্তেইওনকে আক্রমণ ক'রে বসলো—এক ঘা মারলে তাকে তার ছোরা দিয়ে আর রক্তাপ্লুত দেহটা পেড়ে ফেললে পাকস্থলিবিক্রেতার সুরুয়ার ডেকচির ওপর। ম'রেই গিয়েছে এই বিশ্বাসে, আর ঘাঘরা পরতে-পরতে তাদের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে-আসা নেগ্রো মাগিদের আর্তচীৎকারে ভয় পেয়ে, হুয়ান বেরিয়েই দেখতে পেলে বাইরে কাঠের বেড়ার গায়ে কার একটা ঘোড়া বাঁধা। সেটাকে পাকড়ে সে জাহাজঘাটার পাশের রাস্তা দিয়ে জোর কদমে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। যতক্ষণ-না স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ফুটলো দিনের আলো আর তালগাছ ঘেরা নীল ঘোড়াগুলো দেখা গেলো সে আর ঘোড়া থামালে না। তাদের ওপাশে নিশ্চয়ই আছে জঙ্গল, সেখানে আত্মগোপন ক'রেই সে এড়াবে রাজ্যপালের দয়ামায়াহীন কঠোর বিচার।

ক-দিন ধ'রে অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান সমানে রুক্ষ থেকে রুক্ষতর জমিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চললো, আর শেষকালে তার ঘোড়া তার পায়ের নাল খুইয়ে বসলো। যখন সে আখের শেষ খেতগুলো পেছনে ফেলে এলো, তার ডানদিকে ভয়াবহ মরীচিকার মতো উঠে দাঁড়ালো এক পাহাড়ের সার, দু-পাশে গোল খোঁচা-খোঁচা ছোটো পাহাড়, যেন জঙ্গলের পশমি কম্বল গায়ে ঘুমিয়ে আছে মস্ত-সব সারমেয়। ঢালের শাপলাভরা দিঘির মাঝখান দিয়ে লাফিয়ে নেমে এসেছিলো এক জলধারা, ব'য়ে এনেছিলো পচা ফল বীজমূল আর খুদে-খুদে সব কালোচোখ মাছ, সেগুলো

ঝিলিক মেরে স্রোতের উলটো দিকে যাবার চেষ্টা করছে ; এই জলধারার তীর ধ'রে পলাতক উঠে এলো আরো-ওপরে, যতক্ষণ-না সে এসে পৌঁছুলো লালফুলে শোভিত এক গাছপালার বনে, যার আঁকশির মতো বেরিয়ে-পড়া ডালেপালায় হামলা চালিয়েছে বল্মীকস্তূপের এক বিষব্রণ, প্রাণময়তায় যা কিলবিল করছে। কতগুলো ঝোপঝাড়কে দেখালো যেন গায়ে পেঁয়াজের খোশা প'রে আছে, অন্যগুলো নিচে নুয়ে পড়েছে বিশাল-সব ইঁদুরের বাসার ভারে। হুয়ান তার ঘোড়াকে একটা শিমুল গাছের গুঁড়িতে বাঁধলে, কারণ এখন তাকে শৈলশিরার চূড়ায় ওঠবার জন্যে বড়ো-বড়ো উবড়োখাবড়ো পাথর বেয়ে উঠতে হবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে অন্যপাশটায় নামতে শুরু করলে, সেখানে জঙ্গল তেমন নিবিড় নয়, আর সমুদ্র ছড়িয়ে আছে তার পায়ের তলায় : ফেনাবিহীন এক সমুদ্র, গড়িয়ে-পড়া নুড়িপাথরের বাজফাটা শব্দে ভরা ছায়া-ছায়া গুহায় চাপা ধাক্কা দিয়ে ম'রে যাচ্ছে তার ঢেউগুলো। সন্ধেবেলায় সে এসে পৌঁছুলো কড়ি, শাঁখে, ঝিনুকে ছাওয়া এক বেলাভূমিতে, যেখানে অনচ্ছ ফুলকো পোঁটকাগুলো খুদে-খুদে সিন্ধুশামুকের মধ্যে রৌদ্রে ম'রে যাচ্ছে, তামাটে সব আপেল আর মস্ত-সব গুয়ামোর খোলা যারা ষাঁড়ের মতো গ'র্জে উঠতে পারে। হুয়ান তার ফুশফুশ ভ'রে নিলে নোনা হাওয়ায় ; সমুদ্রের টাটকা হাওয়া তার চোখে জল এনে দিলে, কারণ এ তাকে মনে করিয়ে দিলে তার চ'লে-আসার দিনকার সানলুকারের গন্ধ, মনে করিয়ে দিলে অ্যান্টওয়ার্পে তার চিলেকোঠা যার তলায় ছিলো মৎস্যবিক্রেতার দোকান— কিন্তু ঠিক তখনই নারকোল গাছগুলোর পেছনে ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠলো এক কুকুর, আর ফিরে দাঁড়িয়ে পলাতক দেখতে পেলে তার দিকে একজন দাড়িওলা লোক একটা ছিলাটান গাদাধনুক তাগ ক'রে আছে।

আগন্তুক উদ্ধত একরোখাভাবে বললে : 'আমি ক্যালভিনপন্থী !'

'আর আমি একজন মানুষ খুন করেছি,' বললে হুয়ান, এই চেষ্টায় যাতে যে-লোক এইমাত্র যে-অধমতম অপরাধের কথা স্বীকার করেছে, এই কথার মধ্যে দিয়ে তারই স্তরে সে নেমে আসতে পারে। দাড়িওলা তার ছিলা ঢিলে হ'য়ে যেতে দিলে, একটুক্ষণ চিন্তিতভাবে তাকে নিরীক্ষণ করলে ; তারপর সে চেঁচিয়ে হাঁক পাড়লে জনৈক গোলোমনকে—এক নেগ্রো, তার গাল কাটাচেরা—লাফিয়ে নেমে এলো এক গাছ থেকে, প্রায় হুয়ানের ঘাড়েই, আর তার টুপিটা তার মুখের ওপর এমন প্রচণ্ডভাবে টেনে নামালে যে চুড়োটা দু-ফাঁক হ'য়ে গেলো। এইভাবে, নিজেরই টুপিতে চোখ-ঢাকা, তাকে হাঁটানো হ'লো।

৭

মেনেন্দেথ দে আভিলেস-এর বর্বরতায় ফ্লরিডায় অন্তত ছয়শোজন ক্যালভিনপন্থীর শিরশ্ছেদ হয়েছিলো—এই কথাই বললে দাড়িওলা, দারুণ রাগি গলায়, তার বিশাল মুঠো দিয়ে ধর্মপুস্তক বাইবেলে চাপড় মেরে, আর সারাক্ষণ গোলোমন একটু দূরে ব'সে একটা পাথরের ওপর তার মাশেতেতে শান দিলে। এই হুগেনট, রেনে দ্য ল'দোনিয়েরের এক সাথী, আশ্চর্যভাবে, দৈব কৃপায় আরো তিরিশজন লোকের সঙ্গে বেঁচে গিয়েছে, তারপরে তারা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে, বেশির ভাগই গেছে এস্পানিওলার খোঁজে। আর পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তির তত্ত্বের অর্থপ্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে কোনো সৎখ্রিষ্টানের কাছে যা আপত্তিকর মনে হ'তে পারে এমন নানা পাপ-বাক্য উচ্চারণ ক'রে, সে বর্ণনা করলে অবাধ নিরঙ্কুশ নিধন, আর তার মধ্যে রইলো এমন-সব কাটাচেরার অনুপুঙ্খ, যার একটা এইরকম: কারু ঘাড়ে ভোঁতা বাঁকা কৃপাণ লেপটে ব'সে গিয়েছে, যেটা খোলা যায় কেবল করাৎ দিয়ে কেটেই, আর কশাইয়ের দায়ের মতো আওয়াজ ক'রে আরেকজনের শিরদাঁড়ায় পড়লো কুঠার; এ-সব শুনে অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান ঘিনঘিনেভাবে মুখবিকৃতি ক'রে তার মাথা নিচু করলে, বোঝাতে চাইলে যে কিছু কম লাতিন বাক্য ব্যবহার ক'রে ঈশ্বর ও হেসুস ক্রিস্তোকে স্তুতি করার জন্যে এ-শাস্তি মনে হয় বিষম কঠোর, বিশেষত এমন-এক দেশে যেখানে বলিরা সত্যি-বলতে কারুই কোনো ক্ষতি করছে না। দু-হাতে হাঁকানো তলোয়ারের এক প্রচণ্ড কোপে মুণ্ডুর সঙ্গে একজনের এমনকী বাম কাঁধটাও উড়ে গিয়েছিলো!

'আরেকজন তার ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হ'য়ে যাবার পরেও চারপায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছিলো—মদের ভিস্তির মতো ফিনকি দিয়ে ছুটেছিলো রক্ত,' প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ গলায় বললে দাড়িওলা; হুয়ান তার সঙ্গে ঝগড়া করুক এটাই তার ইচ্ছে, যাতে সে গোলোমনকে হুকুম দিতে পারে যেন তার কণ্ঠার ওপর থেকে সবকিছু তার মাশেতের কোপে গোলোমন উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান উত্তেজনার কোনো চিহ্নই দেখালে না! যদিও ফ্ল্যাণ্ডার্সে সে স্বচক্ষে দেখেছে স্ত্রী-লোকদের জ্যান্ত গোর দিতে আর শত-শত লুটারপন্থীদের জ্যান্ত ঝলসে মারতে, আর সে এমনকী আগুন জ্বালাবার জন্যে কাঠ কুড়িয়ে এনে সে-সময় সাহায্যও করেছে, প্রটেস্টান্ট স্ত্রীলোকদের ছুঁড়ে ফেলেছে গর্তে, তবু সবকিছু এখন তার

কাছে এই সন্ধ্যায় অস্ত আলোয় প্রতিভাত হ'লো, বিশেষত এ-সন্ধ্যাটাই যখন তার জীবনের শেষ সন্ধ্যা হ'য়ে উঠতে পারে ; আর সব কিনা এমন-এক দেশে অকথ্য দুর্দশায় দিন কাটাবার পর, যে-দেশে হালজোয়াল পর্যন্ত একটা নতুন উদ্ভাবন, গম অজ্ঞাত, ঘোড়া পরম বিস্ময়, জিনলাগাম অশ্রুতপূর্ব, জলপাই আর আঙুরের দাম তুল্য ওজনের সোনায়, সেখানে ধর্মসভা বস্তুত নেগ্রোদের মূর্তিপূজাকে সামান্যই ধর্তব্যে আনে (যে-নেগ্রোগুলো এমনকী সন্তদেরও নির্ভুল নামে ডাকতে পারে না) কিংবা লাদ্রিনোদের (যারা এখনও ইণ্ডিয়ান গান করে) কোনো পাত্তাও দেয় না, গ্রাহ্যও করে না সেইসব বিবেক-বিচার-বর্জিত যাজকদের যারা ইণ্ডিয়ান মেয়েদের ব'য়ে নিয়ে যায় নিজেদের কুটিরে আর এমনভাবে তাদের দীক্ষা দেয় যে ন-মাস পরে তারা আবার ফিরে আসে শয়তানের খপ্পর থেকে পিতঃ-র কাছে। তার কাছে এটা পেছনে, ঐ পুরোনো জগতে, ঠিক এবং রীতিসম্মত মনে হয় যে লোকের সব-সময় দিব্যমহিমা আর অবতারতত্ত্বের ধর্মমতসংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে যুদ্ধ করাই উচিত। কারণ এই দাড়িওলাটার মতো কাউকে যে আলবার ডিউক জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে হুকুম দেয় সে তো শুধু এইজন্যেই যে সেখানে ধর্মদ্রোহীরা রাজা ফেলিপের বিরুদ্ধে এককটা আস্ত প্রদেশকে খেপিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে, সেই ফেলিপে যিনি কিনা ক্যাথলিকবাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক ও দিবাদ্বিপ্রহরের দানব, আসলে তো ঐ বহ্ন্যুৎসব সুষ্ঠু রাজ্যচালনারই অঙ্গ। কিন্তু এখানে যে সে আছে পলাতক সব গোলামদের মধ্যে। সে তো নিজেই পালাচ্ছে, কারণ সে নিজে একটা দুষ্কর্ম করেছে ; সেও এই ক্যালভিনপন্থীর মতো পলাতক, যার পলায়নসঙ্গীদের একজন সদ্য খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে—এতই সম্প্রতি, যে সে ভুলেই বসেছে তার বাপ্তিস্ম, আর হাবানা থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে এই কারণে যে সে বিশপকে বলেছিলো ক্যাথিড্রালে ধাতুপট্টাবৃত যে-সব ধর্মবস্তু খাঁটি ব'লে বিক্রি করা হয় আসলে সেগুলোর কানাকড়িও দাম নেই, বিশপকে তার জন্যে প্রকাশ্যে দোষারোপ ক'রে সে চেয়েছিলো খাঁটি নিরেট সোনায় দাম পেতে। অতএব রাজ্যপালের কঠোর বিচার থেকে পালিয়ে এসে হুয়ান আশ্রয় পেলে এই ক্যালভিনপন্থী আর এই মারানোর কাছে, আর পেলে অন্য লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ ঘটাবার উষ্ণতাও। আর স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও। কারণ গোলোমন যখন আখের খামার থেকে পালিয়ে-আসা একদল দাসকে নিয়ে এলো, ডালকুত্তাগুলো পথে তাদের কয়েকজনকে পাকড়েছিলো, পরে যাদের প্রভুরা প্রাণদণ্ড দেয়। কিন্তু স্ত্রীলোকরা ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছিলো সামনে, এসে পৌঁছেছিলো জঙ্গলে। কাজেই অ্যান্টওয়ার্পের ঢাকবাদক

হুয়ানের এখন দু-দুজন নেগ্রো স্ত্রীলোক আছে, শুধু তারই সেবা করার জন্যে, আর যখনই তার কামের তাড়া চেতিয়ে ওঠে তাকে চরিতার্থ করার জন্যে। লম্বাজন বিপুলস্তনী, তার কেশ আট সিঁথিতে ভাগ-করা, তাকে সে ডাকে দোনিয়া মান্দিঙ্গা। বেঁটেজনকে, যার নিতম্ব বেরিয়ে থাকে গির্জের দেয়াল থেকে বেরিয়ে-আসা গায়েন-দের আসনের মতো, যার সেখানে মাত্র কয়েকটাই চুল আছে যেখানে কোনো সৎ খ্রিষ্টানির থাকে পুরু গোছা-গোছা চুল, তার নাম সে দিলে দোনিয়া যোলোফা। দোনিয়া মান্দিঙ্গা আর দোনিয়া যোলোফা যেহেতু ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, এমনকী শিকবসানো তন্দুরে শিকে মাছ গেঁথে সেঁকবার সময়ও তারা ঝগড়া করে না, অতএব দিন কেটে যায় বুনো বরা বা হরিণের মাংস নুন মাখিয়ে শুকিয়ে, আর ইণ্ডিয়ান ভুট্টার শিষগুলো ভাঁড়ারে তুলে জমিয়ে রেখে। সময় কাটে ধীরে, মন্থর ; যে-দেশে সারা বছরই গাছগুলো তাদের পাতা ঝরায় সেখানে একটা দিন ঠিক গত দিনটার মতোই ; এবং তারা প্রহর মাপে ছায়ার নড়াচড়া দেখে। যখন অন্ধকার নামে, খোঁয়াড়ের মধ্যে যারা থাকে তাদের দখল ক'রে নেয় এক গম্ভীর-গম্ভীর বিষাদ। প্রত্যেককে দেখেই মনে হয় যে সে যেন কী কথা মনে করবার চেষ্টা করছে, অনুভব করছে পিছুটান, খেদ, বিধুর মনস্তাপ ; শুধু নেগ্রো মেয়েরা গান করে, কাঠের আগুনের ধোঁয়ায়, খামারের গন্ধগুলো ভাপকুয়াশার মতো যা শান্ত সমুদ্রের ওপর ঝুলে থাকে। অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান তার টুপি খুলে নেয়, আর ঢেউয়ের দিকে মুখ ক'রে জপ করে সদাপ্রভুর স্তব আর আস্থামন্ত্র, তার গভীর খাদেনামানো স্বর যেন শপথ ক'রে ঘোষণা ক'রে দেয় পাপের ক্ষমা, দেহের পুনরুত্থান ও চিরজাগরূক প্রাণ সম্বন্ধে তার গভীর বিশ্বাস। একটু দূরে, ক্যালভিনপন্থী বিড়-বিড় করে জেনিভার বাইবেলের শ্লোক ; আর মার্‌রানো—দোনিয়া মান্দিঙ্গা আর দোনিয়া যোলোফার নগ্ন দেহের দিকে তার পেছন ফেরানো—চাপা অশ্রুত কম্পমান স্বরে আবৃত্তি করে দাউদের মহাগীতগুলির একটা : 'হে প্রভু, তুমি স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়ায় ও সত্যে মহান্ [গীতসংহিতা : ৮৬/১৫]।' চাঁদ ওঠে, আর খোঁয়াড়ের কুকুরগুলো সবাই বালির ওপর ব'সে গলা মিলিয়ে ডুকরে ওঠে। সমুদ্র তার নুড়িগুলো তীরের ধারে-ধারে গুহায় গড়িয়ে দেয়। আর যখন সব প্রার্থনা শেষ হয়, য়িহুদি ক্যালভিনপন্থীকে তিরস্কার করে তাশের জুয়োয় ঠকাবার জন্যে, আর তিন মরদই ঘুষোঘুষি লাগিয়ে দেয়, এ ওকে মারে, ও এর ওপর গড়িয়ে পড়ে, কুস্তি করে এ ওর সঙ্গে, হেঁকে বলে ছুরি আনতে, তলোয়ার আনতে, কিন্তু কেউই তা এনে দেয় না, আর পরে আবার মিটমাট ক'রে নেয়

তারা, কান থেকে বালি ঝাড়তে-ঝাড়তে হো-হো ক'রে হাসে। তাদের যেহেতু কোনো টাকা নেই তারা জুয়ো খেলে কড়ি আর ঝিনুক দিয়ে।

৮

কিন্তু মাসের পর অগুনতি মাস কেটে যাবার পর হুয়ান সারাক্ষণ মনমরা হ'য়ে থেকে-থেকে অসুখ বাঁধিয়ে বসলো। দোনিয়া যোলোফা আর দোনিয়া মান্দিঙ্গা মস্ত সব তালপাতা নেড়ে-নেড়ে তাকে হাওয়া করে, আর সেই মরশুমে গরান-গাছের জঙ্গল থেকে যে-খুদে-খুদে মাছিগুলো উড়ে আসে তাদের তাড়িয়ে দেয়; ইণ্ডিয়ানরা তার জন্যে নিয়ে আসে দারুণ-সব মুখরোচক মাছ, তীরের গুহাখোঁদলে মশাল জ্বেলে মাছগুলোর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে তারা তাদের ধরে। একটা হাড় থেকে মজ্জা বার ক'রে নিয়ে নল বানিয়ে অ্যান্টওয়ার্পের ঢাকবাদক ঘণ্টার পর ঘণ্টা তামাক টানে আর বিধুরভাবে স্মৃতির মধ্যে হাৎড়ায় সেইসব দিনের কথা যখন সে শহরগুলোয় ঢুকতো ঝাণ্ডাবাহকের পাশে-পাশে, তুরীভেরী আর বক্সউড-ফাইফের সুরে যখন তারা পা মিলিয়ে এগুতো, হৃদয়-আঁকা সবুজ-সব খড়খড়ি খুলে যেতো, ফুলভরা গোবরাট থেকে ঝুঁকে দেখতো তরুণীরা, তাদের বুকের জামার ঝালরের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া গোলাপি স্তনগুলো যেন নিবেদন করতো তাদের—কারণ ইতালি, কাস্তিইয় আর ফ্ল্যাণ্ডার্সের মেয়েরাই হ'লো সত্যিকার মেয়ে—এইসব বচসাপ্রিয় নেগ্রো মাগিগুলোর চাইতে অনেক আলাদা: এই মদিরামশকগুলোর মাংস এমনই রুক্ষ কঠিন যে চিমটিও কাটা যায় না—অথচ এদেরই এখানে চালানো হয় রমণী ব'লে, কামিনী ব'লে। যে-লোক এককালে আলকালার বিদ্যালয়ে গিয়েছে, সে কী ক'রে তার বিশ্বভ্রমণকালে যে-সব হাজার-হাজার জিনিশ দেখেছে শুনেছে শিখেছে, তার কথা এই আলকাৎরা-কালো প্রাণীগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে? এরা শুধু জানে এদের বর্বর ঢাকগুলো পেটাতে, আর তার সঙ্গে একটা-দুটো এমন অর্থহীন গান জুড়ে দেয়; যখন তারা তাদের তম্বুরা ঝাঁকিয়ে এই ধরনের স্তবগান ধরে, আর গোলোমনের গলা-ছেড়ে-গাওয়া একক গানে যোগ দেয়, বিদ্যার্থী হুয়ান তার অসন্তোষের চিহ্ন হিশেবে কুকুরগুলো নিয়ে জঙ্গলে চ'লে যায়। কারণ হুয়ান সত্যি-তো বিদ্যার্থীই ছিলো একদিন—এ-কথাই সে বলেছে দাড়িওলা আর য়িহুদিকে—আর দিব্য-কুমারী সংক্রান্ত সাংগীতিক স্বরলিপির সঙ্গে-সঙ্গে শিখে-ছিলো সপ্তবিদ্যার প্রধান চারটে বিষয় অর্থাৎ সংগীত, জ্যামিতি, গণিত ও জ্যোতি-

বিদ্যা ; শিখেছিলো হার্প আর ভিহুয়েলা আর স্বরের পর্দা থেকে পর্দায় যাবার তত্ত্ব, একই স্বরের ভিন্ন রূপ আর ভিন্ন-ভিন্ন স্বর মিশিয়ে সংগীতরচনা করে কীভাবে— নিছক সরল স্তবগান আর অর্গান বাজানোর কথা না-হয় না-ই বলা গেলো। আর খেলাভূমিতে যেহেতু কোনো স্পিনেৎ বা ভিহুয়েলা নেই, হুয়ান শুধু কথায় আর গুনগুন ক'রে স্বর ভেঁজে দেখিয়ে দেয় কী ক'রে কেউ রচনা করতে পারে কোনো পাভান-এর ভিন্নস্বর কিংবা অলংকৃত করতে পারে কোন্দে ক্লারো বা মিরামে কোমো ঝোরোর স্বর, এখন দরবারে যেমন বাহবা পায় শৌখিন-সব ফরাশি বা ইতালীয় শৈলী তার মিড়গমকমূর্ছনায়। তার সব গুণপনার এই প্রদর্শনীতে পলাতকের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে অন্যরা এখন তাকে কোনো সামন্তবীরের প্রধান অনুচরের ছেলে ব'লেই ভাবে, যে দারিদ্র্য সহ্য করে আত্মমর্যাদার সঙ্গে, তবু যে কোনো শাবেক বনেদি বাড়ি বিক্রি করবে না—যার ফটকটা যে-কেউ দেখতে পারে, ঐ গাছটার থেকে খুব দূরে হবে না—আর তারা সবাই সেদিকে তাকায়—সান্ ইল্দেফোনসোর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখভাগে, যার ছাত্রদের জীবনযাপন এই ঢাকবাদক রোজই আরো প্রেরণাদীপ্ত আর আনুষঙ্গিক অনুপুঙ্খ সমেত তাদের বর্ণনা ক'রে শোনায়। সত্যি-যে, সে সৈন্য হিশেবে নাম লিখিয়েছে, কারণ রাজাকে সেবা করবার জন্যে সে দায়বদ্ধ ছিলো, যেমন তার সব পূর্বপুরুষই রাজসেবায় জীবন অতিবাহিত করেছে, সেই সুদূর সময় থেকে যখন তারা অংশ নিয়েছিলো শার্লমেনের অভিযানে। এইভাবে তার বংশলতিকাকে মহিমাদীপ্ত ক'রে সে অত কড়ি-শাঁখ আর অত বাজে রান্না-করা কাছিম আর ক্যালভিনপন্থীর তন্দুরে ঝলশানো কাবাব খাবার একঘেয়েমি প্রশমিত করে। প্রায় কষ্টদায়ক তাড়নার সঙ্গে তার জিভ আর টাগরা চায় মদ, আর যখন তার মন বেঘোরে ঘুরে বেড়ায় কাল্পনিক সব কাবাবের দোকানে, সে মনে-মনে ছবি আঁকে বিশাল-সব টেবিলের, যেখানে থরে-থরে সাজানো রয়েছে তিতির, খাশিমোরগ, তুর্কিমোরগ, বাছুরের ঠ্যাং, মস্ত গর্ত-গর্ত পনীর, আচারে জারানো মাছের থালা, পুডিং, মোরব্বা আর আলকারিয়ার মধু। কিন্তু এই খোঁয়াড়ে শুধু হুয়ান একাই অতীতের কথা ভেবে-ভেবে গুমরায় না, যদিও নেগ্রো আর ইণ্ডিয়ানরা র‍্যান্‌চমালিকের মাস্টিফ কুকুরগুলোর কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতে পেরে বেশ খুশিই থাকে, খুশি থাকে অন্যসব মেয়ে আর কুক্কুরীদের মধ্যে থাকতে পেরে, যারা সবসময়েই জন্ম দিয়ে চলেছে। য়িহুদি স্বপ্ন দেখছে তোলেদোর ঘেটোর, যেখানে সে শান্তিতে কাটিয়েছিলো কত-কত বছর, যেখানে বিয়ের উৎসবে ফুর্তি লোটা যায় গীতবাদ্যে, কিংবা

শোনা যায় প্রজ্ঞাবানেদের যখন তাঁরা তাঁদের সন্দর্ভ প'ড়ে শোনান, যেখানে ঘর ধুয়ে যায় না অশ্রু বা রক্তস্রোতে, অতীতের নির্যাতনে লাঞ্ছনায়। চোখ দুটো বুজলেই মারানো দেখতে পায় সরু অলিগলি, বাম দিকে লণ্ঠন আর ছুরি-নির্মাতাদের কারখানা, কাছেই রুটিকেকের দোকান, তাদের ফোলানো পেস্ট্রি, আখরোটের রুটির আংটি আর স্ফটিক জামিরগোলা। মা-বাবা বলাবলি করে শুদ্ধ বাহ্যিক প্রচলিত বদল, আর অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের ছেলেমেয়েদের শেখায় কোনো কায়িক দক্ষতা, সেই সঙ্গে তাদের পড়ায় তোরাহ্ ; কোনো ছেলে যদি তার তুতোভাই মোসের মতো কোনো তুলাদণ্ডনির্মাতা হ'তে না-চায়, তবে সে যাতে কাজ করতে পারে প্রবালে কিংবা আঁকতে পারে খেলার তাশ ইসাক আলফানদারির মতো, কিংবা অন্য তুতোভাই মানাহেন-এর মতো হ'য়ে উঠতে পারে সুবিখ্যাত রৌপ্যকার, কিংবা আয়ত্তে আনতে পারে ক্ষতনিরাময় শিল্প, তার আত্মীয় রাবাই ইয়ুদার মতো। খ্রিষ্টান অন্ত্যেষ্টিতে অর্থের জন্যে বিলাপ গাইবে য়িহুদিপত্নী, আর কারখানাঘর ও দোকান থেকে বিরামহীন শোনা যাবে গণনাযন্ত্রের ওপর পুঁতি সরাবার চাপা মৃদু সুন্দর গান। য়িহুদি স্বপ্ন দেখছিলো ঘেটোর, আর দাড়িওলা পারীর, যাকে সে দাবি করে তার জন্মনগরী ব'লে, যদিও তার জন্ম হয়েছিলো রুয়েঁর শহরতলিতে, আর এক কাঠব্যবসায়ীর বজরায় মাত্র এক হপ্তাই সে শাঁৎলেৎ-এর দেয়ালের তলায় ক্যাবিনবয় হিশেবে কাটিয়েছিলো। কিন্তু সেই এক হপ্তাই তার পক্ষে যথেষ্ট লম্বা ছিলো : একটা ভারি সুন্দর সেতুর ওপর একটা দুর্দান্ত প্রহসন নামিয়েছে অভিনেতারা, আর মঁৎফোকঁর ফাঁসির মঞ্চের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবা গেছে বিশ্বের যত অসার অহমিকা ও দম্ভের কথা, আর মাদেলীন আর মুলের মোড়ে শুঁড়িখানায় চেখে দেখা গেছে মদ। বুনো জন্তুতে ভরা এই হাঘরে দেশটাকে শাপ দিতে-দিতে সে ঘোষণা করলে পারীর সঙ্গে তুলনা হয় এমন-কোনো জায়গাই কোথাও নেই ; নিছক ফেরেব্বাজদের ধাপ্পাবাজিতে ভুলেই কেউ এখানে আসে, আর শেষ-বিহীন জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করে—কেন ? না, এই আশায় যে যেখানে গমের একটা অঙ্কুরও মেলে না সেখানে যদি আচমকা তাল-তাল সোনা পাওয়া যায় ! সে কেবলই বলে হালকা সোনালি চুলের মেয়েদের কথা, ফেনিল আপেলরসের কথা, আর বলে এক হাঁসের কথা আঙুরলতার আগুনে যে নিজের ঘাম ঝরিয়ে নিজের রসেই ঝলসাচ্ছে—এ-সব শুনতে-শুনতে অবশেষে ঢাকবাদকের মেজাজ যায় বিগড়ে, পিত্তি চটকে যায়, সে খিস্তি করে গোলোমনকে আলস্যের জন্যে যখন (এত-সব সাতকাহন শুনে) সেও বিশৃঙ্খলভাবে শুরু ক'রে দেয় তার নিজের পূর্বপুরুষদের

কাহিনী শোনাতে, কেমন ক'রে কবে তাদের হতমান করা হ'লো গায়ে তপ্তলাল লোহার ছ্যাকা দিয়ে। তারা সবাই ছিলো কেউকেটা, সম্ভ্রান্ত—বলে নেগ্রো ; যদিও নিজের দেশের কথা ভাবলেই তার শুধু মনে পড়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণি আর ঝর্ঝর ভরা এক বিশালবিপুল নদী, আর মাটির সঙ্গে গোবর মিশিয়ে তৈরি-করা গুটিকয় কুঁড়েবাড়ি ; নেগ্রো বর্ণনা করে এমন-এক জগৎ যেখানে তার বাবার মাথায় শোভা পেতো পালকখচিত এক মুকুট, আর শাদাঘোড়ায় টানা এক গাড়িতে চ'ড়ে বাবা যেতো, ঠিক তাঁরই মতো সেভিইয়েতে ভোজপরবের দিনে যেমনভাবে আলামেদায় গাড়ি হাঁকিয়ে যেতেন মেদিনা সিদোনিয়াস। সবাই তারা মনখারাপ ক'রে যে যার স্বপ্নের পিছু নেয় নাছোড়, আর তাদের পাশে কাঁকড়ারা গড়িয়ে দেয় শুকনো নারকোলের খোল। তারা চিবোয় সমুদ্রের ধারের ঝোপের ছোটো-ছোটো লাল ফল, যার স্বাদ খানিকটা আঙুরেরই মতো, আর ভুট্টার আর চিচার স্বাদে ক্লান্ত তাদের মুখে এনে দেয় মদের স্বাদ। যে-সব জিনিশ তারা শুধু চিরকাল কামনাই করেছে, কল্পনাই করেছে, তাতেই তাদের মন ভর্তি—কখনও তারা এ-সব সত্যি পায়নি—আর আচমকা বৃষ্টি পড়তে শুরু করে মুষলধারে, সঙ্গে নিয়ে আসে গা-জ্বালানো ধুঁয়াধার পোকামাকড়। যখন দ্যাখে যে ছোট্ট কালো মশামাছির মেঘ তাকে ঘিরে ধরেছে, কানের কাছে ভনভন করছে, হুয়ান শুধু পা ঠুকে-ঠুকে রাগে চাঁচায়, নিজের গালে সজোরে চাপড় মেরে দ্যাখে যে তারই রক্তে এরা সব টৈটুম্বুর হ'য়ে আছে। একদিন সকালে সে জেগে উঠলো কাঁপুনি দিয়ে, সারা মুখটা যেন মোমে তৈরি আর তপ্তলাল ডোরা তার বুকে। দোনিয়া যোলোফা আর দোনিয়া মান্দিঙ্গা পাহাড়ে গেলো সেইসব ভেষজেরই সন্ধানে যা শুধু জনৈক অরণ্যদেবই দিতে পারেন, যিনি নিশ্চয়ই এই আইনবিহীন বর্বর দেশটার আরো-এক শয়তান বাসিন্দা। তাদের তৈরি পাচন গেলা ছাড়া আর-কিছুই করার নেই ; কিন্তু ঘুমের মধ্যে রুগী একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলে : হঠাৎ সে দেখতে পেলে তার দোল-খাটিয়ার সামনে কোম্পোস্তেলার ক্যাথিড্রালকে, তার মিনারগুলো উঠে গিয়েছে আকাশে। বিকারের ঘোরে তার মনে হ'লো ঘণ্টাঘরগুলো এত উঁচুতে উঠে গিয়েছে যে যেন মেঘের মধ্যেই হারিয়ে গেছে, নিশ্চল ডানা মেলে যে-শকুনগুলো হাওয়ায় উড়ছে তাদেরও ঢের ওপরে, শকুনগুলোকে দেখাচ্ছে যেন নভোমণ্ডলের জলে ভাসা দুর্লক্ষণের কতগুলো কালো ক্রুশের মতো। যদিও বেলা এখন দুপুর, ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে এমন স্বচ্ছপ্রাঞ্জল যে পোর্তিকা দে লা গ্লোরিয়ার ওপর তারকাখচিত আকাশকে দেখাচ্ছে কোনো দেবদূতের টেবিলঢাকার মতো। হুয়ান দেখতে পেলে

নিজেকে—সে যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে আরেকজন লোককে যেমন সে দেখতে পেতো—সে এগিয়ে যাচ্ছে পবিত্র প্রাসাদের দিকে, একা, সেই তীর্থযাত্রীর শহরে অদ্ভুত নিঃসঙ্গ, কড়িবসানো এক ঢোলা আংরাখা গায়ে, তার হাতের লাঠি ভর দিয়ে আছে ধূসর-সব খোয়া-পাথরে। কিন্তু দরজাগুলো তার সামনে বন্ধ। সে ভেতরে যেতে চাচ্ছে, অথচ কিছুতেই পারছে না। সে গলা ফাটিয়ে হাঁক দিচ্ছে, কিন্তু কেউ তাকে শুনতে পাচ্ছে না। তীর্থযাত্রী হুয়ান হাঁটু গেড়ে ব'সে প্রার্থনা করছে, গোঙাচ্ছে, দিব্য-কাঠে আঁচড়াচ্ছে, কোনো ভূতঝাড়ানো আত্মার মতো গড়াগড়ি যাচ্ছে ভুঁয়ে। ভেতরে যাবে ব'লে কত তার অনুনয়, কত তার কাকুতি-মিনতি। 'সান্ তিয়াগো!' সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, 'সেণ্ট জেমস!' তারপরেই সে খাবি খাচ্ছে একরাশ নোনা জলে, হাবুডুবু; নিজেকে সে দেখতে পেলে সমুদ্রতীরে নোঙর-বাঁধা এক জাহাজের কাছে গিয়ে কাতরভাবে ভিক্ষে করছে ওঠবার অনুমতি, যদিও একটা পচা কাঠের ডাল ছাড়া অন্য-কেউ আর-কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হুয়ান এত তিক্ত আকুল অঝোর কাঁদলো যে গোলোমন তাকে তার দোলখাটিয়ায় লিয়ানা দিয়ে বেঁধে রাখতে বাধ্য হ'লো, আর সেখানে সে প'ড়ে রইলো মড়ার মতো। আর যখন সে তার আচ্ছন্ন চোখ খুললে সন্ধেয়, খোঁয়াড়ে তখন কোলাহল উত্তেজনা, হৈ-হৈ। তীরের উলটো দিকের শৈলশ্রেণীতে এক জাহাজ এসে ঠেকেছে, দুর্ঘটনায় কাতর এক পোত, বারমুডার ঝড়তুফান যার কাঠামোটার হাড়পাঁজরা বার ক'রে দিয়েছে। মাঝিমাল্লাদের সাহায্য-চাওয়া কাতর স্বর হাওয়ায় ভাসিয়ে আনা হ'লো তাদের কাছে। গোলোমন আর দাড়িওলা জলে ক্যানু নামিয়ে ঠেলে দিলে, আর মার্‌রানো গিয়ে নিয়ে এলো দাঁড়গুলো।

৯

ঊষাকালে আকাশে ফুটে উঠলো ভাইদের আকার, নীল আবছায়া একটা বিশাল পর্বতের মতো। দাড়িওলা—সে এখন ভান করছে সে নাকি বার্গাণ্ডির এক খ্রিষ্টান, ইণ্ডিসে যাবার জন্যে স্বয়ং রাজার অনুজ্ঞাপত্র পেয়েছিলো (পৌঁছেই সে সেটা দেখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো)—সে জানতো যে তার সব ভ্রমণ অচিরেই সাঙ্গ হ'য়ে যাবে। গ্র্যাণ্ড ক্যানারি যেহেতু ইংরেজ আর ফ্লেমিশদের সঙ্গে ব্যাবসা চালায়, আর বেশকিছু ক্যালভিনপন্থী বা লুটারবাদী কাপ্তেন সেখানে তাদের মাল খালাশ করে, এবং সেখানে যেহেতু কেউ তোমাকে জিগেশ করে না তুমি পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তি-

বিধানে বিশ্বাস করো কিনা অথবা লোট-এর সময় উপোশ করো কিনা অথবা দলিলদস্তাবেজের জন্যে শস্তা শীলমোহর কিনতে চাও কিনা, সে জানতো যে এই শহরে তার পক্ষে হারিয়ে-যাওয়া খুবই সহজ হ'য়ে যাবে, তারপর দ্বীপটা থেকে চম্পট দিয়ে ফ্রান্সে যাবার একটা-না-একটা সুযোগ জুটেই যাবে। হুয়ানের দিকে সে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে তাকায়, কিন্তু তারা দুজনেই যা জানে তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করে না। এদিকে মুগুরির সুরুয়া, কিংবা মাংসের কিমা, কিংবা আন্‌-চোভি দিয়ে তৈরি ডিম-পেঁয়াজের স্যালাদ, পনীর আর আচার পুনরাবিষ্কার করার প্রফুল্লতা ছিলো, খোঁয়াড়ে থাকার সময় যার জন্যে তারা বড্ড-বেশি হা-পিত্যেশ ক'রে থাকতো। তারা পেছনে ফেলে এসেছে দোনিয়া যোলোফা আর দোনিয়া মান্দিঙ্গাকে, শোকের নয়—ক্রোধের অশ্রুজলেই ভাসিয়ে; যখন এরা আবিষ্কার করেছিলো যে এরা নেহাৎ হেজিপেজি নয়, বরং স্বয়ং এক সামন্তবীরের পার্শ্বচরের উপপত্নী, অন্য নেগ্রো মাগিদের সঙ্গে তারা এমন ব্যবহার শুরু ক'রে দিয়েছিলো যে এরা যেন কাস্তিইয়ের ভদ্র মেয়েমানুষ। জাহাজে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই রুগী অনুভব করলে যে তার শরীরে ফের স্বাস্থ্য ফিরে আসছে; জাহাজ শেষটায় নোঙর ফেললে সান্‌লুকারে, যেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো তীর্থযাত্রীর আংরাখা আর চপ্পল—কারণ মানৎ হ'লো মানৎ হ'লো মানৎ, আর নিজের মানৎ পালন করেনি ব'লেই তো এত-সব দুর্ভাগ্য তার ওপর বর্ষিত হয়েছে। এবং এখন যখন সে সমুদ্রে দীর্ঘ-সব সপ্তাহ কাটিয়ে সত্যি-সত্যি ডাঙায় পা দিতে যাচ্ছে, তখন রেগুনের ধর্মশালায় সেবার হাত-মুখ ধোবার পর তার যেমন সুখী লেগেছিলো, এখন তার তেমনি সুখী লাগছে ব'লে মনে হ'লো। হঠাৎ তার মাথায় এ-ভাবনাটা খেলে গেলো যে যেহেতু সে পশ্চিম-ইণ্ডিসে গিয়েছিলো তাই এখন সে নিশ্চয়ই একজন পশ্চিম-ইণ্ডিসী। ফলে যখন সে ডাঙায় পা দেবে, সে হ'য়ে উঠবে পশ্চিম-ইণ্ডিসী হুয়ান। এমনি সময়েই সে শুনতে পেলে মাঝিমাল্লার এক তুমুল হৈ-হল্লা, জাহাজের পেছনকার উঁচু মাচাটায়; তারা বুঝি আগমন উদ্‌যাপন করছে এই ভেবে সে ছুটে গেলো দেখতে, আর তাকে অনুসরণ ক'রে এলো দাড়িওলা। কিন্তু সেখানে যা ঘটছিলো তা মোটেই কোনো হাসির ব্যাপার নয়: নয়া খ্রিষ্টানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই বেশ রুক্ষ রূঢ়ভাবে ঠেলাঠেলি করছে। একজন তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিলে মেঝেয়, তারপর তার ঘেটি ধ'রে তাকে জোর ক'রে হাঁটু মুড়ে বসালে: 'সদাপ্রভুর স্তব!' চীৎকার করলে সে তার মুখের কাছে মুখ এনে, 'সদাপ্রভুর স্তব আর তারপর আভে মারিয়া!' আর হুয়ান বুঝতে পারলে যে

মাল্লারা বেশ-কিছুদিন ধ'রেই মায়রানোর ওপর গোপনে নজর রাখছিলো, আর শেষটায় রাঁধুনির কাছ থেকে জানতে পেরেছে—সে বাসন মাজার ভান ক'রে নিজের জন্যে কিছু ময়দা চুরি ক'রে নিয়েছে খমির বা কিণ্ব না-মেশানো রুটি বানাবে ব'লে। আর আজ যেহেতু শনিবার, তারা খেয়াল করেছে যে সে খুব ভোরে উঠে স্নান ক'রে ধোয়া জামাকাপড় পরেছে। 'সদাপ্রভুর স্তব!' সব্বাই তারা চ্যাঁচাচ্ছে এখন। সেই সঙ্গে তাকে বেধড়ক লাথি কষাচ্ছে, আর মায়রানো কিঁউ-কিঁউ ক'রে বস্তু-সব মিনতি করছে। কিন্তু কেউ তাতে কান দিচ্ছে না, আর যখন তারা তাকে জটপাকানো গেরোবাঁধা একটা দড়ি দিয়ে চাবকালে, সে বিড়বিড় ক'রে যা বকতে শুরু করলে তা মোটেই সদাপ্রভুর স্তব বা আভে মারিয়া নয়, বরং দাউদের মহাগীত যা সে খোঁয়াড়ে থাকার সময় দিনে তিনবার গুনগুন করতো: 'হে প্রভু, তুমি স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়ায় ও সত্যে মহান্…' সে তার কথা শেষ করবার আগেই তারা সবাই তার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে লাথি কষাতে শুরু করলে, আর একজন ছুটে গেলো লোহার শেকলবেড়ি আনতে। আর যেই তাকে বেড়িশেকল পরানো হ'লো, যেই সে থু-থু ক'রে মুখ থেকে ফেললে ভাঙা দাঁতগুলো—যেগুলো তারা ভেঙেছে লাঠির ঘায়ে—তারা সবাই এবার দাড়িওলাকে ঘিরে ধরলে, খোলের কিনারে তাকে ঠেশে চেপে ধ'রে তাকে তারা ডাকলে লুটারবাদী বোম্বেটে ব'লে। কিন্তু সে তেরিয়া হয়ে দাঁড়ালে তাদের সামনে, দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলে সব অভিযোগের, পরিষদে গিয়ে তাদের নামে নালিশ করবে ব'লে ভয় দেখালে; এতটাই গলা চড়িয়ে সে কথা বললে সারেঙ শেষটায় একটু সংশয়ে প'ড়ে গেলো, আর সবাইকে শান্ত হ'তে বললো। কিছুক্ষণ দোনোমনা ক'রে সে ঠিক করলে স্বয়ংবর্ণিত বার্গাণ্ডিবাসীকে সে লাস্ পাল্মাসের বিচারসভার হাতে তুলে দেবে—তারাই না-হয় ঠিক করুক তাকে পশ্চিম-ইণ্ডিসে যেতে দেয়া হবে কিনা। মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে, দাড়িওলা দেখলে তার হাঁটুতে বেড়ি পরানো হ'লো; দেখলে যে তারা উপহাস আর গালগাল করতে-করতে নিয়ে গেলো মায়রানোকে, বালতি-বালতি নোংরা জল ঢেলে দিলে তার মুখে। এর সঙ্গে তারা এমনই রূঢ় রুক্ষ ব্যবহার করেছে যে এ তার পেছনে রেখে গেছে রুধিররেখা। হুয়ান দেখলে তারা একে জোড়া মইয়ের একটা দিয়ে ঠেলে নামালে আর এর শেষ হতাশ মরিয়া আর্তচীৎকারের মধ্যে ঘুলঘুলির ঢাকা বন্ধ ক'রে দিলে। সে তখন সদ্য জানতে পেরেছে যে গ্র্যাণ্ড ক্যানারি—এককালে যেখানে মূর ও নবীদীক্ষিতরা শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারতো—এখন ক্যাথলিকবাদের

অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রচারকদের প্রধান পর্যবেক্ষণ-ঘাঁটি হ'য়ে উঠেছে; ধর্মসভার এক দুর্দান্ত হুমকিতে মূর্ত হয়েছে এই ফতোয়া যে লাস্ পাল্‌মাসে ধর্মসভার সবুজ ক্রুশ বসিয়ে জাহাজের মাঝিমাল্লাকে অব্দি সন্দেহ হ'লে পাকড়ানো হবে। তার বন্দীশালার খুপরিগুলো ওলন্দাজ সারেঙ আর অ্যাংলিকান কাপ্তেনে ভর্তি—ধর্মনিরপেক্ষ বাহিনীর হাতে তুলে দেবার প্রতীক্ষায় আছে। আগমাস্তুলের তলায় উবু হ'য়ে ব'সে গোলোমন যেন জ্বরের ঘোরে কাঁপছে, আতঙ্কে ভ'রে গিয়েছে সে, যার নাম তার আগে ছ্যাঁকা দিয়ে খোদাই-করা তার সেই প্রভুর আসিয়েন্দায় সে যখন আমাদের সদাপ্রভুর কাছে হেসুক্রিস্তোর কাছে প্রার্থনা করতো, সে তখন ত্রাণকর্তাকে নাম ধ'রে ডেকেছিলো কিনা, না কি তাঁর পুজো করেছিলো তার নিজের ভাষায়, গোড়ায় তার গলায় অনেক-সব পুঁতির মালা জড়িয়ে নিয়ে। তার কাঁধ চাপড়ে হুয়ান তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলে, যেমন কেউ করে কোনো ভালো পোষা কুকুরকে; কিন্তু তাকে সে এটা বলতে পারলে না—পাছে কেউ শুনে ফ্যালে—যে বিখ্যাত-সব শিরশ্ছেদের দিনে ইন্‌কুইজিটররা নিছক কোনো নেগ্রোকে পোড়াতে গিয়ে কাঠকুটো খুব-একটা খরচ করবে ব'লে মনে হয় না, বিশেষত যখন সহজেই হাতে পাবে কোনো পণ্ডিতকে যিনি বড্ড-বেশি আরবী জানেন, অথবা পাবে কানখাড়া-সব তাত্ত্বিকদের, প্রটেস্টাণ্টদের—আর ওলন্দাজ জাহাজগুলো যেখানে ভেড়ে, সেখানে ধর্মদ্রোহী একটা পুঁথি হাতে-হাতে ঘোরে, প্রচার হয়, যার নাম 'মূর্খ কাজের প্রশংসায়' অথবা 'উন্মত্ততার বাহবা' বা ঐ ধরনেরই কোনোকিছু। আর শিগগিরই যেহেতু ত্রিমূর্তির রবিবার হবে, পোপবিরোধীদের জীবন্ত দাহনের জন্যে যেটা খুবই চমৎকার দিন, পশ্চিম-ইণ্ডিসী হুয়ান মনশ্চক্ষুতে এক্ষুনি দেখতে পেলে মারানোকে, কালো আশীর্বাদী পরা, আর হলদে আংরাখা পরা দাড়িওলা যার আংরাখার সামনে-পেছনে শেলাই-করা থাকবে সান্ আন্‌দ্রেস-এর লাল ক্রুশ। ঝাণ্ডাদণ্ডের তলায় আশিস পাবার পর দুজনেই উঠবে যে যার উলটো গাধায়, চল্লিশ দিনের ইচ্ছাপূরণের জন্যে দূর-দূর থেকে যারা এসেছে তাদের শোরগোল আর টিপ্পনীর মধ্যে, আর তাদের চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জলন্ত চিতার দিকে, আরো-সব কত-কত ধর্মদ্রোহীর সঙ্গে, সঙ্গে নিয়ে যাবে যারা পালিয়েছে তাদের ছবি, যাতে অন্তত তাদের প্রতিকৃতিগুলোকে পোড়ানো যায়।

১০

এক হাটবারে, পশ্চিম-ইণ্ডিসী হুয়ান দাঁড়িয়েছিলো এক কানাগলির শেষে, ফিরি করছিলো খড়পোরা দুই অ্যালিগেটর, যা সে দাবি করলে সে কুস্‌কো থেকে এনেছে, যদিও এ-দুটো সে আসলে কিনেছে তোলেদোর এক বন্ধকি কারবারির কাছ থেকে। তার কাঁধে আছে এক বাঁদর, আর বাম ড্যানায় ব'সে আছে এক তোতা। এক মস্ত গোলাপি শাঁখে ফুঁ দিলে সে, আর অমনি লাল একটা সিন্দুক থেকে বেরিয়ে এলো গোলোমন, কোনো মির‍্যাকল নাট্যের লুসিফারের মতো, হাতে বাড়ানো রকমারি পুঁতির মালা, মাথাধরা সারাবে এমন-সব মণিপাথর, ভিকুনিয়ার পশমে তৈরি কোমরবন্ধ, রাংতা মোড়া চুল আর পোতোসির কারিগর-দের বানানো আরো-সব তুচ্ছ ও অসার রংচঙে শিল্পদ্রব্য। যখন সে হাসলো, নেগ্রো বার ক'রে দিলে উকো দিয়ে ঘ'ষে চোখা-করা দাঁতের পাটি, আর ছুরির ঘায়ে কাটা তার দেশের উপজাতির রীতিমাফিক গালে নানারকম দাগ; তারপর, একটা তম্বুরা তুলে নিয়ে, সে নাচতে শুরু ক'রে দিলে, কোমরটাকে এমনভাবে সোৎসাহে বাঁকিয়ে যে নাড়িভুঁড়ির বড়া বিক্রি করে যে ফোগলা বুড়ি সে শুদ্ধু সান্তা মারিয়ার খিলানের তলায় তার ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এলো তার নাচ দেখতে। এখন যেহেতু মন্থর এস্পানি নাচ সারাবান্দ্, গিনেও আর শ্যাকঁই বুর্গোসের দারুণ উন্মাদনা, তাকে হাততালি দিয়ে বাহবা দিলে বিশাল ভিড়, যারা পরে নতুন জগৎ থেকে আমদানি-করা আরেকখানি নাচের জন্যে অনুনয় করলে। কিন্তু ঠিক তখনই ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেলো; সব্বাই ছুটে গেলো আলশে আর ছাঁইচের তলায় আশ্রয় নিতে; আর পশ্চিম-ইণ্ডিসী হুয়ান নিজেকে আবিষ্কার করলে এক পান্থশালার বৈঠকখানায়, যেখানে হুয়ান নামে আরেকজন তীর্থযাত্রী কড়িবসানো আংরাখা প'রে মেলার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে সেখানে এসে হাজির। সে এসেছে সান্‌তিয়াগোর কাছে মানৎ রাখতে, ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে প্লেগের এক ভয়ংকর মহামারীর সময় সে মানৎ করেছিলো। পশ্চিম-ইণ্ডিসী হুয়ান সান্ লুকরে নেমেছিলো তার লাঠি আর লাউয়ের খোল নিয়ে, যার প্রতীকী তাৎপর্য হ'লো তীর্থযাত্রী তার মানৎ রেখেছে, তারপর তার আলখাল্লা খুলে রাখলে সিউদাদ রেয়ালে, যখন গোলোমন, হঠাৎ-একদিন, এক বাঁদর আর তোতাপাখি নিয়ে তার কাছে এসে হাজির, মেলায় সব রংচঙে গয়নাগাটি বিক্রি করবার জন্যে;

গোলোমনই তাকে বোঝালে যে ভাগ্যে থাকলে দু-দিনেই সে ইণ্ডিস থেকে আনা সব রকমারি নূতন জিনিশ বিক্রি ক'রে এতটাই মুনাফা লুঠবে যে সারা হপ্তাই তারপর মদ-মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করতে পারবে। তার জোরালো পুরুষত্বের কাছে শ্বেতাঙ্গিনীরা কীভাবে সাড়া দেয় সেটা জানবার জন্যে নেগ্রো ততক্ষণে তেতে উঠেছে; পশ্চিম-ইণ্ডিসী কিন্তু রাস্তা দিয়ে কোনো নেগ্রো মেয়েমানুষকে যেতে দেখলেই তার মুণ্ডু হারায়, যাদের নধর পাছা যেন গির্জের গায়েনের বসবার তাকের মতো বেরিয়ে আছে। এখন গোলোমন তার রুমাল দিয়ে বাঁদরটার গা পুঁছছে, আর একটা পিপের কানায় ব'সে তোতাটা ঢুলুনির উদ্যোগ করছে। পশ্চিম-ইণ্ডিসী মদ দেবার হুকুম দিয়ে তীর্থযাত্রী হুয়ানের কাছে নানা লম্বাইচওড়াই আজগুবি গল্প ফেঁদে দিলে। সে বর্ণনা করলে অলৌকিক সঞ্জীবনী জলেভরা এক ঝরনা, যার জলে একবার স্নান ক'রে নিলেই এমনকী সবচেয়ে জরাগ্রস্ত বিকৃতদেহ বিকলাঙ্গও উঠে আসবে চকচকে চুল নিয়ে, গালের সব কোঁচকানো তোবড়ানো ভাঁজ উধাও, স্বাস্থ্য এতটাই পুনরঞ্জিত যে আস্ত এক আমাজোনি বাহিনীকে গর্ভবতী ক'রে দিতে পারবে। সে বললে ফ্লরিডার অম্বর মরকতের কথা, পুয়ের্তো ভিয়েহোতে কী-সব দানবমূর্তি দেখেছিলেন ফ্রান্‌সিস্‌কো পিথার্‌রো, কী-সব করোটি যার দাঁতগুলো তিন আঙুল পুরু, যার কান আছে কুললে একখানা, তাও আবার তার গর্দানে; কিন্তু তীর্থযাত্রী হুয়ান, মাল টেনে-টেনে তার মগজ ঘোলাটে আবছায়ায় ঝিমঝিম করছে, পশ্চিম-ইণ্ডিসী হুয়ানকে বললে যে ইণ্ডিস থেকে আসা লোকে সবসময়েই এ-সব তাজ্জব কথা ফেনিয়ে বলে, আর শেষটায় কেউ তাদের কথা আর বিশ্বাসই করে না। চিরযৌবনের ঝরনায় কারু আর বিশ্বাস নেই, অন্ধরা যে-সব দিস্তে কাগজে আমেরিকার হার্পিদানবীর গল্পকথা বেচে তারও কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে ব'লে কেউ মনে করে না। এই মুহূর্তে প্রজ্বলন্ত বিষয় হ'লো ওমেগুয়া রাজ্যের মনোয়া নগরী, নয়া স্পেন বা পেরু থেকে নৌবহর যত সোনা নিয়ে এসেছে তার চেয়েও বেশি সোনা সেখানে ছড়িয়ে আছে শুধু কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষায়। মায়াশহর সেগোতা আর পোতোসির মাঝখানে যে-অঞ্চল (প্রকৃতির যা সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি) আর আমাজোনের মুখ এমন-সমস্ত পরমাশ্চর্যে ভর্তি যা কেউ কস্মিনকালেও আগে চর্মচক্ষে দ্যাখেনি: মুক্তাদ্বীপ, কোকেনরাজ্য, আর মহাসেনাধ্যক্ষ যে-পার্থিব স্বর্গভূমি দেখেছিলেন ব'লে দাবি করেছিলেন, রাজা ফার্দিনান্দকে লেখা তাঁর পত্র থেকে যার কথা সবাই জেনে গিয়েছে, কোনো মেয়েমানুষের স্তনের মতো এক পাহাড়সমেত সেই বিস্ময়-নগরী।

এক আলেমান নাকি নিজের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে এমন-এক রাজ্যের গুপ্তকথা নিয়েই মরেছে যেখানে ক্ষৌরকারের গামলা, রান্নার বাসনকোশন, গাড়ির চাকার দাঁড়, আর বাতিদানগুলো অব্দি সবচেয়ে মূল্যবান ধাতুতে তৈরি। আরো আবিষ্কারের উদ্দেশে নূতন-নূতন নৌযাত্রার ঢাক বাজছে এখনও, কিন্তু এখানে পশ্চিম-ইণ্ডিসী হুয়ান তীর্থযাত্রী হুয়ানকে বাধা দিয়ে বললে পিথারুরো আর তাঁর বহরের এ-সব বিজয়অভিযানই কিন্তু সবচেয়ে লাভজনক ব্যাপার নয়। ইণ্ডিসে যা থেকে সবচেয়ে নাফা আসে তা হ'লো দিগ্‌দর্শিকার কাঁটার মতো এক মন আর চৌকশ বিচারবুদ্ধি ও নৈপুণ্য—আর সকলের আগে লাফিয়ে এগুবার ক্ষমতা; রাজার ফরমান-পরোয়ানা, স্নাতকদের বিধিআপত্তি বা বিশপদের চ্যাঁচামেচিতে কান দেবার কোনো কারণ নেই, যেখানে ইনকুইজিশন নিজেই সহজ আর নির্ঝঞ্ঝাট হ'য়ে গেছে, আর ধর্মদ্রোহীদের মাংস পোড়াবার বদলে যেখানে চকোলেটের পেয়ালাই আগুনে গরম করা হয়···সেখানে এস্পানিওলায় বাজানো ঢাক কখনও কাউকে ধনদৌলতে কাছে নিয়ে যাবে না। যে-সব ঢাক শোনা উচিত, তা বাজছে সমুদ্রের ওপারে, কারণ তারাই শোনায় মরদদের জন্যে নতুন-নতুন খোলা রাস্তার কথা, আগের মতো বেশি লড়াই না-ক'রেই যে-রাস্তা দিয়ে গিয়ে তুলকালাম ঐশ্বর্য উপার্জন করা যায়, যদি জানা যায় চিকিৎসকের বিদ্যা—কী ক'রে জোড়া দিতে হয় ভাঙা হাড়, অথবা ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব ভেষজে কী ক'রে সারাতে হয় বুনো জন্তুর কামড়।

১১

পরদিন, তার ঢোলা আংরাখা থেকে কড়িগুলো খুলে যার সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলো সেই মেয়েকে দিয়ে দেবার পর, তীর্থযাত্রী হুয়ান সান্তিয়াগোয় রাস্তা ছেড়ে সেভিইয়ের দিকে বেরিয়ে পড়লো। পশ্চিম-ইণ্ডিসী হুয়ান গেলো তার পেছন-পেছন, খক-খক কেশে আর হা ক'রে ফোঁশ-ফোঁশ নিশ্বাস ফেলে, কারণ সে সিয়েররার হাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসেছে। যখন সে রাস্তার এক পান্থশালায় কাঁপুনি দিতে-দিতে খড়ের জাজিমে শুলো, সে কামনাতুরভাবে ভাবলে দোনিয়া যোলোফা আর দোনিয়া মান্দিঙ্গার রুক্ষ চামড়ার উষ্ণ আরামের কথা। মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে সে কাতরভাবে প্রার্থনা করলে রৌদ্রের জন্যে, কিন্তু সাড়া এলো দমকা এক বৃষ্টির ঝাপটায়, সমভূমির ধূসর গন্ধকবর্ণ খোয়াপাথরে ঝ'রে পড়লো বাদল, ভিজে একশা-ভেড়াগুলো জড়াজড়ি ক'রে রইলো এক জলগর্ত ঘেরা সবুজ

ধানের মাঠে, কাদায় তাদের ক্ষুর ডুবিয়ে। গোলোমন এলো পেছনে, খালি পা, বাঁদর আর তোতাটাকে তার ঢোলা কুর্তার আড়ালে ঢেকে, তার খড়ের টুপি কনকনে হাওয়ায় উঁচোনো। ভাইয়া দোলিদে তাদের আমন্ত্রণ জানালে সম্রাটের উপদেষ্টা'র স্ত্রীর জীবন্ত মাংস ঝলসাবার চিতার গন্ধ, তাঁর বাড়িতে নাকি লুটার-বাদীরা জমায়েৎ হ'য়ে প্রার্থনা করতো। এখানে সবকিছু থেকেই পোড়ামাংসের গন্ধ উঠছে, নাকে আসছে জলন্ত সান্ বেনিতোর গন্ধ, শিকেঝলসানো ধর্মদ্রোহী. ওলন্দাজদেশ আর ফরাশিভূমি থেকে ভেসে আসছে কয়েদীদের আর্তনাদ, জ্যান্ত কবর-দেয়া স্ত্রীলোকদের বিলাপ, মানুষবলির তুলকালাম হুলুস্থুল, তলোয়ার খুঁচিয়ে মেরে-ফেলা মায়ের পেটের অজাত শিশুদের ভয়ংকর আর্তনিনাদে ভেসে আসছে অভিশাপ। কেউ-কেউ বললে এই অশ্রু আর রুধির থেকেই উঠে আসবে সুদিন; অন্যরা চেঁচিয়ে বললে ষষ্ঠ মুদ্রা খোলা হ'লো, সূর্য এবার 'লোমজাত কম্বলের মতো কৃষ্ণবর্ণ' হ'য়ে যাবে, আর মর্তপৃথিবীর রাজা, রাজকুমার, ধনবান ও নেতারা, ক্ষমতাসীন সকলেই, সব দাস ও মুক্ত মানুষ, সবাই গিয়ে আশ্রয় নেবে গুহায় ও পাহাড়ে। কিন্তু সিউদাদ রেয়াল ছাড়িয়ে যেতেই মনে হ'লো এখানে লোকে অন্যরকম আছে। ফ্ল্যাণ্ডার্সে কী হচ্ছে না-হচ্ছে সে নিয়ে তারা আদৌ টুঁ শব্দটিও করে না, তারা উৎকর্ণ হ'য়ে আছে সেভিইয়ের দিকে, অনুপস্থিত ছেলেদের খবরের জন্যে উৎসুক, কারু-বা কোনো খুড়ো তার কামারশাল সরিয়ে নিয়ে গেছে কার্তাহেনায়, আর এক মামা দারুণ একটা সরাই খুলেছে লিমায়। কোনো-কোনো গাঁ থেকে সংসারের পাটই চুকিয়ে ফেলেছে আস্ত-আস্ত পরিবার; পাথরকাটিয়েরা আর তাদের মজুররা, অবস্থার ফেরে-পড়া ভদ্রলোক তার ঘোড়া আর দাসদাসী সমেত কেটে পড়েছে। পশ্চিম-ইণ্ডিসী হুয়ান আর তীর্থযাত্রী হুয়ান আরো দ্রুত করলে তাদের পদক্ষেপ, যখন বেগুনের বেগনিলাল আর কুমড়োর তামাটেখয়েরির মধ্যে দেখতে পেলে নারঙ্গের ঝোপগুলো, যাদের মধ্যে গিয়ে ভিড়েছে তরমুজেরও এক খেত। পুনরাবির্ভূত হ'লো শাদা মদের দোকানগুলো, আর নেগ্রো মেয়েরা—ঝলসানো নাশপাতি-রঙের মতো তামাটে চামড়া তাদের, তাদের নিতম্ব বেরিয়ে আছে গির্জের গায়েনদের বসবার জন্যে দেয়াল থেকে বেরিয়ে-আসা তাকের মতো। লোনাজল, আলকাৎরা আর লাক্ষার গন্ধের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বন্দরের ওঠানামার হাঁকডাক হৈ-হৈ। আর যখন সঙ্গে পুঁতিগুলো ব'য়ে আনা নেগ্রোকে নিয়ে দুই হুয়ান এসে পৌঁছুলো কাসা দে লা কোন্ত্রাতাসিওন-এ, দুজনকে দেখে এমন লটকজোড় এমন মানিকজোড় পাজির পাঝাড়া ব'লে মনে হ'লো যে মাল্লাদের

কুমারীমাতাও তাদের তাঁর বেদির সামনে হাঁটুগেড়ে বসতে দেখে ভ্রূকুটি করলেন।

'যেতে দিন এদের, দিব্যজননী,' বললেন সানৃতিয়াগো [সেণ্ট জেমস], জেবেদি আর সালোমির পুত্র ; এই ধরনের পাজি বদমাশের কাছেই শত-শত নূতন নগরীর পত্তনের জন্যে তিনি ঋণী। 'এদের যেতে দিন ; এরা ওখানে গিয়ে আমার কাছে ওদের মানৎ রাখবে।'

আর পতঙ্গদেব বেলজ়েবাব, আগের মতোই সে উদ্ভাবননিপুণ, ছদ্মবেশ প'রে নিলে ছেঁড়া কাঁথায় সাজা এক অন্ধের, মাথায় শিং দুটো ঢেকে রইলো মস্ত এক কালো টুপি, আর যখন সে দেখলে যে বুর্গোসে বৃষ্টি একটু থেমেছে, মেলার একটা গলির এক বেঞ্চির ওপর সে উঠে পড়লো, আর যখন তার লম্বা-লম্বা আঙুল ঘুরে বেড়াতে লাগলো তার ভিহুয়েলার তারের ওপর, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে এক গান ধ'রে দিলে :

স্নতরাং, মহোদয়জনেরা,
সবে আজ হোন উৎফুল্ল,
হঠুক দুঃখ কায়মনেরও,
কেননা কপাল আজ খুললো।
শুনুন, তাহ'লে, তোফা সন্দেশ—
স্বপ্ন ফলবে এক নিমেষে—
কষ্টের থাকবে না কোনো লেশ
সবপেয়েছির ঐ বিদেশে।
গরিব ? কষ্ট খুব ? তাতে কী ?
যত হোক আপদের হামেলা—
ওদেশে নিছক পদপাতে তো
দূরে যাবে যাবতীয় ঝামেলা।
স্বপ্নের দেশে যেতে কী ?, রাজি ?
আস্থন, তাহ'লে, চ'লে এ-ধারে—
একসাথে দশখানা জাহাজই
সেভিইয়ে থেকে যাবে এবারে।

সুযোগ এসেছে, মিছে কে ফিরে
থাকবে কাহিল প'ড়ে দুঃখে ?
লেখান জাহাজে নাম অচিরে,
হেলায় ফেরায় সব সুখ কে ?

ওপরে, ছায়াপথে-ছায়াপথে শুভ্র হ'য়ে ছিলো তারকাখচিত আকাশ

উৎসের দিকে

১

'কী চাও তুমি, বুড়া ?'

বারে-বারে এলো প্রশ্নটা, উঁচু ভারাটার ওপর থেকে। কিন্তু বুড়ো কোনো উত্তর দিলো না। সে এখানে যায়, ওখানে যায়, কোণায়খামচায় খোঁজে, আর এক লম্বা স্বগতোক্তি বেরিয়ে আসতে থাকে তার গলা থেকে—দুর্বোধ্য, একটানা। ছাতের টালিগুলো এর মধ্যেই সরানো হ'য়ে গেছে: আর তাদের পোড়ামাটির কাচের মর্মর পাথরের টুকরোয় তারা ঢেকে ফেলেছে মরা ফুলগাছগুলো। মাথার ওপরে গাঁইতিগুলো স্থাপত্য খসাচ্ছে, চাক-চাক, আর কাঠের পয়োনালী দিয়ে চুন-শুরকির মস্ত মেঘ উড়িয়ে তারা দুমদাম গড়িয়ে নেমে আসছে। আর পর-পর খুলে যাচ্ছে দেয়ালের খাঁজগুলো, অনাবৃত এখন, ঢাকা সরানো—এক সময় কামান-বন্দুক ছোঁড়বার জন্য তাদের বানানো হয়েছিলো, কিন্তু এখন তাদের গুপ্তরহস্য উন্মোচিত। আর দেখা যাচ্ছে চৌকো মতো কিংবা ডিমের ছাঁদে তৈরি মসৃণ-সব ছাত, কারনিশ, পত্রমালা, দেয়ালের গায়ের কারুকাজ; আর দেয়াল থেকে খ'শে-পড়া কাগজ ঝুলছে, যেন কোনো সাপের পরিত্যক্ত খোলশ।

আর এই ভাঙনের দিকে তাকিয়ে আছেন শস্যের দেবী সিয়ারইজ: তিনি দাঁড়িয়ে আছেন পেছনের উঠোনে, চুরমার-ভাঙা কিম্ভূত মূর্তির ফোয়ারার ওপর; তাঁর নাক ভাঙা, বসন বিবর্ণ, ভুট্টার শিরোভূষণ কালিমাময়। ছায়াগুলোকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে রোদের ফলা এসে পৌঁছোয় চৌবাচ্চায়, আর শ্যাওলাঢাকা জলের মধ্যে তাই দেখে ধূসর মাছ হাই তোলে; আকাশের ঔজ্জ্বল্যের পটে মজুর আর রাজ-মিস্ত্রিদের কালো ছায়ামূর্তিগুলোর দিকে গোল-গোল চোখে তাকায় সে, আর ঢ্যাখে তারা ইমারতটির শতাব্দীজোড়া উচ্চতাকে ক্রমেই খাটো ক'রে আনছে। বুড়ো ব'সে পড়েছিলো পাথরমূর্তির তলায়, হাতের ছড়িতে চিবুক ঠেকিয়ে। দেখছিলো বালতিগুলো উঠছে-নামছে, আর দামি-দামি সব টুকরো তাতে ক'রে নামিয়ে আনা হচ্ছে। রাস্তা থেকে নানা ধরনের চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে, আর, মাথার ওপর, পাথরের গায়ে আছড়ে-পড়া ইস্পাতের ঝনঝন শব্দের পটভূমিতে, কপিকলের চাকা বিশ্রী শোর তুলছে নমস্বরে, কর্কশগলার পাখিদের মতো।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো। কারনিশ আর স্তম্ভের ওপরকার ঢাকনা ফাঁকা হ'য়ে

গেলো একে-একে। মইগুলোই শুধু র'য়ে গেলো—পরের দিনের আক্রমণ শুরু করার জন্য প্রস্তুত। হাওয়া হ'য়ে উঠলো সতেজ আর শীতল, এখন যেহেতু ঘাম, টুকরোটাকরা শপথ, দড়ির খশখশ, তেলের বাটির জন্য অক্ষগুলোর আর্তনাদ, আর তেলতেলে শরীরগুলোয় চাপড় মারার শব্দ নেই কোথাও। অন্য-সব জায়গার আগেই সন্ধ্যা নেমে এলো ভেঙে-ফেলা এই ইমারতে। এককালে যেমন সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিগুলোকে ধ'রে ফেলে ওপরে সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভের সার পুরো দৃশ্যটাকে মহিমায় সাজিয়ে দিতো, এখন তাকে ঢেকে ফেললো ছায়ার পরদা। সিয়ারইজ তাঁর ঠোঁট দুটি শক্ত ক'রে বোজালেন। এই প্রথমবার এই ধ্বংসের ভূদৃশ্যের মাঝখানে খোলামেলা ঘরগুলো ঘুমিয়ে পড়বে, জানলাহীন খড়খড়িবিহীন।

তাদের প্রকৃতিদত্ত স্বভাবকে অস্বীকার ক'রে কতগুলো স্তম্ভশীর্ষ চিৎপাত শুয়ে আছে ঘাসে, বাসকগাছের মতো তাদের পাতা, বুঝিয়ে দিচ্ছে তাদের উদ্ভিদ দশা। পারিবারিক মিল দেখে আকৃষ্ট হ'য়ে একটি লতাগাছ তার শুঁড় পাঠিয়ে দিলো তাদের আইঅনীয় সর্পিল অলংকরণের দিকে। যখন রাত্রি নামলো, বাড়িটা মাটির অনেক ঘনিষ্ঠ হ'য়ে এলো। ওপরতলায় এখনও একটা দরজার কাঠামো সটান দাঁড়িয়ে আছে, আর তার হতভম্ব কব্জাগুলো থেকে ঝুলছে চাপ-চাপ অন্ধকার।

২

তারপর বুড়ো নেগ্রো—সে একফোঁটাও নড়েনি—তার ছড়ি দিয়ে নানারকম অদ্ভুত আঁচড় কাটলো হাওয়ায়, তাকে ঘোরালো ঐ পাথরকুচির গোরস্থানের ওপর।

শাদা-কালো মর্মরপাথরের চৌখুপিগুলো সব উড়ে গেলো মেঝেয়, ছেয়ে দিলো মেঝেগুলোকে। লাফিয়ে উঠলো পাথরগুলো, খাপে-খাপে নির্ভুল আটকে গেলো দেয়ালের হাগুলোয়। পেরেক-আঁটা ওয়ালনাটের দরজাগুলো আটকে গেলো কাঠামোয়, গোবরাটে ; স্ক্রুগুলো দ্রুত পেঁচিয়ে ফিরে গেলো কব্জার গর্তে। শুকোনো ফুলবাগানে এলো ফুল ফোটার তাড়া, আর তাদের চাপে টালিগুলো উঠে এলো ওপরে, একে-একে জুড়ে গেলো, পোড়ামাটির গীতল ঘূর্ণিহাওয়া তুলে বৃষ্টির মতো গিয়ে ঝ'রে পড়লো ছাতের কাঠামোয়। বাড়ি উঠলো, আবার আরেকবার অর্জন ক'রে নিলো তার স্বাভাবিক অনুপাত। শস্যের দেবী সিয়ারইজ এখন আর ততটা ধূসর নন। আর ফোয়ারার জলের ঝরঝর হারানো বেগোনিয়াকে আবার ফিরে ডাকলো জীবনের মধ্যে।

সদর দরজার তালার চাবি ঘোরালো বুড়ো, জানলাগুলো খুলতে লাগলো। তার পায়ের শব্দ কেমন ফাঁপা শোনাচ্ছে। যখন যে বাতি জ্বাললো, পারিবারিক চিত্রশালার তৈলচিত্রগুলোর ওপর এক হলদে শিহরন খেলে গেলো। সব বারান্দায় কালো পোশাক পরা লোকজন চাপা গলায় কথা বলছে, চকোলেটের পেয়ালায় ঠুনঠুন বাজছে চামচের ছন্দ।

দোন মারসিয়াল, মারকেস দে কাপেহানিয়াস, শুয়ে আছেন তাঁর মৃত্যুশয্যায়, তাঁর বুকে শোভা পাচ্ছে ঝলমলে সব খেতাব, আর গলন্ত মোমের দাড়িপরা চারটে সরু দীপশিখা পাহারা দিচ্ছে তাঁকে।

৩

আস্তে-আস্তে লম্বা হ'য়ে উঠলো মোমবাতিগুলো, ক্রমশ কম গলতে লাগলো তারা। যখন তারা পুরো আকার ফিরে পেলো, মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী তাদের ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো, বাতিগুলো নিয়ে চ'লে গেলো। সলতেগুলো শাদা হ'য়ে উঠলো, ছুঁড়ে দিলো লাল ফুলকি। অভ্যাগতরা একে-একে বিদায় নিলেন, আর তাঁদের কোচবাক্সগুলো মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে। দোন মারসিয়াল এক অদৃশ্য পিয়ানোর চাবিতে তাঁর আঙুল বোলালেন, তারপর তাঁর চোখ খুললেন।

ছাদের ঢালু বরগার বিশৃঙ্খল স্তূপ জায়গামতো ফিরে গেলো। সব ওষুধের শিশি, কিংখাবের ফিতে, বিছানার পাশে খুলে-রাখা অংসফলকবন্ধনী, ডাগেরো-ছাঁচের ছবি, জাফরির তালপাতা—সব ফিরে এলো আবছায়া থেকে, কুয়াশা থেকে। ডাক্তার যখন পেশাদারি বিমর্ষতায় মাথা নাড়লেন, রোগী অনেক ভালো বোধ করলেন। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে তিনি জেগে উঠলেন পাদ্রে আনাস্-তাসিয়োর কালো-ভুরু-আঁকা দৃষ্টিপাতের মধ্যে। যা শুরু হয়েছিলো তাঁর অনেক পাপের চুলচেরা খুঁটিনাটিভরা স্বীকারোক্তিতে, তা ক্রমে-ক্রমে হ'য়ে উঠলো স্বল্পবাক, বেদনাময় আর সব-এড়িয়ে-যাওয়ার নানা কৌশল। সত্যি-বলতে, তাঁর জীবনের মধ্যে নাক গলাবার কী অধিকার আছে এই খ্রিষ্টান সাধুর? হঠাৎ দোন মারসিয়াল নিজেকে আবিষ্কার করলেন ঘরের মাঝখানে। কোনো ভার নেই আর মাথায়; বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কিংখাবের গুঞ্জনিটায় যে-নগ্ন নারীটি শুয়েছিলো সে তার ঘাঘরা কাঁচুলি খুঁজতে শুরু ক'রে দিলো, আর একটু পরেই সে চ'লে গেলো রেশমের খশখশ আর সুগন্ধের ঝাপটা ছড়িয়ে। নিচের

তলায় বন্ধ কোচবাক্সটার পেতলের ফলকে সাজানো আসনে প'ড়ে ছিলো সোনার মোহরে ভরা একটা থাম।

দোন মারসিয়াল কেমন যেন সুস্থ বোধ করছেন না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় রুমাল বাঁধতে-বাঁধতে তিনি দেখতে পেলেন যে তাঁর মুখ রক্তচাপে কেমন পীড়িত দেখাচ্ছে। নিচের তলায় নেমে এলেন তিনি, তাঁর পড়ার ঘরে, যেখানে উকিল-মোক্তাররা অপেক্ষা করছিলো তাঁরই জন্য, বাড়িটা নিলামে বিক্রি করার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য। তাঁর সব চেষ্টাই বিফল হয়েছে। যে সবচেয়ে বেশি দাম হাঁকবে, তারই কাছে চ'লে যাবে তাঁর সব সম্পত্তি, টেবিলের গায়ে হাতুড়ির বাড়ি পড়ার ছন্দে। তিনি মাথা হেলিয়ে সম্ভাষণ জানালেন ; তারা তাঁকে আর বিরক্ত করলো না। লিখিত বাক্য কেমন রহস্যময়, ভাবলেন তিনি—ঐ কালো সুতোগুলো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে জাল বুনে চ'লে গেছে, তাড়া-তাড়া লম্বা কাগজ ভ'রে গিয়েছে হিশেবপত্রের জাফরিতে ; বুনে-বুনে গেছে চুক্তি, মোক্তারনামা, তারিখ, জমির বিবরণ, গাছপালা, পাথর ; আইন যদি অনুমোদন না-করে তাহ'লে লোকের পায়ে পেঁচিয়ে গিয়ে তাকে বেঁধে ফেলার জন্য দোয়াত থেকে বেরিয়ে আসবে কঠিন তন্তু ; গলায় ফাঁস বেঁধেছে এই সুতো, যেই স্বাধীন কথার প্রথম বুলি শোনা যাবে অমনি এঁটে বসবে। নিজের স্বাক্ষরই তাঁকে ফাঁদে ফেলেছে, তাঁর সঙ্গে বেইমানি করেছে ; দলিল-দস্তাবেজের গোলকধাঁধায় টেনে নিয়ে এসেছে তাঁকে। এইভাবে ফাঁদে প'ড়ে রক্তমাংসের মানুষ রূপান্তরিত হয়েছে কাগজের মানুষে।

সকাল হ'লো। খাবারঘরের ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে বাজলো সন্ধে ছ-টা।

৪

চিরবর্ধমান অনুতাপের ছায়ায়-ছায়ায় শোকের মাসগুলো কেটে গেলো। প্রথমে মনে হয়েছিলো ঘরের মধ্যে কোনো স্ত্রীলোক নিয়ে আসাটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। কিন্তু কোনো নতুন শরীর যেভাবে কামনা চেতিয়ে তোলে, একটু-একটু ক'রে তা যখন ক্রমবর্ধমান নীতিবোধের কাছে হার মেনে গেলো, তার অবসান হ'লো নিদারুণ আত্মনিগ্রহে। এক রাত্রে দোন মারসিয়াল নিজের গায়ে রক্তপাত ক'রে চাবুক মারলেন নিজেকে—শুধু তীব্রতম কামনা অনুভব করার জন্য, যদিও তার পরমায়ু হ'লো ক্ষণস্থায়ী। এই সময়ে আলমেনদারেসের তীর থেকে কোচবাক্সে

ক'রে বেড়িয়ে এক বিকেলে মারকেসা বাড়ি ফিরলেন। তাঁর কোচবাক্সে জোতা ঘোড়াগুলোর বালামচি শুধু তাদের নিজেদের ঘামেই ভিজে গিয়েছিলো। অথচ তবু তারা বাকি দিনটা তাদের আস্তাবলের কাঠের দেয়ালে লাথি মেরে-মেরে কাটালো, যেন নিচু গুরুভার মেঘের নিঃসাড় স্তব্ধতায় তারা খেপে উঠেছে।

সন্ধেবেলায় মার্‌কেসার স্নানঘরে একটা জলভরা কলস ভেঙে গেলো। তারপরে এলো বাসন্তী বৃষ্টি—হ্রদ ছাপিয়ে উপচে পড়লো জল। আর দো-আঁশলা ব'লে, বিছানার নিচে কবুতর পুষতো ব'লে, সাজা-পাওয়া নেগ্রো বুড়িটি উঠোনে ঘুরে বেড়ালো এলোমেলো, আর আপন মনেই বিড়বিড় করলো: 'ওরে মেয়ে, নদীকে কখনো বিশ্বাস করিস্‌নি; কখনো তাকে বিশ্বাস করিস্‌নি যা সবুজ আর ব'য়ে যায়!' এমন-কোনো দিন গেলো না যেদিন জল তার উপস্থিতি জানায়নি। উপনিবেশের রাজ্যপাল যদি বার্ষিক উৎসবে নাচের ব্যবস্থা করেন, আর সেখানে যদি পারী থেকে আনা কোনো পোশাকে পেয়ালা উলটে পড়ে, শেষটায় কিন্তু ততটুকুই হ'লো জলের এই উপস্থিতি!

অনেক আত্মীয়স্বজনের পুনরাবির্ভাব হ'লো। ফিরে এলো অনেক পুরোনো বন্ধু! ঝলমলে আলোয় চ্ছুরিত হ'য়ে উঠলো বসবার ঘরের শামাদান আর বাতি-ঝাড়। দালানের বাইরের দেয়ালের চিড়গুলো বুজে যাচ্ছে, এক-এক ক'রে। পিয়ানো হ'য়ে উঠলো ক্লাভিকর্ড। তালগাছ হারালো তার গোটা কয়েক জড়ুল। লতাগাছ ছেড়ে এলো ওপরতলার কারনিশ। শস্যের দেবী সিয়ারইজের চোখের তলার কালো দাগ আর নেই, স্তম্ভশীর্ষগুলো দেখালো যেন তারা সদ্য-উৎকীর্ণ। মারসিয়াল এখন দারুণ উৎসাহী আর আকুল, আর প্রায়ই অপরাহ্ণ কাটে মার্‌কেসার আলিঙ্গনে। চোখের কোলের কোঁচকানো চামড়া, ভ্রূকুটি আর আর গালের চর্বি উধাও হ'লো, আর চামড়া হ'য়ে উঠলো চিক্কণ ছিমছাম। একদিন নতুন রঙের ভিজে গন্ধ বাড়ি ভ'রে দিলো।

৫

তাদের লজ্জা তাদের ব্রীড়া ছিলো বাস্তব! নিত্য রাত্রিবেলা পাতাগুলো আরো-একটু খুলে যায় আর ঘরের অস্পষ্ট দূর কোণায় ঘাঘরা ঝ'রে পড়ে, খুলে দেখায় আরো-কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে লেসের অন্তর্বাসের। তারপর মারসিয়াল ফুঁ দিয়ে বাতি নেভায়। অন্ধকারে শোনা যায় শুধু মারসিয়ালেরই কণ্ঠস্বর।

ঘোড়ার গাড়িগুলোর এক মস্ত শোভাযাত্রা ক'রে তারা বেরিয়েছিলো আখের আবাদের উদ্দেশে : রোদে ঝলসে উঠেছিলো ঘোড়াগুলোর পিঠ, আর জরি-দেয়া পালিশ-করা চামড়ার জিন। কিন্তু বাসন্তী ফুলেছাওয়া রক্তিম তোরণপথে বাড়ি পৌঁছুতে গিয়ে তারা আবিষ্কার করলে যে পরস্পরকে তারা প্রায় চেনেই না। ও-ডি কোলনের সুবাস, জাভাফুলের নির্যাসমেশানো স্নানের জল, শিথিল কবরী, সিন্দুক থেকে বার ক'রে টালির ঠাণ্ডা মেঝেয় পাতা শুজনি—এইসব নানারকম সুগন্ধেভরা দিনগুলোর প্রমোদ জোগাবার জন্য মারসিয়াল স্থানীয় নেগ্রো নাচিয়ে ও বাজনদারদের অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছিলো। হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় আখের রসের তাপ আর গির্জের কুমারী পূজার ঘণ্টার শব্দ। অকাল বৃষ্টির সূচনা ক'রে শকুন উড়ে বেড়ায় নিচু আর টালিগুলো এতই শুকনো যে প্রথম বড়ো-বড়ো প্রতিধ্বনি-তোলা ফোঁটাগুলো নিমেষে শুষে ফ্যালে। অনভিজ্ঞ আলিঙ্গনে একটি সকাল বিলম্বিত হবার পর তারা যুগলে ফিরে এলো শহরে—তাদের ভুলবোঝা-বুঝি উধাও আর ক্ষতগুলো সেরে-যাওয়া। মার্কেসা তার ভ্রমণবেশ বদ্‌লে পরলো বিয়ের পোশাক, আর প্রথামতো দম্পতি গির্জেয় গেলো তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেতে। আত্মীয়বন্ধুরা ফিরে পেলো তাদের উপহার আর জমকালোভাবে সেজে তারা সবাই বাড়ি ফিরে এলো পেতলের ঝমঝম আওয়াজের মধ্যে। কয়েকবার মারিয়া দে লা মেরসেদেসের কাছে গিয়েছিলো মারসিয়াল; শেষে একদিন স্যাকরার কাছে নিয়ে-যাওয়া হ'লো আংটিগুলো, তাদের উৎকীর্ণ লিপিগুলো তুলো ফেলবার জন্য। মারসিয়ালের কাছে এটা নবজীবনের সূচনা। উঁচু জাফরি-কাটা বাড়িটায় শস্যের দেবী সিয়ারইজের বদলে এক ইতালীয় ভিনাসমূর্তি বসানো হ'লো, আর ফোয়ারার কিম্ভূতেরা চোখে প্রায় পড়েই না এমনভাবে, আরো-তীক্ষ্ণ-ভাবে, কীর্ণ হ'য়ে উঠলো, কারণ উষা যখন আকাশে রং মাখালো বাতি তখনও জ্বলছে।

৬

একরাত্রে, বিস্তর মদ্যপান করার ফলে (এবং তার বন্ধুরা পেছনে যে বাসি তামাকের গন্ধ আর ধোঁয়া রেখে গিয়েছিলো তাতে) বিষম পীড়িত বোধ ক'রে মারসিয়াল এক উদ্ভট অনুভূতি অনুভব করলে : যেন বাড়ির সব ঘড়িগুলোয় প্রথমে বাজলো পাঁচটা, তারপর সাড়ে-চারটে, তারপর চারটে, তারপর সাড়ে-তিনটে...

যেন অস্পষ্টভাবে সে হঠাৎ অন্যান্য সম্ভাবনা সম্বন্ধে কেমন সচেতন হ'য়ে উঠেছে। ঠিক যেমন, অনিদ্রায় অবসন্ন, কেউ বিশ্বাস ক'রে বসেছে যে সে ছাতের ওপর হাঁটতে পারে, মেঝে পরিণত হ'য়ে গেছে ছাতে, আশবাবগুলো কড়িবরগায় দৃঢ়ভাবে আটকানো। শুধু পলায়মান এক অস্পষ্ট ভাবনা—তার মনে তা তিলমাত্র রেখাপাত করেনি, কারণ তখনও সে ধ্যান করার স্পৃহা অনুভব করতো না।

আর যেদিন সে নাবালকত্ব প্রাপ্ত হ'লো, এক চমৎকার সান্ধ্য আসরের আয়োজন করা হয়েছিলো জলশাঘরে। তার স্বাক্ষর যে আর বৈধ ও আইনসংগত নয়, এটা তার কাছে পরম উপভোগ্য ঠেকলো, ঐ সব কীটদষ্ট নিবন্ধ গ্রন্থ আর দলিল-দস্তাবেজ এখন চিরতরে তার জগৎ থেকে অদৃশ্য হবে। সে এমন-এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যখন বিচারশালাকে ভয় পাবার আর কোনো প্রয়োজনই নেই তার, কেননা আইনের কাছে এখন তার শারীরিক অস্তিত্ব উপেক্ষিত। বহুমূল্য সব মদিরাসেবন ক'রে কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে যাবার পর তরুণেরা দেয়াল থেকে নামিয়ে নিলো মুক্তা, দিব্যচিহ্ন ও সর্পশোভিত এক গিটার। কে-একজন সেই ঘড়িটার দম দিয়ে দিলো যাতে বাজে রাখালিয়া আর স্কটিশ গাথার সুর। আরেকজন ফুঁ দিলে কাচের বাক্সে আরানহুয়েস-থেকে-আনা বাঁশিটির পাশে লাল উটলোমের উপাধানে শোয়ানো মৃগয়ার শিঙায়। অনেকটা সাহস সঞ্চয় ক'রে মারসিয়াল্ প্রেম করছিলো সেনিওরা দে কাম্পোফ্লোরিদার সঙ্গে—সেও এই হট্টগোলে যোগ দিলে, আর চেষ্টা করলে উদারার বেসুরো আওয়াজের মধ্যেই পিয়ানোতে ত্রিপিলিত্রাপালার সুর তুলতে। তারপরে সবাই কুচকাওয়াজ ক'রে চললো চিলেকোঠায়, যেই মনে প'ড়ে গেলো সে তার চলটা-ওঠা কড়ি-বরগার তলায় কাপেহানিয়াস পরিবারের যাবতীয় পোশাক-আশাক সঞ্চয় ক'রে রাখা আছে। দরবারের বেশ, রাজদূতের তরবারি, কতগুলো তুলোভরা সামরিক কুর্তা, গির্জার কোনো মান্যগণ্যর কামিজ, ভাঁজে-ভাঁজে ছ্যাঁতা পড়ার দাগসমেত বুটিদার কতগুলো লম্বা আলখাল্লা—সব কর্পূরছড়ানো তাকে জড়ো ক'রে রাখা। জলজলে লাল ফিতে, হলদে ঢোলা শায়া, বিবর্ণ উর্দি আর মখমলে ফুলের রঙে চিলেকোঠার ছায়া বিচিত্র হ'য়ে উঠেছিলো। একবার এক কারনিভালের মুখোশপরা মজলিশের জন্য তৈরি করা হয়েছিলো এক জমকালো রঙবেরঙের পোশাক আর পমপম বসানো কেশজাল—তাকে করতালি দিয়ে সম্ভাষণ জানানো হ'লো। সেনিওরা দে কাম্পোফ্লোরিদা তার লোধ্ররেণু মাখা কাঁধ ঢাকলো ক্রেয়োল মেয়ের গায়ের রঙের এক শালে—কয়েক পুরুষ আগে মারসিয়ালের বংশের কোনো স্ত্রীলোক এক গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক

ক্লারেসের মঠের কোনো ধনাঢ্য মোহান্তর কামনাকে পুনর্বার উসকে তোলার জন্ত তা গায়ে দিয়েছিলো।

সাজগোজ শেষ হ'তেই তরুণেরা সবাই জলশাঘরে ফিরে এলো। মারসিয়াল পরেছিলো এক নগরপালের টুপি, ছড়ি দিয়ে মেঝে ঠুকলো সে তিনবার, আর ঘোষণা করলো যে তারা ভাল্জ দিয়ে নাচ শুরু করবে—যে-নাচটা ছিলো মায়েদের বিষম অপছন্দ, কারণ মেয়েদের পক্ষে তা ঠিক শোভন নয়, কারণ এই নাচে মেয়েরা পুরুষদের কোমর জড়িয়ে ধরতে দেয়, পুরুষদের হাত থাকে তাদের অন্তর্বাসের ওপর, বিশেষত পারীর হালফ্যাশন অনুযায়ী যখন এই অন্তর্বাস বানানো। যত দাসী, সহিস আর বাবুর্চিদের ভিড় জ'মে গেলো সব দরজায়—বাহিরবাটী আর শ্বাসরোধী মণিকোঠা থেকে এই হৈ-হৈ প্রমোদ উপভোগ করতে এসেছে। পরে খেলা হ'লো কানামাছি আর লুকোচুরি। সেনিওরা দে কম্পোস্লোরিদার সঙ্গে এক চীনাংশুকের পরদার আড়ালে লুকিয়ে মারসিয়াল তার গণ্ডদেশে চুম্বন করলে, আর বিনিময়ে পেলে এক সুবাসিত রুমাল, যার ব্রাসেল্স লেসে তখনও ছিলো তার বুকখোলা জামার তলার মধুর উত্তাপের স্পর্শ। আর যখন তরুণীরা সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে সিন্ধুতীরের পটে গাঢ়ধূসর ছায়া-ছায়া কেল্লা আর দুর্গগুলোয় ফিরে গেলো, তরুণেরা গেলো নৃত্যশালায়, যেখানে মুলাটো স্ত্রীলোকরা—ভারি-ভারি বালা আর বাজুবন্ধ প'রে—নিতম্ব দুলিয়ে নৃত্য করলো, এমনকী গুয়ারাচার উগ্র তালের নাচেও একবারও যাদের উঁচু হিলের জুতো পা থেকে খুলে যায়নি! আর সময়টা যেহেতু ছিলো কারনিভালকালীন, আরারা ত্রিচক্ষু বাদ্যদলের সভ্যরা উঠোনে ডালিম গাছের নিচে দেয়ালের আড়ালে বসানো পিয়ানোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের বজ্রগম্ভীর বিষাদ তুলতে লাগলো। টেবিলের আর টুলের ওপর দাঁড়িয়ে মারসিয়াল আর তার বন্ধুরা এক পাকাচুলের নেগ্রো স্ত্রীলোকের নাচের ছন্দ আর লাবণ্যকে প্রবল করতালি দিয়ে সম্ভাষণ করলে—যে তার শ্রী আর সৌন্দর্য ফিরে পেলো নাচের মধ্যে, হ'য়ে উঠলো কাঙ্ক্ষিতা বাঞ্ছিতা আরাধ্যা, আর যখন সে কাঁধ ফিরিয়ে তাকালে, তার চোখে ফুটে উঠলো অহমিকায় ভরা উপেক্ষার দৃষ্টি।

৭

পারিবারিক খাতাঞ্চি ও দেওয়ান দোন আবুন্দিয়োর যাতায়াত এখন খুব ঘন-ঘন। গম্ভীর মুখে তিনি মারসিয়ালের বিছানার পাশে বসেন, আর হাত থেকে আকানা কাঠের ছড়িটা সশব্দে মেঝেয় প'ড়ে যেতে দেন, যাতে সে ঠিক সময়ে জেগে উঠতে পারে। চোখ খুলে মারসিয়াল দেখতে পায় খুশকিভরা আলপাকার ফ্রককোট, খাজনা আর ভাড়া আদায় ক'রে-ক'রে আস্তিনগুলো ঝকঝক করছে। অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্যে ইতি দেবার জন্য শেষটায় একমাত্র যা করণীয় ছিলো তা হ'লো উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করা। এই সময়েই মারসিয়াল সান্ কারলোসের রাজ-বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে চেয়েছিলো।

পরীক্ষাগুলোয় মোটামুটি কৃতিত্ব দেখাবার পর সে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে যেতো—কিন্তু যত দিন গেলো, শিক্ষকের ব্যাখ্যাগুলো তার কাছে ততই অবোধ্য হ'য়ে উঠতে লাগলো। তার ভাবনার জগৎ ক্রমেই ফাঁকা হ'য়ে যাচ্ছে। এককালে যা ছিলো খাটো স্কার্ট ও আঁটো কুর্তা, পরচুলা ও গলবন্ধ, আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের সাধারণ সমাবেশ, এখন তাকে মনে হয় জাদুঘরের মোমের পুতুলের মতো নিষ্প্রাণ। মারসিয়াল প্রথাপদ্ধতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক বিশ্লেষণে আত্ম-নিয়োগ ক'রে নিজেকে তুষ্ট করার চেষ্টা করলে—পুঁথিপত্রে যা লেখা আছে তাকেই সে বেদবাক্য ব'লে গ্রহণ করলে। তার প্রাণিবিজ্ঞানের বইতে এন্‌গ্রেভ-করা ছবির তলায় এইসব শব্দ শোভা পেতো: 'সিংহ', 'উটপাখি', 'তিমিমাছ', 'জাগুয়ার'। ঠিক যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন-ভিন্ন বিশ্লেষণের ঘনসন্নিবিষ্ট কালো অক্ষরের একঘেয়ে ও বিরক্তিকর বয়ানের ওপরে এই সব শিরোনাম শোভা পায়: 'আরিস্ততল', 'সন্ত টমাস', 'বেকন', 'দ্যকার্ৎ'! একটু-একটু ক'রে মারসিয়াল এ-সব জিনিশ শেখবার চেষ্টা ত্যাগ করলে, আর অনুভব করলে যেন একটা ভারি বোঝা নেমে গেলো। তার মন হ'য়ে উঠলো প্রফুল্ল আর সজীব, শুধু স্বজ্ঞা তাকে সবকিছুর অর্থ ব'লে দেয়। কেন ত্রিশিরা কাচের কথা ভাববো, যখন শীতের দিনের সূর্যালোক বন্দরের দুর্গের গায়ে ঝলসে প'ড়ে সব অনুপুঙ্খ তন্নতন্ন ফুটিয়ে তোলে? গাছ-থেকে-পড়া কোনো আপেল প্রলুব্ধ করে শুধু তাতে কামড় বসাতে—এইই তো সব। স্নানের চৌবাচ্চায় এক পা নামানোর অর্থ স্নানের চৌবাচ্চায় এক পা নামানো। যেদিন সে রাজবিদ্যালয় ছেড়ে এলো, সেদিনই সে তার পুঁথিপত্রের কথা বিস্মৃত হয়েছে।

সূর্যঘড়ির কাঁটা আবার এখন ফিরে এসেছে ভূতপ্রেতের জগতে; বর্ণালি এখন অপচ্ছায়ার অপর নাম; উদজার হ'লো এক মেরুদণ্ডী জন্তু।

নগরপ্রাচীরের নীল দ্বারগুলির অন্তরাল থেকে যে-স্ত্রীলোকেরা ফিশফিশ কথা বলে তাদের কাছ থেকে সে একাধিকবার দ্রুতবেগে পালিয়েছে অস্বস্তি নিয়ে। তাদের একজনের স্মৃতি—সে পায়ে দিতো সূ'চিকাজ-করা চটি, কানে পরতো মধুর তুলসীপাতার গুচ্ছ—তাকে তপ্ত সন্ধ্যাগুলিতে দন্তশূলের মতো অনুসরণ করে। কিন্তু একদিন তার গির্জার পুরোহিত, যাঁর কাছে সে সব স্বীকার করেছিলো, এমন রুষ্ট ও ভীতিপ্রদ উক্তি করলেন যে তার সর্বাঙ্গ ভয়ে শিহরিত হ'লো, চোখ ভ'রে উঠলো অশ্রুতে। শেষবারের মতো সে ঐ নারকীয় গুঞ্জনির তলায় নিজেকে আছড়ে ফেললো, তারপর চিরতরে ত্যাগ করলো ঐ অস্পৃশ্য পথগুলিতে যাতায়াত করার প্রলোভন। কিন্তু শানবাঁধানো পথের একটি বিশেষ ফাটলের প্রতি সে পিঠ ফিরিয়েছিলো তবু; যখন নতমুখে হাঁটছিলো এসেছিলো সংকেত—যা তাকে আহ্বান করেছিলো একবার ফিরে সেই সুগন্ধি দেহলি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে; আর শেষ মুহূর্তের এই চিত্তদৌর্বল্য তাকে বাড়ি পাঠালো ক্রুদ্ধ ও অস্থির।

এখন সে চলেছে এক আত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে, আর এই সংকটের মধ্যে সব ধর্মপরায়ণ মূর্তি ও চিত্রকল্পের ভিড়: ঈস্টারের মেষপাল, চৈনিক বনকপোত, আশমানি বেশে শোভিতা কুমারীগণ, কাগজে তৈরি স্বর্ণতারকা, তিন রাজর্ষি, মরালপাখামেলা দেবদূত, সেই গাধা, সেই ষাঁড়, আর এক ভয়াবহ সন্ত দেনিস, যাঁর কাঁধ বিপুল ও প্রশস্ত, যিনি তার কাছে আবির্ভূত হন স্বপ্নে, আর সে বিচরণ ক'রে দ্বিধাগ্রস্ত, ইতস্তত, যেন কোনো হারাধনের সন্ধানে সে বদ্ধপরিকর। যখন সে বিভ্রমভরে বিছানায় ঢোকে, মারসিয়াল মাঝে-মাঝে জেগে ওঠে সাতঙ্কে, হাত বাড়িয়ে দেয় তার রৌপ্য জপমালার দিকে। বাতির শিখাগুলি তাদের তৈলপাত্র থেকে দিব্যমূর্তিগুলির ওপর দুঃখিত আলো ফ্যালে যেই মূর্তিগুলির বর্ণচ্ছটা পুনর্বার তাদের কাছে ফিরে আসে।

৮

আশবাবগুলো ক্রমেই বড়ো হইয়া উঠিতেছে। খাবারটেবিলে কনুই ভর দেয়া তার পক্ষে দিনে-দিনে বেশ কঠিন হইয়া উঠিল। তাদের বাঁকা কারনিশওলা কাবার্ডের সামনেটা ক্রমেই কেমন চওড়া হইয়া যাইতেছে। সিঁড়ির মূরেরা তাদের

মশালগুলো তলদেশে পার্শ্বস্থ হাতলগুলির কাছাকাছি আনিয়া ফেলিয়া তাদের অবয়ব উর্ধ্বে প্রসারিত করিয়া দেয়। আরামকেদারাগুলো আরো গভীর হইয়া উঠিল; দোলকেদারাগুলো একটুতেই উলটাইয়া পড়ে। মর্মরের আংটা-দেয়া স্নানশয্যায় শুইবার সময় এখন আর তার হাঁটু ভাঁজ করিবার প্রয়োজন পড়ে না।

একদিন সকালে মারসিয়াল একটি অশ্লীল কেতাব পড়িতে-পড়িতে হঠাৎ কাঠের বাক্সে ঘুমন্ত শিশার সেনাবাহিনীকে লইয়া খেলা করিবার এক উগ্র তাড়া অনুভব করিল। স্নানকক্ষের চৌবাচ্চার নিচে গুপ্ত স্থানটিতে বইটি লুকাইয়া রাখিয়া মারসিয়াল দেরাজ খুলিল—দেরাজের গায়ে মাকড়শা জাল বুনিয়াছে। এত-বড়ো সেনাবাহিনীর পক্ষে পড়ার টেবিলটি তার কাছে বড্ড-ছোটো ঠেকিল, অতএব মারসিয়াল মেঝেয় বসিয়া তার বন্দুকধারী পদাতিকদের আটটি সারিতে সাজাইল। তারপর আসিল উচ্চপদস্থ অশ্বারোহী সেনাগণ, আর তাদের ঘেরিয়া দাঁড়াইল কৃষ্ণাঙ্গ অধীনেরা; আর পিছনে রহিল গোলন্দাজ বাহিনী—তাদের কামান, কামানঠাশা দাঁড় আর গোলাবারুদ সমেত। আর সব পিছনে আসিল বাজনদারেরা, তাদের বাঁশি মাদল আর বড়ো ঢাক সমেত। বিশেষ স্প্রিং দিয়া গোলাগুলো আটকানো যায়—অতএব কাচের মারবেলগুলিকে পাঁচ-ছ হাত দূর পর্যন্ত ছোঁড়া সম্ভব।

গুড়ুম !···গুড়ুম !···গুড়ুম !···

চিৎপাত উলটাইয়া পড়িল ঘোড়াগুলো, চিৎপটাং পড়িল ঝাণ্ডাবাহকেরা, সশব্দে পড়িল বাজনদারেরা। নেগ্রো ভৃত্য এলিগিয়োকে আসিয়া তিনবার তাকে ডাকিতে হইল—যার পর সে হাত-মুখ ধুইয়া খাবার ঘরের মধ্যে অবতরণ করিতে রাজি হইল।

সেদিনের পর হইতে মারসিয়াল টালিবসানো মেঝেয় বসাটা অভ্যাসে পরিণত করিল। যখন এভাবে বসার সুখসুবিধাগুলো তার বোধগম্য হইল তখন সে এই কথা এতদিন কেন ভাবে নাই তাই ভাবিয়া অবাক। মখমলের তাকিয়ার জন্য বড়োদের অনুরাগ বিস্ময়কর—কেননা এই জন্যই তো তারা এত ঘামিয়া ওঠে। বয়স্কদের কারু-কারু গায়ে কাগজকালির গন্ধ—যেমন দোন আবুন্দিয়োর—কেননা তারা এখনও আবিষ্কার করে নাই বছরের সব ঋতুতে মেঝেয় সটান শুইয়া পড়াটা কত আরামদায়ক শীতল। কেবল মেঝে হইতেই ঘরের সব কোণাখামচি ও সব দৃশ্য পুরাপুরি আঁচ করা যায়। কাঠের গায়ে কী সুন্দর দানা, কীটপতঙ্গের রহস্যময় আঁকাবাঁকা পথ আর ছায়াঢাকা কোণ, যাহা দাঁড়াইয়া কখনোই দেখা যায় না।

যখন বৃষ্টি পড়িল, মারসিয়াল ক্লাভিকর্ডের তলায় গিয়া লুকাইল। বজ্রের প্রতিটি করতালি এই বাজনার বাষ্পে শিহর তুলিল, সব স্বরগুলো গান করিয়া উঠিল। আকাশ হইতে পড়িল বিদ্যুতের ঝলসিত বল্লম, এক প্লাবনতোলা তিনতালের ঝমঝম তৈরি করিয়া—অরগান, পাইনের মধ্যকার হাওয়া, আর ঝিঁঝি পোকার ম্যানডোলিন।

৯

সেদিন সকালে তাহারা তাহাকে তাহার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সে শুনিয়াছিল বাড়িময় ফিশফিশ স্বর, আর মধ্যাহ্নভোজের জন্য যে-খাবার তাহারা আনিয়া দিয়াছিল সপ্তাহের সাধারণ দিনের পক্ষে তাহা ছিল অতীব উপাদেয়। আলামেদার ময়রার কাছ হইতে আনা ছ-টি মিষ্টি ছিল সবশুদ্ধ, যেকালে এমনকী রবিবারে খ্রিষ্টযাগের পরে তাহার জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র দুটি। যতক্ষণ-না এক ক্রম-বর্ধমান বিজ্‌বিজ ধ্বনি দরজার তলদেশ দিয়া আসিয়া তাহাকে খড়খড়ি তুলিয়া তাকাইতে বাধ্য করিল—এক ভ্রমণপুস্তকের এনগ্রেভ-করা ছবির দিকে তাকাইয়া সে নিজেকে আমোদ দিতেছিল—পিতলের হাতলযুক্ত এক শবাধার বহন করিয়া একদল লোকের আবির্ভাব হইতেছে—তাহাদের সর্বাঙ্গ কালো পরিচ্ছদে মোড়া। সে অশ্রুতে প্রায় ফাটিয়া পড়িবে, এমন সময়ে তাহার ঘরে ভৃত্য মেলকোর আসিয়া উপস্থিত; মেঝের উপর তাহার বুটজুতা মচমচ আওয়াজ তুলিতেছে, আর তাহার দন্তপঙ্‌ক্তি মৃদু হাস্যে ঝলসিত হইয়া উঠিতেছে। তাহারা শতরঞ্জ খেলায় মনো-নিবেশ করিল। মেলকোর হইল অশ্বারোহী বীরপুরুষ, সে রাজা। মেঝেয় টালি-গুলোকে শতরঞ্জ খেলার ছক বানাইয়া সে এক খোপ হইতে অন্য খোপে যায়, কিন্তু মেলকোরকে একঘর লাফাইয়া আড়াআড়ি দুই ঘর ছুটিতে হয় অথবা দুইঘর ডিঙাইয়া একঘর লাফাইতে হয়। খেলা চলিল সন্ধ্যার পর পর্যন্ত, তারপর এক সময় অগ্নিনির্বাপক বাহিনী গেল বিপদসংকেত ঘণ্টি বাজাইয়া।

সে উঠিয়া পড়িয়া তাহার পিতার হস্ত চুম্বন করিতে গেল—তিনি, পীড়িত, শয়নকক্ষে তাঁহার বিছানায় শুইয়াছিলেন। মার্কিস অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিতে-ছিলেন, পুত্রের সহিত তিনি তাঁহার স্বাভাবিক গুরুগম্ভীর ও উপদেশাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলিলেন। তাহার 'হ্যাঁ, বাবা,' আর 'না, বাবা' প্রশ্নের জপমালার মধ্যে চমৎকার খাপ খাইয়া গেল—যেন খ্রিষ্টযাগের সময় কোনো দীক্ষিত সাড়া দিতেছে।

মারসিয়াল মার্‌কিসকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত, কিন্তু তাহার কারণ কী তাহা কেহ আন্দাজও করিতে পারিত না। সে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, কারণ তিনি দীর্ঘকায়, এবং যখন তিনি কোনো বলনৃত্যের আসরে যাইতেন তাঁহার বক্ষোদেশে নানাবিধ ভূষণ ঝলমল করিত; সমরবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিশাবে তিনি সোনালি বিনুনি পরিতেন, কোমরে ঝুলিত তরবারি—আর ইহা তাহাকে ঈর্ষাতুর করিয়া তুলিত; কারণ একবার বড়োদিনের সময় তিনি বাজি ধরিয়া কাগজি বাদাম আর কিশমিশ ঠাশা একটি আস্ত তুর্কিমোরগ খাইয়াছিলেন; কারণ একবার তিনি এক মুলাটো রমণীকে পাঁজাকোলা বহন করিয়া নিজের ঘরে লইয়া আসিয়াছিলেন—সে গোল চত্বরে ঝাঁট দিতেছিল—সন্দেহ নাই যে তাহাকে চাবকানোই ছিল উদ্দেশ্য; পরদার আড়ালে লুক্কায়িত মারসিয়াল দেখিয়াছিল একটু পরেই মুলাটো-রমণী অশ্রুপাত করিতে-করিতে বাহির হইয়া আসিল, তাহার বসন খুলিয়া গিয়াছিল; আর মারসিয়াল তাহাকে শাস্তি পাইতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইয়াছিল, কেননা এই রমণীই সর্বদা মিষ্টি আচারের বোয়মগুলি তাকে তুলিয়া রাখিবার আগে সব সাফা করিয়া দিত।

তাহার পিতা যুগপৎ ভয়াবহ ও মহানুভব; এবং এক ঈশ্বর ছাড়া তাঁহাকেই সর্বাধিক ভালোবাসা ছিল তাহার কর্তব্য। মারসিয়ালের কাছে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের অপেক্ষাও অধিক ঈশ্বরসদৃশ, কারণ তাঁহার উপহার ও পারিতোষিক ছিল বাস্তব, স্পর্শসহ, প্রাত্যহিক। তবু সে স্বর্গস্থিত ঈশ্বরকেই বেশি পছন্দ করিত, কারণ তিনি বাগাড়ম্বরের সহিত ততটা বিঘ্নব্যাঘাত সৃষ্টি করেন না।

১০

আশবাবপত্র যখন আরো-একটু লম্বা হইল, এবং মারসিয়াল যখন সর্বাপেক্ষা ভালো করিয়া জানিল খাট বা সিন্দুকের তলায় কী আছে, তখন তাহার একটি মস্ত গুপ্ত কথা ছিল: বাড়ির ভৃত্য মেলকোর তাহার সঙ্গে না-থাকিলে জীবনের কোনো আকর্ষণই তাহার থাকে না। না ভগবান, না তাহার বাবা, না কর্পুস ক্রিস্টি শোভা-যাত্রার স্বর্ণখচিত পুরোহিত—মেলকোরের মতো এত আপন এবং জরুরি আর কেহ নয়।

অনেক, অনেক দূরের দেশ হইতে আসিয়াছে মেলকোর। বিজিত রাজবংশের সে সন্তান। তাহার দেশে আছে মাতঙ্গ ও জলহস্তি, ব্যাঘ্র ও জিরাফ, আর সেখানে

কাগজপত্র ঠাশা অন্ধকার ঘরে দোন আবুন্দিয়োর মতো লোকে কাজ করে না। পশুদের বুদ্ধিবলে পরাস্ত করিয়াই তাহারা জীবন ধারণ করে। তাহাদের একজন একবার এক অতিকায় কুমিরকে নীল হ্রদ হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিল: বারোটা ঝলশাইয়া রাখা হাঁস পর-পর সে এক বৃহৎ বঁড়শিতে ঠাশিয়া গাঁথিয়াছিল, তাহার পর তাহাতে আটকাইয়া গিয়াছিল লোলুপ কুমির। মেলকোর এমন-সব গান জানে যাহা শিখিতে খুবই সহজ—কারণ তাহার গানের কথাগুলির কোনো মানেই থাকিত না আর বারে-বারেই তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে হইত। সে পাকশাল হইতে মিষ্টি চুরি করিয়া আনে, রাত্রিবেলায় সে আস্তাবলের দরজা দিয়া পালাইয়া যায়; আর একবার সে পুলিশকে তাগ করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়াই কাহে দে লা আমার-গুরার অন্ধকারে উধাও হইয়া গিয়াছিল।

বাদলসিক্ত দিনগুলাতে সে তাহার বুটজোড়া পাকশালের উনুনের ধারে শুকাইতে দিত। মারসিয়াল কামনা করিত, ঈশ, অত-বড়ো বুটজুতা পায়ে দিবার মতো যদি বড়ো পা হইত তাহার! মেলকোরের ডান পায়ের জুতার নাম কালাম্বিন, বাঁ পায়েরটি কালাম্বান। এই মানুষ বুনো ঘোড়া বশ করিতে পারে কেবল দুই আঙুলে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া, এই চমৎকার মানুষটি মখমলে সাজে আর নাল পরে, সে মস্ত লম্বা টুপি পরে, আরো জানে গ্রীষ্মকালীন মর্মরমেঝের শীতলতা। আর মিষ্টি কিংবা ফলমূল আশবাবপত্রের আড়ালে লুকাইয়া রাখিতে জানে সে, বৈঠকখানার জন্য উদ্দিষ্ট রেকাবি হইতে সে এইসব ছিনাইয়া লয়। মিষ্টি আর কাগজি বাদামের এক গোপন ভাঁড়ার ছিল মারসিয়াল আর মেলকোরের, যাহাকে তাহারা বলিত 'উরি, উরি, উরা,' আর ষড়যন্ত্রের হাসি হাসিয়া লুটোপুটি খাইত। বাড়িটির আগাগোড়া উপরনিচ তাহারা তন্নতন্ন করিয়া চেনে; শুধু তাহারা দুই-জনেই জানিত যে আস্তাবলের তলায় আছে এক ছোট্ট মণিকোঠা ওলন্দাজ বোতলে ভর্তি, অথবা দাসীদের ঘরের উপরে এক অব্যবহৃত মাচার উপর আছে এক ভাঙা কাচের বাক্স, তাহার ভিতর বারোটি ধূলিমলিন প্রজাপতি আস্তে-আস্তে তাহাদের পাখা হারাইয়া বসিতেছে।

১১

দ্রব্যসামগ্রী ভাঙিবার পর্যায়ে পৌঁছিয়া মারসিয়াল মেলকোরের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইল; সৌহার্দ্য করিল সারমেয়কুলের সহিত। গৃহমধ্যে সারমেয়সংখ্যা কতিপয়।

সর্ববৃহৎটির দেহ ব্যাঘ্রের ন্যায় ডোরাকাটা; ব্যাসেটটির স্তনবৃন্ত ভূমিস্পর্শ করিয়া চলে; গ্রেহাউণ্ডটি বার্ধক্যে পৌঁছিয়াছে, ক্রীড়ায় লিপ্ত হইবার শক্তি তাহার আর নাই; বৎসরের কোনো-কোনো ঋতুতে অপরগুলি যে-পুডলটির পশ্চাদ্ধাবন করিত, দাসীরা তাহাকে তাহাদের সহিত অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

মারসিয়ালের প্রিয় কুক্কুর কানেলো, কারণ সে শয়নকক্ষ হইতে পাদুকা লইয়া অন্তর্ধান করে, গৃহসম্মুখের গোলাপকুঞ্জ খুঁড়িয়া ফ্যালে। সর্বদাই সে হয় অঙ্গারকৃষ্ণ নতুবা রক্তমৃত্তিকায় আচ্ছাদিত; সে অপর-সকল সারমেয়র আহার খাইয়া লয়, অকারণে গর্‌গর্ করে, লুণ্ঠিত অস্থিপঞ্জর ফোয়ারানিম্নে লুকাইয়া রাখে। এবং প্রায়ই সে সত্যভূলুণ্ঠিত কুক্কুটাণ্ড চুষিয়া খায়; তাহার লালাসিক্ত নাসার তীক্ষ্ণ গুঁতায় কুক্কুটী-টিকে শূন্যে ছোঁড়ে। সকলেই কানেলোকে পদাঘাত করে। কিন্তু যখন তাহারা তাহাকে লইয়া গেল, শোকে আকুল মারসিয়াল কাঁদিয়াকাটিয়া রোগ বাঁধাইয়া বসিল। অতএব বিজেতার ন্যায় সারমেয়টি তাহার লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে-করিতে কোথাকার কোন্ দরিদ্রপল্লি হইতে প্রত্যাবর্তন করিল—সেখানে সে পরিত্যক্ত হইয়াছিল—এবং গৃহমধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, অপর সারমেয়গুলির শিকারে বা প্রহরায় যতই নৈপুণ্য থাকুক, এ-সৌভাগ্য তাহাদের কদাপি হয় নাই।

কানেলো আর মারসিয়াল পাশাপাশি প্রস্রাব করিত। প্রায়ই তাহারা বৈঠক-খানার পারস্যগালিচাটিকে মূত্রত্যাগের জন্য নির্বাচন করিত এবং তাহাতে গাঢ় মেঘবর্ণ নানা চিত্র অঙ্কিত হইয়া যাইত। ইহাতে প্রায়শই তাহাদের কপালে প্রহার জুটিত। কিন্তু বয়স্করা অনুভব করিতে পারিত না যে প্রহার বস্তুত ততটা বেদনা-দায়ক নহে। অপর পক্ষে সমস্বরে চীৎকার ও অট্টরোলের সৃষ্টি করিয়া প্রতিবেশী-গণের সহানুভূতিলাভের এক চমৎকার উপায় তাহারা লাভ করিত। যখন উচ্চতলের বক্রদৃষ্টি রমণীটি তাহার পিতাকে 'জানোয়ার' বলিয়া সম্বোধন করিত, মারসিয়াল স্মিত দৃষ্টিতে বান্ধব কানেলোর দিকে চাহিত। আরো-কিয়ৎকাল তাহারা অশ্রুপাত করিত, যাহাতে বিস্কুট জোটে, এবং পরে সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যাইত। তাহারা উভয়েই মাটি খাইত, ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইত, হিরণমৎস্যের চৌবাচ্চা হইতে জল খাইত, আর মধুর তুলসীকুঞ্জের সুবাসিত শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইত। দিবাভাগের সর্বাপেক্ষা তপ্ত প্রহরগুলিতে সান্দ্র পুষ্পবিতানে রীতিমতো ভিড় জমিয়া যাইত। থাকিত সেই ধূসর হংসিনী, তাহার থলিকাটি তাহার বঙ্কিম পায়ের মধ্যে ঝোঝুল্যমান; থাকিত নগ্ন পশ্চাদ্দেশ দেখানো সেই বৃদ্ধ কুক্কুট; থাকিত সেই ক্ষুদ্র তক্ষক যে ক্রমাগত 'উরি, উরা' বলিত বিদ্যুৎবেগে আর গ্রীবায় এক গোলাপি ফিতা পরিয়া লইত;

থাকিত সেই বিমর্ষ সর্প, যাহার জন্ম এমন নগরে হায়-রে যেখানে কোনো সাপিনী নাই ; আর থাকিত সেই ইঁদুর, যে কচ্ছপের ডিম দিয়া তাহার গর্তের মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিত। একদিন একজন অঙ্গুলি তুলিয়া মারসিয়ালকে সারমেয়টি দেখাইল।

'ভৌ-ভৌ !' মারসিয়াল বলিল।

আপন ভাষাই বলিতেছে মারসিয়াল ; চরম মুক্তি লাভ করিয়াছে সে। তাহার হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া এবম্বিধ বস্তু সে স্পর্শ করিতে চাহিতেছে যাহা তাহার আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে।

১২

ক্ষুধা, পিপাসা, উত্তাপ, যন্ত্রণা, শৈত্য : মারসিয়াল যখন সদ্য তাহার অনুভূতিগুলিকে এই মৌলিক ও প্রাথমিক বাস্তবতায় হ্রস্বীভূত করিয়া আনিয়াছে এমতাবস্থায় সে তাহাদের সহগামী আলোকচ্ছটাকে বিসর্জন করিয়া বসিল। আপন নামটি তাহার স্মরণে নাই। দীক্ষা ও নামকরণের অপ্রীতিকর মুহূর্ত অতিক্রান্ত হইতেই গন্ধ, শব্দ, এমনকী দৃষ্টির জন্যও তাহার কোনো কামনা রহিল না। তাহার হস্তদ্বয় আদর করে মনোরম সব আকার ও প্রকার। সে এক বিশুদ্ধ স্পর্শানুভূতিশীল সংবেদজ জীবে পরিণত হইয়াছে। তাহার ত্বকের ছিদ্রগুলি দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। অতঃপর সে তাহার চক্ষু নিমীলিত করে—তাহারা নীহারিকাবৎ অতিকায়মূর্তি ব্যতীত অপর-কিছুই অবলোকন করে না—আর প্রবিষ্ট হয় এক উষ্ণ সান্দ্র ছায়াময় দেহের অভ্যন্তরে—এক মুমূর্ষু ম্রিয়মাণ দেহে। এই দেহের সারাৎ-সারের ঝিল্লি পরিয়া সে জীবনাভিমুখী গড়াইয়া আসে।

কিন্তু এখন সময় অতিক্রান্ত হয় অধিকতর দ্রুতবেগে—সেই বেগ চরম মুহূর্তগুলির আনুপাতিক পরম্পরাকে ক্রমেই হ্রস্ব ও হ্রস্বতর করিয়া তোলে। পল-অনুপল ধ্বনিত হয় যেন কোনো প্রমারাজীবীর অঙ্গুলিমধ্য হইতে তাশগুলি স্খলিত হইয়া পড়িতেছে।

পালকের ঘূর্ণাবাত্যা তুলিয়া পাখি ফিরিয়া যায় তাহার ডিম্বের ভিতর। মাছগুলি দলা পাকাইয়া যায় মৎস্যডিম্বে, শুধু পুষ্করিণীর নিম্নে রাখিয়া যায় তাহাদের আঁশের রুপালি তুষারপাত। তালপর্ণ গুটাইয়া যায়, বৃক্ষ মুদিত পাখার ন্যায় মৃত্তিকানিম্নে অদৃশ্য হইয়া যায়। মৃণাল পুনর্গ্রহণ করে তাহার পাপড়ি, আর মৃত্তিকা ফেরৎ চাহে যাহা-কিছু তাহার আপন ছিল। তোরণশোভিত পথিমধ্যে গমগম করে বজ্র। মৃগ-

ত্বকের হস্তাবরণীতে গজাইয়া ওঠে রোমরাজি। পশমের গাত্রাচ্ছাদন খসিয়া পড়ে, রূপান্তরিত হয় সুদূর তৃণপ্রান্তরে সঞ্চরমান মেষপালে। যাহা-কিছু কাষ্ঠনির্মিত,—সিন্দুক, খাট-পালঙ্ক, ক্রুশচিহ্ন, টেবিল, জানালার খড়খড়ি—সব ফিরিয়া যায় অন্ধকারে, আরণ্য বৃক্ষসারের প্রাচীন শিকড়ের সন্ধানে। যাহা-কিছু লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া জোড়া হইয়াছিল সব খুলিয়া আসে। এক দ্বিমাস্তুল জলপোত—কেহ জানিত না কোথায় সে ছিল নোঙরবদ্ধ—দ্রুতবেগে ফিরিয়া যায় রোমদেশে, কক্ষতল ও ফোয়ারাগুলির মর্মরশিলা বহন করিয়া। বর্ম, সর্বপ্রকার, লৌহনির্মিত বস্তু, কুঞ্চিকা, তাম্রনির্মিত রন্ধনপাত্র, অশ্বশালার অশ্বক্ষুরধাতু—সব গলিতে থাকে, আর এক গলিত ধাতুর প্লাবন ফুলিয়া-ফুলিয়া ছুটিয়া যায় ছাতহীন প্রণালী দিয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরে। বস্তু, প্রাণী—সব, রূপান্তরিত, ফিরিয়া আসিতেছে আদিম অবস্থায়। মৃত্তিকা মিশিয়া গেল মৃত্তিকায়, পশ্চাতে রাখিয়া গেল এক মরুভূমি, যেখানে একদা দণ্ডায়মান ছিল এই বৃহৎ হর্ম্য।

১৩

সকালবেলায় আস্ত বাড়িটা ভেঙে ফেলার কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য মজুররা এসে দ্যাখে তাদের শুরু-করা কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। কে যেন শস্যের দেবী সিয়ারইজের মূর্তিটা নিয়ে গিয়ে গত সন্ধ্যাতেই এক সেকেলে জিনিশের ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি ক'রে দিয়েছে। তাদের ট্রেড ইউনিয়নের কাছে নালিশ জানিয়ে মজুররা শহরের পার্কের বেঞ্চে এসে বসলো। তারপর হঠাৎ যেন কার মনে প'ড়ে গেলো কোন্-এক মার্কেসা দে কাপেহানিয়ার কী-এক অস্পষ্ট কাহিনী—আল্‌মেনদারেসের পানা পুকুরের মধ্যে কোনো-এক বৈশাখের বিকেলে তিনি জলে ডুবে মারা যান। কিন্তু কেউই তার কাহিনীকে কোনো পাত্তা দিলো না, কেননা সূর্য তখন ভ্রমণে বেরিয়েছে পুব থেকে পশ্চিমে, আর ঘড়ির ডান পাশে যে-ঘণ্টাগুলো আস্তে-আস্তে বেড়ে যাচ্ছিলো তা ছিলো সুনিশ্চিত আলস্যের তাঁতে বোনা—কারণ ঐ ঘণ্টাগুলোই অনিবার্যভাবে সবকিছুকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়।

শরণার্থীর অধিকার

রাজনৈতিক পলাতকেরা যদি দূতাবাসগুলোয় আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দেয়া হবে—হয় অধিকার হিশেবে, নতুবা মানবিক ঔদার্যবশত—অবশ্য, যে-দেশে আশ্রয় নেয়া হচ্ছে, তার প্রচলন বা আইনকানুন যদি তা লঙ্ঘন না-করে।—

১৯২৮-এ লা হাবানায় অনুষ্ঠিত প্যান-আমেরিকান সম্মেলনে রচিত সংহিতার ২নং ধারা।

১

রো ব বা র

যেহেতু দিনটা রোববার, রাষ্ট্রপতি ও লোকপরিষদের একান্ত সচিব মিরামোন্তেসের প্রাসাদে এসে পৌঁছুলেন বেলা দশটা নাগাদ ; কাছের একটা দোকানের জানলায় সাজানো একসেট মেকানোর দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন তিনি। এমন দিনে বেশির ভাগ লোকই যায় চার্চে অথবা সমুদ্রতীরে—বিশেষত, বলাই বাহুল্য, গ্রীষ্মকালে। খুব ভেবেচিন্তে গোপনে যে-সব প্রতিবেদন দিতে হয়, সপ্তাহের অন্য দিনগুলোয় সচিবের পক্ষে প্রায় কখনোই তেমন কাজে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয় না ; কেননা প্রায় সারাক্ষণই বিরামহীন স্রোত লেগে থাকে সোনালি জরির কাজ-করা পোশাক- ও ভূষণ- শোভিত রাষ্ট্রদূতদের, থাকে বড়ো-বড়ো সরকারি কর্মচারিদের ভিড়, বিশিষ্ট সব বিদেশী অভ্যাগতের দল, বিখ্যাত বা নাম-না-জানা সব পুরুৎ, দূর-দুরান্তের প্রদেশগুলোর রাজ্যপাল, কর্মপ্রার্থী বা আবেদনকারীরা যারা আসে আগে থেকে ব'লে বা না-ব'লে—সেনাবাহিনীর লোকদের বেলায় বেশির ভাগ সময়ই আগে থেকে বলা থাকে না—রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে চায়, কিংবা অবস্থা যদি ততটাই খারাপ হয় তো নিদেন উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে, যদিও খুব মোলায়েম ক'রে বললেও তাঁর ব্যাবহারিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেশ একটু প্রশ্নসাপেক্ষ। 'আপনার বিষয়টা আমি রাষ্ট্রপতিকে জানাবো,' এই কথাই তিনি বলবেন, বেশ ভারিক্কি চালে। আর তারপর প্রধান বিচারপতির মুখ দেখে বলবেন : 'জেনারেল···অবশেষে

অ্যাদ্দিনে আমরা কিছু খুবসুরৎ ইতালিয় মেয়েছেলে আমদানি করেছি।' (এই ব'লে তিনি তাঁর ডান হাতের আঙুলের ডগাগুলো জুড়ে দিয়ে চুমু খাবেন, বেশ-একটা সপ্রতিভ চালিয়াতি কায়দায়।)

বেয়াতি পোস্‌সিদেন্তেস্। [ধন্য বিত্তবানেরা!] 'আপনারা যে লোলার ওখান থেকে ঐ বাচ্চা-কাচ্চা ক্রেয়োল মেয়েগুলোকে আনেন—আমার তাতে বেদম ক্লান্তি লাগে আজকাল,' প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন কয়েক হপ্তা আগে। 'আমরা এখন এমন-একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যে আমাদের এখন অভিজাত সুরুচিওলা মেমসাহেব চাই, খোদ ইওরোপ থেকে আমদানি করা, যারা অন্তত নিজেদের কথা নিজেরাই বলতে পারবে।'

এই বিশাল অট্টালিকার উঠোনের বাগানের দিকে তাকালেন সচিব : বাড়িটা একতলা; এমন কেতায় তৈরি যা ঝাপসাভাবে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে মনে করিয়ে দেয়; নির্বাচনে জেতা শেষ কয়েকজন রাষ্ট্রপতি এখানে কখনো থাকেননি. কিংবা তাঁরাও থাকেননি যাঁরা তালেগোলে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন; কারণ আর-কিছুই না, বাড়িটার অসুবিধেগুলো বড়ো সুপ্রকট : এর স্নানঘরগুলোর পেল্লায় আয়তন, তাছাড়া গোলন্দাজদের কামানের পাল্লায় এর অবস্থিতি কোনো সামরিক অভ্যুত্থানের সময় রণকৌশলের দিক থেকে মোটেই কোনো সুবিধের নয়। ছোটো ক'রে ছাঁটা ঝোপঝাড়ের আড়ালে সার্জেন্ট রাতোন ব'সে-ব'সে তার পোষা কাছিম ক্লিওপেট্রাকে একটা ভেজা এস্পার্তো ঘাসের ঝুড়ি থেকে লেটুস পাতা তুলে-তুলে খাওয়াচ্ছিলো।

'কাগজ দেখেছেন আজ?' সার্জেন্ট একটা খবরকাগজ তুলে ধ'রে শুধোলে। 'হিটলার তাঁর সেনাবাহিনীকে বলেছিলেন : "মনে রেখো, তোমাদের না-আছে কোনো হৃদয় না-বা কোনো স্নায়ু; যুদ্ধের সময় এদের কোনোটাতেই তোমাদের দরকার নেই। যদি-বা দৈবাৎ মনে কোনো দয়ামায়া পুষে রাখো তো এক্ষুনি তাদের ছেঁটে ফ্যালো। সোভিয়েৎ রুশী সব্বাইকেই খতম করতে হবে; যদি কখনো কোনো বুড়ো বা মেয়েছেলে বা বাচ্চার মুখোমুখি পড়ো, একটুও দোনোমনা কোরো না; সব ক-টাকে খতম কোরো, আর তাতে যে তুমি শুধু নিজের প্রাণটাকেই বাঁচাবে তা নয়, তোমার আত্মীয়স্বজনের ভবিষ্যৎটাকেও বাঁচাবে, আর চিরকালের মতো নিজেকে ভূষিত করবে গরিমায়।" গুলিতে ঝাঁঝরা ক'রে ফ্যালো সব ক-টাকে! ক্লাউসেভিৎজের তত্ত্বটাই চাই আমাদের—অন্তর আমার তো বাপু সেটাই মত। ঐ প্রুশিয়ান লোকটা জবরদস্ত ছিলো বটে!'

ক্লাউসেভিৎজের প্রতি রাতোনের এই তীব্র অনুরাগ সচিবকে সবসময়েই অবাক

ক'রে তোলে—কল্পবিজ্ঞানকাহিনীর ধরনে সে উদ্ভাবন করেছিলো চরম যুদ্ধের পরিকল্পনা : টকটকে লাল সব যন্ত্রদানব ঢুকছে বড়ো-বড়ো শহরে, বাড়িঘরগুলো সব ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে ; কপিকলগুলো পেল্লায় একেকটা বাড়িঘর হিঁচড়ে তুলে নিচ্ছে শূন্যে আর তারপর অনেক উঁচু থেকে আছাড় মেরে ফেলেছে প্রতিরোধের ঠিক মাঝখানটায় ; সুড়ঙ্গের মতো হা-করা সব আগুন-ওগরানো মুখ ; বর্মপরা সাঁজোয়া গাড়ি, যার ভেতর ব'সে আছে তিনশো লোক, সশস্ত্র, তৈরি। রাতোন এই চরম যুদ্ধের কথা শুনেছে আরেকজন সার্জেন্টের কাছে ; সে আবার এর খবর পেয়েছে এক লিউটেনান্টের আর্দালির কাছ থেকে ; লিউটেনান্টের কাছে নাকি 'অন ওয়ার' আর 'দি ওয়াটারলু ক্যাম্পেইন' বই দুটো আছে—ফলে এ-বিষয়ে বক্তৃতা দিতে তার বেজায় ভালো লাগে। 'ঐ ক্লাউসেভিৎজ লোকটা এমনকী নেপোলিয়ানের চেয়েও সরেশ ছিলো!' এবং সার্জেন্ট অনবরত লেটুস পাতা খাইয়েই চলে ক্লিওপেট্রাকে। সদয় সরল একজন মানুষ, তার কাছিমের অসুখ করলে যে হাপুশ কেঁদে ফেলবে, এহেন একজন লোক যে তার মাইনের পেসো প্রায় সবটাই পাড়ার ছেলেদের জন্যে শিশের সেপাই কিনে উড়িয়ে দেয়, মোটামুটি নিয়মিতই যে যায় চার্চের পবিত্র সমাবেশে, পাঠ্যবিষয় বলতে যার আছে অদ্বিতীয় আর দুর্দান্ত এক সুযোগ—সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ কেতাব—একশোবার পড়ার পরেও যে-বইটা এখনো তার সৌন্দর্য, অ্যাডভেনচার ও প্রণয়তৃষ্ণার কামনা মেটায়, ক্ষমতার প্রতি তার গোপন লালসাটাকে উশকে দেয়, আর, হয়তো, এই নেহাৎই-সাধারণ নিচু পদের সেনাটিকে এমন-সব দার্শনিক চিন্তাভাবনা জোগায় বস্তুত যাদের পাওয়া যায় কেবল ব্যেতিয়ুস, এপিক্তেতুস অথবা মার্কুস আউরেলিউসের কেতাবে—এই যাঁরা, ধরুন, লিখেছিলেন 'মন্তেক্রিস্তোর কোঁৎ' বইটা—সেই লোকের মধ্যে এই চরম যুদ্ধের অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা কেমন ক'রে যে এমন তোলপাড় তোলে, তা নিয়ে তাজ্জব হ'য়ে অনেক ভেবেছেন সচিব—এবং এবারই শুধু-যে তা প্রথম ভাবলেন, তাও নয়। এই লোকটা কিনা স্বপ্ন ছাখে সর্বনেশে সব ভয়ংকর যুদ্ধের—এবং নির্বিচার জাতিহত্যার? প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে বিবাদ চলেছে তার দেশের—যে-সীমান্ত কিনা অতীব অস্পষ্ট এবং নিতান্তই তাত্ত্বিক, এবং দুর্গম জঙ্গলে আকীর্ণ, যে-সীমান্তের একমাত্র উচ্চাশা বোধকরি পাঠশালার মানচিত্রে নিজের নামটা তোলা,—সেই সীমান্ত নিয়ে বিবাদটাকে যেন চিরকালের মতো অস্ত্র-প্রয়োগে মিটিয়ে ফেলা হয় না, এ নিয়ে রাতোনের খেদের শেষ নেই। 'আর অস্ত্র-গুলো যেন হয় সবচেয়ে মারাত্মক,' সে এই টিপ্পনীটাও জুড়ে দেয়। এমন-এক

অস্ত্রশালার স্বপ্নে সে বিভোর, যেখানে জড়ো করা আছে যুদ্ধের সব ভয়াবহ কলা-কৌশল, যাদের কেবল ফি-রোববার খবরকাগজের কমিকেই আন্তর্জাতিক রগরগে কাহিনীতে দেখা যায়, স্থানীয় খবরকাগজের জন্যে যে-কমিকগুলো এস্পানিওলে তর্জমা হ'য়ে বেরোয়।

নিজের আপিশে ঢুকে—ঘরটা পম্পেইয়ের কেতায় সাজানো—সচিব কতগুলো নথি আর সেরেস্তা নিয়ে পড়লেন : এগুলো চট ক'রেই সেরে নেয়া যাবে। তাঁর পাশে অপেক্ষা ক'রে আছে এক দোয়াত, নেপোলিয়ানের ঈগলের গায়ে খোদাই ক'রে বসানো। কাজ সারা হ'লে যতক্ষণ-না সার্জেণ্ট রাতোন তাঁর দুপুরের খাবার নিয়ে আসে, সচিব আস্ত প্রাসাদটিতে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটান ; এখন যখন আর্দালি, চাপরাশি, পাহারোলা বা জনতার ভিড় নেই কোথাও, তিনি তারিয়ে-তারিয়ে চাখতে থাকেন নিঃসঙ্গতার এক পরম উপভোগ্য আবেশ। তিনি পেরিয়ে এলেন পঞ্চদশ লুইয়ের আমলের মস্ত বসবার ঘরটি, তার দেয়ালের বিচ্ছিরি নকশাগুলো আর শাদা পিয়ানোটা সোনার মধ্য থেকে ফুটে আছে ; তারপর গ্রন্থাগার, যেখানে সারি-সারি সাজানো আছে মমসেন, ড্রুরি, মিশেলেভ, সেসারে কান্তু আর গিজোর বইয়ের না-পড়া সংস্করণগুলো ; আর তারপরে সেইসব ঘর যেগুলো তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রপতির স্ত্রীর জন্যে নির্দিষ্ট, সবগুলোই যার তাকলাগানো হালফ্যাশনে সাজানো—একেবারে সর্বাধুনিক সব ফ্যাশন। আয়নাগুলো দাঁড় করানো পলিক্রোম দাঁড়ের ওপর, আর কত ছবি—মুচার ধরনে, মুখ ভার-করা ঢোলা জোব্বা-পরা যত ভাঁড়, আবছাভাবে যা মনে করিয়ে দেয় অব্রে বিয়ার্ডস্লিকে, চাঁদের আলোয় তারা ম্যাণ্ডোলিন বাজাচ্ছে ; ছবিগুলো সব শোভা পাচ্ছে পর্দার গায়ে, যে-পর্দাটা দিয়ে হাত-মুখ ধোবার জন্য একটা মস্ত গামলা আর বিদে ঢাকা—এই শেষোক্তটিকে চল্লিশ বছর আগে যখন ফ্রান্স থেকে আগাগোড়া রহস্যে মুড়ে ঢাক-ঢাক গুড়গুড় ভাবে আমদানি করা হয়, তখন সে-এক কেচ্ছাকেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়েছিলো। আম এবং খাশ—দুটি দরবারেরই চেহারা কেমন যেন মধ্যযুগীয়, দেয়ালে বসানো আখরোট কাঠের কুলুঙ্গি, সারি-সারি বর্ম, আর রাষ্ট্রপতির সিংহাসনের ওপরে ঝুলে আছে নকশা-আঁকা চাঁদোয়া, যাতে দেখানো হয়েছে কেমন ক'রে গাছতলায় ব'সে-ব'সে সন্ত লুইস ন্যায়বিচার ক'রে চলেছেন। দুপুরের খাবার দেয়া হ'লো ; সেন্টর আর বাকুস-পূজারীদের ছবির সারির মধ্যে—এই শতাব্দীর সূচনায় যেগুলোকে এঁকেছিলো পারীর একোল্ দ্য ব্যু আর্ৎ-এর এক ছাত্র—একটা মস্ত তৈলচিত্র ঝুলছে—ভ্যোভ ক্লিক-এর এক বোতলের ছবি,

ছিপিটা বোম্‌কে আছে ওপরে, আর যার মধ্য থেকে গলগল ক'রে বেরিয়ে আসছে খুদে-খুদে যত দেবদূত। সচিব সেই মস্ত ভোজটেবিলের মাথায় ব'সে পড়েন, স্বয়ং রাষ্ট্রপতির জায়গায়। সত্যি-বলতে, রোববারগুলোয় তিনি প্রায় ভেবেই নেন যে তিনি নিজেই হলেন রাষ্ট্রপতি, মিরামোন্তেসের প্রাসাদে থাকেন। একবার তিনি এমনকী রাষ্ট্রপতির সেই জরির ফিতে লাগানো কোমরবন্ধও প'রে বসেছিলেন, যাতে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মেজাজটা একটু অনুভব করা যায়।

'জানেন, রাস্তায় ওরা কী কথা বলাবলি করছে?' জিগেশ করলে রাতোন। 'বলছে যে জেনারেল মাবিলান নাকি সেনাবাহিনীর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গোটা শহরে দারুণ হৈচৈ চলেছে। আসলে আমাদের এখানে চাই এক চরম যুদ্ধ—সীমান্তের ওপারে যতক্ষণ-না সব ব্যাটা জবাই হচ্ছে ততক্ষণ—যাতে আর-কেউ কোনোদিনও আর আমাদের এখানে নাক গলাতে না-আসে…' সচিব কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না। তিনি পকেট থেকে পাউল ক্লে-র ছবির একটা ছোট্ট বই বার ক'রে আনলেন। অন্য যে-কোনো ধরনের শিল্পকর্মের চাইতে পাউল ক্লে-র ছবিই সচিবের সবচেয়ে পছন্দ।

২

সো ম বা র

ভোরে উঠেছি। কিছুতেই আর এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারিনি। আর তারপর যথারীতি নিত্যকর্মগুলোর পুনরাবৃত্তি। কুড়ি বছর আগে যেমন ছিলো, আজও তাই। আয়নায় তোমার প্রতিবিম্বটাকে রোজই আরো বয়স্ক দেখায়। আর ক্ষুর। একই ক্রিয়াকলাপ। সেই একইরকম মুখ-বিকৃতি। বিদ্রোহী দাড়ির গোছাগুলো আজও তেমনি বিদ্রোহী—কিছুতেই আর বাগ মানানো গেলো না। তারপর তোমার দাঁতের পাটি। বিছানা থেকে রাস্তার মধ্যেকার এই কাজগুলোর বেড়া তোমায় ডিঙোতেই হবে, সমাজ জোর গলায় জানায়—বিশেষত কেউ যদি হয় রাষ্ট্রপতি এবং লোকপরিষদের একান্ত সচিব। চিৎপাত শুয়ে-থাকা আর লেফাফাদুরস্ত পোশাক প'রে হাঁটা—এই দুয়ের মধ্যে এতসব বেড়া। সেই যেদিন কেউ জন্মায়, তারপর থেকে মানুষের জীবন মানেই হ'লো হামাগুড়ি দেয়া, বুকে হাঁটা, দু-পায়ে হেঁটে চলা—রাশি-রাশি পোশাক-আশাকে নিজেকে মুড়ে, চিরকালই যা তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হ'য়ে থাকবে। তার সেই প্রথমদিনকার ঢিলে জোব্বা

থেকে আজকের এই রাশভারি পোশাক, যার মধ্যে তাকে কবর দেয়া হয়েছে, সে কোনো গন্ধগোকুলের মতো জামা থেকে জামা, কুর্তা থেকে কুর্তায় গন্ধ শুঁকে-শুঁকে এগোয়, যতক্ষণ-না—এবার তাকে পোশাক পরাবে অন্য-কেউ—সে প্রবেশ করে কোনো মুদ্দোফরাশের বৈঠকখানায়। আজও আমার মনে আছে আমার সেই গরিব দিনগুলোর সবুজ স্যুটটাকে—যেটার রং শেষকালে হলদে হ'য়ে গিয়েছিলো; আজও মনে আছে আমার সেই প্রথম সাফল্যের দিনগুলোয় ডবোল ব্রেস্টওলা যে-বিলিতি নীল স্যুটটা আমাকে সান্নিধ্য দিয়েছিলো; আর সেই টুয়িড স্যুট—প্রথম যেদিন আমি সোনিয়ার কাছে প্রেম নিবেদন করেছিলুম, সেদিন যেটা আমার পরনে ছিলো; ছাইরঙা স্যুটটা আমি যতক্ষণে খুলেছি, ততক্ষণে সে—এর মধ্যেই ন্যাংটো—ব'সে-ব'সে একটা পীচ খেতে শুরু করেছে! মনে আছে বাকি সবকিছুও, একেবারে তাদের সাল-তারিখ শুদ্ধু, যেমন লোকে মনে রাখে মদের তারিখ—কবেকার কোন্ ভালো আঙুরের ফসল থেকে তৈরি। লোকে যখন প্রথম চোখ মেলে—যতক্ষণ-না আবার সে বুজিয়ে ফ্যালে চোখের পাতা—আর এমনকী বুজিয়ে দেবার পরেও—লোকে শুধু অনেকগুলো আস্তর বদল-করা ছাতার ভূমিকায় অভিনয় ক'রে যায়:—সেইসব আস্তর, কাপড়, যা, লোকে ভাবে, খুলে দেখায় চারিত্র্য, মেধা আর সামাজিক অধিষ্ঠান। যাবার সময় হ'লো। রাষ্ট্রপতিভবনে যাবার। আমার স্যুটের আঠারোটা বোতাম নিখুঁত আটকানো (ভেতরের পকেটে দুটো, কোমরবন্ধে ছ-টা, জ্যাকেটে তিনটে আর ওয়েস্টকোটে সাতটা।)। ন-টার সময় মন্ত্রীসভার বিশেষ বৈঠক বসবে আজ, সীমান্ত বিষয়ে প্রতিবেশী দেশের দাবিগুলো বিবেচনা ক'রে দেখার জন্যে। আমি এসে রাষ্ট্রপতিভবনে পৌঁছুই, আর একটা ব্যাপার দেখে এমনই তাজ্জব হ'য়ে যাই বেশির ভাগ পথচারীর কাছেই যার কোনো মানে হ'তো না। সার্জেন্ট রাতোন দাঁড়িয়ে আছে প্রহরামঞ্চে, পুরোপুরি সশস্ত্র, গায়ে জড়িয়ে আছে দুইপল্লা কার্তুজবন্ধনী। প্রহরীদের ঘরেও কেমন একটা স্নায়ুর চাপ, উত্তেজনার ভাব, যার প্রবেশচত্বর রাস্তা থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। ঠিক তখনই তাঁর জাগুয়ার হাঁকিয়ে এসে হাজির হলেন অর্থমন্ত্রী: যথাবিধি নম্রভাবে তাঁর দরজা খুলে দেয়া হ'লো, কিন্তু যেই তিনি হলে ঢুকতে যাবেন, সজোরে পাকড়ানো হ'লো তাঁর ঘাড়, আর এক সামরিক পুলিশের হাতে তাঁকে তুলে দেয়া হ'লো। ঠিক একই জিনিশ ঘটলো পূর্তমন্ত্রীর বেলায়, যখন তিনি পৌঁছুলেন তাঁর ক্যাডিলাক হাঁকিয়ে। এবং তা-ই ঘটলো, একে-একে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং তথ্যমন্ত্রীর বেলায়...রাতোন তোমায় দেখে ফেলেছে। সে এগিয়ে আসে।

'আপনি ভেতরে আসবেন না, ডক্টর ? আজ মন্ত্রীসভার বৈঠক আছে যে।' বড্ড বেশি চাপ দিয়ে সে হাত রাখে তোমার কাঁধে।

'এক্ষুনি আসছি,' তুমি বলো, 'কিন্তু কিছু সিগারেট কিনতে চাই আগে।'

'আমি নিয়ে আসছি।'

'সার্জেন্ট,' এমনই কড়া আদেশের সুরে তুমি বলো যে রাতোন হকচকিয়ে যায়, 'নিজের জায়গা ছেড়ে কক্ষনো কোনো সেনা নড়ে না। তোমাকে আবার ক্লাউসেভিৎজ্ প'ড়ে নিতে হবে। তাছাড়া, আমার মনে হয় তুমি সম্ভবত তেমন মন দিয়েও পড়োনি।'

রাতোন হা হ'য়ে যায়, রা সরে না তার, কিন্তু একান্ত-সচিব জানেন মোড়ের শুঁড়িখানার ছোট্ট তামাকের দোকানটায় ঢোকা অব্দি রাতোনের চোখ তাঁকেই অনুসরণ ক'রে চলেছে। আর, একটি মাউসারে যে এক্ষুনি চট ক'রে গুলি পোরা হ'লো তার খুট্ শব্দটা শুনিয়ে সার্জেন্ট বেশ আহ্লাদই পায়।

'শুঁড়িখানাটায় তো পাশের রাস্তায় গিয়ে পড়ার মতো কোনো দরজাই নেই,' নিজের মনে বিড়বিড় করো তুমি। 'এক প্যাকেট চেস্টারফিল্ড দেবেন।' রাতোন এখনও তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। সময় কাটাও, ভাবো, এমন ভাবভঙ্গি করো যাতে এই দেরির কারণ বোঝা যায়, সার্জেন্ট যেন সব ভালো ক'রে দেখতে পায়। 'ঠাণ্ডা পানীয় চাই একটা।' বরফকুচি দেয়া। তবু তুমি বলো: 'উঁহু, মোটেই ঠাণ্ডা না। আরেকটু বরফকুচি দিন তো।' খবরকাগজে শিরোনাম: জেনারেল মাবিলানের অভ্যুত্থানে বিমানবাহিনীর যোগদান। 'এবং রাষ্ট্রপতি ভবনের সেনারাও তা-ই করেছে,' আপন মনে ভাবো তুমি। 'আরেকটা ঠাণ্ডা পানীয় দেবেন।'

আচমকা প্রহরাকক্ষে প্রচণ্ড শোরগোল শুরু হ'য়ে যায়। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এসে পৌঁছেছেন। এ-রকম মহামূল্য পারিতোষিকগুলোর মুখোমুখি প'ড়ে সার্জেন্ট রাতোন প্রহরামঞ্চ ছেড়ে সোজা প্রাসাদের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। কয়েকটা গুলির আওয়াজ শোনা যায়—রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে প্রতিরোধের একটা নিষ্ফল প্রয়াস, পরে আমি শুনতে পাবো। এই ক্ষণিক বিরতির সুযোগ নিয়ে তুমি শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে সোজা চ'লে যাও ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অভ নিউ-ইয়র্কের আপিশটায়, গিশগিশে ভিড় সেখানে লোকের, তারা এখনও জানে না পঞ্চাশ গজ দূরে কী ঘটছে। ওপাশের দরজা দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাও তুমি পাশের রাস্তায়, শহরের পুরোনো তল্লাটে, যেখানে কাউকেই তুমি চেনো না। তোমার একমাত্র আশা লাতিন আমেরিকী কোনো দেশের দূতাবাসে গিয়ে রাজনৈতিক শরণার্থী

হিশেবে আশ্রয় নেয়া। একবার তুমি মেহিকোর দূতাবাসের জমকালো বাড়িটার কথা ভাবো, বিশাল বাগান দিয়ে ঘেরা, তাকলাগানো জৌলুশে ভরা। ব্রাজিলের দূতাবাসের কথাও মনে প'ড়ে যায়—কী সুন্দর তার সুইমিংপুল। ভেনেসুয়েলার দূতাবাসের কথাও ভাবো তুমি একবার, চমৎকার এক গ্রন্থাগার আছে সেখানে, তাছাড়া ছোটো-হাজরির সময় ওরা ভুট্টার চিতই পিঠে খেতে দেয়। কিন্তু তাদের সব ক-টাই যে বড্ড দূরে-দূরে। আর যেহেতু তুমি থাকো রাষ্ট্রপতি ভবনের একশো গজের মধ্যে, আজ সকালে তুমি খুচরো দু-একটা পেসো ছাড়া আর-কিছুই পকেটে নিয়ে বেরোওনি। তাছাড়া মাবিলানের স্যাঙ্গাৎরা অল্পক্ষণের মধ্যেই লাতিন আমেরিকী দেশগুলোর দূতাবাসগুলো ঘিরে পাহারা বসিয়ে দেবে, যাতে ও-সব জায়গায় যারা আশ্রয় নিতে যাবে তাদের ঠেকাতে পারে। হঠাৎ, অরণ্যানীর অঘটনপটীয়সী কুমারী দেবীর চার্চটির মোড় ঘুরেই—বিখ্যাত-সব অলৌকিক কীর্তির জনয়িত্রী তিনি—তুমি গিয়ে থমকে দাঁড়াও একটা শাদাসিধে তিনতলা বাড়ির সামনে, যার দোতলার অলিন্দ থেকে লাতিন আমেরিকার কোনো-একটা দেশের পতাকা শোভা পাচ্ছে: শাদা ডোরা-কাটা জমির ওপর জাতীয় শস্ত্রচিহ্ন গুঁড়ি-মারা দুটি প্যান্থার—কিন্তু চির-উদ্‌গ্রীব—মস্ত সোনালি জমির ওপরটায়, যার মাঝখানে দুই স্ত্রীলোকের দুটি হাত (একজন ইণ্ডিয়ান, আর আরেকজন মেমসাহেব, এমন-এক দেশের প্রতীক যেখানে কোনো শ্বেতাঙ্গিনীই কখনো কোনো ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে কথা বলে না) অত্যাচারের শৃঙ্খল ছিঁড়ে খুলে ফেলেছে। এই শাদাসিধে দূতাবাসটির অন্য পাশে গোমেসভ্রাতাদের লোহালক্কড়ের দোকান। উলটোদিকে মার্কিন দেশের একটা নামজাদা আন্তর্জাতিক দোকানের শাখাপ্রতিষ্ঠানের দেয়াল, যে-দোকানটা শুঁড় বাড়িয়ে পেঁচিয়ে ফেলছে গোটা মহাদেশটাকেই। কোনো দ্বিধা নয়। ছোট্ট সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাও। দূতাবাসের দরজার কড়া নাড়ো তুমি সজোরে, যদিও দরজায় বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে—সকাল এগারোটার আগে কারু সঙ্গে দেখা হবে না। দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রদূত—গায়ে রাতকাপড়।

'বিজ্ঞপ্তিটা দ্যাখেননি আপনি?'

তুমি আস্তে তাঁকে ঠেলে সরিয়ে সোজা গিয়ে ব'সে পড়ো আলোর দিকে মুখ-করা এক আরাম-কেদারায়। 'আমি থাকছি,' তুমি বলো।

'আমি-যে কিছুই বুঝতে পারছি না সেনিওর সচিব, আর আগে আপনাকে চিনতে পারিনি ব'লে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এখন জানলার আলো পড়েছে ব'লে—'

'জেনারেল মাবিলানের সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনের সেনারাও বিদ্রোহ করেছে।

আস্ত মন্ত্রীসভাটিই বন্দী! শুধু আমিই কোনোমতে পালাতে পেরেছি। আমি এই দূতাবাসে শরণার্থী হিশেবে এসেছি—১৯২৮-এ লা হাবানায় যে প্যান-আমেরিকান সম্মেলন হয়েছিলো তার বড়ো-বড়ো বুলিওলা সূত্র অনুযায়ী।'

রাষ্ট্রদূতের মুখ লাল হ'য়ে গেলো, তিনি বোমার মতো ফেটে পড়লেন: 'কিন্তু এ-যে অসম্ভব, সেনিওর, একেবারেই অসম্ভব। আমি খুবই ছোট্ট একটা গরিব দেশের রাষ্ট্রদূত। আপনি তো জানেন—অন্যদের চেয়ে ঢের ভালোই জানেন—আমাদের কোনো-কোনো দেশের রাষ্ট্রদূতেরা কী অকহতব্য মাইনে পান।'

'আমাকে যাতে প্রতি মাসে পাঁচশো পেসো পাঠানো হয় তার ব্যবস্থা না-হয় ক'রে দেবো,' তুমি বলো।

হঠাৎ তোমার পেছন থেকে এক স্ত্রীলোকের গলা ভেসে আসে: 'একা লোকের জন্যে চমৎকার একটা ঘর আছে আমাদের। কেবল গোটা কয় স্যুটকেস সরিয়ে নিলেই হবে।' তুমি ফিরে তাকাও। রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী, ভালো দেখতে, জাপানি কৌঁসুলির স্ত্রীর উপহার দেয়া দারুণ একটা কিমোনো প'রে আছেন, তোমার জন্যে তিনি এক পেয়ালা কফি নিয়ে এসেছেন। 'আশা করি আমাদের মতো দুজন বুড়ো-বুড়ির সঙ্গে থাকতে আপনার খুব বিচ্ছিরি আর ক্লান্তিকর ঠেকবে না।'

বিকেল চারটে থেকে কারফিউ, পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না-দেয়া অব্দি জারি থাকবে। সন্ধে আটটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন জেনারেল মাবিলান। এবং আটটার সময় জেনারেল মাবিলান সত্যি-সত্যি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন: স্বাধীনতার বীর সংগ্রামীদের কথা শোনালেন তিনি, সাত কাহন ক'রে শোনালেন নবলব্ধ মুক্তি সম্বন্ধে; ভবিষ্যতের ন্যায়বিচার, জাতীয় পতাকার মর্যাদা এবং সেনাবাহিনী আর কী-যে গরিমাময় ঐতিহ্য তার, এবং আরো-সব হ্যানোত্যানো—সব ব'লে গেলেন সেই একই ভঙ্গিতে। তিনি, অধিকন্তু, এদিনকার গরীয়ান ঘটনাগুলোকে জড়িয়ে দিলেন আমেরিকার মহামানবদের আদর্শের সঙ্গে—এবং আরো-অনেক-কিছুর সঙ্গে, একই ভঙ্গিতে। তিনি ঘোষণা করলেন যে মঙ্গলবারটি আবার স্বাভাবিক দিন হিশেবেই কাটবে, যদিও ভোর চারটেয় কারফিউ থাকবেই। অবশেষে তিনি ঘোষণা করলেন জনগণের জন্যে বড়ো-বড়ো প্রকল্পের সত্বর সূচনা: কাম্বোকারা বাঁধ প্রকল্প; কোসাল নদীর ওপর সেতু—প্রকৌশলবিদ্যার অঘটনপটীয়সী কৃতিত্বের যা নিদর্শন; পশ্চিম প্রদেশের জন্যে রেলপথ; আর নুয়েভা কোর্দোবা থেকে পুয়ের্তো কাদেনাস অব্দি মোটর রাস্তার পরিকল্পনা।

'ভারি চালাক তো এরা,' তুমি বলো। 'এখনও পুরোপুরি সরকার গঠন করেনি,

অথচ এর মধ্যেই চোর-বাঁটপাড়ের মতো কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে। শুধু একবার ভেবে দেখুন কত মুনাফা মারবে এরা স্লিপার, রেলের লাইন, পেরেক, ব্যালাস্ট, টেলিগ্রাফের খুঁটি—এ-সবের জন্যে। পশ্চিম রেলপথে একেবারে পোয়াবারো··· এমনকী রেলের কাজ শুরু হবার আগেই, গুদোমে কী-কী লাগবে, কাকে-কাকে কন্‌ট্র্যাক্ট দেবে সেতু আর স্টেশনগুলোর···আর মোটর রাস্তা—সেখানকার ভেলকিটা তো আরো সহজ,···অথচ ধরাছোঁয়ারও উপায় থাকবে না কারু : প্রকল্পে থাকবে রাস্তা হবে আট মিটার চওড়া, অথচ আপনি গাড়ি হাঁকিয়ে যাবার সময় দেখতে পাবেন সে শুধু সাড়ে-সাত মিটার। একবার ভেবে দেখুন চারশো কিলোমিটারে মুনাফার বহরটা কী-রকম দাঁড়ায়।'

সে-রাতে শহরে গুলিগোলার আওয়াজ শোনা গেলো।

'কী সব মূর্খতা!' বললেন রাষ্ট্রদূত। 'লাতিন আমেরিকায় হুনৃতার অভ্যুত্থান সবসময়েই সফল হয়।'

'অধম ব্যাপার এটাই যে লাশগুলো কোনোটাই কোনো বড়ো ক্লাবের সদস্য বা ধনী পাড়ার লোকেদের নয়,' তুমি বলো। 'লাতিন আমেরিকার গোলাগুলিরা চিরকালই গরিবগরবাদের মধ্যেই নিজেদের আটকে রেখেছে।'

৩

আরেকটা সোমবার (কোন্ সোমবার, জানি না)

বিশ্রী লাগছে। একঘেয়ে। ক্লান্তিকর। ক্লান্তিকর। ক্লান্তিকর। আর এমন-সব জিনিশ আমাকে ঘিরে আছে আমার একঘেয়েমির মধ্যে যারা নতুন কতগুলো উপাদান যোগ ক'রে দিয়েছে। ব্যাপারটা আদৌ বন্দীদশা নয়, তার চেয়েও বেশি : এই-যে আমি ইচ্ছে করলেই বেরুতে পারি না, এমনকী কয়েক পা দূরের ঐ সিনেমা-হলটি অব্দি যে যাবার উপায় নেই (দূতাবাসের বাইরে দুজন প্রহরী মোতায়েন থাকে), কিংবা এই-যে আমার চৌহদ্দি এখন একটা ঘিঞ্জি ঘর আর ছোট্ট বিছানাতেই হ্রস্বীভূত, এটা সত্যি ; শিয়রের কাছের টেবিলে রয়েছে এক বাক্স ক্যাম্বেলের স্যুপ, দেয়ালের একপাশে জেনারেল ইলেকট্রিক কম্পানির একটা ক্যালেণ্ডার (তাতে দেখা যায় কলোরাডোর গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন, সান্ ফ্রান্‌সিস্কোর গোল্ডেন গেট, রকি মাউণ্টেন, ট্রাউট-শিকারী ট্রলার ইত্যাদি সব দৃশ্য), অন্য পাশে এক গ্রামোফোনের রেকর্ড কম্পানির ক্যালেণ্ডার, এখনও যার তিনটে পাতা বহাল আছে, যেগুলো

উৎসর্গিত হয়েছে ভান্দা লান্দোভ্স্কা, অ্যাল জনসন, এলিজাবেট শ্‌ভার্‌ৎকোফ্‌, লুই আর্মস্ট্রং, দাভিদ ঐস্ট্রাখ আর আর্ট টাটুমের উদ্দেশে। কিন্তু এদের চেয়েও অধম জানলার বাইরের দৃশ্য। উলটো দিকের বাড়িটার খাবার ঘরের জানলা দিয়ে তাকাবার পক্ষে অরণ্যানীর অঘটনপটীয়সী কুমারী দেবীর চার্চের ধনুকখিলান একটা চূড়ান্ত উদ্রম বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্থাপত্য—স্বাভাবিক গ্রামোফোনের চোঙ-মার্কা গম্বুজটি—১৯১০-এর বিশুদ্ধ গথিক রীতিতে তৈরি, সারাক্ষণ আমার ওপর চার্চের উপাসনার লাতিন কথাগুলোর বোমা বর্ষায়। অ্যাদ্দিনে একটি সান্ধ্য প্রার্থনাগীত আমার মুখস্থ :

দুম এস্‌সেৎ রেক্স ইন্‌ আক্কুবিতু স্যুও
নার্দুস মেয়া দেদিৎ ওদোরেম স্যুয়াভিতাস্‌।

[রাজা যখন তাঁর শয্যায় সুখাসীন, তখন আমার চন্দন গাছের মাধুর্য তার সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছিলো।]

আর এই বন্দিত্বের দিনের পর দিনের পর দিন এইভাবে কাটাবার পর, এই প্রার্থনাগীতটাই আমার সাল-তারিখের সব বোধকে গিলে খেয়েছে। আমি জানলা দিয়ে তাকাই গোমেস ভ্রাতাদের লোহালক্কড়ের দোকানের দিকে (১৯১২তে প্রতিষ্ঠিত, সামনে পড়া যায়) আর সেখানে যে-সব জিনিশ বেচা হয় তাদের সাল-তারিখহীন প্রাচীনতায় আমি ডুবে যাই। গোমেস ভ্রাতারা কী-সব বস্তু ও যন্ত্রপাতি শস্তায় বিক্রি করে, তা দেখলে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিজলি বাতির বাল্‌ব অব্দি মানুষের শিল্পায়নের পুরো ইতিবৃত্তটাই একনজরে চোখে প'ড়ে যায় : ইউলিসিসের দড়িদড়া, হালের খুঁটি আর নোঙর; ওজনযন্ত্র আর পরিমাপিকা, যা মনে করিয়ে দেয় সুদূরতম অতীতকে, সেই যখন আদিম মানুষ প্রথমবার ফলমূল মাছ-মাংস আন্দাজে বা করগুণে বিক্রি করা বন্ধ করেছিলো, সেই যখন প্রথম ওজন করতে শুরু করেছিলো পণ্য, আর এইভাবে ব্যাবসা-বাণিজ্যে সুগম ক'রে দিয়েছিলো আইন-আদালত ও জজসাহেবদের প্রবেশপথ; রন্ধ্রময় শিলায় তৈরি হামানদিস্তা, এ-দেশের আদিম মানুষ যা ব্যবহার করতো ঠিক সে-রকম; ছোটো-বড়ো হাপর, যার গায়ে পুরোনো কিংবদন্তিগুলোর ছাপ; ডাইনিদের পানভোজনের হাঁড়িকড়া; চৌকো চ্যাপটা এস্পানি পেরেক, আধ বিঘৎ লম্বা, যা ভেদ ক'রে গিয়েছিলো হেসুস ক্রিস্তোর শরীরের মাংস, আর কিছু ভারি-ভারি নিড়ানি, এখানকার গাঁয়ের লোকদের যা পছন্দ, তাদের আকার আদিকাল থেকেই এক, হাতলগুলো তেমনি প্রচণ্ড নিরেট, ঠিক যেমনটা হাতে ক'রে ছিলো লাফাতে চাষীরা, কৃষি ও রাখালিয়া

জীবনের মিনিয়েচার ছবিতে (প্রায় সবসময়েই তাদের অনুষঙ্গ মার্চ মাস) মধ্যযুগীয় প্রহরপুঁথিগুলোয়। এ-সব দেখে-দেখে বেদম যখন বমি পায়, আমি গিয়ে দাঁড়াই সামনের দিকের জানলায়, যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সেই বিশাল মার্কিন বিপণিসংস্থার খেলনাবিভাগ। আর সেখানে, চার্চ থেকে অনর্গল-নিঃসৃত সমস্ত সাড়াশব্দ, উপদেশ ও স্তবস্তুতির মধ্যে, গোমেস ভ্রাতাদের লোহালক্কড়ের দোকানের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির সুপ্রাচীনতার মধ্যখানে, দাঁড়িয়ে আছে—ডনাল্ড ডাক, আদি ও অকৃত্রিম, অনড় এবং অবিচল। এই-যে তিনি, পিজবোর্ডের গায়ে প্রাণবন্ত, নারঙা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দোকানের জানলার এক কোণায়, প্রবল প্রতাপে শাসন করছেন খুদে-খুদে চলন্ত রেলগাড়ি, কাউবয়দের পিস্তল, তীরভর্তি তূনীর, আড়কাঠের গায়ে রঙিন পুঁতি বসানো ঠেলাগাড়ি। এই-যে তিনি জানলাটায়, যদিও হররোজ প্রায় দশ-বারো বার তিনি বিকিয়ে যান। যখনই কোনো বাচ্চা ব'লে ওঠে, 'ঐ-যে, ওটা চাই, ঐ-যেটা জানলায় আছে,' এক স্ত্রীলোকের হাত পাকড়ে ধরে তার নারঙি ঠ্যাংগুলো, আর তারপর চট ক'রেই হুবহু একরকম দেখতে আরেকটা ডনাল্ড ডাক বসিয়ে দেয় তার জায়গায়। একই জিনিশকে হুবহু একরকম আরেকটাকে দিয়ে বদল করার এই অবিশ্রাম রীতি, একই বেদিতে একই ভঙ্গিতে ঠায় দাঁড়ানো, আমাকে চিরন্তনতার কথা ভাবাতে শুরু ক'রে দিলো। হয়তো ভগবান এমনি ভাবেই মাঝে-মাঝে ছুটি পান তাঁর কাজ থেকে, কোনো বৃহত্তর (প্রবলতর ?) শক্তি (দেবজননী ? ভগবানদের মায়েরা ? গ্যেটে এ-ব্যাপারে কী-একটা বলেছিলেন না একবার ?) যিনি কি না চিরজীবিতার রক্ষয়িত্রী, বদলের মুহূর্তে, যখন কিনা প্রভুর আসন শূন্য, যদিও একটুক্ষণের জন্যে, পর-পর ঘটিয়ে দেন রেল দুর্ঘটনা, বিমান পতন, অ্যাটলান্টিকে জাহাজডুবি, যুদ্ধবিগ্রহ, মারী ও মন্বন্তর। এমনি-কোনো অনুমান ও তত্ত্ব জরুরি ছিলো মার্সিওসের প্রশংসনীয় দেবনিন্দাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে, যে-দেবনিন্দায় এটাই বলা হয়েছিলো যে কোনো বদ জগৎকে তৈরি করতে পারে কেবল কোনো বদ ভগবানই, কোনো অপদেবতা। খেলনার দোকানের ডনাল্ড ডাক আমাকে জেনোর তীরের কুতর্কটা নিয়েও ভাবালো। সদানিশ্চল, সবসময়-একরকম, সে তবু পশ্চাদ্ধাবন করেছিলো এক ক্ষিপ্র নিক্ষেপপথ, দিনে পনেরো-কুড়িবার যার নবীভবন, যা তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো নগরীর দূর-দূর তল্লাটে, শহরতলিগুলোয় ; আমার কাছে সে অবশ্য সময়হীনতারও প্রতীক, ছোট্ট বিদ্যুৎচলা রেলগাড়িটা যে-রকম : রেলগাড়িটা অবিশ্রাম চলেছে তার অনিঃশেষ যাত্রায়, দিনের পর দিন, অহরহ, তার ঐ তিন মিটার লম্বা রেলপথের

ঘূর্ণিপাকে, মোড় ফেরবার সময় সবসময় যাতে আপনা থেকেই জ্ব'লে ওঠে খুদে এক লাল বাতি।

'আজ কি শুক্রবার ?' আমি রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীকে শুধোই।

'উঁহু, সোমবার।'

কিন্তু খবরকাগজ পড়ছিলুম না আমি। জেনারেল মাবিলান ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সম্বন্ধে বিস্তর জানি আমি, বড্ড-বেশি জানি। আমি অনুমান করতে পারি তিনি তাঁর অ্যাডজুটান্টকে জিগেশ করছেন : 'সপ্রতিভা রুচিমতী মেমসাহেবদের ব্যাপারটা কী, সেই যারা নিজেদের কথা নিজেরাই ব'লে দিতে পারে ?'

'আমি খোঁজ লাগিয়েছিলুম, জেনারেল। তাদের হদিশ দিতে পারে কেবল একজনই—হিপ্পোলিতা নামে এক বেশ্যাউলি, যার আস্তানা তাদেয়ো পার্কে।'

'লিউটেনান্ট, এ-পাড়ার আশপাশে একটা বাড়ি চাই ও-রকম।'

'নিশ্চয়ই, জেনারেল।'

আমি জানলায় ফিরে যাই, দেখি তক্ষুনি অষ্টাদশ ডনাল্ড ডাকটি উধাও হ'য়ে গেলো, এবং পরক্ষণেই তার জায়গায় এসে দাঁড়ালো উনিশ নম্বর।

৪

এক সোমবার, যেটা শুক্রবার হ'লেও হ'তে পারে

সীমান্তবিরোধ নিয়ে রাষ্ট্রদূত খুবই ভাবিত, বিমূঢ় ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছেন ; বিরোধ মেটার বদলে, কোনো সম্ভাব্য সমাধানের হদিশ পাবার বদলে, কোন্দলটা ক্রমেই আরো দানা পাকিয়ে উঠেছে ; দস্তুরমতো ঘোরালো ব্যাপার ; বিশেষ ক'রে জেনারেল [হেনেরাল] মাবিলান এখন যেহেতু সামরিক অভ্যুত্থানের রক্তপাত থেকে লোকের নজর অন্যত্র সরাতে চাচ্ছেন—এখনও রোজ রাতেই গুলির আওয়াজ শোনা যায়—আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে লোকের মধ্যে দেশপ্রেমের তড়িৎপ্রবাহ ছড়িয়ে দেবার জন্যে চেষ্টার কোনো কসুর নেই। 'তোমরা তো সেই বীরদেরই সন্তান, যারা…,' 'আমাদের সীমান্ত হোক গৌরবোজ্জ্বল সমরক্ষেত্র,' 'তাঁদেরই গুণ গাই যাঁরা সত্যি-সত্যি গুণী,' 'দেশের জন্যে মরার চাইতে বড়ো-কোনো…' ইত্যাদি-ইত্যাদি সব জিগির অনর্গল নির্গত হ'তে থাকে বেতার ও দূরদর্শন থেকে। রাজধানীর লোকদের মধ্যে গভীরতর অভিঘাত সৃষ্টি করার জন্যে—রাজধানীতে এখনও

তাঁর শত্রুসংখ্যা বিস্তর—জেনারেল মাবিলান ঘোষণা করলেন যে অমুক দিনে, শরণার্থী জানেই না সেটা মাসের কত তারিখ, ২, ১১ না কি ২৬—শহরে বিমান-বিধ্বংসী প্রতিরোধব্যবস্থার জমকালো মহড়া হবে। বাসিন্দাদের সবাইকে একটি ক'রে প্রশ্নোত্তর দেয়া হয়েছে—তাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেমন ক'রে 'স্বাভাবিক-ভাবে-নেমে-আসা' ক্ষেপণাস্ত্রের ঘায়ে জখম হওয়া থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

'কোনো খবরের কাগজ খুলে মাথা ঢাকলে কি নিজেকে বাঁচানো যাবে?—না—।' 'কোনো খোলা ছাতা কি ঠেকাতে পারবে?—না।'—'কোনো গাড়ির আড়াল কি মোটামুটি নিরাপদ?—হ্যাঁ, তবে খেয়াল রাখা ভালো যে পাশের জানলাগুলো যেন নামানো থাকে, আর যথাসম্ভব গাড়ির ঠিক মাঝখানে যেন বসা হয়। আরো, বিশেষ যখন বিমানবিধ্বংসী কামান থেকে গোলা ছোঁড়া শুরু হবে, গাড়িগুলো তখন যেন কাছের ফুটপাতের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় আর সব আলো যেন নেভানো থাকে।'

অবশেষে সেই মহারজনী এসে হাজির। জেনারেল মাবিলান, পুরোদস্তুর সামরিক উর্দিতে মোড়া আর চিবুকবন্ধনী ঢুকে গেছে তাঁর ডবোল চিবুকের ভাঁজে—তিনিই হলেন প্রধান দৃশ্যকার এবং প্রদর্শনীর সর্বাধিনায়ক—তিনি একটা ছোটো টিলার ওপর থেকে বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো পরিবৃত হ'য়ে মহোৎসব পরিচালনা করলেন। সংকেত। সাইরেন। নিষ্প্রদীপ। নিরেট অন্ধকারে কী-হয় কী-হয় ভাব। 'ঐ শুনুন, শত্রুর বিমানের আওয়াজ এর মধ্যেই শোনা যেতে শুরু করেছে।' কিন্তু উষ্ণ মণ্ডলে যেমন হ'য়েই থাকে, বলা নেই কওয়া নেই, নির্দিষ্ট দিনের চমৎকার আবহাওয়াকে ঢেকে ফেলে চারপাশের পাহাড় থেকে দ্রুত ধেয়ে এলো কুয়াশা। 'শত্রুপক্ষের বিমান' জ্যোতির্ময় একটা পর্দা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না। আর নিচের গোলন্দাজদেরও মাতঙ্গধূসর মেঘমালা ছাড়া আর-কিছুই চোখে পড়লো না। 'সবাই একসঙ্গে—ফায়ার!' রোষে ক্ষিপ্তপ্রায় জেনারেল মাবিলান চেঁচিয়ে হাঁকলেন। পরের আধঘণ্টা সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। বিমানগুলো আসে, যায়, তাত্ত্বিক গোলা-গুলি সম্বন্ধে কোনোই আন্দাজ নেই তাদের, কেননা তারা যেখানটায় নেই সবসময় সেখানটাতেই কামান তাগ ক'রে গোলা দাগা হ'লো। অবশেষে তারা ফিরে এলো বিমানবন্দরে। যখন সব শেষ হ'য়ে গেলো জেনারেল ফিরে গেলেন রাষ্ট্রপতিভবনে, মেজাজ বিতিকিচ্ছিরি তেরিয়া।

'আবহাওয়াবিদদের সব ক-টাকে জেলে পোরো,' হাঁকলেন তিনি।

'গরিব পাড়াগুলোয় গুলিগোলার "স্বাভাবিক পতনের" ফলে বিস্তর লোক

হতাহত। শুধু ভাবুন একবার, ওদের বাড়ির ছাতগুলো কার্ডবোর্ডের। সব শুদ্ধু সতেরোজন মারা গেছে আর বেশকিছু বাচ্চা জখম হয়েছে,' শান্তগলায় অ্যাডজুট্যান্ট জানালে। 'খবরটা আমরা চেপে যেতে বলবো?"

'এক্ষুনি। আর খবরকাগজগুলোকে জানিয়ে দাও যে একটু ট্যাঁ-ফোঁ করলেই সেনসরশিপ চাপিয়ে দেবো।'

সীমান্তবিরোধ যতই বিষম ঘুলিয়ে যেতে লাগলো, ততই আমি ভাবতে লাগলুম আমি হয়তো রাষ্ট্রদূতের কোনো কাজে লাগতে পারবো, যাঁর সুন্দরী স্ত্রী কাল আমাকে বলেছিলেন: 'ও একটা আকাট!' কী-যে খুঁজে পাবো, সে-সম্বন্ধে আমার অবশ্য কোনো সঠিক ধারণা ছিলো না, কিন্তু তবু আমি সীমান্তের ওপারের দেশটার ইতিবৃত্ত পড়তে শুরু ক'রে দিয়েছিলুম। দেশটাকে "আবিষ্কার" করেছিলেন ক্রিস্তোবাল কোলোন (কলম্বাস), তাঁর চতুর্থ সমুদ্রযাত্রায়, আর তিনি যদি এ-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য না-ক'রে গিয়ে থাকেন—আমাদের বর্তমান জ্ঞান সবই এক মূর গণিতজ্ঞের মরণোত্তর রচনা থেকে আহৃত, সে-সময় এই মূর ছিলেন ঐ জাহাজের ক্যাবিনবয়, এবং তিনি ছিলেন ইব্রাহিম আল জারকালির বংশধর, জ্যোতিষবিদ্যা সম্বন্ধে যাঁর লেখা একটা পুঁথি আছে—তা, কলম্বাস যদি এ-সম্বন্ধে কিছু ব'লে না-গিয়ে থাকেন, আবারও বলছি, তার কারণ হ'লো কলম্বাস সেদিন ক্যাবিনে শুয়ে জ্বরের ঘোরে কাৎরাচ্ছিলেন, দামি মখমলে সেজেগুজে হাতে পতাকা নিয়ে, 'অমুকের নামে এই দেশের দখল নিলুম' ইত্যাদি-ইত্যাদি আওড়াতে তাঁর আদৌ উৎসাহ হয়নি! অন্য-কাউকেও তিনি পাঠাতে চাননি, কারণ তিনি জানতেন, পতাকাধারীর মুণ্ডুটাই হয়তো সোনা-বসানো চামড়ার উত্তেজক মসৃণতায় ঘুরে যাবে, বিশেষত যখন সেটি সমুদ্রের তুখোড় হাওয়ায় পৎ-পৎ উড়ে চোখে-মুখে এসে পড়বে। কাজেই রাজকেতন থেকেই যায় যথাস্থানে, জাহাজগুলো নোঙর ওঠায়, আর সীমান্তের দেশটা যে সত্যি "আবিষ্কৃত" হয়েছিলো, তার কোনো নথি থাকে না, যদিও অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে ধুন্ধুমার এক তর্কাতর্কি লেগেই থাকে, বারে-বারেই দু-দলের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে, যাদের একদল বলে 'নামা হয়েছিলো ডাঙায়,' আরেক দল বলে, 'মোটেই হয়নি,'—যতদিন-না আরব্য ভাষাগুলো অধ্যয়ন করার জন্য স্থাপিত এক মহাবোধি প্রতিষ্ঠান আল জারকালির বিবরণটা প্রকাশ করলে। একবার ঐ সীমান্ত দেশটি "আবিষ্কৃত" হ'তেই তাকে সভ্য করার প্রথম দলটা এসে হাজির; রাজ্যপাল, এনকোমেনদেরো (মুদির দল), ধ'সে-যাওয়া বড়োলোক ও অভিজাত সেভিইয়ের বদমায়েশ মাছ-ব্যাপারী—এদের সবাই আবার পাশা খেলার জোচ্চুরিতে সমান ওস্তাদ, নতুন-

পুরোনো সব মদেই সমান আসক্ত, এবং ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের উপপতিত্ব ও মালিকানায় সমান তালেবর। তারপর এলো দ্বিতীয় দলটি: বিচারপতি, ফেরেব্বাজ উকিল, গোমস্তা দেওয়ান ও খাতাঞ্চি, যারা দু-শতাব্দীরও বেশি সময় ধ'রে আপ্রাণ চেষ্টায় উপনিবেশটিকে রূপান্তরিত ক'রে দিলো এক বিশাল র‍্যান্‌চে, গোরু-মোষ অগুনতি, যতদূর চোখ যায়, চোখজুড়োনো গমের খেত—অবশ্য মাঝে-মাঝে দু-চারটে ছোটো জমিতে এস্পানিয়ার শাকসব্জিও ফলানো হ'তো। কিন্তু একদিন, কেমন ক'রে কে বলবে, সে-দেশে 'সামাজিক চুক্তি'র একখানা বই এসে হাজির—রচয়িতা জ্‌াঁ-জাক রুসো, জেনিভার নাগরিক (*Foediris aequo, dictamy leges*)। আর তার পরেই 'এমিল'। রুসোরই এক চেলার কাছে তালিম পেয়ে স্কুলের ছেলেরা বই-পড়া শিকেয় তুলে ছুতোর-বিদ্যে আর প্রকৃতিবিজ্ঞান নিয়ে উঠে-প'ড়ে লাগলো—আর প্রকৃতিবিজ্ঞান মানে হ'লো তারানতুলার খপ্পরে-পড়া কোলিওপ্তেরা আর গিরগিটিগুলোকে কেটে-চিরে দেখা। র‍্যান্‌চের পিতাদের মধ্যে যাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি তিনি তো রেগে টং: যারা তুলনায় সরলমতি তারা শুধু জিগেশ করলে কবে সাভয়ারের আবির্ভাব হবে। আর তারপর, যাকে বলে শেষ খড়, এসে হাজির এক ফরাশি 'বিশ্বকোষ'। ভলতেয়ারের চেলা, এক পুরুৎ, আমেরিকায় তার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটালো। অনুস্যূত হ'লো উদারনৈতিক ধ্যানধারণায় ভরা জাতিবন্ধুদের এক স্বদেশপ্রেমী সংঘ। আর তারপর এক চমৎকার দিনে শোনা গেলো আওয়াজ 'পাত্রিয়া ই মুয়ের্তে', স্বদেশ অথবা মৃত্যু। এবং এইভাবে, শহিদদের রক্ষাব্যূহের আড়ালে, আস্ত একটা শতাব্দী গেলো ঘন-ঘন সামরিক অভ্যুত্থান, রাতা-রাতি সরকারবদল, বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, রাজধানীর উদ্দেশে কুচকাওয়াজ, ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বর্বর একনায়ক ও আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরাচারীদের টানাহেঁচড়ায়। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ওগুস্ত কোঁৎ-এর ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মপ্রচারের কতগুলো বিফল চেষ্টাও হয়েছিলো; মন্দির তৈরি হয়েছিলো একাধিক, আর দৃষ্টবাদের ধরতাই-গুলোও ফলাও ক'রে বিশদভাবে প্রচার করা হয়েছিলো। স্বভাবতই, পুজো করা যায় এমন-কোনো দৃশ্যমান সাধুসন্ত ছাড়া এ-জাতীয় কোনো ধর্মের পক্ষে সাফল্যের সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিলো খুবই কম, অতএব বিফল হ'লো দৃষ্টবাদের ক্যালেণ্ডারও, যার একেকটা দিন উৎসর্গ করা হয়েছিলো কোলুমেলা আর কাণ্ট, তিব্বতী তান্ত্রিক আর ত্রুবাদুরদের স্মৃতিতে (তাদেরও বিশেষ-বিশেষ স্মরণীয় দিন ছিলো), এমনকী পারাগুয়াইয়ের একনায়ক ডক্টর ফ্রান্সিয়ার উদ্দেশেও একটা দিন উৎসর্গ করা হয়েছিলো; আর এ-সবই ঘটছিলো কি না এমন-এক দেশে যেখানে সন্ত জোসেফ,

সন্ত নিকোলাস, সন্ত ইসিদোরে (যিনি বৃষ্টি থামিয়ে রোদ ওঠান) আর কাতাতুশের কুমারী দেবী (যিনি একে তো সুন্দরী কৃষ্ণকুন্তলা তায় আবার তুকতাক ক'রে অঘটন ঘটাতে পারেন) ছিলেন সকলের নয়নের মণি। আর এইভাবেই চলেছিলো, দেশটা অধঃপাতে, পুরোপুরি ছারখার, গৃহপালিত পশুগুলো গোরুচোর আর সশস্ত্র দস্যুদের কুক্ষিগত, কৃষিকাজ শেষ দশায় ; শেষটায় সেই ১৯০৭ সালে সীমান্তের প্রশ্নটা প্রথমবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এই প্রশ্নের সুরাহা করার জন্যে দুটি কমিশন বসানো হয়েছিলো, সেই সঙ্গে আবার এক আলেমান কমিশনও তাদের নানারকম ব্যাবহারিক শলা-পরামর্শ দিয়েছিলো ব'লেও এক অভিযোগ উঠেছিলো ; কিন্তু তারা যে ইতিমধ্যেই এক চমৎকার সমাধান বাৎলে দিয়েছিলো, সেটা আমাদের প্রতিবেশীরা একেবারেই ভুলে গিয়েছে ব'লে আমার হ'লো। আমার নিজের দেশের লোকেরা চেয়েছিলো—এবং এখনও চাচ্ছে—গভীর জঙ্গলের পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার জমি। এদিকে এই জঙ্গলে এই কুমারী জমির এমন-একজনও মালিক পাওয়া যাবে না যে আমার দেশের লোক ; কারণ আমাদের দেশে আবার লোকজন ভাসতে-ভাসতে কেবলই চ'লে আসে রাজধানীর দিকে। অন্যদিকে, সীমান্ত দেশের অনেকেই আবার সেখানে থাকে। সমাধান : দুটি দেশই ইরিপারে নদীর জল ব্যবহারের সুযোগ পাবে। সীমান্তরেখা আসলে যতটা-না বাস্তব তার চেয়েও ঢের-বেশি তাত্ত্বিক—এবং যথাস্থানেই সে থেকে যাবে এর ফলে। কিন্তু এই অধিকারের বিনিময়ে আমাদের প্রতিবেশীদের জোগাতে হবে বিশেষ কতগুলো সুযোগ-সুবিধে—এবং সে-সব সুবিধে আমাদের উপনিবেশগুলোকেও দিতে হবে—যদিও, সত্যি-বলতে, আমাদের কোনো উপনিবেশই নেই— ; যারা ঐ বিবদমান অঞ্চলে গিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের চাষবাসের যন্ত্রপাতি জোগাতে হবে, ভাইবেরাদর হিশেবে তাদের মেনে নিতে হবে, কারণ প্রথম যারা ঐ অঞ্চলে গিয়ে বসতি বা খামার গড়েছিলো তারা সত্যি সীমান্তের এ-পাশে আছে না ও-পাশে, না কি দু-দিকেই আছে তাদের দু-পা, এটা ঠিক করাই মুশকিল। তাছাড়া, যাকে সীমান্ত এলাকা ব'লে ভাবা হয়, সেখানে যারা জমি নিতে চাইবে তাদের আরো সুবিধে দিতে হবে, দিতে হবে অধিগম্যতার অধিকার এবং যাবতীয় শুল্ক থেকে অব্যাহতি।

'চমৎকার ! বাঃ, চমৎকার !' সমাধানটা শোনবামাত্র রাষ্ট্রদূত ব'লে উঠলেন। 'জেনারেল মাবিলানকে সব্বাই এর ফলে মেনে নেবে—আপোষ-আলোচনায় ওস্তাদ ধীরস্থির বিচক্ষণ লোক হিশেবে। এদিকে তাত্ত্বিক সীমারেখাটা থেকে যাবে

যেমন ছিলো তেমনি, আর ঐ বিমানবিধ্বংসী প্রদর্শনীর প্রহসনের পর আমাদের জেনারেলও এটা ঘোষণা করতে পারবেন যে আর-কোনো যুদ্ধ হবে না। ছেলেরা ফিরে যাবে মায়ের কোলে, লোকজন তাদের বাড়িঘরে। আর আমাদের দেশের মানসম্মানও বেঁচে যাবে।'

'আপনিই এই সমাধানটা খুঁজে পেয়েছেন,' বললেন রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী: আজ সন্ধেয় কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

৫

শুক্রবার থেকে সোমবার, অথবা বৃহস্পতিবার থেকে পরের মঙ্গলবার

সীমান্তবিরোধের ঝামেলাটার সফল সুরাহা হ'য়ে যাবার পরের মাসগুলোয় দূতাবাসে শরণার্থীর কাজ ক্রমেই অপরিহার্য হ'য়ে উঠলো। তারই জন্যে, তামাকের বিনিময়ে সুতিকাপড়ের এক সুবিধেজনক চুক্তি ঘটানো গেছে; তারই জন্যে সেইসব পণ্য নিয়ে লাভের ব্যাবসা শুরু হয়েছে গতকাল অব্দি যা ছিলো একেবারেই নিষ্ক্রিয় এবং যাদের অবদান ছিলো যৎসামান্য—যেমন, পাহাড়ে চড়ার পন্‌চো—লণ্ডনে বোনা, যা কিনা মূলত সীমান্ত দেশের জাতীয় বেশ। তাছাড়া স্থানীয় মিষ্টির দোকানগুলোতে সরবরাহ করা হচ্ছে জমাট শর্করার স্বচ্ছ পাখি, জীব-জন্তুর আকারে বানানো ক্যাণ্ডি, কুমোরদের তৈরি মাটির বোয়মে মোরব্বা; দোকানে-দোকানে এখন যে-কেউ দেখতে পাবে চামড়ার কোমরবন্ধ, বুরুশ-করা পশুলোমের টুপি, চৌকো গলার চোলি—সীমান্তের ওপারের কারখানাগুলোয় যা বানায়; এ-সব তো বটেই, কিন্তু তাছাড়াও আছে পোড়ামাটির তৈরি চার্চের মডেল—তাতে আবার সন্তদের মূর্তিও বসানো—গাঁয়ে তৈরি গিটার, পেতাচোর বেহালা (পেতাচোয় আবার সকলেই বাদ্যযন্ত্র বানায়); আর, এ-সবের ফলে, আগে যেখানে আমাদের দেশে পণ্য-বিপণনে নিজস্ব কোনো লোককথা বা কিংবদন্তি ছিলো না, এখন সেখানে এক কাল্পনিক লোকপুরাণের বিকাশ ঘটতে লাগলো, বিদেশী পর্যটকদের কাছে যার আকর্ষণ আবার দারুণ…কিন্তু এইই সব নয়; শরণার্থী, এখন সে নিষ্ক্রিয়তায় বেজায় অসুখী—সে যেন বেঁচে আছে কোনো বিপুল সময়হীনতার মধ্যে, যেখানে শুক্রবারের সঙ্গে সোমবার, বৃহস্পতিবার অথবা মঙ্গলবারের কোনোই তফাৎ নেই,

সন্ত নিকোলাস, সন্ত ইসিদোরে (যিনি বৃষ্টি থামিয়ে রোদ ওঠান) আর কাতাতুম্বের কুমারী দেবী (যিনি একে তো সুন্দরী কৃষ্ণকুন্তলা তায় আবার তুকতাক ক'রে অঘটন ঘটাতে পারেন) ছিলেন সকলের নয়নের মণি। আর এইভাবেই চলেছিলো, দেশটা অধঃপাতে, পুরোপুরি ছারখার, গৃহপালিত পশুগুলো গোরুচোর আর সশস্ত্র দস্যুদের কুক্ষিগত, কৃষিকাজ শেষ দশায় ; শেষটায় সেই ১৯০৭ সালে সীমান্তের প্রশ্নটা প্রথমবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এই প্রশ্নের সুরাহা করার জন্যে দুটি কমিশন বসানো হয়েছিলো, সেই সঙ্গে আবার এক আলেমান কমিশনও তাদের নানারকম ব্যাবহারিক শলা-পরামর্শ দিয়েছিলো ব'লেও এক অভিযোগ উঠেছিলো ; কিন্তু তারা যে ইতিমধ্যেই এক চমৎকার সমাধান বাৎলে দিয়েছিলো, সেটা আমাদের প্রতিবেশীরা একেবারেই ভুলে গিয়েছে ব'লে আমার হ'লো। আমার নিজের দেশের লোকেরা চেয়েছিলো—এবং এখনও চাচ্ছে—গভীর জঙ্গলের পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার জমি। এদিকে এই জঙ্গলে এই কুমারী জমির এমন-একজনও মালিক পাওয়া যাবে না যে আমার দেশের লোক ; কারণ আমাদের দেশে আবার লোকজন ভাসতে-ভাসতে কেবলই চ'লে আসে রাজধানীর দিকে। অন্যদিকে, সীমান্ত দেশের অনেকেই আবার সেখানে থাকে। সমাধান : দুটি দেশই ইরিপারে নদীর জল ব্যবহারের সুযোগ পাবে। সীমান্তরেখা আসলে যতটা-না বাস্তব তার চেয়েও ঢের-বেশি তাত্ত্বিক—এবং যথাস্থানেই সে থেকে যাবে এর ফলে। কিন্তু এই অধিকারের বিনিময়ে আমাদের প্রতিবেশীদের জোগাতে হবে বিশেষ কতগুলো সুযোগ-সুবিধে—এবং সে-সব সুবিধে আমাদের উপনিবেশগুলোকেও দিতে হবে—যদিও, সত্যি-বলতে, আমাদের কোনো উপনিবেশই নেই— ; যারা ঐ বিবদমান অঞ্চলে গিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের চাষবাসের যন্ত্রপাতি জোগাতে হবে, ভাইবেরাদর হিশেবে তাদের মেনে নিতে হবে, কারণ প্রথম যারা ঐ অঞ্চলে গিয়ে বসতি বা খামার গড়েছিলো তারা সত্যি সীমান্তের এ-পাশে আছে না ও-পাশে, না কি দু-দিকেই আছে তাদের দু-পা, এটা ঠিক করাই মুশকিল। তাছাড়া, যাকে সীমান্ত এলাকা ব'লে ভাবা হয়, সেখানে যারা জমি নিতে চাইবে তাদের আরো সুবিধে দিতে হবে, দিতে হবে অধিগম্যতার অধিকার এবং যাবতীয় শুল্ক থেকে অব্যাহতি।

'চমৎকার ! বাঃ, চমৎকার !' সমাধানটা শোনবামাত্র রাষ্ট্রদূত ব'লে উঠলেন। 'জেনারেল মাবিলানকে সব্বাই এর ফলে মেনে নেবে—আপোষ-আলোচনায় ওস্তাদ ধীরস্থির বিচক্ষণ লোক হিশেবে। এদিকে তাত্ত্বিক সীমারেখাটা থেকে যাবে

যেমন ছিলো তেমনি, আর ঐ বিমানবিধ্বংসী প্রদর্শনীর প্রহসনের পর আমাদের জেনারেলও এটা ঘোষণা করতে পারবেন যে আর-কোনো যুদ্ধ হবে না। ছেলেরা ফিরে যাবে মায়ের কোলে, লোকজন তাদের বাড়িঘরে। আর আমাদের দেশের মানসম্মানও বেঁচে যাবে।'

'আপনিই এই সমাধানটা খুঁজে পেয়েছেন,' বললেন রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী : আজ সন্ধেয় কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

৫

শুক্রবার থেকে সোমবার, অথবা বৃহস্পতিবার থেকে পরের মঙ্গলবার

সীমান্তবিরোধের ঝামেলাটার সফল সুরাহা হ'য়ে যাবার পরের মাসগুলোয় দূতাবাসে শরণার্থীর কাজ ক্রমেই অপরিহার্য হ'য়ে উঠলো। তারই জন্যে, তামাকের বিনিময়ে সুতিকাপড়ের এক সুবিধেজনক চুক্তি ঘটানো গেছে; তারই জন্যে সেইসব পণ্য নিয়ে লাভের ব্যাবসা শুরু হয়েছে গতকাল অব্দি যা ছিলো একেবারেই নিষ্ক্রিয় এবং যাদের অবদান ছিলো যৎসামান্য—যেমন, পাহাড়ে চড়ার পন্চো—লণ্ডনে বোনা, যা কিনা মূলত সীমান্ত দেশের জাতীয় বেশ। তাছাড়া স্থানীয় মিষ্টির দোকানগুলোতে সরবরাহ করা হচ্ছে জমাট শর্করার স্বচ্ছ পাখি, জীব-জন্তুর আকারে বানানো ক্যাণ্ডি, কুমোরদের তৈরি মাটির বোয়মে মোরব্বা; দোকানে-দোকানে এখন যে-কেউ দেখতে পাবে চামড়ার কোমরবন্ধ, বুরুশ-করা পশুলোমের টুপি, চৌকো গলার চোলি—সীমান্তের ওপারের কারখানাগুলোয় যা বানায়; এ-সব তো বটেই, কিন্তু তাছাড়াও আছে পোড়ামাটির তৈরি চার্চের মডেল—তাতে আবার সন্তদের মূর্তিও বসানো—গাঁয়ে তৈরি গিটার, পেতাচোর বেহালা (পেতাচোয় আবার সকলেই বাদ্যযন্ত্র বানায়); আর, এ-সবের ফলে, আগে যেখানে আমাদের দেশে পণ্য-বিপণনে নিজস্ব কোনো লোককথা বা কিংবদন্তি ছিলো না, এখন সেখানে এক কাল্পনিক লোকপুরাণের বিকাশ ঘটতে লাগলো, বিদেশী পর্যটকদের কাছে যার আকর্ষণ আবার দারুণ···কিন্তু এইই সব নয়; শরণার্থী, এখন সে নিষ্ক্রিয়তায় বেজায় অসুখী—সে যেন বেঁচে আছে কোনো বিপুল সময়হীনতার মধ্যে, যেখানে শুক্রবারের সঙ্গে সোমবার, বৃহস্পতিবার অথবা মঙ্গলবারের কোনোই তফাৎ নেই,

এখন সে দূতাবাসের সব কাজকর্মের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রদূত যখন সারাক্ষণ ব'সে নতুন-নতুন সিমেনঁ পড়েন আর নিজেকে ভাবেন স্বয়ং ইন্সপেক্টর মেইজর ব'লে, শরণার্থী তখন মুসাবিদা করে যত-সব কূটনৈতিক চিঠিপত্র, গোপন প্রতিবেদন, সরকারের কাছে পাঠানো যাবতীয় যোগাযোগের পাঠ, স্মারকপত্র ও বিবৃতি। 'মনে হচ্ছে আপনিই যেন আমাদের দেশের সত্যিকার রাষ্ট্রদূত,' কৌস্থলি একদিন তো ব'লেই ফেললেন, হঠাৎ-হঠাৎ দূতাবাসে এসে হাজির হওয়া তাঁর বাতিক (রাষ্ট্রদূতের মতে, কৌস্থলির বাতিক সব শুঁকে-শুঁকে দেখা আর গোয়েন্দাগিরি করা; কৌস্থলির মুখটা তাঁর বেজায় অপছন্দ, সে মুখে হিংস্র-ভীষণ ঘোড়ার ভাব আছে)। তারপর, একদিন, শরণার্থী সোজাসুজি সীমান্তদেশের নাগরিকত্ব নেবার ইচ্ছে প্রকাশ ক'রে বসলো।

'মাথা খারাপ আপনার,' রাষ্ট্রদূত আমায় বললেন।

'আপনি আপনাদের অসাধারণ সংবিধানটি প'ড়ে দেখতে পারেন,' তুমি বলো, বইটা হাতে নিয়ে, পাতা উলটে, নির্ঘণ্টে প্রাসঙ্গিক ধারাটি খুঁজে বার ক'রে, 'দেশে দু-বছর কাটাবার পর যে-কোনো বিদেশীই নাগরিকত্ব চাইতে পারে। এই দূতবাসে আমি তো আপনার দেশের মধ্যেই আছি। আপনাদের সব আইনকানুন মেনে চলেছি। এ-বাড়ির মধ্যে কোনো অপরাধ করলে শুধু আপনার দেশের আদালতেই আমার বিচার হ'তে পারে।'

'কিন্তু···আপনি এ-বাড়িতে দু-বছর কাটিয়ে দেবার কথা ভাবছেন না কি?'

'কয়েক মাস তো এর মধ্যেই কেটে গেছে। তাছাড়া আপনাকে আমি আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই যে লাতিন আমেরিকার এক বিখ্যাত নেতা এক প্রতি-বেশী দেশের দূতাবাসে সাত-সাত বছর রাজনৈতিক শরণার্থী হিশেবে কাটিয়েছিলেন। মানি যে বন্দীজীবনটা জোনাহ্‌র চেয়েও লম্বা, আর সিলভিও পোলিফোর চেয়েও আদৌ কম নয়।'

'বেশ, সে দেখা যাবে। আগে আপনার দু-বছর তো কাটুক।'

'সে উনি ঠিক কাটাবেন,' এমন-একটা আস্থার স্বরে রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী কথাটা বললেন যে তাতে আমি বাকি মাসগুলো সম্বন্ধে জল্পনা করতে শুরু ক'রে দিলুম— দু-বছর পুরো হ'তে কতদিন বাকি? সে-কতদিন আমাকে এই জগতে কাটাতে হবে যে-জগৎটা ঝুলে আছে ভগবানের শাশ্বতকাল আর ডনাল্ড ডাকের সময়-হীনতার মধ্যে?

রাষ্ট্রদূত আজ খুব সকালেই বেরিয়ে গেছেন, ফ্রককোট প'রে, জাতীয় দিবসের

এক সামরিক কুচকাওয়াজে তাঁর যোগ দেবার কথা। রাষ্ট্রদূতের সুন্দরী স্ত্রী আর আমি আমরা দু'জনে চ'লে গেলুম ছোট্ট গ্রন্থাগারটায়, পূর্ববর্তী রাষ্ট্রদূত যেখানে তাঁর জোগাড়-করা বইগুলো রেখে চ'লে গেছেন।

'চনমনে কোনো রসালো বই পাবেন ব'লে আশা করবেন না কিন্তু,' রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী বললেন। 'আগেকার রাষ্ট্রদূত জেদ ধ'রে বসেছিলেন যে তিনি প্রমাণ করবেন, আমেরিকার বিজেতারা—কোন্‌কিস্তাদোরেরা—যাবতীয় চমৎকারিত্ব খুঁজে পেয়েছিলো শিভালরির কাহিনীতে। ওঁর গ্রন্থাগারের উৎসই ছিলো এই ধারণাটা,' (হাত নেড়ে তিনি পুরো ঘরটা দেখালেন), 'আমাদিস দে গাউলা', যাচ্ছেতাই বই, একঘেয়ে, ক্লান্তিকর ; 'পালমেরিন দে ইরকানিয়া'—আরেকটা ক্লান্তিকর বই ; 'এল্‌ কাবাইয়েরো থিফার'—ডবোল ক্লান্তিকর।

আমি তাক থেকে 'তিরান্‌ৎ লো ব্লান্‌ক' পেড়ে নিলুম। 'আর এটা ?'

'তিনগুণ ক্লান্তিকর।'

'তার কারণ সম্ভবত এই যে আপনি কখনোই সেই লোকটির জগতে ঢোকেননি, যাকে সে বলেছে; "আমার জীবনের সুখোল্লাস", নাইটকে যে লুকিয়ে রেখেছিলো এক আধখোলা সিন্দুকে, তারপর বর্ণনা করেছিলো—চাক্ষুষ দেখিয়েছিলো এক বসনহীনা রাজকুমারীর শারীরিক আকর্ষণগুলো আর তাকে বলেছিলো…' (তক্ষুনি চট ক'রে বইটা খুলে) :

> ওহ্‌, তিরান্‌ৎ, প্রভু আমার ! আপনি এখন কোথায় ? সে-কখন এখানে আসবেন আপনি, দেখবেন তাকে, ছোঁবেন তাকে, যাকে আপনি এ-জগতে সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন ? দেখুন, দেখুন, তিরান্‌ৎ, প্রভু আমার—দেখুন রাজকুমারীর চুলের রাশি ; আপনার হ'য়ে, আপনার নাম ক'রে, এই চুলে আমি চুমু খাচ্ছি, কারণ আপনিই তো জগতের সেরা নাইট। দেখুন, দেখুন, রাজকুমারীর চোখ আর মুখ : আপনার হ'য়ে আমি তাদের চুমু খাচ্ছি। দেখুন, দেখুন, তার স্বচ্ছ নিষ্কলুষ দুটি স্তন, আমার দুই হাতের মুঠোয় যাদের আমি ধ'রে আছি—দেখুন কী মুঠোভরা, সুদৃঢ় আর মসৃণ তার স্তন দুটি। দেখুন তার উদরের দিকে তাকিয়ে, তার ঊরুর দিকে। হায়, কী দুর্ভাগা আমি ! কেন আমি আমার জীবন শেষ ক'রে দিচ্ছি না এখানে ? কোথায় আপনি, হে অপরাজেয় বীর ? আপনাকে যখন এত কাতর ডেকে চলেছি, আপনি কেন দেখা দিচ্ছেন না এখানে ?—শুধু তিরান্‌তেরই হাত—আর-কারু নয়—একে স্পর্শ করার যোগ্য, আদর করার যোগ্য—আমি এখন যাকে স্পর্শ

করছি, সেই-তো পরমা, সেই-তো সুভাগী যাকে পেলে যে-কোনো লোকই সুখে ম'রে যেতে চাইবে।

বইটার কতগুলো অংশের রসালো ও চতুর পরিহাসে বেজায় মজা পেলেন রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী। যে-অধ্যায়ে আমার জীবনের সুখোল্লাসের স্বপ্নকে বর্ণনা করা হ'লো সেটা শুনে তিনি হেসেই আকুল, সেই যেখানে রাজকুমারী সুখে গোঙাতে-গোঙাতে বলেছিলো, 'ছেড়ে দাও আমাকে, তিরানৃৎ, আমাকে ছেড়ে দাও।' আর, শুনে হয়তো মনে হবে যে বড্ড পণ্ডিতি হচ্ছে, তবু এটা সত্যি যে 'সেদিন আমরা আর কোনো-কিছু পড়িনি'···আর শেষটায় যখন আমাদের খেয়াল হ'লো যে লোকজন আর সৈন্যরা সারি ভেঙে রাস্তাঘাট দিয়ে চ'লে যাচ্ছে, জাতীয় দিবসের মহাকুচকাওয়াজ শেষ, প্রণয়ীযুগল বুঝলো যে আবার তাদের বেশভূষা প'রে নিয়ে রাষ্ট্রদূতের পুনরাগমনের জন্যে বৈঠকখানায় ব'সে অপেক্ষা করার সময় এসে হাজির হয়েছে। রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী একটা স্মারকপত্র লেখার খাতা তুলে নিলেন :

'পুরোটাই কেবল সংগঠনের ব্যাপার। জাতীয় দিবস আমাদের আট ঘণ্টার জন্যে শান্তি দেয়। শহিদ দিবস দেয় ছ-ঘণ্টা, কারণ মালা দেবার পর পান-ভোজনের ব্যবস্থা আছে। স্বাধীনতার শতবর্ষ দেয় ন-ঘণ্টা, এবং আমরা দুজনে একসঙ্গে ব'সে মধ্যাহ্নভোজ সারতে পারি, কারণ আর-কেউ থাকবে না। জাতীয় শোক পালনের দিন বছরে ছ-টা—অনুষ্ঠানগুলো চলে চার ঘণ্টা ধ'রে, যাবতীয় ভাষণ সমেত। (আমি একটা গুজব রটিয়েছি যে আমার যকৃতের অসুখ আছে, অতএব এ-সব অনুষ্ঠানে আমাকে স্বামীর সঙ্গে যেতে হয় না।) রাষ্ট্রপতিভবনে নববর্ষের উৎসব—ঘণ্টা পাঁচেক তো চলবেই ; জওয়ান দিবস, আট ঘণ্টা, কারণ শোভাযাত্রার পর সমরদপ্তরের সংঘে মধ্যাহ্নভোজ থাকে ; তার সঙ্গে যোগ করো নানারকম কার্নিভাল, রানীর অভিষেক ; আর দূতাবাসগুলোর আমন্ত্রণ—এদের কয়েকটায় অবশ্য আমাকেও যেতে হবে, না-হ'লে ভালো দেখাবে না। কিন্তু তার শোধ তুলবো যখন মহাপুরুষদের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হবে—আর ভগবান জানেন, এ-দেশে মহাপুরুষদের কোনোই অভাব নেই ! আর এইটুকুই শুধু নয়, চার্চের সন্নেসিনিদের আপ্যায়ন আছে, গত শতাব্দীর একজন মহান শিক্ষাবিদের বাড়িতে ফলক বসাবার অনুষ্ঠান আছে ; বাঁধ, সেতু, জাহাজঘাটা ইত্যাদি-ইত্যাদির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছে।'

এমন সময় রাষ্ট্রদূত এসে হাজির, হাঁফাচ্ছেন, ঘাম ঝরছে, কড়া ইস্ত্রি-করা

গলবন্ধটা ভেজা আর কোঁচকানো, মুখে গরমের জন্যে নালিশ, সারাক্ষণ খটখটে রোদের মধ্যে খোলা মঞ্চে ব'লে থাকতে হয়েছে ব'সে মেজাজ বেজায় তিরিক্ষি। 'মার্কিন দূতাবাসের সমরবিশেষজ্ঞ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে আমাদের সাঁজোয়া-বাহিনীগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্নচিহ্ন বৈ আর-কিছু নয়।' তার ওপর, পদাতিক বাহিনী বড্ড ক্লান্তিকর ধুলোর ঝড় তুলেছে, কারণ, এক নতুন বাতিক দেখা দিয়েছে সম্প্রতি : তাদের নাকি হাঁসের মতো থপথপ ক'রে কুচকাওয়াজ ক'রে যেতে হবে।

৬

যে-কোনো বার

কোনো রাজনৈতিক শরণার্থীকে আশ্রয় দেবার জন্যে যে-বিধিটি রচনা করা হয়েছিলো (প্যান-আমেরিকান সম্মেলন, ১৯২৮, ধারা ২, অনুচ্ছেদ ২), যার শর্ত অনুযায়ী 'আশ্রয় দেবার অব্যবহিত পরেই কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে পলাতকের দেশের বিদেশমন্ত্রীকে খবর জানাবার কথা'; রাষ্ট্রদূত বিধিটিকে সম্মান দেখিয়ে তক্ষুনি নির্দেশগুলো পালন করেছিলেন। তার ফলে, সেনাবাহিনীর দুটি লোক সারাক্ষণ সঙিন উঁচিয়ে দূতাবাসের সামনে পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকে, যার দরুন বেশ-খানিকটা অস্বস্তিই হয় আবেদনকারীদের, তাদের সংখ্যা যদিও বেশি নয়, তবু দূতাবাসের এক্তিয়ারের বাইরে তাদের কাজকারবার থাকে। সেটাই বোঝাবে আজ সকালের অবিশ্রাম গুলি-গোলা সোজা তোমার পেটে এসে লেগেছে ব'লে কেন তোমার মনে হচ্ছিলো। তুমি যেখানে আছো, সেখান থেকে কয়েক পা মাত্র দূরে, খেলনার দোকান—তারই কাছাকাছি গুলি খেয়ে বেচারিদের লাশ পড়েছিলো—আর অরণ্যানীর কুমারীদেবীর চার্চের মধ্যকার রাস্তায়, পুলিশ তখনও ছাত্রদের ওপর গুলি চালাচ্ছে; জেনারেল মাবিলান এমনভাবে সংবিধান সংশোধন করতে চাচ্ছিলেন যে আট বছর তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকতো, এছাড়া গণভোটের মাধ্যমে তাঁর আবারও নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা ছিলো—ছাত্রদের বিক্ষোভ ছিলো তারই বিরুদ্ধে। ঐ ছাত্রদের মাঝখানে থাকতে পারলেই আমার ভালো লাগতো, ভালো লাগতো ওভাবে চ্যাঁচাতে, ঢিল নাটবলটু লোহার টুকরো ছুঁড়তে, ঘোড়সোয়ার বাহিনীর লোকদের ঘোড়া থেকে হিঁচড়ে টেনে নামাতে। কিন্তু আমার জন্যে মোতায়েন দুই বিশেষ পাহারোলা মানেই তো আমি একটা সহজ চাঁদমারি—

কিছুই করার জো নেই। তার চেয়েও যেটা বড়ো কথা, আমি-তো বিশদভাবেই জানি ছাত্রদের যে-দলটিকে প্রথম পাকড়ানো হবে তাদের ওপর কী-রকম বিশেষ বর্বরতার সঙ্গে নৃশংস অত্যাচার চালানো হবে; জেলখানাগুলো এতই গিশগিশে ভিড়ে ভরাট যে কখনো-কখনো শেষের দিকে যে-সব বন্দী আসে তাদের বরাতে জোটে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য—তাদের নিয়ে রাখা হয় আশপাশের হোটেলে; জানি তো গেস্টাপো আর মার্কিন এফ-বি-আইয়ের কাছ থেকে শেখা, ইতিমধ্যেই ধ্রুপদী হ'য়ে-যাওয়া, অত্যাচার করার কী-সব নমুনা আছে—কী-সব লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ; একটা পুরোনো মোটরের চাকার ওপর বারো ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পরীক্ষা। কিন্তু ততক্ষণে যাবতীয় মনোবিকারের রোগীরাই এসে হাজির হবে অকুস্থলে: ধর্ষকামী, বিধিসম্মত বলাৎকারী, যাবতীয় বর্ণিত-অবর্ণিত যত ইতর চরিত্র, 'বাজপাখির' হুকুমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। 'বাজপাখি' লোকটার তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের নখগুলো এতই লম্বা আর শক্ত যে চট ক'রেই সে তাদের বসিয়ে দিতে পারে মানুষের গলায়, মুহূর্তে ফুটো ক'রে দিতে পারে শ্বাসনালী। আর বেশ্যার দালাল ও মেয়েধরার ব্যাবসাদারদের কথা না-হয় মুলতুবিই থাক, এখন তাদের পারমিট আর লাইসেন্সও আছে, যাতে তারা সবসময়েই প্রমাণ করতে পারে যে তারা হ'লো, আসলে, রাজ্যপালের রাজনৈতিক গোয়েন্দা-বাহিনী।

তুমি প্রেমে প'ড়ে গেছো; আর এই প্রেমে পড়ার জন্যে অনবরত তুমি তিরস্কার করো নিজেকে, যেন এটা একটা দোষ কিংবা অপরাধ। দর্শনের বিশাল স্তরগুলো যারা ভেদ করেছিলো, রাস্তায় যারা গুলি খেয়ে মরলো, তারা সবাই একই জাতের লোক, হুবহু এক, তফাৎ শুধু এটাই যে এরা কোনো নতুন প্রজন্মের মানুষ; এরা তোমারই সহযোগী, সহযোদ্ধা, আর তুমি-যে একদিন এদেরই মতো ছিলে, তা মোটেই বেশিদিনকার কথা নয়। আর তারাও তো একই লোক, যারা মুখ বেঁকিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিলো: 'জগৎ চালায় দুটি তাড়না: যৌনতা আর মুনাফা।' তারাও একই লোক, যারা তাজ্জব হ'য়ে গিয়েছিলো, যখন দেখেছিলো কয়েকজন বস্তুবাদী দার্শনিক প্রাক-সক্রাতিক পুঁথিগুলোর ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দিচ্ছে যদিও পুঁথিগুলো এতই সংক্ষিপ্ত আর ব্যবচ্ছিন্ন যে তাদের মধ্য থেকে কোনো স্পষ্ট স্বচ্ছ চিন্তার ধারা নিষ্কাশিত ক'রে নেয়াই দুরূহ···আমি জানলা দিয়ে তাকাই: ঐ-যে ওখানে মাটিতে চিৎপাত প'ড়ে আছে আমারই মতো কয়েকজন মানুষ, রক্ত ঝ'রে পড়ছে অনর্গল, বুকে হিঁচড়ে চলেছে বুলেটের ঝাঁকের মধ্যে দিয়ে, ঝাঁকে-ঝাঁকে

যা এখনো বিঁধে যাচ্ছে ওদের ঝাঁঝরা শরীরে। তুমি রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়াও, তাঁর কোলে মাথা রেখে কাঁদতে থাকো।

'বীভৎস! বীভৎস!' তিনি বলেন। 'তোমাদের পুলিশগুলো সব ক-টাই বর্বর!'

'তার চেয়েও অধম, কারণ এখন তাদের শিক্ষাদাতা মার্কিনরা!' তুমি ফুঁপিয়ে কাঁদো। এই কান্নাকাটি তোমার মন ভালো ক'রে দেয়। তারপর তোমাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী তোমাকে তাঁর পাশে শোয়ান। তাঁর শরীরের ওপর শুয়ে তুমি চোখ বোজো, আর অমনি রাত নেমে আসে। কোন্ বারের রাত? তোমার জানা নেই। তারিখ? তোমার কোনো ধারণাই নেই। মাস? তাতে তোমার কিছু এসে-যায় না। বছর? একমাত্র যে-সালটা তুমি এখান থেকে দেখতে পাও সেটা খোদাই করা আছে গোমেস ভ্রাতাদের দোকানের গায়ে: '১৯১২তে প্রতিষ্ঠিত'। 'হয়তো সেটাই কোনো যুগান্তকারী বছর,' তেতো গলায় বলো তুমি। আর তার পরে আরো সংগম, আরো প্রণয়, যা আসলে সময়হীন। সেই যেমন এক ফরাশি গায়ক গাইতো: 'জগৎ যদি-বা শেষ হ'য়ে যায়, চোখে পড়বে না আমাদের।' প্রণয়, রতিসুখ, এই বন্দীশালায়, পলাতকের এই আশ্রয়ে, এই সময়হারা সময়ের মধ্যে, আমার মধ্যে ঠিক সেই অনুভূতি জাগায় কোনো অচেনা বাড়িতে আফিম টেনে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার পর জেগে উঠলে যেমন লাগে, যখন পা দুটো জেগে উঠেছে আর শূন্যে ছুঁড়ে ফেলছে নিজেকে, এল্‌পেনেরের মতো, কারণ কোথায় যে সে আছে, তার কোনো ধারণাই তার নেই। কিন্তু তুমি তো ভালোবাসো রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীকে—তাঁর নাম সেসিলিয়া; তাঁর শ্বেতবাহুর গভীর আলিঙ্গন তোমার কাছে খুব জরুরি। তোমার এই মনস্তাপের মধ্যে তাঁর আলিঙ্গনে তুমি খুঁজে পাও মায়ের মমতা, সেবিকার শুশ্রূষা আর রক্ষিতার উষ্ণতা। সেসিলিয়ার পাশে নিবিড় শুয়ে থেকে, তুমি রাষ্ট্রদূতকে সরিয়ে দেবার বিশদ মৎলব আঁটো। আর্সেনিক চলবে কি? কিন্তু—নিজের ওপর সন্দেহ না-জাগিয়ে পাবে কী ক'রে তুমি আর্সেনিক? পটাসিয়াম সায়ানাইড? সহজে কাজে লাগানো যায়, আর তার 'শারীরিক উচ্ছেদ' চমকপ্রদ সব কৌশলেই সফল করা যায়: বদহজমের জন্যে রাষ্ট্রদূত প্রতিরাতে যে-বড়ি খান, তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া যায় অনায়াসে; বড়িগুলো কোনো পাশার মতো পাশাদানে ঝাঁকানো হবে। আর তারপর অপেক্ষা ছাড়া আর-কিছুই করার নেই। আজ হ'লো না। আজ হ'লো না, নিশ্চয়ই কাল হবে, মাত্র তো তিনটে বড়িই আছে শিশিতে। আর যখন মাত্র দুটি বাকি থাকবে,

আমরা অন্ত্যেষ্টির বন্দোবস্ত করার ফন্দি আঁটবো, কী-সব জরির ফিতে আর ভূষণে সাজিয়ে মৃতদেহটিকে নিয়ে যাওয়া হবে কবরে। আর যখন কেবল একটাই বাকি থাকবে? অকহতব্য আকৃতিতে ভরা একটা রাত কাটবে। কিন্তু…কে যাবে, কে গিয়ে নিয়ে আসবে সায়ানাইড? সবচেয়ে ভালো হ'তো কুরারে, ইণ্ডিয়ানরা যার খোঁজ জানে, জানে কোন্ লতাপাতা থেকে তৈরি করে এই বিষ; শরীরের কোষে তার কোনো চিহ্নই থাকে না। বিষমাখানো ছুঁচ দিয়ে কোনো ইন্‌জেকশন—আর শিকার তক্ষুনি আছড়ে পড়ে মাটিতে, খাবি খায়, অথর্ব হ'য়ে যায় তার ফুশফুশের পেশী। কিন্তু কুরারে আনা যাবে কী ক'রে? ছোটো-ছোটো শুকনো লাউয়ের খোলের মধ্যে রাখে তাদের ইণ্ডিয়ানরা। আর বিষ আনতে কাউকে তো যেতে হবে গুয়াচিনাপা ইণ্ডিয়ানদের দেশে, আর সেখানে যেতেই লাগে একমাস, প্রথমে নৌকোয়, তারপর ক্যানুতে। নিজেদের এত অক্ষম এত অসহায় লাগে ব'লে দুজনে মিলে কাঁদো তোমরা একসঙ্গে। কফিনের পাশে দাঁড়াতে পারলে কী সুখই না হ'তো আমাদের!…তুমি জানলায় গিয়ে দাঁড়াও। বন্দুকের আওয়াজ থেমে গিয়েছে। জখমদের তারা সরিয়ে ফেলেছে—জখমদের, না কি মৃতদের? খেলনার দোকানের জানলার কাচ ফুটো ক'রে গেছে এক বুলেট, ডনাল্ড ডাককে সে উলটে ফেলেছে তার বেদিতে, আর পিজবোর্ডে তৈরি বুকে রেখে গেছে একটা কালো গর্ত। যেহেতু এটা শহিদ দিবস, তাই তাকে বদ্‌লে অন্য-কোনো হুবহু ডনাল্ড ডাককে বেদিতে বসিয়ে দেবার জন্যে কেউ নেই। সে প'ড়ে রইলো সেখানে, দু-ঠ্যাং ছড়ানো, নারঙি দুটো পা আকাশের দিকে উঁচনো, ল্যাগবেগে।

৭

বৃহস্পতিবার বোধহয়

বর্ষাকাল আসতেই সীমান্তদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কটা আবার একটা বিশ্রী মোড় নিলে। আবার প্রজ্বলিত করা হ'লো সীমান্ত নিয়ে কোন্দল, আবার ঝলসে উঠলো দুরভিসন্ধি। কিন্তু জেনারেল মাবিলান এবার তাঁর সব ক-টা বাহিনীকে একজোট করালেন, আর তাঁর তথ্য ও প্রচার দপ্তর এবং সেনসরশিপ সংগঠনকে যুদ্ধের তাড়না ঠাণ্ডা করার জন্যে লেলিয়ে দিলে। যেহেতু দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপীড়ন চালিয়ে যাবার জন্যে সেনাবাহিনী চাই—মিছিল ছত্রভঙ্গ করা, হরতাল

ঠাণ্ডা করা, কারফিউ জারি করা ও মানানো, আপিশ কাছারি বাড়িঘর খানাতল্লাশ করা, রাস্তায়-রাস্তায় সশস্ত্র পাহারা বসানো ইত্যাদি-ইত্যাদি কত জরুরি কাজ প'ড়ে আছে—অতএব, কয়েক ডিভিশন সৈন্যকে জঙ্গল-সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়ে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে অরক্ষিত রাখা তাঁর আদৌ সমীচীন মনে হ'লো না। সেই একই কারণে সীমান্তদেশের প্রতি তাঁর প্রাক্তন চোখরাঙানি ও ঔদ্ধত্যও বদ্‌লে গেলো রাজনৈতিক সহনশীলতা ও সহযোগিতায়। 'আমি কোনো আন্তর্জাতিক গণ্ডগোল চাইনে,' তিনি ঘোষণা করলেন। অবশ্য, এর পেছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ হ'লো: এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিতর্কিত অঞ্চলে জলের দরে খনিগুলোর ইজারা পেয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো আর জটপাকানো যে সশরীরে গিয়ে প্রতিবেদন দেবার জন্যে রাষ্ট্রদূতকে তাঁর দেশের সরকার জরুরি তলব পাঠালো। বেশি হ'লে তিনি মাত্র দিন পনেরো থাকবেন দেশে। অসাধারণ মমতার সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী তার বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে দিলেন, এমনকী পরদিন সঙ্গে ক'রেও গেলেন বিমান-বন্দরে। হাওয়াই জাহাজটা লজ্‌ঝড় মার্কা, বাতিল মডেল, তা দেখে তিনি খুব খুশি, কারণ ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা যে-কোনো মুহূর্তে, বিমানবন্দরের তদারকি বিভাগ একে বলে 'উড়াল কফিন'। পরদিন কৌঁসুলি এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

'আপনি এখন আমারই স্বদেশীয়, আমারই সহযোগী,' আমায় বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন তিনি, হাতে তুলে দিলেন আমার নতুন জাতীয়তা লাভের স্বীকৃতিপত্র। এখন থেকে আমার সমরচিহ্ন হবে—হাতের দলিলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলুম—দুই সদাজাগ্রত প্যান্থার, গুঁড়ি-মারা, সোনালি ত্রিভুজটার ওপর দিকে শুঁৎ পাতা; নিশ্চয়ই এই প্রতীকটির উৎস স্থাপত্যবিদ্যা, কারণ ইওরোপীয়দের কাছে আমার নতুন দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতিনিধি হলেন সযৌক্তিক নাইটভবনের যুবরাজ কাদোশ।

'কিন্তু শুধু এইটুকুই নয়,' কৌঁসুলি ব'লে চললেন, তাঁর গলার স্বর ও ছন্দ হঠাৎ কেমন যেন বদ্‌লে গিয়েছে। 'গত দু-বছর ধ'রে আমি আমাদের সরকারকে "আপনার" কাজকর্ম বিষয়ে সারাক্ষণ ওয়াকিবহাল রেখেছি,' আস্তে ধীরে তিনি জানালেন। 'সীমান্ত-বিরোধ, বর্ধিত বাণিজ্য, পণ্যসামগ্রীর লাভজনক বিনিময়, ইত্যাদি-ইত্যাদি। আপনার নিজের দেশ হবার আগেই সীমান্ত দেশের জন্যে আপনি কী-কী করেছেন, সব তাঁরা ভালো ক'রেই জানেন। ঐ বুদ্ধুটা (রাষ্ট্রদূতের আরাম-কেদারাটা দেখালেন তিনি) কোনো কাজেরই নয়—আর এটাও তাঁরা সবাই

জানেন। আর সেই জন্যেই (গলার স্বর নামিয়ে) তাঁর বদলে আপনাকে নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়েছে।' আমি যখন আপত্তি জানালুম, কৌসুলি জানালেন তাঁর দেশে—'আমাদের দেশে'—রাষ্ট্রদূতদের পদ কখনো সাধারণ পেশাদার কূটনীতিকদের দেয়া হয় না—বরং দেয়া হয় দেশের উজ্জ্বল ও সক্ষম রত্নদের : লেখকদের, লশ্নিকারদের, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাঁরা বিখ্যাত তাঁদের, অথবা সাংবাদিকদের। অধিকন্তু, আমেরিকার ঐতিহ্য চিরকালই কূটনীতিক ও অধ্যাপকের পদে মহাদেশের অন্যদেশের মানুষদের নিয়োগ করা। মধ্য-আমেরিকায় তাই রাষ্ট্রদূত কুবার মন্ত্রীরা ; ভেনেসুয়েলার জনৈক আন্দ্রেস বেলো তাই ছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর···'আমার মনে পড়ে···'

কী-কী উদাহরণ দেবেন, ব'লে দেয়া যায়। আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'কিন্তু এরা আমাকে কিছুতেই কূটনৈতিক "অভয়পত্র" দেবে না।'

'মাবিলান আমাদের দেশের সঙ্গে ভাব করার জন্যে এতটাই মুখিয়ে আছে—বিশেষত এখন যখন প্রগতির মিত্রদের কাছ থেকে দেড়শো কোটি ডলার নিংড়ে নেবার মওকা পাওয়া গেছে—যে সে গলাকাটা জ্যাককেও "অভয়পত্র" দেবে।' (হাসি।)

'কিন্তু রাষ্ট্রদূত ? তাঁর স্ত্রী ?'

'রাষ্ট্রদূতকে, বাস্তবিক, ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—তাঁকে গোটেনবুর্গে বদলি করা হয়েছে, দূতাবাসের সাধারণ কর্মী হিশেবে। আর তাঁর স্ত্রী—যদি তাঁর আপত্তি না-থাকে, তাহ'লে তিনি দূতাবাসের সচিব হিশেবে থেকে যেতে পারেন।'

অভয়পত্র মঞ্জুর করা হ'লো অবিলম্বেই। আর পরের মঙ্গলবার শরণার্থী গেলো রাষ্ট্রপতিভবনে—জেনারেল মাবিলানকে তার পরিচয়পত্র দিতে। সেই দিনই শেষ-বারের মতো কোনো পাহারা ছিলো দূতাবাসের সামনে—আর তারা পা ঠুকে সেলাম জানালে আলাদা। রাষ্ট্রদূতের ফ্রককোট তার গায়ে বেশ ভালোই মানিয়ে গেলো। তবে টপ-হ্যাটের চামড়ার বন্ধনীর নিচে তাতে গুঁজতে হ'লো খবর-কাগজ ; ঘি-রঙের দস্তানা দুটো সে ধ'রে রইলো বাঁ হাতে, অ্যাসপারাগাসের গোছার মতো, কারণ সেগুলো আবার বড্ড আঁটো হ'তো। পুরো অনুষ্ঠানটা চমৎকার কাটলো ; দূতাবাসের গাড়ি, কূটনৈতিক দপ্তরের উপপ্রধানের নিরেশ আলাপ—তিনিই অন্যান্য রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। একটা মঙ্গলবার। মঙ্গল, মঙ্গল, মঙ্গলবার! মঙ্গলবার ২৮শে জুন। ২৮শে জুন ! এমন-একটি মাস যার নাম উচ্চারণ করবামাত্র মনে প'ড়ে যায় সমুদ্রতীর আর খোলামেলা বিশাল জমি···কূটনৈতিক দপ্তরের উপ-

প্রধানের সঙ্গে প্রাক্তন শরণার্থী এসে পৌঁছুলো রাষ্ট্রপতিভবনে। সার্জেন্ট রাতোন যখন তার নজর কাড়বার চেষ্টা করলে, করুণ এবং অনুতপ্ত চাউনিতে, সে কোনো পাত্তাই দিলে না। তাকে আপ্যায়িত করা হ'লো সামরিক সম্মানে, আর সে ঢুকে পড়লো জেনারেল মাবিলানের আপিশে। অসীম সৌজন্যের সঙ্গে সাদরে তাকে স্বাগত জানানো হ'লো আর জেনারেল তার পরিচয়পত্র খুঁটিয়ে পড়ার উপভোগ্য প্রহসনের মধ্য দিয়ে গেলেন—যদিও পরিচয়পত্রের ভাষা সব ক্ষেত্রেই সব দেশের বেলাতেই একই রকম। তারপর তিনি ছোট্ট একটা ভাষণ দিলেন: দুই দেশের মধ্যকার যুগ-যুগান্তের বন্ধুতা আর এই বর্তমান পারস্পরিক সমঝোতার ফলে দুটি দেশই এখন অভাবিত সমৃদ্ধির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে; দুই দেশেরই ঐতিহ্য একই রকম গরীয়ান ও মহিমাময়; দুই দেশের ভ্রাতৃত্ব—এবং ভবিষ্যতের আরো সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববন্ধন···এবং আরো অনেক-কিছু, সবই এই জাতীয়; নতুন রাষ্ট্রদূতও এই একই ভঙ্গিতে ভাষণ দিলেন, তিনিও উল্লেখ করলেন, 'সমৃদ্ধি', 'মৈত্রীবন্ধন', 'সমঝোতা', 'ভ্রাতৃত্বের বোধ', 'আমাদের আমেরিকা ভবিষ্যতের মহাদেশ', 'নতুন জগতের স্বচ্ছদৃষ্টি সরকারদের পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে যুগ-যুগের তাত্ত্বিক বিরোধের মীমাংসা'—এবং আরো-অনেক-কিছু—যা-যা এমনতর অনুষ্ঠানে শোনা যায়। দু-দেশের সমৃদ্ধি কামনায় পান করার জন্যে দু-গেলাশ শ্যাম্পেন। আর এক সাদর হাতঝাঁকুনি, যখন জেনারেল নতুন রাষ্ট্রদূতকে কানে-কানে বললেন:

'আমি ছবিওলাদের ডাকিনি। একটু বিশ্রী হ'তো হয়তো। আমি খবর মাধ্যম-গুলোকে একটা চিরকূট পাঠিয়ে দেবো—আপনারই নামে নাম এমন আরেকজনের কথা বলা হচ্ছে, ভাববে তারা।'

'সে আমি বুঝি, জেনারেল।'

গলার স্বর আরো নামিয়ে জেনারেল বললেন, 'রিকার্দো, তুমি একটা শুয়োর।'

'আর ঐসব সুরুচিসম্পন্না, পরিশীলিতা ইওরোপীয় সুন্দরীদের খবর কী—যারা নিজেদের কথা নিজেরাই বলতে পারে, জেনারেল?'

'বেরোও এখান থেকে, এক্ষুনি।'

কূটনৈতিক দপ্তরের উপপ্রধান এগিয়ে এলেন, জানালেন সাক্ষাৎকার শেষ। নতুন রাষ্ট্রদূত প্রতি পদক্ষেপে কুর্নিশ করতে-করতে পায়ে-পায়ে দরজার কাছে এসে পৌঁছুলেন। বাইরে এসে, পর্দা তুলে গলা চড়িয়ে বললেন, 'চলি, ফেলিপে।'

রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন—সামনে সাজানো দারুণ সব খাবার আর মদ। আমার প্রিয় রুশী শশার আচারের অভাব ছিলো না। আমের

চাটনিরও না—কোনো-কোনো খাবারের সঙ্গে মেখে খেতে স্বাদ বাড়ে। আর ছিলো ফরাশি ভাজাভুজি, ব্রাজিলের আখের রসের মদের সঙ্গে খেতে যা তোফা লাগে। সেই প্রথম ডনাল্ড ডাকটার বদলে আরেকজনকে বসানো হয়েছে বেদিতে, নিখুঁত সুঠাম একজনকে। কিন্তু তার চেহারার অনুষঙ্গে এবার আমার আর সময়হীনতার কথা মনে পড়লো না তেমন ক'রে, ঠিক যেমন গোমেস ভ্রাতাদের লোহালক্কড়ের দোকানের এডিসন বাল্ব দেখে মনে পড়লো না মেনলো-পার্কের কথা, যেমন পড়েছিলো গতকাল। ক্যালেণ্ডার থেকে সব বাতিল পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেললুম আমি, শুধু রইলো মঙ্গলবার ২৮শে জুন। আর যখন, কয়েকটা চটপটগেলা আখের রসের মদের গেলাশ একটু রঙিন ক'রে এনেছে সবকিছু, আমরা খাবার ঘর থেকে জুড়ি বেঁধে বেরিয়ে গেলুম।

হুম এস্‌সেৎ রেক্স ইন আক্কুবিতু সুও,
নার্হ্‌স মেয়া দেদিৎ ওদোরেম স্যুয়াভিতাস্

এই লাতিন আমরা ডুবিয়ে দিলুম বেতারে-বাজা লুই আর্মস্ট্রং-এর শিঙার আওয়াজে। পরদিন, ঘোরের মধ্যে খেয়াল করতে বেশ সময় লাগলো যে আজ, এখন, এটা বুধবার, আর বুধবারগুলোর সুনির্দিষ্ট কিছু-কিছু দায়িত্ব আছে। কিন্তু বৃহস্পতিবারের পর থেকে তারিখ ও বারগুলো আবার ফিরে এলো কক্ষপথে, তাদের স্বস্থানে—মানুষের পরমায়ুর মধ্যে তাদের যে-স্থান। আর কাজ শুরু হ'য়ে গেলো, আর দিন কেটে চললো।

যেমতো নিশা

১

আর তাঁর [আপোলোর] অবতরণ হ'লো রাত্রির মতো।

—ইলিয়াড, সর্গ ১

অন্তরীপগুলি যদিও এখনও ছায়ায় বিলীন, তাহাদের মধ্যকার সমুদ্র সবুজ হইয়া উঠিতেছে ; এমন সময় প্রহরা তাহার শঙ্খনির্ঘোষে জানাইল যে রাজা আগামেমনন আমাদিগকে যে-অর্ধশত রণপোত পাঠাইয়াছেন সেগুলি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংকেত শুনিয়া, এতদিন ধরিয়া যাহারা গোময়লিপ্ত গম মাড়াইয়ের মেঝেগুলায় অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা তীরের দিকে গম লইয়া আসিতে শুরু করিল ; পোতগুলিকে যাহাতে সরাসরি দুর্গের দেয়ালের গায়ে ভিড়াইয়া দেয়া যায়, সেই-জন্য বেলনগুলাকে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইতেছিল। পোতের তলিগুলি যখন বালিতে ঠেকিল তখন সারেঙদের সহিত কিঞ্চিৎ টানাহিঁচড়া শুরু হইল, কারণ মাইসেনিবাসীদের নিকট এতবার আমাদের নৌচালনবিদ্যায় অজ্ঞতার কথা ফলাও করিরা প্রচার করা হইয়াছে যে তাহারা তাহাদের লগি বাড়াইয়া আমাদের দূরে-দূরে রাখিবার চেষ্টা করিল। তাছাড়া, বেলাভূমি এখন বাচ্চাকাচ্চার ভিড়ে গিশ-গিশ করিতেছে ; তাহারা সেনাদের পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া যাইতেছে, সেনাদের চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করিতেছে, আর দাঁড়িদের চৌকির তলা হইতে বাদাম চুরি করিবার জন্য তাহারা ঠেলাঠেলি করিয়া পোতের পাশ দিয়া বাহিয়া উঠিতেছে। প্রভাতের স্বচ্ছ ঢেউগুলা চ্যাচামেচি, গালাগাল, ধস্তাধস্তি আর ঘুষোঘুষির মধ্যে আছড়াইয়া পড়িয়া ভাঙিয়া যাইতেছে ; আমাদের নগরপ্রধানেরা এই হুলুস্থুলের মধ্যে স্বাগতভাষণগুলি কিছুতেই শুনাইতে পারিতেছিলেন না। তাহাদের হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের যাহারা লইয়া যাইতে আসিয়াছে, তাহাদের সহিত দেখা হইবার মুহূর্তে, আমি আশা করিয়াছিলাম আরো-গম্ভীর আরো-আনুষ্ঠানিক কোনো সাড়ম্বর রীতি ও আচার। ইষৎ মোহভঙ্গের বোধ লইয়াই আমি হাঁটিয়া চলিয়া আসিলাম ডুমুর গাছটির দিকে ; আমি প্রায়ই ইহার সবচেয়ে মোটা ডালটায় চড়িয়া, হাঁটু দিয়া ডালটাকে চাপিয়া ধরিয়া, পা ঝুলাইয়া বসি, কেননা ইহা আমাকে কেমন যেন কোনো নারীদেহের কথা মনে করাইয়া দেয়।

পোতগুলি যখন জল হইতে তুলিয়া আনা হইতেছে, আর পাহাড়ের চূড়াগুলি যখন লুকিয়া ফেলিতেছে রৌদ্রঝলক, আমার প্রাথমিক বিশ্রী মনোভাবটা ধীরে-ধীরে মিলাইয়া যাইতে শুরু করিল; মেজাজ খারাপটা স্পষ্টই ছিল সারা রাত্রি না-ঘুমাইবার ফল; তাহা ছাড়া আগের দিন বড্ড বেশি পান করিয়া ফেলিয়াছিলাম, সেই-যে কিছু ছেলেছোকরা সম্প্রতি দেশের অভ্যন্তর হইতে উপকূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে আমাদেরই সঙ্গে যাহারা সকালের পরেই বাহির হইয়া পড়িবে, তাহাদের সহিত কাল রাতে মাইফেল জমিয়া উঠিয়াছিল। যখন বসিয়া-বসিয়া দেখিলাম লোকজনের শোভাযাত্রা—নানা আকারের ঝুড়ি, বোয়ম, কালো-কালো মদের ভিস্তি লইয়া পোতগুলির দিকে চলিতেছে—আমার মধ্যে এক গনগনে অহমিকা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সৈন্য হিশাবে আমার শ্রেষ্ঠতার একটি বোধ। মহাপোতনগরীর পথে যাইবার সময় কোনো রহস্যময় ও অজ্ঞাত উপসাগরে আমরা যখন জলে ভেজা গলুইয়ের আশ্রয়ে ঘুমাইয়া থাকিব, ঐ জলপাই তেল, ঐ রজনমণ্ডিত সুরা, আর সর্বোপরি ঐ গম—যাহা দিয়া রাত্রে অঙ্গারের উপর সেঁকিয়া চাপাটি তৈরি করা হইবে—আমি নিজেই আমার বেলচা দিয়া যে-গম ঝাড়িতে সাহায্য করিয়াছিলাম—সমস্তই পোতে তোলা হইতেছে আমারই জন্য। দীঘল পেশল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিছক চাষবাসের কাজে আর ক্লান্ত করিবার প্রয়োজন নাই; যে-পুরুষ তাহার পোষা জীবজন্তুর স্বেদসিক্ত পিঠ হইতে মাটির দিকে তাকাইয়াছে, অথবা সারাটা জীবন কাটাইয়া দিয়াছে ভূমিতলে উবু হইয়া আগাছা বাছিয়া, শিকড় উপড়াইয়া, খেত নিড়াইয়া, তাহাদের গোরু-মহিষ যে-ভঙ্গিতে লতাপাতাঘাস জাবর কাটে, প্রায় সেই একই পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মাটির গন্ধ ছাড়া আর-কিছুই জানে না এমন-সব পুরুষালি কাজ আমার জন্য নহে; আমার দুই বাহু রচিত হইয়াছে অ্যাশ কাঠের ভল্ল ছুঁড়িবার জন্য। এই লোকগুলি কোনোদিনও সেই মেঘের তলা দিয়া যাইবে না দিনের এই সময়ে যাহা আঁধার করিয়া দেয় দূরের সবুজ দ্বীপপুঞ্জ, যেখান হইতে আনা হয় কটুগন্ধময় সুরাসার। ইহারা কোনোদিনই জানিতে পাইবে না ট্রয় নগরীর প্রশস্ত সব রাস্তা; যে-নগরী আমরা অবরোধ করিব, আক্রমণ করিব, ধ্বংস করিয়া ফেলিব। দিনের পর দিন মাইসেনির রাজা আমাদের যে-দূত পাঠাইয়াছেন, সে অনবরত শুনাইয়াছে প্রায়ামের অপমানকর ঔদ্ধত্যের কথা, তাহার প্রজাদের স্পর্ধিত ক্রিয়াকলাপ কীভাবে আমাদের লোকজনদের উপর দুঃখকষ্ট ঘনাইয়া আনিতেছে তাহার কথা। তাহারা টিটকারি দিয়াছে আমাদের পৌরুষমণ্ডিত জীবনচর্যাকে; আর ক্রোধে-রোষে কম্পমান, আমরা

শুনিয়াছি কীভাবে ঈলিয়ামের লোকে আমাদের দীর্ঘকেশ আকিয়ানদের একের পর এক স্পর্ধিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়াছে—যদিও আমাদের সাহসের তুলনা অপর-কোনো জাতিতেই পাওয়া যাইবে না। শুনা গিয়াছে রুষ্ট গর্জন, মুষ্টি-বদ্ধ হাত আন্দোলিত হইয়াছে, প্রসারিত করতল উর্ধ্বে তুলিয়া উচ্চারিত হইয়াছে, শপথবাক্য, প্রাচীরগাত্রে ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে বর্ম ও কবচ—যে-মুহূর্তে আমাদের কানে পৌঁছিয়াছে স্পার্তার হেলেনের ধর্ষণকাহিনী। উচ্চকণ্ঠে দূতেরা জানাইয়াছে তাহার অতুলনীয় রূপের কথা, তাহার আভিজাত্যমণ্ডিত চালচলন ও স্পৃহনীয় চলনছন্দের কথা, সেইসঙ্গে তাহারা বর্ণনা করিয়াছে নিদারুণ বন্দিত্বের মধ্যে কী দুঃসহ নিষ্ঠুরতা তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে—যখন ভিস্তিগুলি হইতে উচ্ছল মদিরা বহিয়া গিয়াছে শিরস্ত্রাণগুলির মধ্যে। সেই একই সন্ধ্যায়, সমগ্র নগরী যখন রাগে-ক্ষোভে-ঘৃণায় ফুঁসিয়া উঠিয়াছে, আমাদের বলা হইয়াছিল যে আমাদের জন্য অর্ধশত কৃষ্ণবর্ণ রণপোত পাঠানো হইবে। ব্রনজ় ঢালাইয়ের কারখানায় প্রজ্বলিত হইয়াছিল অগ্নিশিখা, আর বুড়িরা পাহাড় হইতে করিয়া আনিয়াছিল কাঠ। আর এখন, কয়েকটা দিন কাটিবার পর, এই-তো আমি তাকাইয়া আছি আমার পায়ের কাছে আসিয়া ভেড়া পোতগুলির দিকে—সুঠাম সবল তাহাদের তলি আর কাঠামো, আর কোনো পুরুষের পুরুষার্থ যেমন থাকে তাহার দুই উরুর ফাঁকে, তেমনিভাবে দুই পাশের প্রাকারগুলির মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে তাহাদের মাস্তুল; আমার মনে হইল, যেন কোনোভাবে আমি নিজেই এই কাঠগুলার মালিক, আমাদের জাতির লোকদের অজানিত কোনো অলুক্ষুণে ছুতোরবিদ্যায় এই কাঠগুলো রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে সিন্ধুজলের ছুটন্ত অশ্বে, আমাদের বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য তৈরি, যেখানে সর্বকালের মহত্তম অভিযানটি ভাঁজে-ভাঁজে খুলিয়া আসিতেছে কোনো দুর্বর্ষ মহাকাব্যের মতো। আর আমি—এক লাগাম-নির্মাতার পুত্র, আমার পিতামহ ছিল ষাঁড় খাশি করায় ওস্তাদ—সেই-আমারই সৌভাগ্য হইয়াছে এই মহাকাব্যে অংশ নিবার—যেখানে এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে, নাবিকদের গল্প-উপন্যাস মারফৎ যাহার বিকিরণ আমাদের কাছেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি আমি; ট্রয়ের প্রাচীর স্বচক্ষে দেখিব, বীরের মতো অনুসরণ করিব আমাদের মহান দলনায়ককে, স্পার্তার হেলেনকে উদ্ধার করিবার কাজে বিনিয়োগ করিব সমুদয় শক্তি ও সামর্থ্য—এই দুর্লভ সম্মান ও গৌরব বর্তাইয়াছে আমার উপর; পৌরুষমণ্ডিত এই উদ্যোগ; এবং যুদ্ধের চরম বিজয় পরিণামে আমাদের দিবে চিরকালের জন্য সুখ, সমৃদ্ধি আর

গরিমা। জলপাইঢাকা পাহাড়ের ঢাল হইতে বহিয়া আসা বাতাস একবার বুক ভরিয়া টানিয়া লই, আর ভাবিতে থাকি এমনতর কোনো স্তায়যুদ্ধে, বিচারবিবেচনা-বোধের সম্মানে, আত্মবিসর্জন করা কেমন চমৎকার ও গৌরবদীপ্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু শত্রুর ভল্লে বিদীর্ণ হইয়া যাইবার ভাবনাটা আমাকে মনে করাইয়া দিল আমার মায়ের শোকের কথা, আর হয়তো অপর একজনের কথাও—হয়তো গভীরতম শোকই তাহার, অথচ এ-ক্ষেত্রে সেই বার্তা তাহাকে শুনিতে হইবে শুষ্ক চোখে—কারণ শ্রোতা হইবে পরিবারেরই কর্তা। রাখালদের রাস্তা ধরিয়া আমি ধীরে-ধীরে নামিয়া আসি শহরে। তিনটি ক্ষুদ্র ছাগলছানা মৃদু তুলসীগন্ধী হাওয়ায় তিড়িং-তিড়িং করিয়া লাফাইতেছে। নিচে, বেলাভূমিতে তখনও পুরা দমে চলিতেছে গম বোঝাই করিবার কাজ।

২

গিটারের টুংটাং এবং মন্দিরার ঝাঁপতালে চারিপাশে পোতগুলির প্রত্যাসন্ন প্রস্থান উদ্‌যাপিত হইতেছিল। 'শ্রীময়ী' পোতের খালাশিরা এক দাসত্বমুক্ত নেগ্রো রমণীর সহিত জারাম্বেক নাচিতেছে আর সেই সঙ্গে গাহিতেছে পরিচিত সমস্ত লোক-সংগীত—মোসা দেস্ রেতোনিওর গীতের মতো, যাহার মধ্যেকার কথার ফাঁকগুলি ভরিয়া দিতেছে অনুসন্ধিৎসু সব হাত। ইতিমধ্যে, উপদর্শকের ইণ্ডিয়ান দাসদিগের সহায়তায় এখনও রণপোতে বোঝাই করা চলিতেছে সুরা, তেল ও শস্য—তাহারা দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের ভাবী ধর্মযাজক বন্দর অভিমুখে আসিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছেন: দুটি খচ্চরের পিঠে চাপানো হইয়াছে দারুনির্মিত একটি অর্গানের হাঁপর ও নল—তিনি ঐ খচ্চর দুইটিকে চালাইয়া লইয়া আসিতেছেন। যখনই আমার সহিত রণপোতের কাহারও দেখা হইয়া যায়, জানলায়-জানলায় মেয়েদের আনিয়া দাঁড় করাইবার জন্য, তৎক্ষণাৎ শুরু হইয়া যায় কোলাহলমুখর কোলাকুলি, আতিশয্যমণ্ডিত নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি এবং যথেষ্ট হাস্যরোল ও বারফট্টাই। যাহারা রুটি সেঁকে, পশম আঁচড়ায়, অথবা ওলন্দাজ জামা-কাপড়ের ফিরি করে—বারান্দায় বসিয়া সন্ন্যাসিনীর দল যে-জামায় সুচের কাজ তোলে—আমরা তাহাদের মতো নই; আমাদের দেখায় যেন একেবারেই অন্য জাতের মানুষ—তাহাদের জ্ঞানের পরিধির বাহিরে নানা দুর্ধর্ষ অভিযান চালাইবার জন্যই যেন আমরা বিশেষভাবে তৈরি। নগরচত্বরের মাঝখানটায় রৌদ্রে

পিত্তলনির্মিত বাদ্যযন্ত্রগুলি ঝিলিক মারিতেছে; কাপ্তানের ছয়জন শিঙাবাদক জনপ্রিয় মনমাতানো সুর বাজাইতেছে, আর বুর্গাগুির ঢাকীরা বেদম পিটাইতেছে তাহাদের ঢাক আর আদ্যিকালের ভেরী—ভেরীর মুখটা ঠিক ড্র্যাগনের ন্যায়—এমনই গলা ফাটাইতেছে যেন কামড়াইয়া দিবে।

বাছুরের চামড়া ও করদোবার চামড়ার গন্ধে ঝিম-ধরা দোকানটায় আমায় বাবা একটি জিনের মধ্যে সূচ ফুঁড়িতেছিলেন, ভঙ্গিটা অর্ধমনস্ক—যেন মনটা অন্য-কোথাও পড়িয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই কেমন শান্ত বিষণ্ণভাবে তিনি বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, হয়তো তাঁহার মনে পড়িয়া গেছে ক্রিস্তোবালিথোর বীভৎস মরণ, সে ছিল আমার চ্যাংড়া বয়সের সমস্ত রগরগে অভিযানের সঙ্গী, যাহাকে ড্র্যাগনমুখের ইণ্ডিয়ানরা তীর ছুঁড়িয়া ঝাঁঝরা করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইহাও জানেন যে আজকাল সকলেই ইণ্ডিসে যাইবার জন্য খেপিয়া উঠিয়াছে—যদিও অধিকাংশ বুদ্ধিমান লোকেই ইতিমধ্যে টের পাইয়া গিয়াছে যে নিছক কয়েকজনের সুবিধার জন্য ইহা বহুলোকের পাগলামি ব্যতীত আর-কিছুই নহে। আমার বাবা সেরা জাতের কারুশিল্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন: আমাকে বলিলেন, কোর্পুস ক্রিস্টির শোভাযাত্রায় কেহ যদি কোনো লাগামনির্মাতার নিশান হাতে যায়, তবে সে ততটাই শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় কোনো বিপজ্জনক অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিলে। ভালো খাবারদাবারে ভরা কোনো টেবিল, কোনো ভর্তি ভাঁড়ারকোষ এবং শান্তিসুমধুর পরিণত বয়েস—এইসবের সুখসুবিধা তিনি বিশদ করিয়া বলিলেন। এদিকে শহরের উত্তেজনা ক্রমেই বাড়িতেছে, আর আমার মেজাজটাও যে ঠিক অমনতর কাণ্ডজ্ঞানে ভরা কথাবার্তার সহিত সুরে বসানো নাই—ইহা টের পাইয়াই তিনি স্নেহভরে আমাকে আমার মায়ের ঘরের দরজার কাছে লইয়া আসিলেন। এই মুহূর্তটাকেই আমি সর্বাপেক্ষা ভয় পাইতেছিলাম; মায়ের চোখে অশ্রুধারা দেখিয়া আমি নিজেই চোখের জল সামলাইতে পারিলাম না; যতদিন-না সব্বাই জানিয়া গিয়াছিল যে কাসা দে লা কোন্‌ত্রাতাসিওনের খাতায় আমার নামটাও উঠিয়া গেছে, ততদিন আমরা আমার যাইবার কথাটা তাঁহার কাছে চাপিয়া গিয়াছিলাম। আমার দ্রুত প্রত্যাবর্তনের জন্য নাবিকদের কুমারী মাতার নিকট তিনি যে-সব ব্রত ও মানৎ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম, এবং মা যাহা-যাহা বলিলেন, এক কথাতেই সবকিছুতে সম্মতি ও প্রতিশ্রুতি দিলাম, যেমন এ-সব দূর দেশের মেয়েদের সহিত কোনো পাপসম্পর্কে যাইব না—শয়তান তাহাদিগকে নন্দনকাননের ছলে ন্যাংটো করিয়া

রাখে, যাহাতে অসাবধান কোনো সৎ খ্রিষ্টানের মাথাটা বিগড়াইয়া দিয়া বিপথ-চালিত করিতে পারে যদি-না আগেভাগেই তাহারা এমন হেলাফেলায় শরীর দেখাইয়াই কাহারও মনকে দুষিত করিয়া ফ্যালে। ইতিমধ্যেই দিগন্তের পরপারে কী পড়িয়া আছে, তাহার স্বপ্নে বিভোর কাহারও কাছে কিছু দাবি করাই যে বৃথা, ইহা বুঝিয়া অতঃপর মা আমাকে উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, পোতগুলা কতটা নিরাপদ আর মাঝিমাল্লারাই বা কেমন ওস্তাদ। আমি 'শ্রীময়ী' পোতটির পোক্ত বাঁধুনি ও নাব্যতার কথা সাতকাহন করিয়া বাড়াইয়া বলিলাম, ঘোষণা করিলাম যে তাহার সারেঙ ইণ্ডিসে যাতায়াত করিয়া অতীব অভিজ্ঞ, এবং স্বয়ং স্থনিও গারথিয়ার দোস্ত। এবং তাঁহার মন হইতে ভয়-ভীতি সরাইয়া দিবার জন্য ইনাইয়া-বিনাইয়া তাঁহাকে শুনাইলাম নয়া দুনিয়ার পরমাশ্চর্যগুলির কথা, যেখানে সর্বপ্রকার অসুখবিসুখ সারিয়া যায় মহাজন্তুর নখরে আর মৃগনাভিতে; তাঁহাকে এই কথাও কহিলাম যে ওমেগুয়াদের দেশে আছে এক স্বর্ণনগরী—আগাগোড়াই স্বর্ণ-মণ্ডিত—এতই বিশাল যে খুব ভালো হাঁটিয়ের পক্ষেও সমগ্র নগরীটি পার হইতে লাগে দুই দিন এক রাত্রি, এবং যদি-না অন্যকোনো অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে আমরা ধন-দৌলত খুঁজিয়া পাই, অথবা খুঁজিয়া পাই ঐশ্বর্যময় কোনো আদিবাসী মুল্লুক, যাহাদের আমরা চট করিয়া হারাইয়া দিব, তবে আমরা নিশ্চয়ই ঐ স্বর্ণনগরীতে যাইব; আমার মা তখন ধীরে-ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন যে ইণ্ডিসফেরৎ ভ্রমণকারীরা মিথ্যা অহমিকা ফলাইয়া একরাশি অলীক কাহিনী শুনায়, আমাজোন আর নর-খাদকদের কথা বলে, শুনায় ভয়ংকর বারমুডার ঝড়ঝঞ্ঝার কথা, অথবা বিষের তীরের কাহিনী—যে-তীর কাহারও গায়ে বিঁধামাত্র সে যে প্রস্তরমূর্তিতে পরিণত হইয়া যায়। আমার সমস্ত আশাবাদী কথার উত্তরে একগাদা অপ্রীতিকর তথ্য জড়ো করিয়া তিনি যখন আমার মুখোমুখি দাঁড়াইলেন, তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম যাবতীয় বড়ো-বড়ো আদর্শ ও অভিপ্রায়ের কথা, তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিলাম, যাহারা কস্মিনকালেও ক্রুশচিহ্নের কথা শুনে নাই, সেই বেচারি মূর্তিপূজকদের দুর্দশার কথা, আমাদের দিব্য ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের হাজার-হাজার আত্মাকে আমরা উদ্ধার করিব, হেসুস ক্রিস্তো তাঁর সন্তদের, দূতদের, যে-অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহাই পালন করিব। আমরা সব যেমন রাজার সেনা, তেমনি ঈশ্বরেরও, এবং ইণ্ডিয়ানদের সদ্ধর্মে দীক্ষিত করিয়া, তাহাদের বর্বর কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া, আমাদের দেশ যেমন ধ্বংসাতীত মহিমা লাভ করিবে, সেইসঙ্গে সমগ্র ইওরোপে তেমনি সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাশালী দেশ হইয়া উঠিবে। আমার কথায়

কিঞ্চিৎ স্বস্তি লাভ করিয়া, মা আমার কণ্ঠে একটি অংসফলক ঝুলাইয়া দিলেন, বিষাক্ত প্রাণীদের কামড় হইতে বাঁচাইবার জন্য দিলেন নানাপ্রকার মলম ও টোটকা, আর আমাকে দিয়া সেইসঙ্গে প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইলেন যে তিনি নিজ হস্তে আমার জন্য পশমের যে মোজা জোড়া বানাইয়া দিয়াছেন, তাহা না-পরিয়া যেন কখনও আমি ঘুমাইতে না-যাই। ক্যাথেড্রালের ঘণ্টাগুলি যখন ঢং-ঢং শুরু করিয়া দিল, তিনি উঠিয়া পড়িয়া সূচিকর্ম করা একটি শাল খুঁজিতে গেলেন—এই শাল তিনি শুধু বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষেই গায়ে দেন। গির্জায় যাইবার পথ আমি লক্ষ করিলাম, সব দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও আমার মা-বাবা যেন গর্বে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন—কাপ্তানের সেনাদের মধ্যে তাহাদেরও তো একটি ছেলে আছে—এবং তাঁহারা রাস্তার লোকদের বারংবার এমনভাবে সম্ভাষণ জানাইতেছেন যে তাহার ভিতর সচরাচর যতটা থাকে তাহার চেয়েও ঢের বেশি আড়ম্বর ও দেখানেপনা ছিল। কাহারও যদি কোনো বীর পুত্র থাকে, যে কোনো গরীয়ান ন্যায় যুদ্ধে যোগ দিতে যাইতেছে, তবে স্বভাবতই তাহার ধন্য বোধ হয়। আমি বন্দরের দিকে তাকাইলাম। তখনও পোতগুলিতে শস্য ওঠানো হইতেছে!

৩

আমি তাকে বলতুম আমার মধুরা, যদিও এখনও কেউই জানে না যে আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছি। যখন তার বাবাকে দেখলুম পোতগুলোর কাছে বুঝতে পারলুম যে সে এখন একা থাকবে, কাজেই আমি হাওয়ার ঝাপটায় তুবড়ে-যাওয়া মনমরা জাহাজঘাটা দিয়ে এগিয়ে গেলুম: ঘাটে আছড়ে পড়ছে সবুজ জল, পাশটায় শেকল আর আংটা লাগানো, কাদায় আঠায় সবুজ। শেষ বাড়িটায় না-পৌঁছুনো অব্দি সারা রাস্তা এই একই দৃশ্য। বাড়িটার সবুজ খড়খড়ি সবসময় নামানো থাকে। জংধরা কড়াটায় শব্দ তুলেছি কি তুলিনি, দরজা খুলে গেলো: সমুদ্রের পিচকিরি সমেত একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। কুয়াশার জন্য এর মধ্যেই বাতি জ্বালানো হ'য়ে গেছে। আমার মধুরা আমার পাশেই ব'সে পড়লো একটা পুরোনো কিংখাবে মোড়া গভীর আরামকেদারায়, আর তার মাথা রাখলে আমার কাঁধে, এমন-একটা হতাশ করুণ ভঙ্গি তার যে ঐ আয়ত মধুর চোখদুটিকে কোনো প্রশ্ন করার সাহস আমার হ'লো না—কারণ চোখ দুটি যেন বিস্ময়বিধুর তাকিয়ে আছে কিছুই-না-এর দিকে। ঘরভরা অদ্ভুত জিনিশগুলো

এখন যেন আমার কাছে এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। কোনো-একটা সংযোগ আমাকে বেঁধে ফেললো দিগদর্শিকা, নক্ষত্রসংস্থানযন্ত্র আর বায়ুমাপক যন্ত্রের সঙ্গে; ঠিক যেমনভাবে বাঁধলো ছাতের কড়ি থেকে ঝোলা করাত মাছ, চুল্লির দু-দিক টান ক'রে ঝোলানো মের্‌কাতোর ও ওর্তেলিউসের আঁকা সমুদ্রের নকশা আর আকাশের মানচিত্র—যেখানে ভিড় ক'রে আছে সপ্তর্ষি, লুব্ধক আর ধনুর্ধরেরা। দরজার তলা দিয়ে গুঁড়ি মেরে আসছিলো হাওয়ার শিস, হঠাৎ শুনতে পেলুম তাকে ছাপিয়ে আমার মধুরা আমাকে জিগেশ করছে আমাদের প্রস্তুতি কেমন চলছে। যাক, নিজেদের কথা ছাড়া অন্যকিছু নিয়ে কথা বলা যাবে—এতে আশ্বস্ত হ'য়ে আমি তাকে বললুম যাজক আর অনুস্মারকদের কথা, যারা আমাদের সঙ্গে জাহাজে উঠবে, আর প্রশংসা করলুম অভিজাত ও চাষীদের ধর্মবিশ্বাসের—ফ্রান্‌সের রাজার নামে যারা ঐসব সুদূর দেশের দখল নেবার জন্য আদিষ্ট হয়েছে। আমি তাকে বললুম যে আমি মহানদী কোলব্যের-এর কথা জানি। রুপোঝুরি প্রাচীন সব গাছের সার গেছে যার দু-তীর ধ'রে, যার ওপরে বকের পাঁতি শাদা ক'রে রেখেছে আকাশ, আর নিচে রাজার মতো ব'য়ে চলেছে লাল স্রোত। আমরা সঙ্গে নিচ্ছি ছ-মাসের রসদ। 'সুন্দরী' আর 'মনোতোষিণী' জাহাজ দুটোর নিচের খোলগুলো ফসলে বোঝাই। মেহিকো উপসাগর আর চিকাগুয়ার মধ্যে ছড়ানো বিশাল আরণ্য অঞ্চলকে সভ্য ক'রে তোলার জরুরি দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছি আমরা, আর তার অধিবাসীদের আমরা শেখাবো নতুন-নতুন কর্মকৌশল। ঠিক যখন ভাবছি যে আমি কী বলছি তা আমার মধুরা খুব মন দিয়ে শুনছে, সে হঠাৎ ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো, আর অপ্রত্যাশিত তেরিয়া ভঙ্গিতে বললে যে সকাল থেকে শহরের সব ঘণ্টাকে যা বাজাচ্ছে সেই উদ্যোগে মহত্ত্ব বা গৌরব কিছুই নেই। কাল রাতে, কেঁদে-কেঁদে ফোলা চোখে, তার ছিলো উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা; সে জানতে চাচ্ছিলো সমুদ্রের ওপারের জগৎটার কথা, যেখানে আমি চলেছি, আর তা তাকে বাধ্য করেছিলো মঁতেইন-এর সন্দর্ভগুলো হাতে নিতে, আর শিক্ষার পরিচ্ছেদে আমেরিকা সম্বন্ধে যা-কিছু লেখা ছিলো সব সে পড়েছিলো। সেখানে সে জানতে পেরেছিলো এস্পানিদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা, কেমন ক'রে তারা তাদের ঘোড়া আর গোলাবারুদের সাহায্যে নিজেদের দেবতা ব'লে চালিয়ে দিয়েছিলো। কুমারীর তীব্র ঘৃণায় ঝলসে উঠে আমার মধুরা আমাকে দেখিয়েছিলো সেই অনুচ্ছেদ যেখানে অবিশ্বাসী বোর্দোবাসী মঁতেইন বলেছিলেন ইণ্ডিয়ানদের কথা, 'আমরা যাদের অজ্ঞতা আর অনভিজ্ঞতাকে কাজে খাটিয়ে, আমাদের

জীবনচর্যা আর রীতিনীতির দৃষ্টান্ত তুলে ধ'রে, নিয়ে এসেছি প্রবঞ্চনা, বিলাসব্যসন, লোলুপতা ও সর্বপ্রকার অমানুষিকতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে'। এই অধর্মাচরণে দুঃখে-ক্ষোভে অন্ধ হ'য়ে এই ধর্মপ্রাণা তরুণী—সে তার বুকে সবসময় প'রে থাকে সোনার ক্রুশ—সত্যি-সত্যি এমন-এক লেখকের মত সমর্থন করেছিলো, যে কিনা অধর্মভরে এই কথা ঘোষণা করতেও পেছ-পা হয়নি যে নতুন দুনিয়ার বর্বরদের কোনোই কারণ নেই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ ক'রে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করার, কেননা তাদের নিজেদের ধর্মই নাকি দীর্ঘকাল ধ'রে খুব ভালোভাবেই তাদের কাজে লেগে এসেছে। আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে এ-সব ভ্রান্তি আসে শুধু প্রেমে-পড়া কোনো তরুণীর আপত্তি থেকেই—আর রূপসী সে, লাবণ্যময়ী—তার বিদ্বেষ জাগছে সেই পুরুষের প্রতিই যে তাকে বাধ্য করছে এত দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে, যে-পুরুষ শুধু চট ক'রে নিজের ভাগ্য ফেরাবার জন্যই এমন একটা বহুবিজ্ঞাপিত উদ্যোগে বেরিয়ে পড়ছে। এটা আমি বুঝতে পারছিলুম ঠিকই, কিন্তু তবু আমার সাহসকে বীরত্বকে এমনভাবে উপেক্ষা ও ঘৃণা করার জন্য আমি গভীরভাবে আহত বোধ করছিলুম; যে-অভিযান আমাকে বিখ্যাত ক'রে তুলবে তার প্রতি তার কিনা কোনোই আকর্ষণ বা কৌতূহল নেই! কোনো-একটা দুর্ধর্ষ কীর্তি স্থাপন করতে পারলে, অথবা কোনো অঞ্চলকে পায়ের তলায় দাবাতে পারলে, রাজা আমাকে হয়তো কোনো উপাধি বা খেতাব দিয়ে বসবেন—যদিও তাতে হয়তো আমার হাতে গুটি-কয় ইণ্ডিয়ান মারা পড়বে! কোনো মহৎ কাজই কোনো রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব বিনা সম্পন্ন হয় না, আর আমাদের পবিত্র বিশ্বাস তো এটাই যে ধর্মকে খোদাই করতে হয় রক্তের অক্ষরেই। কিন্তু আমার মধুরা যে এখন সান্তো দোমিঙ্গোর এমন-একটা কুৎসিত ছবি আঁকছে, তার পেছনে আছে প্রবল ঈর্ষার তাড়াই তো—যে-সান্তো দোমিঙ্গোতে গিয়ে আমরা নামবো, তাকে সে বর্ণনা করছে মনমাতানো বেমানান কথায়, সেটা নাকি 'ভ্রষ্টা নারীদের নন্দনকানন'। এটা তো স্পষ্টই যে তার কৌমার্য সত্ত্বেও সে ভালোই জানে আশপাশের জাহাজঘাটা থেকে সে-কোন্ ধরনের মেয়েরা কোতোয়ালির লোকদের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে আর খালাশিদের অবিরাম হাস্যরোল ও খিস্তিখেউড়ের মধ্যে এল কাবো ফ্রাঁসের উদ্দেশে যাত্রা করে। কেউ হয়তো তাকে বলেছে, হয়তো কোনো দাসীই তাকে বলেছে একধরনের উপরতি পুরুষদের পক্ষে ঠিক স্বাস্থ্যকর নয়, আর সে তাই কল্পনা ক'রে বসেছে যে আমি বুঝি আমেরিকার নদনদীতে যার অবাধ প্রাচুর্য সেই বন্যা ঝড় বা জলসর্পের চেয়েও ভয়ংকর কোনো দুর্বিপাকের মধ্যে গিয়ে পড়ছি—দুর্নীতিজাগানো তাপ ও নগ্নতায়

ভরা কোনো নন্দনকাননে। শেষটায় আমি বিরক্তিই বোধ করতে লাগলুম। এ-রকম মুহূর্তে আমি প্রত্যাশা করেছিলুম সজলকোমল কোনো বিদায়, অথচ তার বদলে এ কী আপদ! আমি নিন্দা-টিটকিরিতে বিঁধিয়ে দিতে শুরু করলুম মেয়েদের ভীরুতা, বীরত্বে তারা অক্ষম, তাদের জীবনদর্শন শুধু কাচ্চাবাচ্চার কাঁথাকাপড়েই বাঁধা—গৃহস্থালির কাজেই বন্দী। আর, এমন সময়, এক সশব্দ কড়া নাড়া ঘোষণা করলে তার বাবার অসময়ে বাড়ি ফেরা। আমি পেছনের জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালালুম, ভাগ্যিশ বাজারের কেউই আমায় দেখতে পায়নি : কারণ পথিক, জেলে বা মাতালরা—সন্ধে হ'তে-না-হ'তেই তাদের সংখ্যা অগুনতি—কাকে যেন ঘিরে ছিলো, একটা চৌকির ওপর উঠে লোকটা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কী-সব বলছিলো। আমি গোড়ায় ভেবেছিলুম সে বুঝি কোনো ফিরিওলা, বীর্যবর্ধক ওভিয়েতো সঞ্জীবনী বেচতে চাচ্ছে, কিন্তু দেখা গেলো যে আসলে সে এক সন্ন্যাসী, চীৎকার ক'রে দাবি করছে সব পবিত্র তীর্থস্থানের মুক্তি। আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের রাস্তা ধরলুম। কিছুকাল আগে আমি প্রায় ফুক দ্য নোইঙ্গর জেহাদে নাম লিখিয়ে ফেলেছিলুম। এক সবিরাম জ্বর—আমার সাধ্বী মায়ের মলম ও মালিশ এবং ভগবানের দয়া যা সারিয়ে তুলেছিলো—খুব ভাগ্য যে যাত্রার দিনে আমাকে বিছানায় থর্থর ক'রে কাঁপাচ্ছিলো : সেই অভিযান শেষ হয়েছিলো—সকলেই জানে—খ্রিষ্টানদের সঙ্গে খ্রিষ্টানদের যুদ্ধে। ক্রুসেড, জেহাদ, ধর্মযুদ্ধ—এ-সবে আজকাল কোনো মানসম্মান নেই। তাছাড়া, আমার তো অন্য জিনিশ ভাববার আছে।

৪

বাতাস ম'রে গিয়েছে তখন। আমার বাগ্‌দত্তার সঙ্গে হাঁদার মতো ঝগড়াটা ক'রে তখনও আমি চ'টে আছি, আমি চ'লে গেলুম বন্দরে জাহাজগুলোকে দেখতে। জাহাজঘাটায় সেগুলো সব পাশাপাশি নোঙরবাঁধা, খোলের ঢাকা খোলা, কেউ যাতে চিনতে না-পারে পাশগুলো তাই ঝকমকে ছদ্মবেশ পরানো, হাজার-হাজার ময়দার বস্তা রাখা হচ্ছে খোলের মধ্যে। মালবাহকদের শোরগোল ও চ্যাঁচামেচি, সর্দার মাঝির বাঁশির তীক্ষ্ণ-সব বিস্ফোরণ, আর কপিকলগুলো চালাবার জন্য কুয়াশা-ছেঁড়া সংকেত—এইসবের মধ্য দিয়ে পদাতিক বাহিনী আস্তে এগিয়ে চলেছে পাটাতনের মধ্যকার সরু রাস্তাটা ধ'রে। পাটাতনের ওপর, তেরপলের তলায়, জড়ো ক'রে রাখা হচ্ছে কিম্ভূতকিমাকার সব জিনিশ আর ভয়ানক সব যন্ত্রপাতি। মাঝে-

মাঝে একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাখা আস্তে-আস্তে ঘুরছে গড়খাইয়ের ওপর আর তারপরেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে খোলের অন্ধকারে। দোকানপাটের ওপর দিয়ে পাটের দড়ির বাঁধন থেকে ঝুলতে-ঝুলতে ভাল্‌কিরিদের মতো সেনাধিনায়কের ঘোড়াগুলো চলেছে। আমি মাঝখানকার একটা উঁচু সরু লোহার সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েছিলুম। আর হঠাৎই, আচমকা, তীব্র কষ্টের সঙ্গে বুঝতে পারলুম যে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি—সব শুদ্ধু তেরো ঘণ্টাও নয়—তার মধ্যেই আমাকে উঠতে হবে এই জাহাজগুলোয়, যেগুলোর মধ্যে এখন আমারই ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা হচ্ছে। তারপর আমি ভাবলুম মেয়েদের কথা: সামনে প'ড়ে আছে নারীসংস্পর্শহীন কঠোর উপরতির দিন, অন্য-কোনো উষ্ণ থর্থর কামনাতুর শরীর থেকে সুখ নিংড়ে না-নিয়েই ম'রে যাবার বিষণ্ণতা! অধীর হ'য়ে—আর তখনও মেজাজ তিরিক্ষি, কারণ আমার মধুরার কাছ থেকে একটা চুমো অব্দি পাইনি আমি—আমি হন-হন ক'রে চললুম সেই বাড়িটার দিকে যেখানে নটীরা থাকে। ক্রিস্তোবাল, নেশায় চুর, এর মধ্যেই তার মেয়েটির ঘরে বন্ধ। আমার মেয়েটি আমায় আলিঙ্গন করলে, হাসলে, কাঁদলে, বললে, যে আমার জন্য তার নাকি গর্ব হয়, যে সৈন্যদের উর্দি গায়ে আমায় নাকি দারুণ সুপুরুষ দেখায়, যে এক ভাবী-কথক তাশ প'ড়ে তাকে বলেছে যে মহা-অবতরণিকার সময় আমার নাকি কোনো বিপদ হবে না। একাধিকবার আমায় সে বললে 'বীরপুরুষ', যেন সে নিশ্চিত জানে আমার মধুরার অন্যায় মন্তব্যগুলোর পাশে তার এই চাটুবাক্য কেমন নিষ্ঠুর শোনাবে। আমি বেরিয়ে গেলুম ছাতে। এক-এক ক'রে আলো জ্ব'লে উঠছে শহরে, ফুটিয়ে তুলছে আলোর সব বিন্দুতে ইমারৎগুলোর অতিকায় জ্যামিতি। নিচে, রাস্তার ওপর, মানুষের মাথা আর টুপির এক বিশৃঙ্খল দঙ্গল।

এত দূর থেকে সন্ধেবেলার কুয়াশায় পুরুষ থেকে স্ত্রীলোকদের চিনতে পারা অসম্ভব। অথচ এটাই তো নিয়ম যে এই অজানা অচেনা মানুষের দঙ্গল বেঁচেই থাকবে, আর কাল ভোরবেলায় আমায় গিয়ে উঠতে হবে জাহাজে। শীতের মাস-গুলোয় আমি চ'ষে বেড়াবো ঝড়ের সমুদ্র, তার তারপর গিয়ে নামবো কোন্ সুদূর ডাঙায়—ইস্পাত আর আগুনের গনগনে হামলার মধ্যে—আমার স্বদেশের আদর্শ বাঁচাবার জন্য। এইই শেষ, প্রতীচীর মানচিত্রের ওপর আর-কখনও কেউ এসে তলোয়ার ঘোরাবে না। এবার আমরা চিরকালের মতো খতম ক'রে ফেলবো নতুন টিউটনিক বর্বরদের আর বিজয়ী হ'য়ে অগ্রসর হবো সেই বাঞ্ছিত ভবিষ্যতের দিকে যেখানে মানুষে-মানুষে কোনো বিরোধ থাকবে না আর। আমার রক্ষিতা তার

কাঁপা হাতটা রাখলে আমার কপালে, হয়তো সে অনুমান করতে পারছিলো আমার চিন্তার মহত্ব। তার আদ্ধেক খোলা ঢোলা জামাটার তলায় সে ছিলো পুরোপুরি নগ্ন।

৫

গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম উষার কয়েক প্রহর আগে, ঈষৎ টলোমলো পায়েই, কেননা মদিরা পান করিয়া আমি প্রতারিত করিতে চাহিয়াছিলাম দেহের অবসাদকে, অপর-কাহারও দেহ ভোগ করিবার পর অলস সুখাবসাদে সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। প্রচণ্ড ক্ষুধা পাইয়াছে, নিদ্রাও, এবং সেইসঙ্গে সমাসন্ন যাত্রার চিন্তায় আমি ছিলাম গভীরভাবে বিক্ষুব্ধও। একটা চৌকির উপর আমার অস্ত্রশস্ত্র আর কোমরবন্ধ নামাইয়া রাখিলাম, আর পরক্ষণেই নিজেকে শয্যার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিলাম। আর তখনই, ঈষৎ বিস্মিত হইয়াই, আমি বুঝিতে পারিলাম, মোটা পশমের চাদরটার তলায় কে যেন শুইয়া আছে: আমি যেই আমার ছুরিটার জন্য হাত বাড়াইব, অমনি জ্বরাতুর দুই তপ্ত বাহু আমাকে জড়াইয়া ধরিল—এমনভাবে আমার গলা পেঁচাইয়া ধরিয়াছে যেন এই দুই বাহু কোনো ডুবন্ত মানুষের। আর সেইসঙ্গে দুটি বর্ণনাতীত মসৃণ কোমল পা আমার দুই পা লতার ন্যায় বেষ্টন করিয়া ফেলিল। আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম, যখন দেখিলাম যে গোপনে আসিয়া যে আমার বিছানায় শুইয়াছিল সে আর-কেহ নহে—আমারই মধুরা। তাহার ফুলিয়া-ফুলিয়া কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে সে আমাকে বলিল কেমন করিয়া অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া সে পলাইয়া আসিয়াছে, ঘেউ-ঘেউ ক্ষিপ্ত কুকুরগুলোর তাড়া হইতে ছুটিয়াছে সন্ত্রস্তা আতঙ্কিতা, আমার পিতার বিতানের ভিতর দিয়া সন্তর্পণে পা টিপিয়া-টিপিয়া আসিয়াছে আমার ঘরের জানালার কাছে। এইখানে সে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, অধীর, শঙ্কাতুর। সেদিন অপরাহ্ণে ঐ হাঁদার ন্যায় বচসার পর, সে মনে-মনে ভাবিয়াছে আমার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে কী-কী বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশা, আর মেয়েরা প্রায়ই যেমন নিজেদের দেহকে বিলাইয়া দিয়া সৈন্যদের বিপত্তিতে ভরা জীবনের ভার হালকা করার চেষ্টা করে, তেমনিভাবেই কামনা করিয়াছে আমাকে—যেন তাহাদের সযত্নলালিত কুমারীত্বের এই নৈবেদ্যই, অন্যের ইন্দ্রিয়-সুখের কাছে এইভাবে বেপরোয়া বিলাইয়া দেয়াতেই, যাত্রার মুহূর্তে, উপভোগের আশা ব্যতিরেকেই, রহিয়া গিয়াছে আনুষ্ঠানিক জলসিঞ্চনের বিঘ্নমোচন-করা মন্ত্রঃপূত

ক্ষমতা। কোনো প্রেমিকের হাত যাহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই, এমন-কোনো অনাঘ্রাত তনুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের মধ্যে আছে এক তুলনাহীন পরম-আরাধ্য নবীনতা, তনুর সাড়া ও স্পন্দনের মধ্যে আছে এক তুলকালাম সংবর্ধনা, এক স্বজ্ঞাচালিত অকপট সরলতা, যাহা কোনো অস্পষ্ট অস্ফুট তাড়ায় বুঝিয়া লয় পরিয়া ফ্যালে সেইসব তনুভঙ্গিমা যাহাতে সম্ভব হইয়া ওঠে নিবিড়তম দৈহিক মিলন। আমার মধুরার বাহুবেষ্টনের ভিতর শুইয়া যখন আমি অনুভব করিতেছি ছোট্ট কচি রোমগুচ্ছের কোমলতা যাহা ভীরুর মতো আমার একটি উরুকে স্পর্শ করিয়া গেল, আমি ক্রমে আরো-ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম—কেন আমি অতিপরিচিত সহবাসে আমার সব শক্তি ফুরাইয়া আসিয়াছি—আমার হবু ইন্দ্রিয়নিবৃত্তির দিনগুলির কথা ভাবিয়াই আমি বর্তমান আতিশয্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। আর এখন যখন আমাকে উপহার দেয়া হইতেছে এই চিরবাঞ্ছিত ইচ্ছাপূরণের সুযোগ, আমি প্রায় নিঃসাড় পড়িয়া আছি আমার মধুরার কম্পমান অধীর শরীরের তলায়। ইহা বলিব না যে এই নূতন ভোগের তাড়নায় আমার তারুণ্যে সে-রাত্রে পুনর্বার উদ্দীপক আগুন ধরিয়া যাইবার উপায় ছিল না—কিন্তু এই-যে দুর্ভাবনা—একজন কুমারী নিজেকে দিতে আসিয়াছে আমার কাছে এবং তাহার বদ্ধ সুনিবিড় অটুট কোরক চাহিবে আমার দিক হইতে এক মন্থর একটানা তীক্ষ্ণ প্রয়াস—আমাকে কেন যেন ব্যর্থতার এক প্রচণ্ড ভয় ও আবেশে ভরিয়া তুলিল। আমি আমার মধুরাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলাম একপাশে, সস্নেহে আলগোছে তাহার কাঁধে চুম্বন করিলাম, এবং তাহাকে রচিত-আন্তরিকতার সহিত বুঝাইতে শুরু করিলাম, যে বিদায়কালীন তাড়ার মধ্যে এমন সহবাসে আমাদের বিবাহরাত্রির সুখকে বিসর্জন দিলে কী-প্রচণ্ড ভুলই না করা হইবে ; সে যদি অন্তঃস্বত্বা হইয়া পড়ে তবে কী বিপুল লজ্জা হইবে তাহার, আর ছেলেমেয়েদের পক্ষেও ইহা গভীর দুঃখের হইবে। যদি কোনো বাবা না-থাকে তাহাদের, যে তাহাদের শিখাইতে পারে কেমন করিয়া ফাঁপা গাছের কোটর হইতে বাহির করিয়া আনে সবুজ মধু অথবা নুড়িপাথরের তলা হইতে কেমন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করে পোঁটকা মাছ! সে সব কথাই শুনিল, অন্ধকারে তাহার আয়ত উজ্জ্বল চোখ দুটি জ্বলিতেছে, আর আমি বুঝিতে পারিলাম যে সহজাত বুদ্ধির সুড়ঙ্গদেশ হইতে বাহির-হইয়া-আসা ক্ষুব্ধ অসন্তোষ তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছে : এই প্রকার সুযোগ করিয়া দিবার পরেও তাহাকে জোর করিয়া নিংড়াইয়া লইবার পরিবর্তে যে-পুরুষ দোহাই পাড়ে যুক্তির আর বিবেচনার, সেই পুরুষের প্রতি ঘৃণা ছাড়া তাহার আর কী আছে! শিকারের সাফল্যের পর

রক্তাপ্লুত বিজয়চিহ্নের মতো বিছানায় ফেলিয়া রাখা, বিদ্ধ, ছিন্ন, স্তনে দন্তপঙ্‌ক্তির চিহ্ন, তাহার পরাজয়ের মুহূর্তে পরিপূর্ণ নারীত্বে রূপান্তরিত হইবার জয়োল্লাস— ইহার বদলে কিনা ঠাণ্ডা যুক্তির বুলি! ঠিক তখনই আমরা শুনিতে পাইলাম গোরুদের হাম্বারব, মঙ্গল অনুষ্ঠানে তীরের কাছে তাহাদের বলি দেওয়া হইবে, আর পাহারার শঙ্খনির্ঘোষ। সারা মুখে ঘৃণা লেখা, আমার মধুরা আমাকে স্পর্শ করিবার সুযোগ না-দিয়াই চট করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, এবং, না, সলাজ ভঙ্গিতে নহে, বরং শস্তায় দাঁও ছাড়িয়া দিতেছিল বলিয়া কেউ যেমন হ্যাঁচকা টানে পুনরায় ফিরাইয়া লয় তাহার বেসাতি, অমনিভাবে সে ঢাকিয়া ফেলিল তাহার মোহিনী পশরা, আর অকস্মাৎ তাহা আমার কামনায় আগুন ধরাইয়া দিল। আমি তাহাকে থামাইবার আগেই সে জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িল। আমি দেখিলাম, সে জলপাই বনের মধ্য দিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া যাইতেছে, আর সেই মুহূর্তে আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমি যাহা এইমাত্র হারাইলাম, তাহাকে ফিরিয়া পাইবার চেয়ে বরং আমার পক্ষে দেহে কোনো আঁচড় ছাড়াই ট্রয় নগরীতে ঢুকিয়া পড়া সহজ হইবে।

আমি যখন মা-বাবার সহিত রণপোতগুলির কাছে গিয়াছি, তখন আমার মধ্যে সেনানীর অহমিকাকে হঠাইয়া দিয়া চাপিয়া বসিয়াছে এক সহ্যাতীত ঘৃণা ও তীব্র বিরক্তির সহিত অন্তর্লীন শূন্যতা আর আত্মঅবমাননার এক নিদারুণ ক্রোধ। নাবিকেরা যখন তীর হইতে তাহাদের বৈঠা আর লগি দিয়া পোতগুলিকে ঠেলিতে লাগিল, আর দাঁড়িদের সারের মধ্যে মাস্তুলগুলি দাঁড়াইল ঋজু ও সটান, আমি বুঝিতে পারিলাম যে সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইবার আগে যে-ঝলমলে প্রদর্শনী পানভোজন আর ইন্দ্রিয়বিলাস চলে, তাহা এখন শেষ হইল। এখন আর মালার সময় নাই, সময় নাই লরেল পাতার মুকুটের। সকল গৃহে মদিরা সেবনের অবসান হইল, দুর্বলদের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি আর স্ত্রীলোকদের অনুগ্রহ বিতরণও শেষ হইয়াছে। ইহার বদলে এখন হইতে আমাদের ভবিতব্য তূরীভেরীর তাড়া, জলকাদা, বৃষ্টি-ভেজা রুটি, দলনায়কদের ঔদ্ধত্য ও বদমেজাজ, ভ্রান্তিভরে ছিটানো রক্তধারা, পচিয়া-যাওয়া ক্ষতস্থানের দূষিত কটু গন্ধ। অনুভব করিলাম দীর্ঘকেশ, ক্ষমতা ও সুখে আমার শৌর্যবীর্যের পরিমাণ কতটা হইবে, সে-সম্বন্ধে আমার আত্মবিশ্বাস হ্রাস পাইতে শুরু করিয়াছে। এক যুদ্ধফেরৎ অভিজ্ঞ সৈনিক—সে পুনরায় যুদ্ধে যাইতেছে এই-জন্যই যে ইহাই তাহার জীবিকা, ঠিক যেমনভাবে কোনো মেষপালক তাহার ভেড়া-দের লোম ছাঁটিতে যায়, সেও তেমনিভাবেই যুদ্ধে চলিয়াছে—যে-ই শুনিতে রাজি

হইতেছে, তাহাকেই বলিতেছে যে স্পার্তার হেলেন ট্রয়নগরে গিয়া খুবই সুখে আছে, যে যখন সে পারিসের শয্যায় কামকেলি ক'রে, তাহার গভীর শ্বাস আর সান্দ্র শীৎকার প্রাসাদের সমস্ত কুমারীদের গণ্ডদেশ লজ্জায় রাঙাইয়া দেয়। লেডার দুহিতার অসুখী বন্দিত্বের পুরো কাহিনীটা, এবং ট্রয়বাসীরা তাহাকে অপমান ও লাঞ্ছনা করিতেছে বলিয়া যে-গল্প ফাঁদা হইয়াছে, তাহা নিছকই রটনা। মিথ্যা সম্প্রচার, মেনেলাউসের সম্মতিক্রমে আগামেমননই যে-সব বানাইয়াছে। বস্তুত, এই উদ্যোগের আড়ালে, এবং পর্দা হিশাবে যে বড়ো-বড়ো আদর্শের কথা বলা হইতেছে তাহার আড়ালে, বহুবিধ স্বার্থ ও অভিপ্রায় লুকানো আছে, যাহা কদাপিও যোদ্ধাদের কাহারোই কোনো উপকারে আসিবে না; সর্বোপরি—বৃদ্ধ সৈনিক আরো বলিল—অনেক মৃৎনির্মিত শিল্পদ্রব্য, অনেক বসনভূষণ, রথচালন প্রতিযোগিতার দৃশ্য সম্বলিত অনেক কুঁজো ও কলস, আর এশিয়ায় যাইবার নূতন-নূতন রাস্তা দখলে আনা—এশিয়ার লোকেরা ব্যাবসা ও বিকিকিনিতে উন্মাদনা বোধ করে—এবং চিরকালের মতো ট্রয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে খতম করিয়া দেওয়া—ইহাই আসলে মূল অভিপ্রায়। গম আর মানুষে ঠাশাঠাশি বোঝাই, বেশি ভারের তলায় ডুবু-ডুবু, রণপোতগুলি খুবই আস্তে আমাদের দাঁড়ের তাড়ায় সাড়া দিল। আমার দেশের শহরের রৌদ্রে-ঝলসানো বাড়িঘরগুলির দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিলাম। আমার দুইচোখে প্রায় জল আসিয়া গিয়াছিল। আমি মাথা হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া লইলাম, তাহার টিকলির আড়ালে চোখদুটিকে ঢাকিলাম—ইহাকে সুগোল আর মসৃণ করিবার জন্য আমি বিস্তর খাটিয়াছিলাম—যেন ইহাকে দেখিবামাত্র মনে পড়িয়া যায় তাহাদের সেই জমকালো ও চমৎকার টিকলিগুলার কথা, যাহারা তাহাদের যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সেরা শিল্পী ও কারিগরদের আদেশ করিয়াই পাইয়া যায়, আর যাহারা সাগর পাড়ি দেয় সবচেয়ে দ্রুত, সবচেয়ে ছিপছিপে, সবচেয়ে দীর্ঘ রণপোতে।

প্রজ্ঞাবানেরা

১

উষা সজীব হ'য়ে উঠেছিলো ক্যানুতে-ক্যানুতে। দক্ষিণের নদীর সঙ্গে যেখানটায় এসে মিশেছে ওপর-থেকে-নেমে-আসা নদীর ধারা, সেখানে মোহনার সেই বিপুল হ্রদ বা অন্তর্দেশী সমুদ্রের বিশাল প্রসারে দ্রুত, ক্ষিপ্র, চঞ্চল নৌকোগুলো একের পর এক এসে হাজির হচ্ছিলো, গর্বিতভাবে তারা দেখাচ্ছিলো তাদের ছিপছিপে দীঘল কাঠামো, আর থেমে যাবার আগে, তাদের বৈঠার সাবলীল ছন্দ ও সুসমঞ্জস বক্রচলন ; এর মধ্যেই অন্য অনেক নৌকো আগেই এসে পৌঁছেছিলো, তারা দাঁড়িয়েছিলো নিশ্চল, গায়ে-গায়ে লাগানো, গুচ্ছময় ; আর কতগুলো সঙ কিম্ভূত সেজে পেছন থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে আসছিলো সামনের দিকে গলুইতে, বেজায় ফুর্তি আর ইয়ার্কি মারছিলো তারা, আর তাদের কিম্ভূতকিমাকার খেলায় বোমৃকে দিচ্ছিলো সবাইকে।

এমন-সব উপজাতির লোক এসে এখানে জড়ো হয়েছে, যাদের মধ্যে ছিলো শতাব্দীর শক্রতা—কেউ হয়তো ও-দলের কোনো স্ত্রীলোককে নিয়ে গেছে কেড়ে, আবার অন্য-কেউ হয়তো চুরি করেছে এ-দলের মাংস আর ভুট্টা—কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে মারামারির কোনো মেজাজ নেই ; সব ঝগড়াঝাঁটি ভুলে গিয়ে তারা কেমন বোকার মতো এ ওর দিকে তাকিয়ে হাসছিলো, কোনো বাক্যালাপ না-ক'রেই অবশ্য। এখানেও আছে ওয়াপিশান আর শিরিশান উপজাতির মানুষ, অনেকদিন আগে—দুই, তিন কিংবা চার শতাব্দী আগে—যারা কুটি-কুটি ক'রে কাটতো পরস্পরের ডালকুত্তোর দল, চুরি করতো পরস্পরের অস্ত্রশস্ত্র, আর এমন-সব হিংস্রভীষণ মারাত্মক লড়াই বাঁধিয়ে দিতো, যে সে-কাহিনী বলবার জন্য একজনও বেঁচে থাকতো না। কিন্তু সঙের দল তাদের যৌনাঙ্গগুলো দেখিয়ে ক্যানু থেকে ক্যানু লাফিয়ে-লাফিয়ে ডিঙিয়ে এলো : গাছপালা লতাপাতার রস নিংড়ে বানানো রং দিয়ে লেপা তাদের মুখ, হরিণের শিং লাগিয়ে যৌনাঙ্গগুলো অবিশ্বাস্য বড়ো ক'রে তুলেছে তারা, ঝাঁকাচ্ছে তাদের তম্বুরা, আর ঝোলা কড়িঝিনুকের জাল। এই শান্তি আর মৈত্রীর আবহাওয়া নতুন আগন্তুকদের একেবারে অবাক ক'রে দিলে—অস্ত্রশস্ত্র সব আছে নাগালের মধ্যে, সব এমন শানানো যে যে-কোনো মুহূর্তে কাজে লেগে যাবার জন্য তৈরি, এমনভাবে ফসকা গেরো দিয়ে সব বাঁধা যে এক হ্যাঁচকা টানেই

সব খুলে নেয়া যাবে—যদিও সেগুলো প'ড়ে আছে চোখের আড়ালে, ক্যানুগুলোর খোলের মধ্যে, তলায় ; আর এই নৌকোগুলোর জমায়েৎ, গতকালকের শত্রুদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের এই সমতান, সঙের দলের উচ্ছল কিচিরমিচির—এই সমস্তই এখন সম্ভব হয়েছে একটাই কারণে—কেননা সব উপজাতিকেই (সেই-যারা থাকে প্রপাতের ওপাশে, সেই-যাদের আগুন নেই, সেই-যারা ঘরনীড়হারা যাযাবর, সেই-যারা রং-করা গিরিপাহাড়ের মানুষ, সেই-যারা জলের সুদূর মিলনভূমির দেশে থাকে) বলা হয়েছে এক বিপুল উদ্যোগের জন্য বৃদ্ধ সকলের সাহায্য চায়। শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, সব উপজাতিই বৃদ্ধ আমালিওয়াককে তার বিপুল প্রজ্ঞার জন্য শ্রদ্ধা করে—বৃদ্ধের অনুধাবন বিশাল, সূক্ষ্ম যথাযথ তার সুবিচারের বোধ, আর এই জগতে এত দীর্ঘদিন সে কাটিয়েছে যে তার অভিজ্ঞতার পরিধি সুবিস্তৃত ; তাছাড়া পাহাড়ের চূড়ায় আমালিওয়াক বসিয়েছে প্রকাণ্ড তিন পাথরের একশিলা, যখনই কোথাও কোনো বাজ পড়ে, এই তিন পাথরের প্রতিধ্বনিকে সবাই তখন বলে আমালিওয়াকের ঢাকের আওয়াজ। যাকে দেবতা বলে, আমালিওয়াক তা নয় ; কিন্তু সে এমন মানুষ যে 'সব জানে' ; সাধারণ মর্তবাসী যে-সব জিনিশ বোঝে না, সে-রকম অনেককিছু সে জানে, বোঝে ; যে হয়তো মাঝে-মাঝেই কথা বলে কোনো নাগজনকের সঙ্গে, যে-আদিনাগ শুয়ে আছে পাহাড়ের ওপর কুণ্ডলি পাকিয়ে ; কোনো হাত যেমন ক'রে হুবহু অনুসরণ করে অন্য হাতের ছাপ, তেমনি সে নানা-কিছুর অনুসরণ ক'রে জন্ম দিয়েছে এমন-সব ভয়ানক দেবতাদের যারা মানুষের ভাগ্য শাসন করে, সুন্দর রামধনুরঙা তুকান পাখির চঞ্চুতে যাদের সুমঙ্গল মূর্ত, আর যাদের অমঙ্গল প্রকাশ পেয়েছে প্রবাল-সাপের মধ্যে, যার ছোট্ট ছিমছাম ফণাটি লুকিয়ে রেখেছে মারাত্মক গরল! মাঝে-মাঝে লোকে ঠাট্টা ক'রে বলে যে আমালিওয়াকের বয়েস এখন এতটাই যে সে এখন নিজের সঙ্গেই কথা বলে, হাঁদার মতো কথায়-বার্তায় নিজেরই প্রশ্নের উত্তর দেয়, আর নয়তো কথা বলে পিপে জালা ঝুড়ি বোয়ম তীর-ধনুকের সঙ্গে—যেন তারা সব জ্যান্ত মানুষ। কিন্তু তিন দামামার এই বৃদ্ধ যখন তলব পাঠালো, তার মানেই এই যে কিছু-একটা অভূতপূর্ব ঘটতে চলেছে। সেইজন্যই এই সকালে ওপরের নদী আর দক্ষিণের নদীর মোহনার শান্ত জল ক্যানুতে-ক্যানুতে এমন কানায়-কানায় ভ'রে গিয়েছে।

জলের ওপরে বেরিয়ে গেছে যে-চ্যাপটা পাথরখণ্ড, কোনো অর্ধসমাপ্ত অতিকায় সেতুর মতো, বৃদ্ধ আমালিওয়াক যখন তার ওপরে এসে দাঁড়ালো চারপাশে নেমে এলো মৃত্যুর স্তব্ধতা। সঙের দল ফিরে গেলো যে যার নিজের ক্যানুতে, ডাইনি-

পুরুতেরা তাদের যে-কান কম বধির সেটা বাড়িয়ে দিলে তার দিকে, উৎকর্ণ, আর মেয়েরা বন্ধ ক'রে দিলে তাদের জাঁতা ঘোরানো, গম পেষাই। নৌকোর সারের সবচেয়ে দূর কিনার থেকে বোঝা যাচ্ছিলো না বৃদ্ধের বয়েস আরো বেড়েছে কিনা। দূর থেকে তাকে দেখালো কোনো শশব্যস্ত কীটের মতো, যেন পাথরখণ্ডটার ওপরে কোনো খুদে মিরকুট্টে জ্যান্ত জিনিশ। তারপর সে তার হাত তুললো, কথা শুরু করলো। প্রকাণ্ড-এক উৎক্ষেপ নাকি মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করতে বদ্ধ-পরিকর ; বললো, এ-বছর সাপেরা ডিম পেড়েছে গাছপালার মগডালে ; বললো, যদিও তার পক্ষে কারণটা খুলে বলা অসম্ভব, তবু এক ভয়াবহ সর্বনাশ এড়াবার সেরা উপায়টা হবে চট ক'রে কোনো পাহাড়ে, গিরিচূড়ায় বা পর্বতমালায় গিয়ে আশ্রয় নেয়া।

'ওখানে তো কিছুই গজায় না,' এক ওয়াপিশান তার পাশের এক শিরিশানকে বললে—সে চুপচাপ বৃদ্ধের কথা শুনছিলো, কিন্তু তার মুখে লেপটেছিলো এক ধূর্ত প্যাঁচালো হাসি।

কিন্তু বামপাশে, যেখানে ওপর-থেকে-আসা ক্যান্তুগুলো ভিড় জমিয়েছিলো, এক তীব্র শোর উঠলো : কে যেন চেঁচিয়ে বললে : 'আমরা কি দু-দিন দু-রাত ধ'রে নৌকো বেয়ে এসেছি শুধু এই কথা শোনবার জন্যে ?'

'সত্যি-সত্যি কী ঘটবে, জানতে চাই,' চীৎকার উঠলো যারা ছিলো ডানপাশে তাদের মধ্যে।

'যারা দুর্বল, রোগাপটকা, তারাই সবসময় গিয়ে দেয়ালে ঘা খায় !' চীৎকার করলে বামদিক।

'মোদ্দা কথাটা বলো। মোদ্দা কথাটা বলো !' চীৎকার করলে ডানদিক।

বৃদ্ধ আবারও তার হাত তুললো। সঙের দল আবার চুপ ক'রে গেলো। বৃদ্ধ আবারও বললো এক দীর্ঘ সুপ্রকাশ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে যা জেনেছে, তা সম্পূর্ণ খুলে বলবার অধিকার তার নেই। এই মুহূর্তে সে শুধু চায় সকলের অস্ত্রশস্ত্র—এক বিপুল-সংখ্যক গাছপালার গায়ে সে-সব আছড়ে পড়ার জন্য, এবং যত শিগগির তা সম্ভব, তত শিগগির। ভুট্টায় মাশুল দেবে সে—বিশাল-বিশাল ভুট্টাখেত আছে তার—আর দেবে শুকনো কন্দমূলের গম, যাতে তার সব ভাঁড়ার কানায়-কানায় ভরা। যারা তাদের ছেলে-মেয়ে, জাদুকর, ডাইনি-পুরুত, সঙের দল নিয়ে এসেছে, তাদের সকলকেই—উপস্থিত সকলকেই—যা-যা দরকার সব দেয়া হবে—এমনকী পরে সঙ্গে তল্পি বেঁধে নিয়ে যাবার জন্যও আরো ভূরি-ভূরি জিনিশ দেয়া হবে। এই

বছর এমন-এক খরখরে অদ্ভুত স্বরে সে কথাগুলো বললো যে যারা তাকে জানতো, তারা বেশ অবাকই হ'লো—এই বছর কেউ আর ক্ষুধা থেকে কোনো কষ্ট পাবে না, ঝড়বাদলের দিনে নিছক কেন্নো খেয়ে দিন কাটাতে হবে না তাদের। কিন্তু একটা জিনিশ খুবই জরুরি ; সব আগে, তাদের গাছপালাগুলো কেটে ফেলতে হবে ফিটফাট করে ; গুঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে ; কেটে পেড়ে ফেলতে হবে সব ডালপালা—তা সে ছোটোই হোক বা বড়োই হোক : আর এমন কাঠ তার কাছে নিয়ে আসতে হবে যেগুলো হবে মসৃণ, পাহাড়ের ওপরকার ঐ ঢাকগুলোর মতো—তাতে কোনো জট বা গ্রন্থি বা বন্ধুরতা থাকতে পারবে না ; তারপর তা স্তূপ ক'রে রাখতে হবে ঐ খোলা জায়গাটায়—আর সে হাত তুলে অরণ্যসংলগ্ন এক বিশাল ফাঁকা জায়গাটাকে নির্দেশ করলো—সেখানে কোন্ উপজাতি কত কত কাঠ দিয়েছে তা নুড়ি সাজিয়ে-সাজিয়ে হিশেব করা হবে। বৃদ্ধ কথা থামালো, এক সময় শেষ হ'লো করতালি ও সংবর্ধনা, আর কাজ শুরু হয়ে গেলো।

২

'বুড়ো একটা পাগল, উন্মাদ!' এই কথাই বললে ওয়াপিশান উপজাতির লোকেরা, বললে শিরিশানরা, গুহাহিকো আর পিয়ারোয়ারা ; এই কথাই বললে সকল উপজাতির লোক, যারা গাছ কাটার কাজে লেগে পড়েছিলো—বিশেষ যখন দেখলে যে তারা যে-কাঠ নিয়ে আসছে তা দিয়ে বৃদ্ধ একটা বিশাল ক্যানু বানাতে শুরু করেছে—অন্তত যা সে বানাচ্ছে, তাকে ক্যানুর মতোই দেখাচ্ছে—যদিও এমন-কোনো ক্যানুর কথা কোনো মানুষের মগজই ভাবতে পারতো না। এ এক হাস্যকর ক্যানু, অসম্ভব ক্যানু, এ কখনও জলে ভাসতে পারবে কিনা সন্দেহ, তিন ঢাকের পাহাড়ের ঢল থেকে একেবারে জলের গায়ে এসে পৌঁছেছে ক্যানুটা, ভেতরটা খুপরি করা : কেন—তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, তার খুপরির দেয়ালগুলো এমন যাতে দরকারমতো এদিক-ওদিক সরানো যায়। এই তিনতলা ক্যানুর ওপরটায় তৈরি করা হ'লো এমন-কিছু যাকে দেখালো ঠিক একটা বাড়ির মতো, ছাতটা ছাওয়া চারপল্লা তালপাতা দিয়ে, দু-দিকে একটা ক'রে জানলা বসানো ; আর, তাছাড়া, ক্যানুর খোলটা এতই গভীর যে এ-দেশের কোনো নদীতে তা সম্ভবত কখনোই ভাসবে না—বিশেষত, এখানে জলের মধ্যে যে অগুনতি বালুতীর আর ডুবো-

পাহাড়ের ছড়াছড়ি, তাতে নির্ঘাৎ ধাক্কা খাবে। অথচ, কী-অদ্ভুত ব্যাপার, এটাকে দেখতে ঠিক কোনো-একটা ক্যান্থুর মতো—নাব্যতার জন্য যা-যা চাই, সব আছে : জোড়তলি, পোলিঙ্গ, ছুঁচলো গলুই। কিন্তু এটাকে তবু কখনোই জলে ভাসানো যাবে না। এটা আবার কোনো মন্দিরও নিশ্চয়ই নয়, কারণ দেবতারা পুজো পান পাহাড়চুড়োর গর্তে-গুহায়, যে-সব গুহার দেয়ালে-দেয়ালে তাদের পূর্বপুরুষ এঁকে গেছে পশুপ্রাণী, শিকারদৃশ্য, বিশাল স্তনের স্ত্রীলোক ; না, বৃদ্ধ—সন্দেহ নেই—নিশ্চয়ই এক উন্মাদ ! তবে তার এই পাগলামি বেশ লাভজনক। আছে কন্দমূলের গম আর ভুট্টা, এবং খিদে মেটাবার পরেও এত রাশি-রাশি ভুট্টা থেকে যাবে যে জালার মধ্যে তা গাঁজিয়ে নিয়ে বানানো যাবে চিচা। যত দিন যায়, ক্যান্থুটা ক্রমেই যত বড়ো হয়, এই অতিকায় ক্যান্থুর ছায়ায় তারা এ দিয়ে ভোজসভা লাগিয়ে দেয়। এবার বৃদ্ধ চাইলো আঠালো পাতার এক গাছ থেকে চুঁইয়ে-পড়া শ্বেত রঞ্জন : যে-সব জোড়ের মুখে একটা তক্তা আরেকটার খাপে-খাপে নিখুঁত লেগে যায়নি, তার ফাঁকফোকরগুলো এই রজন মাখিয়ে ভরাট করা হয়। রাতে তারা নাচ জুড়ে দেয় আগুনের কুণ্ডের চারপাশে ; ডাইনি-পুরুতরা প'রে নেয় বিশাল সব পাখি আর দত্যিদানোর মুখোশ ; সঙের দল নকল ক'রে দেখায় হরিণ আর মাকড়শা আর ব্যাং ; এছাড়া নানা উপজাতির মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা, প্রতিস্পর্ধা, দ্বৈতালাপ, রক্তপাতহীন খেলা ও বাজি। তারপর আসে নতুন উপজাতির দল—নতুন খেলা দেখায় তারা। যতদিন-না আমালিওয়াক ক্যান্থুর ছাতের ওপর এক ফুলেভরা ডাল পুঁতে দিয়ে, অতিকায় ক্যান্থুটার পাটাতনে দাঁড়িয়ে বললে যে এবার কাজ শেষ, ততদিন ধ'রে একটানা চললো উৎসব। প্রত্যেককেই কথা-মতো কন্দমূলের গমে আর ভুট্টায় মজুরি দিয়ে দেয়া হ'লো আর উপজাতিরা রওনা হ'য়ে পড়লো যে যার নিজের তল্লাটের উদ্দেশে : তাদের মনে যে একটু খেদ জাগেনি, তা নয়। ঐ-যে, ঐখানে পূর্ণিমার ফুটফুটে জ্যোৎস্নায়, দাঁড়িয়ে আছে ঐ অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব ক্যান্থুটা—এমন-একটা ক্যান্থু, আগে কেউ কোনোদিন যার কোনো দোসর চোখেও দ্যাখেনি—এ এমন-এক পার্থিব ইমারৎ যেটা কোনোদিনও জলে ভাসবে না, যদিও তার চেহারাটা জলপোতেরই, যার-ওপরে-আছে-এক-বাড়ি, যার চারপল্লা তালপাতায় ছাওয়া ছাতে ঐ দেখা যাচ্ছে আমালিওয়াককে, গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন, অদ্ভুত-সব বিচিত্র-সব অঙ্গভঙ্গি ক'রে চলেছে। সর্ব-বস্তুর-রচয়িতার-মহান-কণ্ঠ তাকে বোধহয় কী-সব ব'লে চলেছে। সে ছিঁড়ে ফেলেছে ভবিষ্যতের বেড়াজাল আর কোনো গোপন জগৎ থেকে পাচ্ছে যাবতীয় নির্দেশ :

'আবার এই পৃথিবীকে জনাকীর্ণ ক'রে তুলতে হবে তোমায়—তোমার স্ত্রী যেন কাঁধের উপর দিয়ে তালবীজ ছড়িয়ে দেয় পেছনে।'

মাঝে-মাঝে শোনা যায় মহানাগের জনকের কণ্ঠস্বর, তার মারাত্মক মাধুর্যে যে আতঙ্ক জাগায়, গুনগুন ক'রে সে এমনভাবে কথা বলে যে রক্ত হিম হ'য়ে যায়।

'কেন একা আমাকেই,' ভাবলে বৃদ্ধ আমালিওয়াক, 'দেয়া হ'লো এই বিপুল গোপন রহস্যের ভার—যা লুকোনো রইলো বাকি সকলের কাছে? কেন আমারই ওপর চাপানো হ'লো এই ভয়াবহ আরতির দায়িত্ব? কেন শুধু আমার কাঁধেই চাপানো হ'লো এই বিপুল কর্মের ভার?'

কৌতূহলী এক সঙ থেকে গিয়েছিলো শেষ নৌকোগুলোর একটায় যাতে সে নিজের চোখে দেখতে পারে এই অতিকায় ক্যানুর অদ্ভুত আস্তানায় এর পরে কী-কী ঘটবে। আর যখন চাঁদ ডুবে গেলো চারপাশের পাহাড়ের আড়ালে, অদ্ভুত অসাধারণ অভাবনীয় সব মন্ত্রের গুঞ্জন শোনা গেলো, এমন-এক স্বর সে-সব মন্ত্রের উচ্চারণ করছে, যা আমালিওয়াকের চেয়েও অনেক-অনেক শক্তিশালী। আর তারপর যেখানে কাটা গাছগুলোকে ফেলা হয়েছিলো, কী যেন নড়তে শুরু ক'রে দিলে—সে বুঝি গড়া উদ্ভিজ্জে, গাছপালায়, মাটিতে। ভয়ানক একটা শব্দ হ'লো—লাফ দেবার, ওড়ার, বুকে হাঁটার, জোর কদমে ছোটার, ঠেলাঠেলির—সব ঐ অতিকায় ক্যানুকে লক্ষ্য ক'রে। ভোর হবার আগেই আকাশ শাদা হ'য়ে গেলো সারসে-সারসে। নখদন্তের এক বিশাল পুঞ্জ, শুঁড়ের আর চোয়ালের খড়্গের এক বিশাল বিস্তার, গর্জন ক'রে উঠলো, গম্ভীর ডেকে উঠলো, হাওয়ায় তুললো দমকা আলোড়ন; আন্দোলিত শুণ্ডের এক উদ্দাম ঠেলাঠেলিপুঞ্জ—এক পুঞ্জীভূত বিস্তার—প্রচণ্ড গতিতে ঝেঁটিয়ে এলো চারপাশ; সেই অবাস্তব জলপোতটায় ঢোকবার জন্য সে কী তাড়া আর রুদ্ধশ্বাস ঠেলাঠেলি তাদের! ওপরে দ্রুতবেগে উড়ে আসছে পাখিদের এক চাঁদোয়া—সেই খড়্গা, শিং, টগবগ-ছোটা খুর, দাঁত আর চোয়ালের মুহুর্মুহু আস্ফালন শুধু হাওয়া আর-ছাড়া কিছুতেই যাদের কামড়াতে পারছে না। আর মাটি কাঁপছে এ ওর গায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো সরীসৃপে-সরীসৃপে—জল-ডাঙা দুয়েরই যত সরীসৃপ—ক্ষণে-ক্ষণে রং-পালটানো মন্থর গিরগিটি আর সেইসব সাপ যারা ল্যাজ থেকে স্বর তোলে ঝমঝম—নিজেদের তারা ছদ্মবেশ পরিয়েছে আনারসের, নয়তো যেন হলদে পাথর বা লাল প্রবালের বালা সেজে ব'সে আছে। বেশিক্ষণ না-যেতেই আসতে শুরু করলো মধ্যদিনের জীবরা—সেইসব প্রাণী, যাদের কাছে সময়মতো পৌঁছোয়নি সাবধানবাণী, যেমন রক্তিম হরিণ, কিংবা অন্যরা—যেমন

কাছিম—দীর্ঘ ভ্রমণ যাদের কঠিন ঠেকে, বিশেষত ডিম পাড়ার ঋতুতে, অবশেষে যখন সে দেখলো যে শেষ কাছিমটি এসে ক্যান্থুতে ঢুকেছে, আমালিওয়াক পাটাতনের বিশাল দুয়ারটা বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে গেলো বাড়িটার সবচেয়ে উঁচু অংশে, যেখানে তার পরিবারের মেয়েরা—অর্থাৎ তার উপজাতি, যেহেতু তাদের লোকে বিয়ে করে তেরো বছর বয়সে—জাঁতা ঘোরাতে-ঘোরাতে ব'সে-ব'সে গান গাইছে। সেদিন দুপুরে আকাশ কালো ক'রে এলো—যেন কালো তল্লাটের কালো মাটি উঠে এসেছে শূন্যে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে কলঙ্ক মাখিয়ে দিয়েছে।

তারপর শোনা গেলো সর্ব-বস্তুর-রচয়িতার বিপুল-কণ্ঠস্বর, নির্দেশ দিচ্ছে: 'কানে ছিপি আঁটো তোমার।'

আমালিওয়াক নির্দেশমতো কাজ করেছে কি করেনি, এমন সময় বাজ ফেটে পড়লো—এমন ভয়ংকর, এত প্রলম্বিত যে সেই অতিকায় ক্যান্থুর জীবজন্তুরা তাতে বধির হ'য়ে গেলো। তারপর শুরু হ'লো বৃষ্টি। কিন্তু সবাই যাকে জানে, সে তেমন বৃষ্টি নয়। এ হ'লো দেবতাদের রোষের আক্রোশের বৃষ্টি—এক অন্তহীন পুরু জলের দেয়াল, ওপর থেকে গ'লে পড়ছে; অন্তহীন গ'লে যাচ্ছে জলের এক ছাদ। সে এমন বৃষ্টি যে এমনকী নিশ্বেস নেয়াও সম্ভব হচ্ছিলো না ব'লে বৃদ্ধ চ'লে গেলো তার কুঠুরির ভেতর। এরই মধ্যে জল চুঁইয়ে ঢুকেছে ভেতরে, মেয়েরা শুরু ক'রে দিয়েছে বিলাপ, শিশুরা উঠেছে ডুকরে। আর এখন কাকে বলে দিন কাকে বলে রাত তাও চেনা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। সবটাই রাত। এটা সত্যি যে আমালিওয়াক কতগুলো সলতে পাকিয়ে রেখেছিলো, সেগুলো জ্বালাবার পর তারা শুধু একটা দিন বা একটা রাতই জ্বলেছিলো। কিন্তু এখন যখন আলো উধাও হ'য়ে গেলো, বৃদ্ধের সব হিশেব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেলো, সে দিনকে ভেবে নিলে রাত, আর রাতকে দিন। আর তারপর, হঠাৎ, এমন-এক মুহূর্ত এলো, বৃদ্ধ যাকে ভুলবে না কোনোদিন; হঠাৎ একপাশে হেলে পড়তে লাগলো ক্যান্থুর গলুই। কোনো-এক প্রবল শক্তি যেন ভাসিয়ে দিচ্ছে ক্যান্থু, তুলে ধরছে তাকে শূন্যে, যাঁরা-সব-শাসন-করেন তাঁদের নির্দেশমাফিক যে-কাঠামোটা তৈরি করা হয়েছে, তাকে যেন ঠেলা লাগাচ্ছে কেউ। আর সেই এক মুহূর্তের শঙ্কা, দ্বিধা, প্রবল আকৃতি আমালি-ওয়াককে বাধ্য করলো আস্ত এক জালা চিচা এক ঢোঁকে পান করতে; সে টের পেলে ঢেউয়ের নিস্তেজ প্রতিঘাত, সেই অতিকায় ক্যান্থু ডাঙার সঙ্গে তার শেষ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছে। ভাসছে সে। তারপরেই সে তুলকালাম ছুটলো সামনে, পাহাড়ের মাঝখানে প্রপাতের এক জগতের মধ্যখানে ঝাঁপিয়ে পড়লো,

যে-প্রপাতগুলোর একটানা ক্রুদ্ধ গর্জন মানুষ ও জন্তু সকলের বুকেই আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছিলো। বিশাল ক্যানু ভেসে চলেছে।

৩

গোড়ায় আমালিওয়াক ও তার ছেলেপুলে ও তার নাতিপুতি এবং তাদেরও ছেলে-পুলে ও নাতিপুতি সবাই মিলে পাটাতনের ওপরে ঠ্যাং ছড়িয়ে বুক বেঁধে সারি-সারি দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, আর্তস্বরে চ্যাচাচ্ছিলো, প্রাণপণে চেষ্টা করছিলো নৌকোর হাল ফেরাবার হাতলটাকে বশে আনতে। কিন্তু বৃথা সে-চেষ্টা, ব্যর্থ। চারপাশে তাকে ঘিরে আছে পাহাড়, অবিশ্রাম তাকে চাবকাচ্ছে বিদ্যুৎ, বিশাল ক্যানু তীব্র-বেগে আছড়ে পড়ছে প্রপাত থেকে প্রপাতে, আর তীরের সব হ্যাঁচকা মোচড়ে আর বাঁকে, আর কোনোমতে শুধু তটের শৈলপ্রাচীরে আছড়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে নিজেকে, আর শুধু জলের ক্ষিপ্ত ধারার প্রচণ্ড গতিটাকে অনুসরণ করার ঝোঁকেই। বৃদ্ধ যখন বিশাল ক্যানুর কিনারের রেলিঙের ওপর দিয়ে তাকালো, সে দেখতে পেলো ক্যানু ছুটে চলেছে শুধু ঝোঁকের মাথায়, কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই, কোন্‌দিকে চলেছে ঠিক নেই—পুবদিকে নয় অন্তত (কোনো তারা কি চোখে পড়ে ?)—তরল কাদার এক সমুদ্র চারপাশে, যার বিস্তার ক্রমেই পাহাড়পর্বত অগ্নিগিরির আকার হ্রাস ক'রে ফেলছে ! এবার সে কাছ থেকে সেই সংকীর্ণ জ্বালা-মুখটাকে দেখতে পেলে, একদিন যে শিখা বমি ক'রে দিতো। তার ভিজে লাভার ঠোঁট এখন আর তেমন ভয়-ধরানো নয়। যতই তাদের ঢল উধাও হ'য়ে যাচ্ছে জলের তলায়, পাহাড়গুলো ততই ছোটো হ'য়ে আসছে। আর বিশাল ক্যানু তার অচেনা অস্থির ধাবমান পথে ছুটে যাচ্ছে বিপজ্জনক মাছেদের ঝাঁকের দিকে, কখনো-বা হ্যাঁচকা মোচড় খেয়ে পুরো পাক খাচ্ছে বনবন, তারপর কোনো দৃক্‌পাত না-ক'রেই ছুটছে কোনো ঘূর্ণিতোলা প্রপাতের দিকে, অবিশ্রাম যে আছড়ে পড়ছে নিচের অপেক্ষাকৃত শান্ত জলে। এইভাবেই সে ছুটলো সারাক্ষণ, কেউ কোনো-দিনও যে-সব প্রণালীতে আসেনি তাদের মধ্য দিয়ে, যতক্ষণ-না—যখন আমালি-ওয়াকের তালগোলপাকানো হিশেব বললো যে এইরকম ভয়ানক বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম কুড়ি দিন—হঠাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হ'য়ে গেলো। এক বিশাল জলবিস্তার ছড়িয়ে আছে চারপাশে, পাহাড়গুলোর শেষ চূড়াগুলোর মধ্যে থৈ-থৈ করছে এক বিপুল ও নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, তার কাদামাটির তীর দাঁড়িয়ে আছে সে-যে

কত হাজার বিঘত উচ্চতায় কে জানে ; আর এইখানেই আমালিওয়াকের বিশাল ক্যান্থ প'ড়ে রইলো অচঞ্চল। এ যেন সমস্ত-কিছুর-রচয়িতার-বিপুল কণ্ঠস্বর এক সাময়িক যুদ্ধবিরতির হুকুম দিয়ে বসেছে। মেয়েরা ফিরে গেলো তাদের জাঁতায়। নিচের খোলে ঘুমিয়ে পড়লো সব জীবজন্তু ; সুপ্রকাশের দিন থেকে তাদের সবাই-কেই—এমনকী যারা আমিষাশী, তাদেরও—ভুট্টা আর গমের প্রাত্যহিক পথ্যেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আমালিওয়াক—হা-ক্লান্ত, অবসন্ন—চিচার এক বিশাল জালা গলায় উপুড় ক'রে ঢেলে দিয়ে তার দড়ির খাটিয়ায় আছড়ে ফেললো নিজেকে—ঘুমুবার জন্য।

একটানা তিন দিন যখন ঘুমিয়েছে, তখন হঠাৎ আঁৎকে জেগে উঠলো ঘুম থেকে—তার পোত হঠাৎ যেন কিসের গায়ে ধাক্কা লাগিয়েছে। কিন্তু কোনো পাহাড় নয় সেটা, নয় কোনো শিলাখণ্ড, কিংবা অরণ্যের ফাঁকা পোতাশ্রয়ের ধারে যে জীবাশ্মে পরিণত-হওয়া গাছপালা প'ড়ে ছিলো, তাও নয়। অথচ ধাক্কাটা এমন অতর্কিত যে তাব অভিঘাতে অনেক-কিছুই এলোমেলো ছিটকে গেছে : জালা-বোয়ম, বাসনকোশন, হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র। অথচ সেইসঙ্গে ধাক্কাটা কেমন যেন মসৃণ, যেন জলে-ভাসা একটা কাঠ গিয়ে আরেকটা কাঠের গায়ে লেগেছে, কিংবা যেন কোনো ভাসমান গাছের ডাল গিয়ে আরেকটা ভাসমান গাছের ডালের গায়ে গিয়ে লেগেছে এবং পরস্পরের পিঠে ঘা দিয়ে তারপর একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে ভাসতে শুরু করেছে, ঠিক যেন স্বামী-স্ত্রী। আমালিওয়াক তার ক্যানুর উচ্চতম অংশে চললো। তার ক্যানুর সঙ্গে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অদ্ভুত কিছুর চাক্ষুষ সংযোগ ঘটেছে। না, ক্যানুর কোনো ক্ষতি হয়নি, তবে তার গায়ে ধাক্কা লেগেছে এক বিশাল তরীর, যার কাঠামো আর পোলিঙ্গ সব হা ক'রে আছে, খোলামেলা, মনে হ'লো তরীটা যেন বাঁশে আর শরে আর লতায়-পাতায় বানানো। আরেকটা ভারি-অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে তার : একটা মাস্তুলকে জড়িয়ে, হাওয়ার টান যেদিকে সেদিকে ঘুরছে এক চৌকো বর্গাকার পাল—এখন যদিও হাওয়ার তেমন-কোনো জোর দমক নেই, তবু সে নিজের পেটে এমনভাবে হাওয়া ঢোকাচ্ছে যেন সে কোনো কুটিরের ধোঁয়া-ওগরানো নল। পোতটা প'ড়ে আছে অন্ধকার, জীবনের কোনো সাড়া নেই কোথাও ; সব দেখে বৃদ্ধ আমালিওয়াক তার বিচক্ষণ অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে তরীটার আয়তন অনুমান করার চেষ্টা করলো—কোনো জালার মধ্যে কতখানি চিচা আছে আমালিওয়াকের চোখ তা সহজেই অনুমান করতে পারে। লম্বায় সে প্রায় তিনশো হাত আর চওড়ায় পঞ্চাশ আর উচ্চতায় তিরিশ হাত পরিমাণ।

'অনেকটা প্রায় আমার ক্যানুর মতোই,' সে আপনমনে বললে, 'যদিও সুপ্রকাশের সময় সবচেয়ে বড়ো যে-পরিমাপ বলা হয়েছিলো ; তা-ই আমি ব্যবহার করেছি। যেহেতু দেবতারা সব আকাশে চলাফেরা করেন—নৌচালনার তাঁরা অতি সামান্যই জানেন, বোঝা গেলো।' সেই অদ্ভুত তরীর পাটাতনের ঢাকা খুলে গেলো, আর তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো খুদে-মতো এক বৃদ্ধ, মাথায় তার লাল টুপি, তাকে দেখাচ্ছে দারুণ রুষ্ট : 'অ্যাঁ ? আমাদের দুজনেরই মাথায় তাহ'লে একই মৎলব খেলে গিয়েছিলো !' এক অদ্ভুত ভাষায় সে ব'লে উঠলো, এমন-এক সুরে যাতে প্রতিটি কথার উত্থান-পতন ঝমঝম করছে ; কিন্তু আমালিওয়াক তার কথা বুঝতে পারলো, কেননা তখনকার দিনে প্রজ্ঞাবানেরা মানুষের সব ভাষা বা আঞ্চলিক বুলিকে বুঝতে পারতো। আমালিওয়াক ঐ অদ্ভুত নৌকোটার গায়ে দড়িদড়া ছুঁড়ে ফেলবার হুকুম দিলে : তারপর অন্য নৌকোয় গিয়ে অন্য বৃদ্ধের সঙ্গে কোলাকুলি করলে। অন্য বৃদ্ধের গায়ের রং পীতাভ, সে জানালে সে সিন-দেশ থেকে এসেছে, আর তার বিপুল নৌকোর অন্ত্রের মধ্যে নিয়ে এসেছে সেই দেশের কিছু জীবজন্তু। খোলে ঢোকবার ঢাকা খুলে সে আমালিওয়াককে কতগুলো কাঠের খুপরি দেখালে, যার মধ্যে অচেনা সব জীবজন্তুর একটা জগৎ যেন র'য়ে গেছে—স্পষ্টতই স্বপ্নেও অ্যাদ্দিন যাদের কথা ভাবা যায়নি, জীবজগতের সেইসব প্রজাতি। একটা খুব বিশ্রী দেখতে কালো ভল্লুক দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তার দিকে বেয়ে উঠছে দেখে আমালিওয়াক আঁৎকে উঠলো ; নিচে দেখা গেলো অতিকায় কতগুলো হরিণ যাদের পিঠে কুঁজ ; আর কতগুলো মার্জারতুল্য জীব, এক মুহূর্তও স্থির থাকে না, যাকে তারা বলে বনবেড়াল।

'তুমি এখানে কী করছো,' সিনের মানুষ শুধোলে আমালিওয়াককে।

'আর তুমি ? তুমি নিজে ?' উলটে জিগেশ করলে বৃদ্ধ।

'মানবজাতি আর জীবজন্তুর সব প্রজাতিকে বাঁচাচ্ছি আমি,' বললে সিন-দেশের মানুষ।

'আমিও মানবজাতি আর জীবজন্তুর সব প্রজাতি বাঁচাচ্ছি,' বললে বৃদ্ধ আমালিওয়াক।

আর সিন-দেশের বৃদ্ধের অধীন স্ত্রীলোকরা তখন কিছু ধান্যসুরা এনে দেয়ায় সে-সন্ধ্যায় এ-সব বিষয় নিয়ে আর-কোনো কথা হ'লো না—অবশ্য এ নিয়ে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলা ছিলো ভারি কঠিন কাজ। আর সিন-দেশের বৃদ্ধ ও আমালিওয়াক যখন নেশায় যৎকিঞ্চিৎ বুঁদ হ'য়ে পড়েছে, যখন ঠিক ভোর হবে-হবে, হঠাৎ দুটো

নৌকোতেই কিসের সঙ্গে ধাক্কা লাগার এক বিরাট দুমদড়াম আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠলো। আয়তাকার এক জাহাজ, লম্বায় তিনশো হাত, চওড়ায় প্রায় পঞ্চাশ হাত, আর তিরিশ থেকে পঞ্চাশ হাত উঁচু—ওপরে এক বাসগৃহ বসানো, তাতে বাতায়নও আছে একটা—পাশাপাশি দড়ি দিয়ে বাঁধা পোতদুটির গায়ে এসে ধাক্কা খেয়েছে। তারা তার উদ্ধত অশালীন নৌচালনার জন্য এত্তেলা পাঠাবার আগেই এক বৃদ্ধ আবির্ভূত হ'লো তার ওপর, সত্যি এক থুরথুরে বুড়ো, লম্বা দাড়ি, আর সে এসেই এক টানকরা শুকনো চামড়ার গায়ে খোদাই করা কী-সব পড়তে শুরু ক'রে দিলে। সবাই যাতে তার কথা শুনতে পায়, তাই গলা ফাটিয়ে সে পড়ছিলো; সে বললে:

'ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ আমায় বললে: "তুমি গোফর কাষ্ঠ দ্বারা এক জাহাজ নির্ম্মাণ কর; সেই জাহাজের মধ্যে কুঠরী নির্ম্মাণ করিবে, ও তাহার ভিতরে ও বাহিরে ধূনা দিয়া লেপন করিবে। তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালা নির্ম্মাণ করিবে।"'

'আমাদের নৌকোতেও তিনটে তলা আছে,' বললে আমালিওয়াক।

কিন্তু অন্যজন ব'লেই চললো: '"আর দেখ, আকাশের নীচে প্রাণবায়ু বিশিষ্ট যত জীবজন্তু আছে, সকলকে বিনষ্ট করণার্থে আমি পৃথিবীর উপর জলপ্লাবন আনিব, পৃথিবীস্থ সকলে প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু তোমার সহিত আমি আপনার নিয়ম স্থির করিব; তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ করিবে।"'

'আর আমিও ঠিক তা-ই করিনি কি?' জিগেশ করলে বৃদ্ধ আমালিওয়াক।

কিন্তু অন্যজন তার নিজের সামনে প্রকাশিত বাক্যগুলোই ব'লে যেতে লাগলো: '"আর মাংসবিশিষ্ট সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রী-পুরুষ জোড়া-জোড়া লইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার্থে আপনার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবে; সর্ব্ব-জাতীয় পক্ষী ও সর্ব্বজাতীয় পশু ও সর্ব্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ জোড়া-জোড়া প্রাণ-রক্ষার্থে তোমার নিকটে প্রবেশ করিবে।"'

'ঠিক তা-ই আমি করিনি কি?' বললে বৃদ্ধ আমালিওয়াক। মনে-মনে ভাবছিলো এই নতুন আগন্তুকটি তার সব প্রকাশিত বাক্য নিয়ে বড্ড ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে—বড্ড বাড়াবাড়ি করছে—অথচ এই সুপ্রকাশ আসলে হুবহু অন্য-সকলেরই মতো। কিন্তু এক পোত থেকে অন্য পোতে যাতায়াত করার ফলে ক্রমে-ক্রমে তাদের মধ্যে সহমর্মিতার বন্ধন সৃষ্টি হ'য়ে গেলো। সিন-দেশের মানুষ, বৃদ্ধ আমালিওয়াক আর নূতন আগন্তুক—সকলেই ছিলো প্রচণ্ড পানাসক্ত। নূহর সুরা, বৃদ্ধের চিচা, আর

সিন-দেশের মানুষের ধান্তেশ্বরীর প্রভাবে তাদের মেজাজ বেশ-একটু নরম ও বিগলিত হ'য়ে গেলো। প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠলো, গোড়ায় একটু সসংকোচে, একটু লাজুক স্বরে; প্রশ্ন উঠলো তাদের নিজের-নিজের উপজাতি সম্বন্ধে, তাদের স্ত্রীলোক-দের সম্বন্ধে, তাদের খাদ্যরুচি সম্বন্ধে। এখন শুধু মাঝে-মাঝে বৃষ্টি পড়ে, আর তাও যেন আকাশকে একটু সাফ ক'রে দেবার জন্য। নূহ—নিরেট কঠিন তার জাহাজ—একবার প্রস্তাব করলে যে মর্তধাম থেকে সব উদ্ভিজ্জ লোপ পেয়ে গেছে কি না তা একটু পরীক্ষামূলকভাবে খোঁজ নিয়ে দেখবে। এখন-শান্ত কিন্তু সেই অকথ্য ঘোলা-জলের ওপরে সে এক পায়রা উড়িয়ে দিলে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পাখি ফিরে এলো, তার ঠোঁটে জলপাই গাছের কচি পাতা। পরে বৃদ্ধ আমালিওয়াক জলে ছেড়ে দিলে এক ইঁদুর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইঁদুর ফিরে এলো, থাবায় ভুট্টার শিষ। সিন-দেশের মানুষ উড়িয়ে দিলে এক তোতাপাখি, সে ফিরে এলো ডানার ভাঁজে ধানের শিষ নিয়ে। প্রাণ ফিরে আসছে আবার তার স্বাভাবিক ধারায়। এখন শুধু যা চাই, তা ঐ-তাঁদের কাছ থেকে একটা নির্দেশ, যাঁরা মানুষের আসা-যাওয়া লক্ষ করেন তাঁদের লুকোনো মন্দির আর পাহাড়চূড়ার গুহাকন্দর থেকে। জল ক্রমেই নেমে যাচ্ছে।

৪

দিনের পর দিন কেটে গেলো, অথচ সমস্ত-কিছুর-রচয়িতার বিপুল কণ্ঠস্বর তবু র'য়ে গেলো স্তব্ধ: তেমনি স্তব্ধ হ'য়ে রইলো ইয়াহ্‌র স্বর, যাঁর সঙ্গে দেখা যেতো নূহর দীর্ঘ আলাপ চলে, যাঁর কাছ থেকে নূহ মনে হয় আমালিওয়াকের চেয়েও বহু স্পষ্ট নির্দেশ পেয়েছে; তেমনি স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন তিনি যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, সিন-দেশের অন্তরিক্ষে যিনি একটা বুদ্বুদের মতো ভেসে বেড়ান, সিন-দেশের বুড়ো যাঁর কথা শুনতে পেতো এতকাল। পাশাপাশি-বাঁধা পোতগুলোর কাপ্তানরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। কী করা উচিত তা তারা বুঝতে পারছিলো না। এদিকে জল নেমে যাচ্ছে ক্রমেই, গজিয়ে উঠছে পাহাড়—ক্রমশ বড়ো হচ্ছে; আবার দিগন্তে ছায়ার মতো ফুটে উঠলো গিরিমালা—এখন যখন কুয়াশা আর নেই। আর, এক সন্ধ্যায় কাপ্তানরা যখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পানোৎসবে মেতেছে, চতুর্থ-এক জলপোতের আগমনবার্তা তাদের কাছে এসে পৌঁছুলো। প্রায় শুভ্রশ্বেত এক জাহাজ, চমৎকার ছিমছাম ঝকঝকে তার কাঠামো, চিক্কণ-মসৃণ

তার গলুই, আর পালটা দেখতে এমন যেমনটি অন্তরা কেউ কখনও ছাখেনি। খুব দক্ষভাবে সে পাশে এসে ভিড়লো, আর কাপ্তান বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে, মাথায় কালো পশমের টুপি।

'আমি দেউকালিওন,' সে বললে, 'আমি এমন-এক দেশ থেকে এসেছি যেখানে ওলিম্পুস নামে এক মস্ত পাহাড় আছে। গগনদেব আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, জ্যোতির্দেব আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, যখন এই ভীষণ প্লাবন শেষ হ'য়ে যাবে, তখন পৃথিবীকে আবার জনাকীর্ণ ক'রে তোলার।'

'কিন্তু এ-রকম একটা ছোট্ট জাহাজে জীবজন্তুগুলো আপনি কোথায় রেখেছেন?' জিগেশ করলে আমালিওয়াক।

'জীবজন্তুর কথা তো কিছু বলা হয়নি,' নতুন আগন্তুক জানালে। 'এ-সব যখন শেষ হ'য়ে যাবে, আমরা পাথর নেবো—পাথরখণ্ডরাই পৃথিবীর অস্থি—আর আমার স্ত্রী পিরহা তার কাঁধের ওপর দিয়ে নুড়িগুলো পেছনে ছুঁড়ে দেবে—অমনি একেকটা নুড়ি থেকে একজন ক'রে মানুষ জন্মাবে।'

'তালবীজগুলো দিয়ে আমিও তা-ই করবো,' বললে আমালিওয়াক।

আস্তে তখন উঠে যাচ্ছে কুয়াশা, চোখের সামনে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে কাছের ডাঙার বাঁকা রেখা, এমন সময় হঠাৎ আবির্ভূত হ'লো—যেন তাদের ওপর হামলা করতেই—আরেকটা জাহাজের বিশাল বপু—হুবহু প্রায় নূহর জাহাজের মতো দেখতে। ওস্তাদের মতো তাকে চালিয়ে এনে মাল্লারা রাশ টানলে, পুরো ঘুরিয়ে দিলে জাহাজের মুখ।

'আমি উর-নাপিশ্‌তিম,' দেউকালিওনের পোতের ওপর লাফিয়ে নেমে বললে নতুন কাপ্তান। 'জলের দেবতা আমায় আগেভাগেই জানিয়েছিলেন কী হ'তে চলেছে। তো এই বজরা বানিয়ে নিলুম আমি, পাল খাটিয়ে ভেসে পড়লুম অথৈ জলে, পরিবারের লোকজন আর সব প্রজাতির জীবজন্তু নিয়ে। আমার মনে হয় দুঃসময়টা কেটে গিয়েছে। প্রথমে একটা পায়রা উড়িয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু সে ফিরে এলো কিছু না-পেয়েই--জীবনের কোনো সাড়া যে কোথাও আছে তার কোনো প্রমাণ ছাড়াই। সেই একই জিনিশ ঘটেছিলো, যখন পাঠিয়েছিলুম এক সোয়ালো পাখি। কিন্তু দাঁড়কাক আর ফিরে এলো না, আর তাতেই প্রমাণ হ'লো যে সে কোনো খাদ্য খুঁজে পেয়েছে। আমি নিশ্চিত জানি আমাদের দেশের সেই অংশে এখনও মানুষজন বেঁচে আছে—যার নাম ব-দ্বীপের নদী, তিনকোণা একটুকরো জমি। জল নেমে যাচ্ছে এখনও। যে যার নিজের দেশে ফিরে যাবার সময়

এসেছে। জল এত মাটি ছড়িয়েছে সবখানে, মাঠে-ঘাটে এত জায়গায় পলি পড়েছে যে এবার খুব ভালো ফসল পাওয়া যাবে।'

'আমরা শিগগিরই খোলের দরজা খুলে দেবো—কাদামাটি জলাভূমিতে ছেড়ে দেবো জীবজন্তুদের,' বললে সিন-দেশের মানুষ। 'তারপর আবার শুরু হ'য়ে যাবে ভিন্ন-ভিন্ন প্রজাতিতে লড়াই, একে-অন্যকে ছিঁড়ে খাবে ওরা। ড্র্যাগনদের কাউকে বাঁচবার সম্মান আমার কপালে জোটেনি, সে-জন্য আমি দুঃখিত—কারণ এই প্রজাতি নিশ্চয়ই অ্যাদ্দিনে লোপ পেয়ে গেছে। একটাই কেবল পুরুষ-ড্র্যাগন পেয়েছিলুম আমি, কিন্তু হাজার খুঁজেও পাইনি কোনো মেয়ে-ড্র্যাগন—সেই উত্তরদেশে, যেখানে বক্রদন্ত হাতির পাল ঘুরে বেড়ায়, যেখানে মস্ত-সব গিরগিটি তেলের বস্তার মতো ডিম পাড়ে, সেখানেই ঐ পুরুষ-ড্র্যাগনের দেখা মিলেছিলো।'

'মানবজাতি এই প্রলয় থেকে কিছু শিখলো কি না, তারই ওপর সব নির্ভর করে,' বললে নূহ।

'অনেকেই হয়তো পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চুড়োয় উঠে প'ড়ে নিজেদের বাঁচিয়েছে,' বললে দেউকালিওন।

দলনায়কেরা সবাই একসঙ্গে চুপচাপ খেতে বসলো। গভীর এক দুঃখের বোধ—কেউ তা মুখ ফুটে বলেনি, সব বুকের মধ্যে বন্ধ—টনটনে কান্নায় তাদের গলা বুজিয়ে দিয়েছে। নিজেকে তারা নির্বাচিত ভেবেছিলো, একমাত্র ভেবেছিলো—এই অহমিকা এখন নির্বাপিত; এমন দেবতাদের দ্বারা তারা নির্বাচিত হয়েছে, যাঁদের সংখ্যা বস্তুত সংখ্যাতীত—সেই দেবতারা যে যাঁর নিজের-নিজের মানুষজনের কাছে হুবহু একইভাবে সব কথা বলেছেন, এমনকী অবিকল হুবহু একই কথা ব্যবহার করেছেন তাঁরা। 'আশপাশে নিশ্চয়ই আমাদের জাহাজের মতোই আরো জাহাজ আছে,' ঔর-নাপিশ্‌তিমের গলার স্বর তিক্ত। 'দিগন্তের ওপাশে—অনেক-অনেক দূরে—নিশ্চয়ই আরো মানুষ শুনেছে এই সতর্কবাণী, তারাও নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে সমুদ্রযাত্রায়, নিজেদের মালপত্র নিয়ে কেউ-কেউ নিশ্চয়ই সে-দেশ থেকেও এসেছে যেখানে লোকে পুজো করে অগ্নিদেবতাকে পর্জন্যদেবকে বরুণদেবকে; নিশ্চয়ই কেউ-কেউ এসেছে উত্তরপ্রান্তিক সাম্রাজ্য থেকে, যেখানকার লোকজন শুনেছি প্রচণ্ড পরিশ্রমী ও কর্মঠ।'

ঠিক সেই সময়ে সমস্ত-কিছুর-রচয়িতার বিপুল কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো আমা-লিওয়াকের কানে: 'অন্য জাহাজগুলোর কাছ থেকে স'রে যাও—জল যেখানে

নিয়ে যাবে, সেই দিকেই ভেসে চলো।' এই ভীষণ নির্দেশ বৃদ্ধ আমালিওয়াক ছাড়া আর-কেউ শোনেনি। কিন্তু ভারি-একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য উঠলো সকলের মধ্যে, একটা অদ্ভুত হুড়োহুড়ির ভাব, সবাই চাচ্ছে চটপট স'রে পড়তে—একে-অন্যকে বিদায় না-জানিয়েই তারা ফিরে গেলো যে যার নিজের জাহাজে। বিশাল জলের মধ্যে প্রতিটি জাহাজ খুঁজে পেলে তার একান্ত নিজস্ব স্রোত—অথে এই জলকে এখন দেখাচ্ছে যেন কোনো-এক বিশাল মোহনা, যেখানে অনেকগুলো নদীর জল এসে মিলেছে। আর অকস্মাৎ আমালিওয়াক আবিষ্কার করলে যে তার আশপাশে আছে শুধু তারই পরিবারের লোক, তারই দেশের জীবজন্তু—আর-কেউ কোথাও নেই। 'দেবতা আছেন অনেক,' সে ভাবলে মনে-মনে, 'আর যেখানে এত জাতি, এত দেবতা, সেখানে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে না। বরং বিশ্ব ভ'রে যাবে ভুলবোঝাবুঝিতে, জটিলতায়-কুটিলতায়, বিষম বিশৃঙ্খলায়।' দেবতারা তার চোখের সামনে মূল্য হারাতে লাগলো। তবে, তবুও, তার সামনে আছে এক পরম কর্তব্য, আর সেটা সমাপন করা জরুরি। বিশাল ক্যানুটাকে সে দ্রুতবেগে চালিয়ে নিয়ে এলো তীরে, তারপর তার এক স্ত্রীকে নিয়ে নামলো ডাঙায়, আর তাকে বললো যে সে যে-তালবীজের বস্তা ব'য়ে নিয়ে এসেছে, সেগুলো সে যেন কাঁধের ওপর থেকে পেছনদিকে ছিটিয়ে দেয়। সে যখন নির্দেশ-মতো কাজটা করলো—আহ্, কী চমৎকারই যে লাগলো দেখতে, বীজগুলো রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো মানুষে, কীটপতঙ্গের মতো আকার, এত খুদে-খুদে—কয়েক পলকের মধ্যেই তারা বড়ো হ'য়ে উঠলো ভ্রূণের আকারে, ভ্রূণের আকার থেকে সদ্যোজাত শিশুতে, বালকে, কিশোরে, পরিণত মানুষে। ঠিক একই জিনিশ ঘটলো যে-সব বীজের মধ্যে ছিলো নারীর প্রাণকণা তাদের বেলায়। সকাল যখন শেষ হ'লো, এক ক্রমবিকাশমান জনতা ছেয়ে ফেললো বেলাভূমি। কিন্তু তক্ষুনি কী-একটা অস্পষ্ট গুজব ছড়িয়ে পড়লো, কে নাকি কোথাকার কোন্ স্ত্রীলোককে অপহরণ করেছে, আর অমনি ভিড় ভাগ হ'য়ে গেলো যুযুধান দুটি দলে, আর লড়াই শুরু হ'য়ে গেলো। যেই সে দেখলো এই সদ্য-সৃষ্ট সদ্য-বাঁচানো মানুষরা কেমনভাবে পরস্পরকে হানছে, কাটছে, মারছে, আমালিওয়াক তড়িৎগতিতে পালিয়ে এলো তার বিশাল ক্যানুতে। উপকূলে মানুষের পুনরুজ্জীবনের জন্য যে-যে জায়গা বাছা হয়েছিলো, সেই অনুযায়ী এটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো যে এখন দুটো জাত আছে—সমতলের মানুষ আর পাহাড়ি মানুষ। কোন্-একজনের চোখটা এর মধ্যেই কোটর থেকে বেরিয়ে এসে লটপট ক'রে ঝুলছে মুখের সামনে; আরেকজনের

অন্ত্র বেরিয়ে পড়েছে উদর থেকে, রক্তমাখা, কুণ্ডলিবাঁধা ; আর ধারালো এক পাথরের ঘায়ে আরেকজনের করোটি ভেঙে চৌচির—বেরিয়ে পড়েছে মগজের সব ঘিলু। 'সব মিথ্যে-মিথ্যে ঘটলো, খামকাই,' বললে আমালিওয়াক। নোঙর তুলে সে তক্ষুনি আবার বিশাল ক্যানুকে ভাসিয়ে দিলে জলে। আর সে-রাতে সে ঢকঢক পান করলে অসম্ভব পরিমাণ চিচা।

পলাতকেরা

১

একটা গাছের তলায় এসে পথের রেখা শেষ হয়েছে। আর প্রতিবার যেই হাওয়া নাড়া লাগায় পচা ফলের গায়ে লেপটে-থাকা মাছিদের, অমনি এক কালো মানুষের গায়ের স্পষ্ট জোরালো গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু কুকুরটি—কুকুর ছাড়া আর-কোনো নামেই তাকে কখনো ডাকা হয়নি—একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিলো। পিঠ থেকে পোকাগুলো খশাবার জন্যে, আর টান-টান পেশীগুলোকে ঢিলে ক'রে দেবে ব'লেও, ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খেলে সে। অনেক দূরে, ঘনিয়ে-আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে, মানুষের দলটার শোরগোল হারিয়ে গেলো। কালো লোকটার গায়ের গন্ধ কিন্তু তেমনি জোরালোই থেকে গিয়েছে। হয়তো পলাতক নেগ্রো দাসটি লুকিয়ে আছে কোথাও, কোনো ডালে ব'সে আছে ঘাপটি মেরে, হয়তো চোখ দিয়ে খোঁজবার চেষ্টা করছে। অথচ কুকুর তবু আর শিকারি দলটার কথা ভাবছে না। লিয়ানায়-ছাওয়া মাটিতে আরেকটা গন্ধ—হয়তো সে পরে এসে এখানে গা ঘষেছে ব'লে চিরকালের মতো এ-গন্ধটাও হারিয়ে যাবে। একটা মেয়েলি গন্ধ—যে-গন্ধটা কুকুর তার পিঠ থেকে ঘ'ষে-ঘ'ষে তুলে দিতে চাচ্ছে, চিৎ হ'য়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে হাসছে। তার জিভটা বড্ড ছোটো; যে-গর্তটা তার কাঁধের হাড়গুলো আলাদা ক'রে আছে, জিভটা সে টেনে লম্বা ক'রে দিতে চাচ্ছে তারই দিকে।

ছায়াগুলো ক্রমেই কেমন আরো ভেজা-ভেজা হ'য়ে এলো। কুকুর উলটে গেলো, লাফিয়ে উঠলো। চিনিকলের ঘণ্টা আস্তে-আস্তে দোল খাচ্ছে। তার কান দুটি খাড়া হ'য়ে উঠলো। কুয়াশা আর ধোঁয়া মিশে গিয়ে উপত্যকায় একটা নীলচে নিশ্চলতা নেমে এসেছে, আর তার ওপর ভাসছে ইটে-তৈরি একটা চিমনির ছায়া, মস্ত ডানাওলা এক ছাত, গির্জার গম্বুজ। প্রতি মুহূর্তে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে ছায়াগুলো, আর টুকরো-টুকরো আলো দেখে মনে হয় ছায়াগুলো বুঝি ঝিলের জলে ডুবে যাচ্ছে। কুকুর খিদেয় কাতর। কিন্তু, ঐ-যে, ওখানে, মেয়েলি গন্ধটা—মাঝে-মাঝে কালো লোকটার গন্ধ তাকে ছেয়ে ফেলছে। কিন্তু তার নিজের গরমের গন্ধ—অন্য গরমটির গন্ধ যাকে দাবি করছে—বাকি সবকিছুকেই ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। কুকুরের পেছনের পা-দুটি আড় হ'য়ে উঠলো, ঘাড় ফিরিয়ে

নিজের পেছনটা দেখবার চেষ্টা করলে সে। ছোটো-ছোটো রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠিত হাঁকের ছন্দে তার বুকের খাঁচার তলায় পেটটা ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। কড়া রোদ্রে ভারি হ'য়ে গিয়েছিলো যে-ফলগুলো, টুপটুপ ক'রে তারা খ'সে পড়ছে এখানে-সেখানে, আওয়াজ হচ্ছে ভেজা-ভেজা, আর উষ্ণ শাঁসগুলো ছিটকে পড়ছে মাটিতে।

মাথা নুইয়ে ঝোপের দিকে ছুটতে শুরু করলে কুকুর। কোন্ দিকে যাওয়া উচিত এ-সম্বন্ধে তার নিজের যে-ধারণা ছিলো, ঠিক তার উলটো দিকে ছুটেছে সে, যেন উপদর্শকের চাবুক তাকে তাড়া ক'রে আসছে। কিন্তু মেয়েলি গন্ধটা যে ওখানে! তার ঝোলা নাকটা এতক্ষণ একটা প্যাঁচালো পায়ে-চলার পথ অনুসরণ ক'রে আসছিলো আর গন্ধটা মাঝে-মাঝে এমনকী যেন থমকে পেছিয়ে যাচ্ছিলো, পথ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিলো পাশে, আবার মাঝে-মাঝে প্রখর হ'য়ে উঠছিলো লজ্জাবতী লতার ঝোপে, হারিয়ে যাচ্ছিলো লাজুকলতার গোটানো পাতার মধ্যে। ভেজা পাতাগুলো যেন গেঁজিয়ে উঠেছে। তারপরেই গন্ধটা আবার অপ্রত্যাশিত জোরালোভাবে লাফিয়ে উঠছিলো কোনো নোংরার ওপর, অন্য-কারু ল্যাজ যাকে একটু আগে ঝেঁটিয়ে গেছে। একটা বেজির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য হঠাৎ সেই অদৃশ্য পথরেখা থেকে কুকুর লাফিয়ে ফিরে এলো—অদৃশ্য পথটা যেন একটা সুতো, বারে-বারে জট পাকাচ্ছে, আবার জট খুলে ছড়িয়ে পড়ছে। ঝাঁকুনির আওয়াজ হ'লো দু-বার, যেন কোনো দস্তানার ভেতর কাস্তানেৎ বাজছে ঝনঝন, তারপর সে বেজিটাকে ছুঁড়ে ফেললো একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে, শিরদাঁড়া ভেঙে ফেলবে ব'লে। আচমকা থমকে গেলো কুকুর, একটা পা শূন্যে তোলা। অনেক দূরের পাহাড় থেকে ঘেউ-ঘেউ ভেসে আসছে।

এটা চিনিকলের ঝাঁকটার ডাক নয়। ডাকটার ধরন আলাদা, স্বরগ্রামে ভিন্নতা স্পষ্ট, আরো-উগ্র আরো-কর্কশ, একেবারে গলার গভীর থেকে উঠে আসছে যেন, শুধু জোরালো চোয়াল আওয়াজটাকে একটু-যা মোলায়েম ক'রে দিচ্ছে। কোথাও নিশ্চয়ই কোনো কুকুরের ঝাঁকের মধ্যে দারুণ লড়াই বেঁধেছে—আর এই কুকুরগুলোর গলায় নিশ্চয়ই তামার তৈরি দাঁতালো গলবন্ধে নম্বরওলা চাকতি বসানো নেই তার মতো। এতদিন যে-ধরনের আওয়াজ শুনে সে অভ্যস্ত, তার চেয়ে একেবারেই আলাদা এইসব অচেনা গর্জনের সামনে—অনেকটা নেকড়ের গর্জনের মতোই হিংস্র এই ডাক—কুকুর ভয় পেলো!

অন্যদিকে ছুটলো সে, যতক্ষণ-না লতাপাতার গায়ে জ্যোৎস্নার ছোপ পড়লো। মেয়েলি গন্ধটা আর নেই সেখানে। বরং নাকে এলো কালো মানুষটার গন্ধ।

আর ঐ-তো, কোনো ভুল নেই, ঐ-তো ঘুমন্ত কালো লোকটা—ডোরাকাটা প্যান্ট, উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে। সেই-যে ভোরবেলায় সেই-যেখানে ছিলো টগবগে-ফোটা ডেকচি আর খড়ের গাদার ওপর তার বিছানা, সেখানে শপাং-শপাং চাবুকের মধ্যে রূঢ় গলায় তাকে হুকুমটা দেয়া হয়েছিলো, সেটা তামিল করতে কুকুর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো তার ওপর। কিন্তু ঐ-ওখানে, ঠিক জানে না কোথায়, পুরুষ-কুকুরদের মধ্যে লড়াই চলছে তখনও। পলাতক নেগ্রো দাসটির পাশে কতগুলো চিবোনো পাঁজরার হাড়। পিঁপড়ের ঝাঁকের কাছ থেকে মাংসের স্বাদ খানিকটা ছিনিয়ে নেবার জন্য আস্তে এগিয়ে এলো কুকুর, সাবধানে, তার কান খাড়া। তাছাড়া, ঐ কুকুরগুলো এমন হিংস্রভাবে ডাকছে যে তার ভয় করছে। আপাতত খানিকক্ষণ না-হয় মানুষটার আশপাশেই থাকুক আর কান খাড়া রাখুক। কিন্তু দক্ষিণের বাতাস শেষটায় বিপদের ভয় উড়িয়ে নিয়ে গেলো। তিনবার ঘুরপাক খেলে কুকুর, তারপর অবসন্ন, কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়লো। কোনো-এক বেজায় খারাপ দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে ছুটলো তার পাগুলো। ভোরবেলায় ঘুমের ঘোরে পালিয়ে-যাওয়া নেগ্রো দাসটি হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে এমন-একটা ভঙ্গিতে যাতে বোঝা যায় অনেক মেয়ের সঙ্গে শুয়ে সে অভ্যস্ত। উষ্ণতার আশায় কুকুর তার বুক ঘেঁষে কুঁকড়ে শুলো। দুজনেই পালাচ্ছে, পুরোদমে ছুটছে—একই দুঃস্বপ্নের তাড়ায় তাদের স্নায়ু যেন প্রায় ছিঁড়ে যাবে।

কাছ থেকে ভালো ক'রে দেখবে ব'লে বাদাম গাছ থেকে নেমে এসেছিলো এক মাকড়শা। এবার সে তার সুতো গুটিয়ে আবার উধাও হ'য়ে গেলো গাছের ওপরে। গাছের পাতাগুলো তখন রাত ভেদ ক'রে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে আসছে।

২

অভ্যাসবশেই পলাতক দাস আর কুকুর চিনিকলের ঘণ্টার শব্দে জেগে উঠলো। যেই আবিষ্কার করলে তারা দুজনে একসঙ্গে শুয়েছিলো, পরস্পরের গা ঘেঁষে, চমকে ধড়মড় ক'রে তারা উঠে পড়লো। দুজনেই তারপর পেছিয়ে গেলো দুটি গাছের গায়ে আর অনেকক্ষণ একদৃষ্টে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। কুকুর এখন একজন প্রভু পেতে চায়, আর কালো লোকটার প্রত্যাশা যদি কোনো সাথী বা বন্ধু জোটে আবার।

উপত্যকার তখন ঘুম ভাঙছে। ক্রীতদাসদের তাড়া দেবার জন্য উগ্র ঘণ্টার

শব্দের উত্তরে এখন ক্ষীণভাবে ভেসে এলো গির্জের ঘণ্টার ঢিমে তালের সুরেলা আওয়াজ—আর তার শ্যামল অনুজ্জ্বলতা দুলতে লাগলো ছায়া থেকে রৌদ্রে, ঘোড়ার চিঁহি, গোরুর হাম্বারবের মধ্যে দিয়ে কিংবা এখনও যারা মেহগিনির খাটে শুয়ে আছে, তাদের উদ্দেশ ক'রে একটু প্রশ্রয়-মেশানো ধমক দেবার ভঙ্গিতে। ডিম-গুলো তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলবার জন্য মোরগরা মুরগিদের আশেপাশে ঘুর-ঘুর করছে, যাতে উপদর্শকের বউয়ের ছোটো আঙুল জানতে না-পারে ডিমের উপস্থিতি। মূল বাড়িটার চারপাশে পাক খাচ্ছে এক ময়ূর—আলো ক'রে তুলছে সব, ডেকে উঠছে প্রত্যেক কোণে, প্রত্যেক দেয়ালের কাছে। আখপেষাই কলের ঘোড়াগুলো শুরু ক'রে দিয়েছে তাদের দীর্ঘ বৃত্তাকার অভিযান। ক্রীতদাসেরা রুটিভরা মাটির শানকি আর গেঁজানো আখের রসের বাটির সামনে নতজানু হ'য়ে ব'সে প্রার্থনা করছে। পলাতক দাসটি তার প্যান্টের বোতাম খুললো—এক রেশম গাছের গুঁড়িতে ফেনিল স্রোত ঝ'রে পড়লো! কুকুর তার ঠ্যাং তুললো এক কচি পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে। কাটা আখগাছের গুঁড়িগুলোয় কাস্তের কোপ দেখা যাচ্ছে এখনও। কালো লোকদের খুঁজে বার করতে অভ্যস্ত ঝাঁকটার ডালকুত্তোগুলো তাদের শেকল ঝনঝন ক'রে বাজাচ্ছে—চিনিকলে যাবার জন্য তারা অধীর।

'কী রে? আসবি আমার সঙ্গে?' জিগেশ করলে পলাতক দাসটি।

কুকুর বাধ্যভাবে তাকে অনুসরণ করলে। ঐ-ওখানে চিনিকলে বড্ড-বেশি চাবুক, বড্ড-বেশি শেকল আর বেড়ি—বিশেষত যারা অনুতাপ ক'রে ফিরে যায় তাদের জন্য। কোনো মেয়েলি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না এখন। কিন্তু কালো লোকের গায়ের গন্ধও আর নেই। এখন কুকুর বরং গোরাদের গায়ের গন্ধ সম্বন্ধে বেশি সচেতন—সে-গন্ধের অর্থই হ'লো বিপদ, বিভীষিকা! কারণ উপদর্শকের গায়ের গন্ধ গোরা-গোরা—তার কড়া ইস্ত্রি-করা ঝলমলে গাইয়াবেরা কামিজের মাড়ের গন্ধ আর শুওরচামড়ার জুতোর কালির কটু গন্ধ সত্ত্বেও। এই শাদা-শাদা গন্ধটা বাড়ির তরুণীদেরও—তাদের লেসের কাজ-করা জামার সুগন্ধ তাকে ঢাকতে পারে না। গির্জের পুরুতের গন্ধও এটা—তার সঙ্গে গলন্ত মোম আর ধূপের গন্ধ মিশে গির্জের ছায়ার গন্ধ কেমন যেন দমআটকানো, অথচ এত ঠাণ্ডা! অরগানবাদকও এই একই গন্ধ ব'য়ে বেড়ায়, যদিও অরগানের হাপরটা তার পোকায়-কাটা উটের লোমের টুপিটার গায়ে এতবার ফুঁ দিয়েছে। এই শাদা গন্ধের কাছ থেকে দূরে স'রে যেতে হবে। কুকুর, তাই, তার দল পালটে ফেলেছে।

৩

প্রথম-প্রথম কুকুর আর পলাতক দাস তাদের বাঁধাধরা খাদ্যের অভাব অনুভব করতো। কুকুরের মনে প'ড়ে যেতো, চিনিকলে সন্ধেবেলায় ডেকচি-ডেকচি হাড় বিলুনো হ'তো। আর, প্রার্থনার ঘণ্টার পরে, বা রোববারে পিপেগুলো সরিয়ে দেবার পরে, যে বালতিভর্তি ভাত আর সীম পাওয়া যেতো তার জন্য পলাতক দাসের মন কেমন ক'রে উঠতো। সেইজন্যেই গোড়ার দিকে, লাথি-ঝাঁটা বা ঘণ্টার শব্দ না-থাকা সকালগুলোয় বেশিক্ষণ ঘুমুবার পর, ক্রমে-ক্রমে তারা দিনের আলো ফোটবার সঙ্গে-সঙ্গেই খাবারের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলো। সিডার গাছের পাতার আড়ালে কোথাও বেজি-টেজি লুকিয়ে থাকলে, কুকুর তা শুঁকে-শুঁকে বার করতো, তারপর পলাতক দাসটি ঢিল ছুঁড়ে তাকে খতম করতো। যেদিন তারা আচমকাই এক বুনো শুওরের হদিশ পেয়েছিলো, সেদিন তাদের কাজ করতে হয়েছিলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা : শুওরটা, তার কান ফালা-ফালা তখন, কুকুরের সব ঘেউ-ঘেউতে সে ঘাবড়ে যাচ্ছে বিষম, কিন্তু তখনও সে উলটে আক্রমণ করছিলো; শেষকালে একটা মস্ত পাথরের ঘায়ে সে কোণঠাসা হ'য়ে পড়েছিলো, আর তারপর সাবাড় হয়েছিলো বেদম লাঠির ঘায়ে। ধীরে-ধীরে কুকুর আর দাস ভুলেই গেলো যে এককালে তারা বাঁধাধরা সময়ে খাবার খেতো। যা-ই জোটাতে পারে, তা-ই তারা গোগ্রাসে গেলে, যতটা পারে পেটে ঠাশে, কেননা কে জানে কাল হয়তো বৃষ্টি-বাদলা শুরু হবে, আর পাথরগুলোর মধ্যে ওপর থেকে ধেয়ে আসবে ঢল, আর উপত্যকার ঢাল জলে থৈ-থৈ করবে। ভাগ্যিশ, কেমন ক'রে ফল খেতে হয় কুকুর তা জানতো। যখনই ক্রীতদাসটি কোনো আম ইত্যাদি আবিষ্কার করে, কুকুরের ভেজা-ভেজা নাকটাও হলদে বা লালে মাখামাখি হ'য়ে যায়। তাছাড়া এ-কুকুরটা ছিলো চিরকালই ডিমচোর; বাগদা চিংড়ির জন্য তার নতুন প্রভুর এই নাছোড় ভালো-বাসার ক্ষতিপূরণ করতো সে তিতিরের বাসায় চড়াও হ'য়ে। বাগদা চিংড়িগুলো ঘুমুতো মাটির তলায়, নদীতে, তাদের গর্তে—যার মুখে প'ড়ে থাকতো শুকনো মরা শামুকগুগলির খোলাগুলো।

ঝাউগাছের পর্দা দিয়ে ঢাকা একটা গুহায় থাকতো তারা। গুহার ছাত থেকে ফোটা-ফোটা জল ঝরতো ব'লে চুনের সরু-সরু ঝিল্লি ঝুলতো। মাঝে-মাঝে অশ্রু ঝরায় তারা; বাঁধাধরা বিরতির পর, ঠাণ্ডা ছায়াকে ভ'রে দেয় যেন কোনো ঘড়ির

শব্দে : টপ, টপ। একদিন কুকুর গুহার একদিকের দেয়ালের গুঁড়ি খুঁড়তে শুরু ক'রে দিলে। একটু পরেই তার দাঁত আবিষ্কার করলে এক উরুর হাড় আর কিছু পাঁজর—এত পুরোনো যে মজ্জাতে আর-কোনো শাঁস বা স্বাদ নেই; তার মুখের মধ্যে ডেলা-ডেলা বিস্বাদ ধুলোর মতো তা গুঁড়িয়ে গেলো। তারপর সে পলাতক দাসের কাছে ব'য়ে নিয়ে এলো এক নরকরোটি। পলাতক দাসটি তখন মাহা সাপের চামড়া দিয়ে একটা কোমরবন্ধ তৈরি করছিলো। যদিও গর্তের মধ্যে কতগুলো বাটি, রেকাবি আর হামানদিস্তা প'ড়ে ছিলো, পলাতক তার অস্থায়ী ডেরায় মরা মানুষের উপস্থিতিতে আঁৎকে ওঠে। বিড়বিড় ক'রে ভগবানের নাম জপ করতে-করতে সেদিন বিকেলেই সে বৃষ্টির তোয়াক্কা না-ক'রেই গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ভেজা কুকুরের গায়ের গন্ধের চাদর গায়ে দিয়ে, গাছের ঝুরি আর শেকড়-বাকড়ের মধ্যে ঘুমুলো তারা দুজনে। সকালবেলায় তারা আরেকটা গুহা খুঁজে বার করলে। তার ছাতটা আরো-নিচু—মানুষকে এর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। অন্তত এখানে তো আর সেই হাড়গোড় নেই—যা একেবারেই কোনো কাজে লাগে না, বরং আচমকা ঝাঁকুনিই লাগায় স্নায়ুতে, ডেকে নিয়ে আসে অলুক্ষুণে যত-সব ভূত-প্রেত।

যেহেতু অনেকদিন তারা কোনো শিকারি দলের সাড়াশব্দ পায়নি, এবার একটু-একটু ক'রে সাহস ক'রে তারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে শুরু করলে। কখনও রাস্তা দিয়ে যায় কোনো গোরুর গাড়ির চালক, পলাতক দাসটির চেনা; কিংবা কোনো ভক্তিমতী স্ত্রীলোক, নাসারেনের আলখাল্লা গায়ে; কিংবা কোনো গিটারবাদক; কিংবা এমন-কেউ শহরের সব মাতব্বরদের সঙ্গে যার দারুণ দহরম-মহরম। আর তারা চুপচাপ দূর থেকেই তাকিয়ে-তাকিয়ে ত্যাখে তাদের। সন্দেহ নেই যে পলাতক দাসটি একটা-কিছুর জন্য উন্মুখ প্রতীক্ষা ক'রে আছে। গিনি ঘাসের ওপর সে এক-টানা কয়েক ঘণ্টা উপুড় হ'য়ে শুয়ে থাকে, তাকিয়ে থাকে সেই ধুলিধুসর রাস্তার দিকে—কচিৎ যে-পথটা ব্যবহার করে লোকে, একটা কোলাব্যাঙও যেটা ইচ্ছে করলে মস্ত একটা লাফে ডিঙিয়ে যেতে পারে। সেইসব প্রতীক্ষার সময় কুকুর তার আমোদ খোঁজে শাদা-শাদা প্রজাপতির ঝাঁককে ছত্রভঙ্গ ক'রে বা কোনো হলদে গায়ক-পাখিকে পাকড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় অনবরত লাফিয়ে।

একদিন যখন পলাতক দাস—কখনো-যার-পাত্তা-নেই, এমন-কিছুর প্রতীক্ষায়—উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে, ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ তাকে কব্জির ওপর ভর দিয়ে উঠিয়ে দিলে। জোর কদমে ছুটে আসছে দুই চাকার এক ঘোড়ার গাড়ি—চিনি-কলের ছাইরঙের টাট্টুতে টানা। ঘোড়া জোতা দাঁড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে

কোচোয়ান গ্রেগোরিও, শপাং-শপং ক'রে চাবুক চালাচ্ছে সে। আর তার পেছনে গির্জের পুরুতের ছোট্ট রুপোর ঘণ্টাটা বাজছে···টুং···টুং···। সে-যে কতদিন হ'লো কুকুর কোনো ঘোড়ার চেয়েও জোরে দৌড় লাগাবার আমোদ পায়নি! ফলে সে এখন সব সতর্কতা হাওয়ায় ছুঁড়ে ফেড়ে দিলে।

টিলাটা থেকে পুরোদমে ছুটে নামতে লাগলো সে। টান-টান তার শরীর, রৌদ্রে নীল, তেজিয়ান, আর ঘোড়ার গাড়ির নাগাল ধ'রে ফেলে টাট্টুর পায়ের মাঝখানে—একবার ডান পায়ের কাছে, একবার বাঁ পায়ের কাছে, কখনো সামনে, কখনো পেছনে—সে ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডাকতে শুরু ক'রে দিলে, আর কোচোয়ান আর পুরুতের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার ক'রে চীৎকার করতে লাগলো। টাট্টু এবার ছুটলো ঊর্ধ্বশ্বাসে। লাগামের হ্যাঁচকা টান পড়ায় চোখের ঠুলিটা খুলে ফেলবার জন্য সজোরে ঝাঁকালে সে তার কাঁধ। হঠাৎ তার জোয়ালের একটা দাঁড় গেলো ভেঙে, জিনের সঙ্গে জোড়টা গেলো খুলে। পুতুলের মতো ল্যাগবেগে হাত-পা নেড়ে পুরুত আর কোচোয়ান সোজা ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়লো ছোট্ট পাথুরে সেতুটার ওপর—ধুলোয় রক্তে সব মাখামাখি।

ছুটে এলো পলাতক দাস। হাতে বেত, কুকুরকে চাবকাবে ব'লে শাসিয়ে নাড়াচ্ছে সেটা। কুকুর ছুটছে পাশে-পাশে, ভঙ্গিটা তার—'দোষ হ'য়ে গেছে, ক্ষমা চাই'। কিন্তু কালো লোকটা হঠাৎ চাবুক নাড়ানো বন্ধ ক'রে দিলে। একটু অবাকই হয় এই ভেবে যে দুর্ঘটনার ফলটা তো আসলে তেমন মন্দ হয়নি। পুরুতের জোব্বা আর পোশাক খুলে নিলে সে, আর নিলে কোচোয়ানের গায়ের কুর্তা আর বুটজোড়া। পকেটের পর পকেট, সব হাৎড়ে মিললো প্রায় পাঁচ পেসো। তাছাড়া পেলে ছোট্ট রুপোর ঘণ্টাটি। তারপর লুঠেরারা ঝোপে ফিরে এলো। আলখাল্লাটায় নিজেকে আগাগোড়া মুড়ে পলাতক দাসটি স্বপ্ন দেখলে রাত্রের সব ভুলে-যাওয়া পুলকের। তার মনে হানা দিলে মরা পতঙ্গে-ভরা কেরোসিনের কুপিজ্বলা শহরের শেষ প্রান্তের বাড়িগুলো। এত রাতেও সেখানে আলো জ্বলে—সেখানে দু-বার তাকে তারা যেতে দিয়েছিলো বড়োদিনের ফাউ-উপহার হিশেবে, যেভাবে খুশি খরচ করার অনুমতি দিয়ে। কালো লোকটা, বাহুল্য হবে বলা, যে, পছন্দ করে-ছিলো মেয়েমানুষ।

৪

তাদের তাক লাগিয়ে দিয়ে বসন্ত এলো, সকালবেলায়। কুকুর জেগে উঠলো তার পেছনের পা-দুটোর মাঝখানে এক অসহ্য টান ভাব নিয়ে, আর তার চোখের মধ্যে কেমন একটা অসুখ-অসুখ ভাব। গরম লাগছে না, অথচ তবু সে হাঁফাচ্ছে। তার দুই শ্বদন্তের মধ্যে ঝুলে বেরিয়ে এসেছে এক জিভ, শামুকের খোলার মতো ধারালো তার নরম প্রসার। পলাতক দাসটি নিজের মনেই কী-সব বিড়বিড় করছে। দু-জনেরই মেজাজ বেজায় তেরিয়া। রাস্তায় বেরিয়ে এলো তারা সকাল-সকাল, কিন্তু খাবারের কথা মনে ক'রে নয়। কুকুর ছুটছে এলোমেলো, হন্তদন্ত, উত্তেজিত, কোনো গন্ধ শুঁকে পাওয়া যায় কিনা তার ব্যর্থ চেষ্টায় উদ্ব্যস্ত। পোকামাকড় মারলে সে রাশি-রাশি, চিরকালই এই পোকামাকড়গুলো তার বিশ্রী লাগে, কিন্তু এখন শুধু-শুধুই মারলে, খামকাই। কোনো-কিছু মেরে ফেলবে ব'লেই, এমনি-এমনি, শুধু মারার নেশায়। গমের ছড়া দাঁতের ফাঁকে পিষে ফেললে, কচি অঙ্কুর-গুলো উপড়ে তুললো। যখন একটা ব্যাঙ তার চোখে থুতু ছিটোলে, তার তিরিক্ষি-ভাব পৌঁছলো চরমে। আর পলাতক দাসটি আছে তার প্রতীক্ষায়—কোনোদিনই এমনভাবে সে প্রতীক্ষা করেনি।

কিন্তু পথ দিয়ে কেউ গেলো না সেদিন। যখন রাত বাড়লো আর প্রথম বাদুড়-গুলো উড়ো মাটির ঢেলার মতো অস্থির হ'য়ে বেরিয়ে এলো ঝোপঝাড়ের ওপর, পলাতক দাসটি আস্তে-আস্তে চিনিকলের আশপাশের বাড়িগুলো লক্ষ্য ক'রে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলে। কুকুর এলো তার পিছু-পিছু, তারহ মতো বেড়ি আর চাবুকের কোনো পরোয়া না-ক'রে। শুকনো ঝরনার খাত অনুসরণ ক'রে তারা একটু-একটু ক'রে ক্রীতদাসদের ছাউনির দিকে এগুতে লাগলো। চেনা গন্ধ নাকে আসছে এখন, যেন অতীত থেকে ভেসে এসেছে পোড়াকাঠ, ক্ষার, গুড়, ঘোড়ার অস্থির খুরের দাপটে উড়ে-আসা ধুলো। তারা বোধহয় পেয়ারা জ্বালাচ্ছে, কারণ হাওয়ায় ভেসে আসছে মোরব্বার মাতাল-করা অসহ্য মিষ্টি গন্ধ। কুকুর আর পলাতক দাস এগুতে লাগলো পাশাপাশি। মানুষটার মাথা এতটাই নোয়ানো যে তা যেন কুকুরেরই মাথার সমান উঁচু।

হঠাৎ আবাদের একজন কালো স্ত্রীলোক রাস্তা পেরিয়ে গেলো কামারশালার দিকে। পলাতক দাসটি ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। তাকে সে তুলসীপাতার

ঝোপের ওপর এনে ফেললো, মেয়েটার চীৎকার চাপা দিয়ে দিলো তার চওড়া হাতের চেটো। এক বিলিতি কুত্তি ছিলো তার সাথে। পারীর প্রদর্শনী থেকে তাকে কিনে এনেছিলেন দোন মার্‌সিয়াল। সে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে কুকুর তার পথ আটকালে। তার মাথা থেকে ল্যাজ অব্দি রোঁয়া ফুলে উঠেছে। তার পুরুষালি গন্ধটা এমনই তীব্র, প্রখর আর নেশা-ধরানো যে বিলিতি কুত্তি ভুলেই গেলো, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তাকে ফরাশি সাবানে স্নান করানো হয়েছে।

কুকুর যখন গুহায় ফিরে এলো, তখন দিনের আলো ফুটছে। পলাতক দাস ঘুমুচ্ছে পুরুতের আলখাল্লা মুড়ি দিয়ে। নিচে—নদীতে—স্রোতের মধ্যে খেলা করছে দুটি শুশুক। তারা তাদের লাফঝাঁপে ঘোলা ক'রে দিচ্ছে স্রোত, আর কাদাজলের ওপর ভাসিয়ে দিচ্ছে ফেনার মেঘ।

৫

পলাতক দাস ক্রমেই বড্ড অসাবধান হ'য়ে পড়ছে। এখন সে একেবারে গ্রাম অব্দি চ'লে যায়। এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়; সময় নেই অসময় নেই, দিনের যে-কোনো সময় কোনো একা খোকানি বা দাইকে পেড়ে ফ্যালে মাটিতে—যারা হয়তো খুঁজতে বেরিয়েছিল কোনো ফণিমনসা বা ধনে পাতা বা অন্য-কোনো লতাপাতা—ভূত ঝাড়বার ওষুধ বানাবে ব'লে। আর যে-রাত থেকে সে সাহস ক'রে রাস্তার ধারের সরাইটা থেকে মাল টানতে গিয়েছিলো, সেই থেকে সে টাকাকড়ির জন্যে একেবারে হন্যে হ'য়ে উঠেছে। একাধিকবার সে কোনো ফাঁকা গলি থেকে কোনো চাষীর টাকার গেঁজিয়া নিয়ে চম্পট দিয়েছে—প্রথমে তাকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়েছে ঘোড়া থেকে, তারপর লাঠি দেখিয়ে তাকে চুপ করিয়ে রেখেছে। এ-সব হানার সময় কুকুরও যায় তার সঙ্গে, যতদূর পারে তাকে সাহায্য করে। তবু এখন তারা আগের চেয়ে অনেক খারাপ খায়, এবং এখন থেকে বেশির ভাগ সময়ই তাদের খুশি থাকতে হয় তিতির, সারস বা বন-মুর্গির ডিম খেয়ে। তাছাড়া পলাতক দাসটি সবসময়েই আতঙ্কে থাকে, উৎকণ্ঠায় থাকে। কুকুর একবার ঘেউ করলেই সে আঁকড়ে ধরে তার চোরাই কাস্তে, কিংবা তরতর ক'রে বেয়ে ওঠে কোনো গাছে। বসন্তের দারুণ কষ্টের দিনগুলো কেটে যেতেই কুকুরকে দেখা গেলো আর মোটেই শহরের ধারে-কাছে ঘেঁষতে চাচ্ছে না। বড্ড-বেশি বাচ্চা ছেলেমেয়ে ওখানে, তাকে দেখলেই ঢিল ছোঁড়ে, লোকেরা লাথি কষায়, আর তার গন্ধ পেলেই পাড়ার যত কুকুর ঘেউ-

ঘেউ ক'রে খেঁকিয়ে ওঠে। তাছাড়া ও-সব রাতে পলাতক দাসটি ফেরে টলতে-টলতে, আর তার মুখ থেকে এমন-একটা গন্ধ বেরোয় কুকুর যাকে তামাকের গন্ধের মতোই দারুণ অপছন্দ করে। সেই জন্যই তার প্রভু যখন কোনো আধো-আলোয় ভরা বাড়িতে ঢোকে, কুকুর তার জন্য অপেক্ষা করে একটা বুদ্ধিমান দূরত্ব বজায় রেখে। আর এইভাবেই তাদের দিন কাটছিলো। তারপর একরাতে পলাতক দাসটি এক ঝি-র ঘরে বড্ড-বেশি সময় কাটিয়ে ফেললো। কুঁড়েঘরটাকে চুপিসাড়ে ঘিরে ফেললো অনেক লোক, হাতে তাদের খোলা কাস্তে আর মাশেতে, কাটারি। একটু পরেই পলাতক দাসটিকে হিড়হিড় ক'রে টেনে আনা হ'লো রাস্তায়—উলঙ্গ, আর্তভাবে সে চীৎকার করছে। কুকুর যেই চিনিকলের উপদর্শকের গায়ের গন্ধ পেলে, রাস্তা থেকে ছুটে পালিয়ে এলো ঝোপে।

পরদিন সে দেখতে পেলে পলাতক দাস যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। তার গায়ের ঘাগুলোয় নুন ছিটিয়ে শুকোনো হয়েছে। তার গলায় বেড়ি, পায়ে বেড়ি, আর তাকে নিয়ে যাচ্ছে সান ফার্নান্দোর চারজন পুলিশ। তার প্রত্যেক পদক্ষেপেই তারা তাকে গাদাবন্দুকে বারুদ ঠাশার লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে, আর অনবরত 'চোর,' 'মাতাল,' 'লম্পট,' 'বেজন্মা,' 'অকম্মার ধাড়ি,' ইত্যাদি ব'লে খিস্তি করছে।

৬

উপত্যকার দিকে চোখ রাখা যায় এমন-একটা উঁচু পাথরের ধার ঘেঁষে ব'সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠছিলো কুকুর। মাঝে-মাঝে তার ওপর নেমে আসে এক গভীর দুঃখ। যখন সেই মস্ত ঠাণ্ডা সূর্য পৌঁছোয় তার পুরো বর্তুল আকারে, লতাপাতার ওপর এমন-একটা শুকনো ছায়া ছড়িয়ে দেয় যে কষ্ট হয়। আগে বৃষ্টিবাদলার রাতে গুহায় যে-আগুন জ'লে উঠতো, তা এখন অতীতের কাহিনী। আসন্ন শীতের সময় আর সে মানুষের উষ্ণতার স্পর্শ পাবে না, এমন-কেউই কাছে থাকবে না যে ঐ দাঁতালো তামার তৈরি গলবন্ধটা খুলে দেবে, যেটা তার ঘুমকে ছিঁড়ে ফালা-ফালা ক'রে দেয়, যদিও পুরুতের আলখাল্লাটা সে এখন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গেছে। অন্যদিকে, অবশ্য, অনবরত শিকার ক'রে-ক'রে, অবশেষে, সে এখন যে-সব প্রাণী খাদ্য হিশেবে মোটেই সুবিধের নয় তাদের সম্বন্ধে অনেকটাই সহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছে। এখন সে মাহা সাপকে তপ্ত পাথরের আড়ালে লুকিয়ে যেতে দেয়, একবারও ঘেউ ক'রে ওঠে না; এখন তো পলাতক দাসটি নেই যে তাকে

তাড়া লাগাবে সাপটাকে পাকড়াতে। সে হয়তো বানাতে চাচ্ছিলো কোনো কোমরবন্ধ বা তার চর্বি দিয়ে কোনো মলম। তাছাড়া, সাপের গন্ধ পেলেই তার গা কেমন গুলিয়ে ওঠে। যদি-বা সে কখনো কোনোটার ল্যাজ পাকড়ায় তা শুধু এইজন্যেই যে প্রত্যেক প্রাণীই চায় অন্তত অন্য আরেকজনের সঙ্গ। এখন আর সে বুনো বরা দেখলে আক্রমণ করতে সাহস পায় না—যদি-না প্রচণ্ড ক্ষুধা তাকে উত্তেজিত করে। এখন সে জলের পাখি, বেজি, ইঁদুর, কিংবা গাঁয়ের গোলাবাড়ি থেকে পালিয়ে-আসা মুর্গি খেয়েই নিজেকে তুষ্ট রাখে। তবে চিনিকলকে সে ভুলে গিয়েছে। তার ঘণ্টার শব্দ এখন তার কাছে সব অর্থই হারিয়ে বসেছে। কুকুর এখন এমন-সব পাথরের আড়ালে আশ্রয় খোঁজে মানুষের কাছে যা অনধিগম্য। ড্র্যাগন গাছের এক জগতে থাকে সে, হাওয়া যার ডালেপালায় দোল দিলেই নতুন পালানের মতো শব্দ ওঠে; থাকে অর্কিডের জগতে; অন্যগাছে বেয়ে-ওঠা পরভৃৎ লতার জগতে—যেখানে ধূসর কানঢাকা সবুজ গিরগিটি বুকে হাঁটে, যেগুলোর স্বাদ এতই বিশ্রী যে থাকুক তারা যেখানে খুশি। তার শরীর শুকিয়ে গেছে—পাঁজরার ওপর মাংসের আস্তর নেই আর, হাড় বেরিয়ে এসেছে, গায়ে জড়িয়ে আছে যতরাজ্যের কাঁটা না-লাগা বুনো লতাপাতা।

ফিরে এলো বসন্ত, তার জ্বর নিয়ে। একদিন বিকেলে যখন অদ্ভুত-এক অস্বস্তি তাকে কিছুতেই ঘুমুতে দিচ্ছিলো না, হঠাৎ কুকুরের নাকে এসে পৌঁছুলো এক রহস্যময় গোপন মেয়েলি গন্ধ—এত জোরালো, এমন প্রখর যে গোড়ায় যেটি ছিলো ঝোপের মধ্যে ছুটে পালিয়ে যাবার প্রথম কারণ। পাহাড়গুলো থেকে অনেক কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। এবার কুকুর গন্ধটাকে সজোরে আঁকড়ে ধরলো। এক ঝরনা সাঁৎরে পেরিয়ে গিয়েও আবার সে শুঁকে পেলে তাকে। এখন আর সে ভয়ে কাবু নয়। গন্ধ শুঁকে-শুঁকে চললো সে সারা রাত, নাকটা প্রায় মাটি ছুঁয়ে আছে, আর জিভ থেকে ক্রমাগত লালা ঝ'রে পড়ছে। দিন ফুটতেই আস্ত গিরিখাত ম-ম ক'রে উঠলো। যে-গন্ধ শুঁকে পেয়েছে, তার পেছন-পেছন অনুসরণ ক'রে এসেছে বুনো কুকুরের একটা ঝাঁক। তাদের মধ্যে এমন কতগুলো পুরুষ আছে যাদের ছাঁদ নেকড়ের মতো। তাদের চোখ চকচক ক'রে উঠেছে, সটান খাড়া তারা পায়ের ওপর, চড়াও হবার জন্য উদ্যত। আর মেয়েলি গন্ধটা গাঢ় হ'য়ে উঠেছে তাদেরই পেছনে।

কুকুরের লাফটা ছিলো মস্ত। তাড়া ক'রে এলো বুনো কুকুরের ঝাঁক। তাদের শরীরগুলো গাদাগাদি—একজনের গায়ে আরেকজন। হিংস্র গর্জনের এক দুরন্ত

বিশৃঙ্খল ঘূর্ণিহাওয়া। কিন্তু তামার গলবন্ধের দাঁত চট ক'রেই তাদের মুখ থেকে বার ক'রে আনলো আর্তনাদ। মুখগুলো রক্তে মাখামাখি, কানগুলো ফালা-ফালা। যখন দলের সবচেয়ে বয়স্ক পাণ্ডাটার টুঁটি পেলে কুকুর তখন তা ক্ষত-বিক্ষত আর দু-টুকরো ; অন্যরা পেছিয়ে এলো—অর্থহীন রোষে তারা হিংস্রভাবে গর্জন করছে। তখন কুকুর ছুটে গেলো রণক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে, ছাইরঙা রোঁয়া-খাড়া কুত্তিটার সঙ্গে শেষ যুদ্ধ সাঙ্গ করার জন্য—যে তার দাঁত বার ক'রে অপেক্ষা করছিলো। মেয়েলি গন্ধটা মিলিয়ে গেলো তার তলপেটের ছায়ায়।

৭

বুনো কুকুররা শিকার করে দল বেঁধে। তার জোরেই তারা বড়ো-বড়ো জন্তু শিকার করতে পারে, আর তার মানেই হ'লো বেজায় মাংস আর প্রচুর হাড়। যখন কোনো হরিণের খোঁজ পায়, শিকার চলে অনেকদিন ধ'রে। প্রথমে তাড়া ক'রে যাওয়া, তারপর জন্তুটি যদি কোনোক্রমে কোনো বড়ো খাদ বা নয়ানজুলি লাফিয়ে ডিঙিয়ে যেতে পারে, তবে সেখানেই তার পালা ইতি। তারপর যদি কোনো গুহা পড়ে শিকারের সময় তখন আক্রমণ। চোখে ঘাই লাগুক বা গায়ে জখমই হোক, জন্তুটিকে শেষ অব্দি মরতেই হয় কুকুরের দলের দাঁতের কাছে, যারা এমনকী তখনও-জ্যান্ত শরীরটা থেকে চাপ-চাপ বাদামি লোম খাবলে নেয়, উষ্ণ কিন্তু টাটকা রক্ত খায়। কোনো গলার শিরা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোয় রক্ত, কিংবা কানের গোড়া থেকে, যে-কানটাকে কোনো কুকুরের কামড়ই এইমাত্র ছিঁড়ে নিয়েছে। এই হিংস্র কুকুরগুলোর অনেকেই কানা—কোনো শিং হয়তো উপড়ে নিয়েছে চোখ। সকলেরই গায়ে কাটা দাগ, পচা ঘা, দগদগে কাঁচা মাংস বেরিয়ে আছে এখানে-ওখানে। যে-সব দিনে শিকার জোটে না, কুকুররা নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে আর কুত্তিরা শুয়ে-শুয়ে অপেক্ষা করে যুদ্ধের ফলাফল কী হয় জানবার জন্য—তাদের ঔদাসীন্য চমকপ্রদ। চিনিকলের ঘণ্টা—কখনো-কখনো হাওয়া যার রণন ব'য়ে নিয়ে আসে—কুকুরের মনের মধ্যে কোনো স্মৃতিই জাগায় না।

একদিন বুনো কুকুররা একটা গন্ধ খুঁজে পেলে লিয়ানা কাঁটাঝোপে, আর ঐ-সব নরকের লতাপাতার মধ্যে যেগুলো কাঁচা ঘা-কে বিষিয়ে দেয়। গন্ধটা কোনো কালো মানুষের। কুকুররা সাবধানে এগুলো শামুকগুগলি ছাওয়া সরু পথটা

দিয়ে—যেখানে একটা বহুদিনের বুড়ো পাথর দাঁড়িয়ে আছে এক মরা মানুষের মতো মুখ বাড়িয়ে। মানুষ সাধারণত তাদের আশপাশে হাড়গোড়, নাড়িভুঁড়ি, টুকরোটাকরা ছড়িয়ে রাখে, কিন্তু তবু মানুষ সম্বন্ধে সাবধান থাকাই ভালো, কারণ মানুষ হ'লো সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী। কারণ তারা হাঁটে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে, আর সেজন্যেই তারা দূর থেকে লাঠি দিয়ে মারতে পারে, অথবা ঢিল ছুঁড়তে পারে। কুকুরের ঝাঁক ঘেউ-ঘেউ থামিয়ে দিলে।

হঠাৎ, লোকটা এসে হাজির। কালো মানুষের গায়ের গন্ধ ছড়াচ্ছে সে। তার কব্জি থেকে ঝুলছে বেড়ির শেকল, আর তাল রাখছে তার চলার সঙ্গে। আর তার ডোরাকাটা প্যান্টের কানার তলায় মোটা বেড়ির ঝমরঝম। পলাতক দাসটিকে চিনতে পারলে কুকুর।

'কুকুর!' কালো লোকটার গলায় খুশি। সে আবার ডাকলে, 'কুকুর!'

ধীরে তার কাছে এগিয়ে এলো কুকুর। তার পা শুঁকলো, কিন্তু নিজেকে ছুঁতে দিলে না। ল্যাজ নেড়ে-নেড়ে তাকে ঘিরে-ঘিরে ঘুরলো। যখনই লোকটা ডাক দেয়, সে পালিয়ে যায়। আর যখন কেউ তাকে ডাকে না, সে যেন খুঁজে বেড়ায় মানুষের গলা, এককালে যা সে একটু-একটু বুঝতে পারতো। কিন্তু শব্দটা এখন তার কাছে এতটাই অচেনা লাগছে, আশ্চর্য ঠেকছে, এত বিপজ্জনকভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেইসব হুকুম এককালে যে-সব সে তামিল করতো। শেষটায় পলাতক দাসটি এগিয়ে এলো এক পা, ঝুঁকে আলতো নরম হাত বাড়িয়ে দিলে কুকুরের মাথার দিকে। কেমন অদ্ভুত চেঁচিয়ে উঠলো কুকুর, কেমন-একটা চাপা গরর্‌গর গর্জন, যাতে কর্কশ রোষ মেশানো। কালো লোকটার গলা তাগ ক'রে সে হঠাৎ লাফ দিলে।

হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেছে এক পুরোনো হুকুম, চিনিকলের গোরা উপদর্শক যে-হুকুমটা দিয়েছিলো অনেক দিন আগে, যেদিন এক ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো জঙ্গলের ঝোপে।

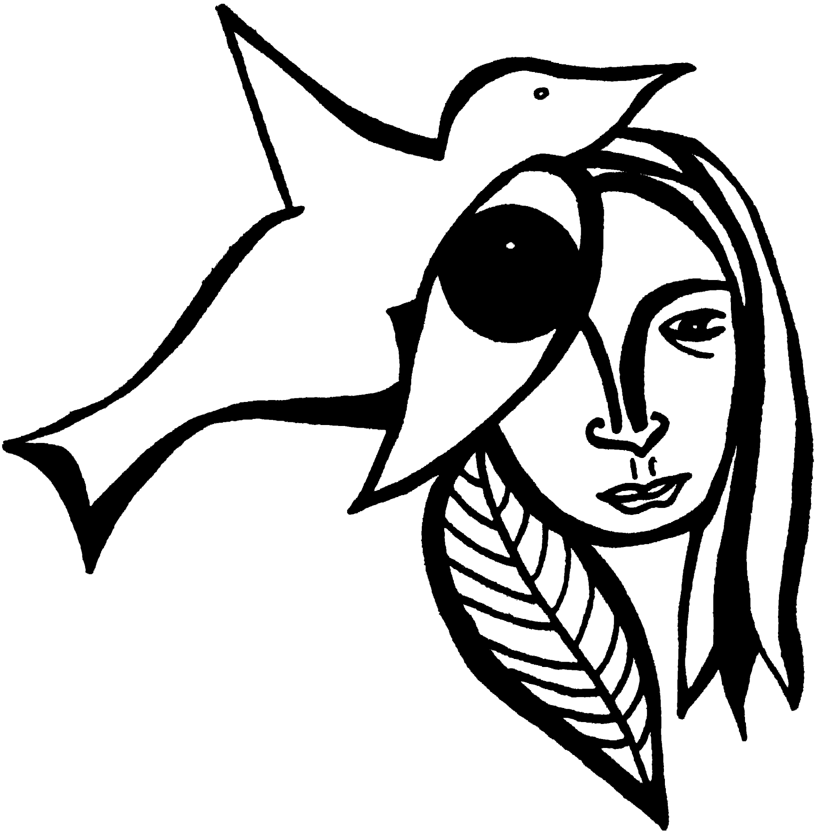
৮

যেহেতু কোনো মেয়েলি গন্ধে ভারি হ'য়ে নেই হাওয়া, আর দিনকাল বেশ শান্তিতে ভরা, বুনো কুকুররা ঘুমিয়েই তাদের ভোজের তৃপ্তি কাটিয়ে দিলে। মাথার ওপর গাছের ডালের ওপর পাক খাচ্ছে শকুনরা, অপেক্ষা করছে কুকুররা কখন কাজটা

পুরো শেষ না-ক'রেই এখান থেকে চ'লে যাবে। সবচেয়ে বেশি ফুর্তি করলে কুকুর আর সেই ছাইরঙা কুত্তিটা—পলাতক দাসটির ডোরাকাটা কামিজ নিয়ে খেলা করতে দারুণ আমোদ তাদের। দুই প্রান্ত ধ'রে টান লাগায় দুজনে, দু-দিকে, দাঁতের জোর পরখ ক'রে দেখবার জন্য। যখনই একটা টুকরো ছিঁড়ে যায়, তারা দুজনে ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। আর তারপরেই আবার শুরু করে। এ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে শেষ অব্দি এত কাছে-কাছে দাঁড়ায় তারা যে পরস্পরের নাক ছোঁয়-ছোঁয়, কারণ ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোটা ক্রমেই ছোটো হ'য়ে এসেছে। অবশেষে এখান থেকে চ'লে যাবার হুকুম হ'লো। তাদের ডাক মিলিয়ে গেলো, ধীরে-ধীরে, বনের মধ্যে।

অনেক বছর ধ'রে, রাত্তিরবেলা, শিকারিরা এ-পথটা এড়িয়েই যেতো। শেকল আর হাড়গোড় পথটা তাদের জন্য নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে।

—



বাস্তবের কুহক, কুহকী বাস্তবতা
এবং আলেহো কার্পেন্তিয়ের

লাতিন আমেরিকা ব'লে সত্যি কি কিছু আছে ? উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় তো ছোটো-বড়ো অনেক দেশ, এবং তারও বাইরে আছে ক্যারিবিয়নের কোনো-কোনো দ্বীপ, যাদের প্রত্যেকের রাজনৈতিক অস্তিত্ব স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিশেবে। কেমন ক'রে তবে আমরা বলবো লাতিন আমেরিকা এক ও অখণ্ড-এক বোধগ্রাহ্য চেতনা ? এটা ঠিক যে ব্রাজিল বা সুরিনাম বা ফরাশি গিয়ানা—এইরকম কোনো-কোনো দেশের প্রধান ভাষা তো এস্পানিওল নয়, বরং পোর্তুগিস বা ওলন্দাজ বা ফরাশি ; আর ক্যারিবিয়নের একটা বড়ো অঞ্চলের ভাষা তো ইংরেজিই—যে-ক্যারিবিয়নের নাম পশ্চিম-ইণ্ডিস। ঔপনিবেশিকতার বিবর্তনও তো সব দেশে সমানভাবে ঘটেনি। তবে লাতিন আমেরিকা কী ? আর এই প্রশ্নেরই সমাধান খোঁজবার জন্যে আমাদের দাঁড়াতে হবে বৃহত্তর-কোনো সত্যের মুখোমুখি।

সাধারণত আমাদের সাহিত্যের আলোচনায় আমরা ধ'রে নিই যে, কোনো-একটা ভাষায় লেখা হ'লে, তাকে সেই ভাষারই সাহিত্য ব'লে মেনে নিতে হবে : অর্থাৎ—সাহিত্যের পরিচয় ভাষানির্ভর। তবে সেটা যে পুরোপুরি সঠিক পদ্ধতি, তাও নয়। যেমন ইংরেজিতে লেখা হয় শুধু তো ইংলণ্ডেরই সাহিত্য নয়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, অস্ট্রেলিয়ার, ক্যানাডার, নিউ-জ়িল্যাণ্ডের, পশ্চিম-ইণ্ডিসের, আফ্রিকার—ভারতীয় উপমহাদেশেরও সাহিত্যের একটা বড়ো অংশই ইংরেজিতে রচিত। অথচ আজ আমরা এটাও জানি যে এই প্রত্যেক দেশের ইংরেজি ভাষা একরকম নয়, লেখকদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য ভিন্ন, প্রকাশভঙ্গিও স্বতন্ত্র, অভিনিবেশগুলো প্রায়ই উঠে আসে নিজের-নিজের দেশের সমস্যার (বা বাস্তবতার) মধ্য থেকে। এক্ষেত্রে এটাও ঠিক এইসব দেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (কিংবা কোথাও-কোথাও তার অভাব, যেমন ঘটেছিলো প্রাক্তন উপনিবেশগুলোয়), ভৌগোলিক অবস্থান, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সমাবেশ, তরাইয়ের বিন্যাস, জলহাওয়া, ঋতুর আবর্তন—সবকিছু মিলে-মিশে তাদের সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে, আর সেইসঙ্গে আরো জুড়ে গিয়েছে সামাজিক অবস্থার ভিন্ন-ভিন্ন চেহারা। এমনিতে মনে হয় একই ভাষায় লেখা, অথচ এক ভাষাও নয় আবার—এইসব দেশের ইংরেজি আজকাল অভিজ্ঞতা অনুযায়ীই অনেক বদলে গিয়েছে। বদলেছে উচ্চারণ ও বাগ্বিধি, বানান ও অভিনিবেশ। যেমন এক ভাষায় লেখা হ'লেই তাকে নিছক ইংরেজি সাহিত্য বলা যায় না, তেমনি তার উলটোটাও অন্যদিক থেকে সত্যি : এ তো, শেষ অব্দি,

ইংরেজিতেই লেখা। লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশের এস্পানিওল কিন্তু এস্পানিয়ার ভাষা নয়—উচ্চারণের তফাৎ তো আছেই, আছে শব্দসম্ভারের তফাৎ, এমনকী প্রয়োগেরও—কিন্তু প্রধান তফাৎ বক্তব্যে—আর সে-তফাৎকে সৃষ্টি করেছে দেশগুলোর আপন-আপন ইতিহাস। স্বভাবতই কোন্‌কিস্তাদোরদের দেখার ভঙ্গির সঙ্গে বিজিতদের পরাজিতদের দেখার ভঙ্গি এক হ'তে পারে না। তাছাড়া, যদিও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় রোমান ক্যাথলিক ধর্মও আরো-একটা ঐক্যের সূত্র, এস্পানিয়ায় যেমন, কিন্তু নূতন মহাদেশের (নুয়েভা মুন্‌দো) তিনটি প্রাচীন সভ্যতার যৌথ- ও কৌম- স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা লাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে বিভিন্নতা দিয়েছে, লাতিন আমেরিকার লেখকদের রচনায় তার কোনো-কোনো চিহ্ন ও লক্ষণ নজরে আসবেই, লেখক যতই হোর্হে লুইস বোর্হেসের মতো নিজেকে ইওরোপীয় সভ্যতার বংশধর ব'লে পরিচয় দিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করুন না কেন, সে-সব চিহ্ন ও লক্ষণ এমনকী হোর্হে লুইস বোর্হেসের পক্ষেও বেমালুম উড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। এই তিন সভ্যতার পুরাণ, কিংবদন্তি, বীর নায়ক (অথবা তার অনুপস্থিতি)—এইসব লাতিন আমেরিকার শিল্প-সাহিত্যকে এক স্বতন্ত্র আয়তন দিয়েছে, যা এস্পানিয়ার সাহিত্যে অনুপস্থিত। কারা লাতিন আমেরিকার নায়ক? সিমোন বোলিভার থেকে সান্দিনো থেকে চে গ্যেভেরা থেকে সালভাদোর আইয়েন্দে, ভিক্তর হারা আজ ইতিহাসের সবীজ অভিজ্ঞতা। মিগেল লিত্তিন যখন ছদ্মবেশে, হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে, তাঁর নামে হুলিয়া আছে জেনেও, পিনোশেৎ-এর হন্তা-শাসিত চিলের রাস্তায় তথ্যচিত্র তুলতে যান, তখন গার্সিয়া মার্কেসের বইতে তিনিও নায়ক হিশেবে দেখা দেন। হাভিয়ের এরাউদ, ওতো রেনে কাস্তিইয়ো বা রোকে দালতোন যখন খুন হ'য়ে যান অপশাসনের কুখ্যাত ও সশস্ত্র গুণ্ডাদের হাতে, তখন তাঁরাও নায়ক হ'য়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে তো ছিলো এমনই-এক লাতিন আমেরিকার ধারণা, যা পেরিয়ে গিয়েছিলো ভৌগোলিক এবং তথাকথিত রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা—বহুবিধ সীমান্ত, অনেক বেড়া ও বাধা—আর রচনা ক'রে দিয়েছিলো এমন-এক অখণ্ডতার বোধ, যার সত্যতা ও তীব্রতা শুধু-যে রাজনৈতিক দিক থেকেই অনস্বীকার্য তা নয়, তার শিল্পসাহিত্যেরও এক প্রধান উপকরণ। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই শিল্পসাহিত্যই জিইয়ে রেখেছিলো এক আন্তর্মহাদেশীয় জাতিত্বের বোধ, ঐক্যের চেতনা। হ'তে পারে, বিভিন্ন খণ্ড-ছিন্ন দেশের শাসকেরা চেয়েছিলো সীমান্তকে আঁটো ক'রে বসাতে, যাতে বাইরে থেকে না-ঘটতে পারে নূতন ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ, যেমন দেখিয়েছেন চিলের হোসে

দোনোসো তাঁর আলোচনায়, কিন্তু তিনিও দেখেছেন কী-রকম রোমাঞ্চকর ছিলো অভিজ্ঞতা যখন একের পর এক নতুন লেখক সব বাধানিষেধ এড়িয়ে ঢুকে পড়েছিলেন বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে। সেই ১৮৮১তেই লাতিন আমেরিকার জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা কুবার হোসে মার্তি (১৮৫৩-১৮৯৫) স্পষ্ট ক'রে সমস্যাটিকে চিনে ফেলেছিলেন :

> যে-মানুষের নিজের কোনো সংজ্ঞার্থ নেই, তার রচিত সাহিত্যরও কোনো স্পষ্ট চেহারা থাকে না। কিন্তু যে-মুহূর্তে জনগণ কোনো-এক অবিচ্ছিন্নতার বোধে সংহত হ'তে থাকে, তাদের সাহিত্যের উপাদানগুলোও অগ্রসর হয় একীভূত হয়, এক মহান ভবিষ্যতের কল্পনায় প্রত্যাশায় পরস্পর-সংলগ্ন হয়। এই মহান রচনা আমাদের নেই, কিন্তু আসুন, আমরা একযোগে সবাই এই হতাশাকে ধিক্কৃত করি—শুধু-যে তার অভাব আছে, নিছক সেই কারণেই নয়, কেননা এটা তো এই সত্যেরই প্রতীক হ'য়ে ওঠে যে আমাদের মধ্যে কোনো মহান দেশের ধারণাই নেই। তা প্রতিফলিত করে সেই বোধকেই যে আমরা এখনও কোনো মহান স্বাধীন দেশের কথা ভাবতে পারছি না।···ভাষা কাকে ফোটায়, কাকে অভিব্যক্ত করে? যতক্ষণ-না থাকে কোনো অন্তঃসার যা অভিব্যক্ত হ'তে চায় ততক্ষণ সব কথাই প'ড়ে থাকে মৃত স্তূপের মতো। কোনো এস্পানিওল আমেরিকা যদি না-ই থাকে, তবে কোনো এস্পানিওল-আমেরিকী সাহিত্যও থাকতে পারে না।

হোসে মার্তি যে-এস্পানিওল-আমেরিকী সাহিত্যের কথা ভেবেছিলেন, এখন তা আর কোনো স্বপ্নদ্রষ্টার নিছক আশাবাদ নয়, বাস্তব সত্য। নিজে ক্যারিবিয়নের একটি ছোট্ট দ্বীপ থেকে এসেছিলেন হোসে মার্তি, কিন্তু রচনা ক'রে দিয়েছিলেন আমেরিকী মহাদেশের সংজ্ঞার্থ।

কুবার আয়তন ১১৪,৫২৪ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৭১-এর শুমারি অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিলো ৯,২৮৬,০০০। তার মধ্যে রাজধানী লা হাবানাতেই থাকতো সতেরো লক্ষ লোক। ভাষা এস্পানিওল। লোকসংখ্যার ৭৩ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ, বাকি ২৭ শতাংশ নেগ্রো ও মেস্তিসো। দেশের বিত্ত আসে প্রধানত রপ্তানি থেকে—চিনি, দস্তা, রাম, তামাক আর কুচো চিংড়ি। কুবা ক্যারিবিয়নের বৃহত্তম দ্বীপ। নিচু কতগুলি পর্বতশ্রেণী আছে বটে, কিন্তু মূলত এর জমি উর্বর সমভূমি, উপত্যকা

আর ছোটো-ছোটো টিলায় ভরা। দেশে আছে প্রধান দুটি নদী—একটি ব'য়ে চলেছে উত্তরে আর পশ্চিমে, অন্যটি দক্ষিণে। কুবা প্রতিবছর যে-পরিমাণ চিনি আর আখ উৎপন্ন করে তা জগতের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। আর কুবার তামাক যে কত বিখ্যাত তা হাবানা চুরুটের কিংবদন্তিতেই সপ্রমাণ। গিইয়েমো কাব্রেরা ইনফেন্তো 'হোলি স্মোক' নামে ভারি মজার এক আখ্যায়িকা রচনা করেছেন—কোলাজের ধরনে—তার বিষয়বস্তু তামাক। এখন অবশ্য চিনি আর তামাকের ব্যাবসা প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। বেশি শর্করা স্বাস্থ্যের হানিকর, ধূমপান জীবনের বিনাশ ত্বরান্বিত করে—এই দুই প্রচারের ধাক্কায় কুবার রপ্তানি টলমল করছে এখন। ১৯৫৯ সালের পয়লা জানুয়ারি তরুণ বিপ্লবী ব্যবহারজীবী ফিদেল কাস্ত্রো আরহেন্তিনার চিকিৎসক চে গ্যেভেরার সহায়তায় ফুলহেন্সিও বাতিস্তার স্বৈরাচারী সরকারকে হঠিয়ে দিয়ে কুবাকে আমেরিকা মহাদেশের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করেন। তৎকালীন সোবিয়েৎ ধাঁচের এক সমাজতান্ত্রিক সরকার কুবার রূপান্তর ঘটিয়ে দেয় কয়েক বছরের মধ্যেই।

মেহিকোর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রিয়ুস (যা আসলে এদুয়ার্দো দেল রিয়োর ছদ্মনাম) তাঁর 'কুবা প্রাথমিকী' নামে কমিক্সের বইটি যেভাবে শুধু করেছিলেন তা স্মরণ ক'রে দেখা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না; কথা ও ছবিতে ভরপুর সে-বই থেকে খানিকটা কথাই শুধু স্মরণ করা যাক:

> এ-কথা তো ছেলেবুড়ো সব্বাই জানে যে কুবা চিরকালই একই জায়গায় থেকে গিয়েছে। এমনকী ক্রিস্তোবাল কোলোনও [ক্রিস্তোফারো কোলোম্বো বা ক্রিস্টফার কলম্বাস] একে দেখতে পেয়েছিলেন ২৮ অক্টোবর ১৪৯২তে, আর একে বর্ণনা করেছিলেন এই ব'লে যে 'আজ অব্দি যত দ্বীপ মানুষের চোখে পড়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।'
>
> এই কথা ব'লেই রানী ইসাবেলের নামে তিনি দ্বীপটা দখল ক'রে নেন, আর একটা বাণিজ্যকেন্দ্র খুলে বসেন।
>
> ক্রিস্তোবাল কোলোন ভেবেছিলেন তিনি বম্বাই এসে পৌঁছেছেন, আর এই দ্বীপে যারা থাকতো, অর্থাৎ যত তাইনোস, সিবোনেইরেস্ আর গুয়ানাতাবেইয়েসদের তিনি ই ণ্ডি য়া ন ব'লে ডাকলেন।
>
> এই মানুষগুলো লম্বা-লম্বা সব চুরুট ফুঁকতো (চা গ্যেভেরার ধরনে) আর নিজেদের উৎসর্গ করেছিলো শিশুদের জন্ম দেবার কাজে, কারণ বেঁচে

থাকবার জন্যে যা-যা তাদের লাগে সবই দ্বীপের জমি খুব সহজেই তাদের দিয়ে দেয় — সেজন্যে ইউনাইটেড ফ্রুট কম্পানি কিংবা অ্যালায়েন্স ফর প্রগ্রেস অথবা ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, কারুরই সাহায্য তাদের লাগতো না।

[ক্রিস্তোবাল কোলোনের মগজে] প্রথম যে-সমস্যাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, তা হ'লো এই : কী নাম দেয়া হবে দ্বীপটার। কে-একজন — বেজায় তুখোড়, আগুয়ান, সপ্রতিভ — ব'লে বসলো দ্বীপটার নাম দেয়া হোক রাজকন্যার নামে, 'হুয়ানা'। (এবং কিছুদিন এই নামই ছিলো তার···কিন্তু নামটা এতই ছোট্ট যে মানচিত্রে হুয়ানা দ্বীপ একেবারেই হারিয়ে গেলো।)

এক রোমান ক্যাথলিক পুরুত একদিন বললে তার মাথায় নাকি চমৎকার একটা নাম খেলে গিয়েছে, 'ফের্দিনান্দ' ; এবার নামটা যদিও আগের চাইতে বড়ো আর গালভরা, কেউ নিজেদের 'ফের্দিনান্দান' ব'লে পরিচয় দিতে চাইলো না···

তখন আরেক পুরুত (পুরুতে-পুরুতে একেবারে ছয়লাপ ছিলো তখন) প্রস্তাব করলে নাম দেয়া হোক 'সান্তিয়াগো'। কিন্তু অচিরেই দেখা গেলো দ্বীপে আর কোনো চিঠিই এসে পৌঁছোয় না। কেননা আরেকজন তুখোড় উদ্ভাবনী-শক্তিওলা পুরুত এর আগেই 'সান্তিয়াগো দে চিলে' প্রতিষ্ঠা ক'রে বসেছিলো।

তখন কোন্কিস্তাদোরদের একজন ভাবলে, 'আমরা কেন দ্বীপটাকে একটা ক্যাথলিক নাম দিচ্ছি না ?' (সে হচ্ছে ঐজাতীয় জীব, যারা সবসময়ে পুরুতদের সঙ্গে ভাবসাব রাখতে চায়, আর তাই সে প্রস্তাব করলে নাম দেয়া হোক 'আভে মারিয়া'।) তো কিছুকাল এই নামও গ্রাহ্য হ'লো···ফলে আজ আমাদের বেশ আশ্চর্যই লাগে এ-কথা ভাবলে, যে দ্বীপটার নাম এখন কি না কুবা। সম্ভবত এটা দেশটার 'ইণ্ডিয়ান' বাসিন্দাদের কোনো অন্তর্ঘাতমূলক কাজের প্রমাণ, কেননা লোকগুলো সব ডাহা নাস্তিক — কেউ খ্রিষ্টান নয়। (যা কেউ আজও জানে না তা হ'লো এই 'কুবা' কথাটার মানে কী — অন্তত আমি তো বাপু জানি না।)

তা ক্রিস্তোবাল কোলোন তো কিছুদিন পরেই পাল তুলে এস্পানিয়া চ'লে গেলেন, জোর খবর নিয়ে, আর ১৫১১তে আরেকজন এস্পানিওল দোন্ দিয়েগো দে বেলাথ্কেথ্ কুবায় এসে হাজির হলেন, আর পত্তন করলেন প্রথম পুয়েব্লো : বারাকোয়া। পরে দ্বীপের লোকসংখ্যার একটা শুমারি

নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু, উফ, ইণ্ডিয়ানদের গোনা বা হিশেব নেয়া—সে-এক অসম্ভব কাণ্ড। এরা কেউ এক জায়গায় শান্ত হ'য়ে থাকে না, সবসময় টো-টো ক'রে চরকি ঘুরছে। কাজেই এস্পানিয়ার লোকেরা এমন-একটা পদ্ধতি বার ক'রে নিলে যেটা পরে ইয়াঙ্কিরাও নকল করেছিলো: অর্থাৎ একটা-একটা ক'রে সবাইকে খুন ক'রে ফেলতে লাগলো তারা, তারপর তাদের লাশ-গুলো নিশ্চিন্তে গোনাগুনতি ক'রে তারা আবিষ্কার করলে যে কুবায় আসলে দশ লক্ষেরও বেশি ইণ্ডিয়ান 'ছিলো', (এই চমৎকার শুমারি পদ্ধতি তাদের এতই ভালো লেগে গেলো যে তারা ঠিক করলে, 'বেশ, এবার মেহিকো চলো, শুমারি চালাতে!') বেশির ভাগ ইণ্ডিয়ানদের খতম ক'রে দেবার পর খ্রিষ্টান পুরুতরা চাইলে যে বাকি যে-কটা বেঁচে আছে তাদের সদাপ্রভু হেসুস ক্রিস্তোর সত্যধর্মে নিত্যধর্মে দীক্ষিত করতে হবে···কিন্তু উল্লুকগুলো মূর্তি পুজো করে, তাও আবার মূর্তিগুলোর মুখচোখ ইণ্ডিয়ানদের মতোই দেখতে—কিছুতেই তারা এস্পানিয়ার লোকজনদের মুখচোখওলা মূর্তি পুজো করবে না···হতচ্ছাড়া! আর যেহেতু কারুরই খ্রিষ্টান হবার কোনো গরজ বা মাথা-ব্যথা ছিলো না, পুরুতরা ইণ্ডিয়ানদের দলপতি হাতুয়েই-কে গ্রেপ্তার ক'রে খ্রিষ্টান করার চেষ্টা করলে। কিন্তু হাতুয়েই জিগেশ করলে—'স্পেনদেশীদের আত্মা কোথায় যায়?' এক পুরুত উত্তর দিলে, 'স্বর্গে।' 'তা যদি হয়,' হাতুয়েই বললে, 'তাহ'লে আমি নরকেই যেতে চাই।' এবং তারা তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলে। (এবং এই আরেকটা পদ্ধতি, পরে যেটায় ইয়াঙ্কিরা মহা ওস্তাদ হ'য়ে উঠেছিলো, বিশেষত ভিয়েৎনামে তা বিস্তর কাজে খাটিয়েছিলো।) কিন্তু প্রায় সব ইণ্ডিয়ানকেই খতম ক'রে দেবার পর স্পেনদেশীরা দেখলে তারা একটা মস্ত ভুল ক'রে বসেছে: কাজকর্ম করবে কে? কেই-বা জমি চাষ করবে, বাড়িঘর তৈরি করবে, গির্জে বানাবে? স্পেনদেশীরা নিশ্চয়ই নয়। তারা যে কোন্‌কিস্তাদোর!

কাজেই তারা আরেকটা সহজ সমাধান উদ্ভাবন ক'রে নিলে: (ইয়াঙ্কিরা পরে যেটা চমৎকার নকল করেছিলো—গুরুমারা বিদ্যেয় ইয়াঙ্কি চেলারা ভারি তুখোড়)। তারা আফ্রিকা থেকে কালা আদমিদের পাকড়ে আনতে লাগলো, বিশেষত যেহেতু তখনকার দিনে তাদের পাওয়া যেতো শস্তায়।

এইভাবে কুবা এস্পানিয়ার একটি উপনিবেশ হ'য়ে উঠলো—সেইসঙ্গে রইলো ক্রীতদাস প্রথার রমরমা (যদিও অতীব-ভক্ত খ্রিষ্টান সব একেকজন)।

এস্প্যানিয়ার রাজা রাজ্যপাল ও অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ করতে লাগলেন, আর দ্বীপটাকে সজুত, ঠাণ্ডা ও তাঁবে রাখলেন অর্থপিশাচ সেনাদের সাহায্যে। পরে স্পেনদেশীরা দেশের চারদিকে কেল্লা আর গড়খাই বানালে—ঠিক যেমন-ভাবে উত্তর আমেরিকায় ইয়াঙ্কিরা পরে বানাবে : সব ঔপনিবেশিকরাই এক জাতের !

এদিকে জগৎ শিগগিরই টের পেয়ে গেলো কুবা দ্বীপের মাহাত্ম্য—যুদ্ধ-টুদ্ধ ছাড়া বাণিজ্যেরও সুবিধে হয় দ্বীপটা হাতে থাকলে—কেননা কুবা হ'লো আমেরিকা যাবার চাবি। এবং ইংরেজদের মতো কাণ্ডজ্ঞানওলা বানিয়ার জাতের চাইতে সেটা আর বেশি ক'রে কে বুঝবে। কিন্তু ইংরেজদের জারিজুরি খাটলো না—রানী এলিজাবেথের নামে যতই জয়ধ্বনি দিক, তারা মাত্র একবছর কুবাকে নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিলো। ১৭৬৩তে ইংলণ্ড আবার এস্প্যানিয়াকে কুবা ফিরিয়ে দিলে। [এই দেয়া-নেয়া-ফিরিয়ে-দেয়ায় কেউ অবশ্য ইণ্ডিয়ান বা ক্রীতদাসদের মনের কথা কী, জানতে চায়নি।]

এদিকে কুবায় যারা বাস করতো, তারা শিগগিরই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়ে গেলো যে কোথাও একটা বিষম গোল পাকিয়েছে : দ্বীপের উৎপাদন ও ঐশ্বর্য নেহাৎ ফ্যালনা নয়, অথচ সব টাকা, সব চিনি, সব ফলমূল চ'লে যাচ্ছে এস্প্যানিয়ায়, আর এস্প্যানিয়ার রাজা আর রোমের পোপের কোষাগারে গিয়ে জমা হচ্ছে। তারই ফলে ১৮১৯-এ কুবার স্পেনদেশীরা এস্প্যানিয়ার স্পেন-দেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বসলো : তবে দুর্ভাগ্য—যারাই বিদ্রোহ করে-ছিলো, তাদের সবাইকেই ফাঁসিতে ঝোলানো হ'লো। তদ্দিনে সারা লাতিন আমেরিকাই এস্প্যানিয়ার নাগপাশ কেটে বেরিয়েছে—শুধু কুবাই পারেনি। কাজেই পর-পর আরো অভ্যুত্থান হ'লো : ১৮২৬-এ, ১৮২৮-এ, ১৮৩০-এ, ১৮৪৮-এ, ১৮৫১তে, ১৮৫৫তে—যদ্দিন-না এই বিদ্রোহ করাটা কুবার লোকদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেলো। সংগ্রামকে আরো-একটু কঠিন ক'রে তোলবার জন্যে ক্যাথলিক কর্তারা বেশ কতগুলো সদাচারী খ্রিষ্টান আইনকানুন পাশ করলো। কোনো কুবান কোনো সরকারি পদে থাকতে পারবে না। কোনো কুবান কোনো কারখানা বা ব্যাবসা গড়তে পারবে না। কালা আদমি আর শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে কোনো বিয়ে চলবে না—যদি-না এদের মধ্যে কেউ অভিজাত ও নীলরক্তবান হয়। কোনো স্পেনদেশীর বিরুদ্ধে মামলায় কোনো কুবানেরই কোনো বৈধ অধিকার নেই। কোনো কুবান কাউকে বাড়ি ভাড়া দিতে পারবে

না। সেনাবাহিনীর অনুমতি ছাড়া কোনো কুবান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারবে না। (অর্থাৎ অনুমতি ছাড়া কোনো কুবানের স্বর্গে যাবারও অধিকার নেই।)

সুতরাং যা হবার তা-ই হ'লো। কোনো কুবানই এটা মুখ বুজে সহ্য করলো না। ১৮৬৮ সালে এলেন মাসেয়ো (বন্ধুদের কাছে যিনি আন্তোনিয়ো) কার্লোস মানুয়েল দে সেস্‌পেদেস, মস্ত জমিদার, ক্রীতদাসদের মুক্ত ক'রে দিয়ে যিনি এস্পানিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন (বোধহয় ইতিহাসের প্রথম ভালোমানুষ বড়োলোক) এবং কুবা প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন। তাঁর সাফল্যের পেছনে ছিলো ক্রীতদাসদের অবদান—দাসপ্রথায় ক্লিষ্ট যত নেগ্রো, মুলাটো, মেস্তিসো সবাই তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

উদ্ধৃতি একটু লম্বাই হ'লো, কিন্তু তবু এর প্রয়োজন ছিলে, কেননা কুবার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যদি যৎকিঞ্চিৎ কোনো ধারণা না-থাকে, তবে তার শিল্পসাহিত্যকে বোঝা অসম্ভব হবে। কোন্‌কিস্তাদোররা শুমারির অছিলা ক'রে কুবায় যে নির্বিচার জাতিহত্যা চালিয়েছিলো, তারই সুদূরপ্রসারী জের শুরু হ'লো তখন যখন মাঠে-ঘাটে-নগরে-বন্দরে কাজ করাবার জন্যে আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের দাস ক'রে আনা হ'লো কুবায়, ১৯৭১-এর শুমারিতে অব্দি সেই ঐতিহাসিক অবস্থার চিহ্ন দেখা যাবে। সেই ১৫১৭ সালের আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাসদের এনে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো কুবার আখের খেতে, এবং তাদের আনাই হ'তে লাগলো—এমনকী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অব্দি : একসময় কুবায় আফ্রিকার মানুষের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ-ষাট ভাগও পেরিয়ে গিয়েছিলো। সাহিত্য কেমন ক'রে এই বাস্তবতায় সাড়া দেয় তার প্রমাণ নিকোলাস গ্যিয়েনের এই ছোট্ট কবিতাটি, যার নাম "আখ" :

নিগ্রোরা
আখের ঠিক পাশে।

ইয়াঙ্কিরা
আখের খেতের উপর।

মাটি লুটোয়
আখের খেতের নিচে।

রক্তধারা
হারাচ্ছি গা থেকে।

[অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ, 'চিড়িয়াখানা']

আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন নিকোলাস গিয়েনকে বলা হ'তো 'লাতিন আমেরিকার কালো হোমার' অথবা কেনই বা ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকার কাছে কুবার পরিচয় ছিলো 'নিকোলাস গিয়েনের দেশ'। এই নিকোলাস গিয়েনই তাঁর কাব্যসংগ্রহের প্রথম খণ্ডে বলেছিলেন ('ওব্‌রা পোয়েতিকা', লা হাবানা, ১৯৭২):

> আমাদের এই দেশে আফ্রিকার উপাদান এতই প্রচুর, বিশাল এবং আমাদের সামাজিক জলবিদ্যায় এতগুলোই তার প্রবল জরুরি প্রবাহ যে, এর হিয়েরোগ্লিফ-গুলোর রহস্যভেদের জন্যে চাই সত্যিকার সূক্ষ্ম কোনো কারুশিল্পীকে।

আর লিদিয়া কাব্রেরা—আরো-একজন কুবার কবি—স্পষ্ট ক'রেই জানান 'এল্ মোন্তে' বইতে: 'নিগ্রোকে না-জেনে আমাদের মানুষকে কেউ বুঝতে পারবে না।'

কিন্তু কারা এই নিগ্রো, এই কালা আদমিরা? দেশচ্যুত, ছিন্নমূল, দূরাগত—তারা শুধু দাসত্বের প্রবল বিভীষিকার মধ্যে আঁকড়ে ধ'রে রেখেছিলো তাদের সংস্কৃতি—তাদের পুরাণ, কিংবদন্তি, নাচগান, জীবনযাপন। স্বভাবতই, কোনো উৎপাটিত সংস্কৃতি যদি অন্য দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে চায় তবে তার চরিত্র হ'য়ে ওঠে কিছুটা স্থাবর ও স্মৃতিনির্ভর—সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্তনের বদলে স্মৃতির মধ্যে যা টিঁকে থাকে, তা এক 'পরিমার্জিত' সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। কিছু বাদ যায়, সময় আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু-বা বদল হ'য়ে যায়, আবার অনেকটাই থাকে অনড়, অপরিবর্তিত, স্থাণু। ফুলাহ্, মান্দিঙ্গো, বাম্বারা, য়োরুবা, আরারা, মিনা, বান্টু, কালাবার—আফ্রিকার কত দেশের কত-যে গোষ্ঠীকে এই দেশের জল-হাওয়ায়-মাটিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়েছে, যার ছাপ পড়েছে জীবনে ও সাহিত্যে। আফ্রিকার একটা বড়ো অংশেরই সাহিত্য ছিলো কথ্য ও শ্রাব্য—তার মানেই প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত—বক্তার সঙ্গে সরাসরি ভাববিনিময়

হ'তো শ্রোতাগোষ্ঠীর। এছাড়া থাকতো মুখের কথার ছন্দ, তাল, লয়, সামাজিক জীবনের চালচিত্রের মধ্যে তা ওতপ্রোত মিশে থাকতো। আর ছিলো টান-টান ঢাকের আওয়াজ। কুবার সমস্ত সাহিত্যকেই এই মৌখিক সাহিত্য অন্তহীনভাবে প্রভাবিত ক'রে গেছে। কথ্য সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণই হ'লো অনুপ্রাস, অন্ত্যমিল, অর্ধমিল, ছন্দোবদ্ধ পুনরাবৃত্তি আর অনুকার শব্দের বহুল ব্যবহার—অর্থাৎ শব্দের ঝংকারই কৌম সমাজে স্নায়ুর ওপর মন্ত্রের মতো কাজ ক'রে যেতো। আমরা আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর একটি ছোটো কবিতা লক্ষ করলেই সে-সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ করতে পারবো :

শক্তি সবই যায়, ধ'সে যায়,
তোমারই জয়কার, ওলোরুন! ইয়াম্বা ও!
ঢাকের গুমগুম বেজে যায়,
এবং জেগে ওঠে মৃতেরা সব
বাবালুওয়াইয়ের ভবনে।
সে-কথা ব'লে দেন কুলপতি,
তোমারই জয়কার ওলোরুন! ইয়াম্বা ও!
দরোজা-কাঠামোর হলুদ ছাঁচে-ছাঁচে!
মোরগ ম'রে গেছে এখুনি—
মহান ওবাতালা, তাঁর সে রক্তিম
বেদীর ওপরে, হে ওলোরুন!
তোমারই জয়কার, জয়-জয়! ইয়াম্বা ও!

এই কবিতার নাম করা হয়েছে আফ্রিকার দেবতাদের ওবাতালার নামে—সে ওলোরুন, অর্থাৎ ভগবানের রাজ-প্রতিনিধি, শুদ্ধতার দেবতা, তারই ওপর ভার সৃষ্টির পার্থিব কাজ সম্পূর্ণ করার। শুধু তা-ই নয়, য়োরুবাদের ধর্মের স্তুতিবাদনের ভঙ্গি আছে এই কবিতায়, আর 'ইয়াম্বা ও!' কথাটা ব্যবহার করে কুবার নিগ্রোরা, দেবতাদের জয়কার জানাতে। কার্পেন্তিয়ের কিন্তু কখনও ভোলেননি নিকোলাস গিয়েনের এই কথা :

> যে-শিল্প নিগ্রোকে কোনো কৌতূহল-জাগানো মানুষ হিশেবে না-দেখে শুধু কালো রঙের কোনো এষণা হিশেবে ছাখে, সে-শিল্পকে আমি প্রত্যাখ্যান

করি। সন্দেহ নেই নিগ্রো প্রসঙ্গ কোনো চিত্রশিল্পীকে ছবি আঁকার অনেক নমনীয় উপাদান জোগায়, প্রথম শ্রেণীর উপাদানই সে-সব, আর সংগীতশিল্পীকে জোগায় অসাধারণ ছন্দের দোলা আর ভাষার নতুন-নতুন সব সম্ভাবনা ও ঐশ্বর্য। কিন্তু আমরা যেন এ-কথা কখনোই ভুলে না-যাই যে লক্ষ-লক্ষ নিগ্রো দাসত্বের প্রচণ্ড বিভীষিকার মধ্যে বেঁচে-থাকার জন্যে লড়াই ক'রে চলেছে।··· এদের সবই / সবাই কিন্তু তাম্বোর, মাকুম্বা, বুম্বা বা ভুডু নয়···

আর আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর কৃতিত্ব এখানেই যে, এই সাবধানবাণী তিনি শুধু যে কখনও ভোলেননি, তা নয়—প্রায় এরই প্রতিধ্বনি করেছেন তিনি নানা স্থলে।

•••

জয়-জয়কার একুয়ের !

আলেহো কার্পেন্তিয়ের (১৯০৪-১৯৮০) দ্বিতীয় প্রজন্মের কুবান : তাঁর বাবা ছিলেন ফরাশি স্থপতিবিদ আর মা রুশী ব্যালেরিনা : তাঁর মধ্যে না-ছিলো ইণ্ডিয়ান রক্ত, না-বা আফ্রিকাবাসীর রক্ত। নিজে তিনি শুধু সংগীততত্ত্ববিদই নন, স্বয়ং সংগীত রচনা করেছেন—লিখেছেন কুবার সংগীতের ইতিহাস—আর সংগীতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতার চিহ্ন পাওয়া যায় তাঁর গল্প-উপন্যাসেও, যেখানে তিনি ব্যবহার করেন বিন্দু-প্রতিবিন্দু, 'লাইটমোটিফ' (পৌনঃপুনিক, আবৃত্ত, ঐশ্বর্যময়, বহুস্তর গুপ্ত সংযোগ)। কিন্তু বুদ্ধিজীবী হিশেবে তাঁর এমন-কোনো আত্মাভিমান ছিলো না যে তিনি জনগণ থেকে বা রাজনীতি থেকে দূরে স'রে থাকবেন ; এমন কথা যে কোনোদিনই তিনি ভাবেননি, শুধু তা-ই নয়, কুবাকে স্বাধীন ও সমাজ-তান্ত্রিক ক'রে তোলার স্বপ্ন ছিলো ব'লে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিয়েছেন, আর সেজন্যে ১৯২৮ সালে তাঁকে জেলে যেতে হয়। সে-সময় তিনি আফ্রো-কুবান আন্দোলনের সঙ্গে কেবল যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তা-ই নয়, লিখেছিলেন তাঁর আফ্রিকার উপাদানে ভরা কবিতা, 'কালো সংরাগ' নামে একটি অপেরাও লিখেছিলেন যেটা পারীতেও অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, আর লিখেছিলেন আফ্রো-কুবান উপাদান সংবলিত একটি তথ্যময় উপন্যাস, যেটা ১৯৩৩-এ অনেক ফোটোচিত্র সমেত প্রকাশিত হয়েছিলো : 'একুয়ে-ইয়াম্বা ও!', যে-উপন্যাসকে এখনও প্রায় দলিলের মতো ব্যবহার করা চলে, যদিও এই উপন্যাসের রচনারীতি তাঁর পরবর্তী গল্প-উপন্যাসের চেয়ে একেবারেই অন্যরকম।

এই ছোট্ট উপন্যাসটির ('জয়-জয়কার একুয়ে-র') প্রথম খশড়াটির নাম কার্পেন্তিয়ের অন্যভাবে ভেবেছিলেন : 'হাবানার জেলখানা, ১-৯ আগস্ট, ১৯২৭'। পরে কার্পেন্তিয়ের এ-বই আর প্রকাশ করতে চাননি (যদিও এখন তা তাঁর সমগ্র রচনাসংগ্রহের অন্তর্ভূ'ত), কারণ তাঁর মনে হচ্ছিলো যদিও এই উপন্যাস তিনি এমন লোকদের নিয়ে লিখেছেন যাদের তিনি ছেলেবেলা থেকেই চিনতেন, তবুও তাঁর মনে হয়েছে তিনি তাদের মনের ধাতটা ঠিক ধরতে পারেননি—কিংবা তাদের জীবনযাপন ফুটিয়ে তোলবার জন্যে যে-ভাষা দরকার, সে-ভাষাও তখন তিনি আয়ত্তে আনতে পারেননি। এ-কথা তবু তর্কাতীতভাবে সত্য যে কার্পেন্তিয়েরের এই উপন্যাস কুবার কালো মানুষদের সংস্কৃতিকে গভীর মমতা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলো, ঠিক যে-কাজটা করতে চেয়েছিলেন ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে তাঁর বন্ধু মিগেল আনহেল আস্তুরিয়াস তাঁর 'গুয়াতেমালার পুরাণকথা' বইতে বা ব্রাজিলের মারিও দে আন্দ্রাদে তাঁর 'মাকুনাইমা' উপন্যাসে।

কুবার ১৯২৩-এর বিদ্রোহী প্রজন্মের সক্রিয় কর্মী ছিলেন কার্পেন্তিয়ের—'১৯২৩-এর প্রজন্ম' চেয়েছিলো কুবার জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে বিপ্লব ঘটাবে, তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো একনায়ক হেরার্দো মাচোদোর অপসারণ। নিজেদের শেকড় খোঁজবার জন্যেই আফ্রো-কুবান সংস্কৃতিকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলো তারা, কালোদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলো নিজেদের অভিজ্ঞতা, ভেবেছিলো একমাত্র এই দুয়ের মিশোলেই কুবার পক্ষে সম্ভব হবে নিজেদের ভাষা ফিরে-পাওয়া। মেনেগিল্দো কুয়ে—সে একজন কাল্পনিক কালো কুবান—তাকে ঘিরেই এই উপন্যাস গ'ড়ে উঠেছে। গিয়র্গি লুকাচ একবার বলেছিলেন উপন্যাস একই সঙ্গে কারু জীবনচরিত আবার কোনো সমাজেরও ইতিহাস। এই মেনেগিল্দো কুয়ের জীবনচরিত লিখতে গিয়ে কার্পেন্তিয়ের ছুঁতে চাচ্ছিলেন কুবার কালোদের সংস্কৃতি। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে কুয়ে-র জন্মের মুহূর্তে, আর তার সমাপ্তি যখন সে তার প্রণয়িনীর অন্য-একজন প্রেমপ্রার্থীর হাতে নিহত হ'লো। আফ্রিকার মানুষদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পালাপার্বণ থেকে শুরু ক'রে ওঝা, হাকিম, তুকতাক প্রভৃতি অনেক কিছু ভিড় ক'রে এসেছে এই উপন্যাসে। পরে অবশ্য আলেহো কার্পেন্তিয়ের নিজেই এই বই সম্বন্ধে বলেছিলেন :

সেই যখন আফ্রো-কুবান লোককথায় সাধারণের দারুণ আগ্রহ জন্মেছিলো… আমি [তখন] একটি উপন্যাস লিখেছিলুম 'একুয়ে-ইয়াম্বা-ও!' (জয়-জয়কার

> একুয়ে-র), যার পাত্র-পাত্রী ছিলো তখনকার দিনের গ্রামসমাজের নিগ্রোরা। এখানে বলা উচিত যে আমি বড়ো হ'য়ে উঠেছিলুম কুবার অজ পাড়াগাঁয়ে, কালো চাষীদের ছেলেদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে; পরে সান্তেরিয়া আর নিয়ানিগিজমোর পালাপার্বণে দারুণ আগ্রহী হ'য়ে উঠে আমি অগুনতি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলুম। তারই যেন দলিল, এমনি অসংখ্য তথ্য ঠাশা এই উপন্যাসটি ছাপা হয়েছিলো মাদ্রিদে, ১৯৩৩ সালে, ইওরোপে যখন আদিমতাবাদ বা প্রিমিটিভিস্‌ম নিয়ে তুমুল হুলুস্থুল চলছে। এবং এখন: কুবার পালাপার্বণের বাস্তবতা সম্বন্ধে বিশ বছর ধ'রে সন্ধান ও সমীক্ষা চালাবার পর, আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার উপন্যাসে আমি যে গভীরবিশাল জরুরি ও অব্যবহিত এবং সেইসঙ্গে বিশ্বজনীন জগতের ছবি এঁকেছি ব'লে দাবি করেছিলুম, তা তখন আমার আয়ত্তের বাইরে থেকে গিয়েছিলো।

এটা অবশ্য তাঁর বিনয়ই; তবে বিষয়ের সঙ্গে তাঁর নিজের দূরত্বেরও ইঙ্গিত আছে এই কথাগুলোয়। তবু এটা মনে রাখা জরুরি, তিনি নিজে এ-বইয়ের প্রচার বন্ধ ক'রে দিতে চাইলেও, মেহিকোয় বা আরো কোনো-কোনো দেশে এ-বইয়ের অজস্র বোম্বেটে সংস্করণ বেরিয়েছিলো, ফলে শেষে রচনাসংগ্রহে এর একটা পরিমার্জিত প্রামাণিক পাঠ ছাপতে দিতে তিনি রাজি হন। কার্পেন্তিয়েরর যে পরবর্তীকালে কুবার সংগীতের প্রধান তাত্ত্বিক হ'য়ে ওঠেন, সে-কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 'একুয়ে-ইয়াম্বা-ও!'-তে বারে-বারে আফ্রো-কুবান সংগীতের সেই তীব্রপ্রখর অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে: এখানে ঐরকম একটি মুহূর্ত তুলে দিলে বোধহয় বোঝা যাবে কার্পেন্তিয়েরর তখন কীভাবে কাজ করতে চাচ্ছিলেন।

> সকল কণ্ঠস্বর সেই একই ছন্দে ফেটে পড়লো। ঝনঝন ক'রে বেজে উঠলো সুরের চাবিগুলো, তিনটে দীর্ঘ তালকম্প, তারপর দুটো ছোটো ক্ষিপ্র কম্পন। ধ্বনি গিয়ে পৌঁছুলো সোজা মাথার মধ্যে, মদের মতো মসৃণ। জোরে, আরো জোরে। এখন তারা সবাই গলা ছেড়ে চ্যাঁচাচ্ছে, গতির ছন্দের শরীরী বাসনায় ঝাঁকিয়ে দিতে শুরু করেছে তাদের কাঁধ। কালো আন্তোনিও নাচতে শুরু ক'রে দিলে একা-একাই, কোণা ধ'রে টেনে-টেনে নিচ্ছে তার রঙে-রঙে ভরা রুমালটা। তাকে ঘিরে একটা বৃত্ত, একটা বলয় গ'ড়ে উঠলো।

ঐ শোনো বাজে মারাকাস, ঝমঝমঝম !

ঐ শোনো বাজে ঢাক ! কত ঢাক বাজে !

মোরগের লড়াইয়ের গণ্ডিটায় যারা ছিলো, এমনি-সব কথা ব'লে-ব'লে তারা নৃত্যশিল্পীকে তাড়া দিয়ে উশকে দিতে লাগলো, আর তার কোমর যেন নমনীয়তায় হ'য়ে উঠলো ভিমরুলের মতো আর তার পাছা দ্রুত দুলতে লাগলো কোনো রতিবিলাসের ছন্দে। সে তার রুমালটা ছুঁড়ে ফেললে মাটিতে, আর একবারও তাল না-কেটে, ছন্দ ভুল না-ক'রে, প্রায় কোনো শম্বুর মতো ঘুরতে লাগলো বনবন, রুমালটা সে তুলে নিলে দাঁত দিয়ে, আর চারপাশে উৎসাহের সে কী চীৎকার।

বাজনা আরো ক্ষিপ্র, দ্রুত, দুঃসাহসী হ'য়ে উঠলো। মেনেগিলদো এসে এবার ঢুকলো বৃত্তের মধ্যে। দুই নৃত্যশিল্পী আড়ে-আড়ে তাকাচ্ছে এখন পরস্পরের দিকে, যেন বন্য দুই জন্তু যুদ্ধের জন্যে তেতে উঠছে। তারা বৃত্তের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে নাচছে, হেলিয়ে দিচ্ছে কাঁধ আর দুই ড্যানা—অক্ষম কোনো নৃত্যভঙ্গিমায়, ধেয়ে যাচ্ছে ছুঁয়ে যাচ্ছে পরস্পরের যৌনদেশ একান্তরভাবে, অভিনয় ক'রে দেখাচ্ছে কামের তাড়ায় স্ত্রী কেমন অস্থির ওড়ে পুরুষের সামনে তারই যেন এক রীতিনৃত্য।

'ধরো ওকে ! পোড়াও ওকে তুমুল !' গায়কেরা চীৎকার ক'রে উঠলো। আর এই আবর্তিত পশ্চাদ্ধাবন ক্রমশ আরো-কোনো তাৎপর্যে যেন ভ'রে গেলো। দুজনেই চাচ্ছে পরস্পরের কাছে কেউ তারা পিঠ দেখাবে না, 'নারী' হ'য়ে-যাওয়াটা এড়াতে চাচ্ছে প্রাণপণে, আকস্মিক কোনো পায়ের ছন্দে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পুরুষের নারী হ'য়ে-যাওয়ার অস্বাভাবিক বিসংগতি ঘ'টে যেতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। মেনেগিলদো—এর মধ্যেই সে নেশায় চুর—এমন হুঁশিয়ার হ'য়ে নাচছে যে তারা তাকে একা-একাই পাছা নাচাতে দিলে। চারটে হাত শুরু ক'রে দিলে নিয়ানিগোর তাল। রীতিপ্রচলের প্রতি আনুগত্যকে ফের প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবার বাসনা—ছাগযূথের ঔদ্ধত্যে যা শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলো—উদ্দীপ্ত ক'রে তুললো বাজনদারদের, শুধু কয়েক মুহূর্তেরই জন্য, যা ছিলো পবিত্র ছন্দ তাকে মাটির পৃথিবীর কলঙ্কে নামিয়ে আনতে।

কার্পেন্তিয়ের চাচ্ছিলেন পাঠক যেন দর্শক হ'য়ে ওঠে এই নাটকীয় মুহূর্তটার—কিন্তু কেন এই দৃশ্যটা সরাসরি চাক্ষুষ দেখা জরুরি, তার ব্যাখ্যা কিন্তু প্রাঞ্জল নয়—শুধু

শেষ পঙ্‌ক্তিতে একটি ইঙ্গিত আছে তার। যেন কোথাও একটা দ্বিধা আছে তাঁর, এখনও পুরোপুরি প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারেননি যেন অচেনা জিনিশকে চিনিয়ে দেবার, আবার আভাঁগার কালাপাহাড়ি মনোভাবের দিকেও একটা টান আছে—যেন ভেঙে দিতে চান এই আনুগত্য। পরে, ১৯৭৯ সালে, কার্পেন্তিয়েরের বইটির পুনর্মুদ্রণের সময় বলেছিলেন :

> 'জাতীয়তাবাদী' হবো আবার সেই সঙ্গে 'আভাঁগারও' হবো—কিন্তু কেমন ক'রে, সেটাই ছিলো প্রশ্ন···খুবই কঠিন প্রকল্প সন্দেহ নেই, কারণ সব জাতীয়তাবাদী চৈতন্যই নির্ভর করে ঐতিহ্য বা প্রচলনের প্রতি কোনো-একরকম শ্রদ্ধার মনোভাবের ওপর, অথচ আভাঁগার চায়, অনিবার্যভাবে, প্রচলের শেকল ভেঙে বেরিয়ে আসতে।

কিন্তু সব দ্বিধা সন্দেহ অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, এটা না-মেনে উপায় নেই যে, কার্পেন্তিয়েরেই প্রথম উপন্যাসে চেষ্টা করেছিলেন লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতিতে আফ্রিকার উপস্থিতিকে সম্মান জানাতে, যে-কাজটা অনায়াসে, অথচ বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে, দুই দশক পরে তিনিই সম্ভব ক'রে তুলবেন তাঁর 'এই মর্তের রাজত্ব' উপন্যাসে।

তাঁর পরের লেখার কৃৎকৌশলের সঙ্গে এ-বইয়ের রচনাকৌশলের প্রায় কোনো মিলই আমাদের আর চোখে পড়বে না : সত্যি-বলতে, এ-বই বেরুবার পর কিছুদিন তিনি আর-কোনো গল্প-উপন্যাসও লেখেননি। কয়েক বছর পর তিনি যখন আবার লিখতে শুরু করলেন তখন ভাষার মধ্যে বাস্তবেরই বিকল্প নির্মাণ বা বাস্তবের হুবহু প্রতিচিত্রণের বদলে তাঁর রচনার কাঠামো নির্ভর করলো সন্ধান, অনুসন্ধান, অভিযানের দুর্বার গতির ওপর। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে প্রথম যে-গল্প প্রকাশিত হ'লো, সেটা "উৎসের দিকে" (ভিয়াহে আ লা সেমিলিয়া)—যার মধ্যে সময়ের গতি তুলকালাম ছুটেছে উলটো দিকে। গল্প শুরু হয় আসিয়েন্দার ভাঙন দিয়ে—বড়ো-বড়ো জমিদারির দিন যে শেষ হ'য়ে গিয়েছে তারই ইঙ্গিত দিয়ে গল্প শুরু ; এক কালো দাস—এখন সে বুড়ো থুরথুরে—ব'সে-ব'সে দেখছে যে-জমিদারবাড়িতে সে সারা জীবন কাজ করেছে, মিস্ত্রিরা এসে সে-বাড়িটা ভেঙে ফেলছে—পরে এখানে অন্যকিছু গড়া হবে। এর পরে তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে অতীত—কিন্তু না, ফ্ল্যাশব্যাক নয়, বর্তমানের মধ্যে অতীতের ঝলক হঠাৎ এসে হানা দিচ্ছে না—বরং গল্পের পরিসরের মধ্যে সময়ের পুরো গতিটাকেই উলটে

দেয়া হয়েছে—কাহিনীর সূচনা তার মনিবের মৃত্যুশয্যায়, তারপর ধীরে-ধীরে আমরা এগিয়ে (বরং বলা ভালো, পেছিয়ে) যাই তার জন্মমুহূর্তে, এমনকী তার ভ্রূণাবস্থাকে পেরিয়েও আরো অতীতে, যখন সে ছিলো পঞ্চভূতে বিলীন। হালকা চাল কাহিনীর, রচনার রীতি বারোক, অর্থাৎ দুঃসাহসী, টগবগে, ঘূর্ণিময়, উচ্ছল—আমরা যত অতীতে এগোই ভাষাও ততই পেছিয়ে যায়—কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য এখানেও ছিলো, যেটা চিরকালই তাঁর লেখায় থেকে যাবে—সে হ'লো খুঁটিনাটির বিবরণ, অনুপুঙ্খের পুঞ্জীভূত তালিকা, যার পেছনে তাঁর যে শুধু সযত্ন অভিনিবেশই ছিলো তা নয়, যার উদ্দেশ্য ছিলো দলিল হ'য়ে-ওঠা—বাস্তব, স্পর্শসহ, মূর্তিমন্ত। ঠিক এই ধরনেরই সজীব বাস্তবতা দেখা যাবে তাঁর "পলাতকেরা" গল্পে—যেখানে নিগ্রো ক্রীতদাস প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় বনে-পাহাড়ে, এক গোপন গুহায়; তাকে তাড়া ক'রে এসেছিলো প্রভুর শিকারি কুকুর, কিন্তু ক্রমে সেই কুকুরই হ'য়ে ওঠে তার সঙ্গী, সাথী, সহচর। দুজনেই পালিয়েছে: অরণ্যের আহ্বানে, স্বাধীনতার সন্ধানে—কিন্তু যেহেতু নিগ্রো ক্রীতদাসটির কোনো রাজনৈতিক চৈতন্য নেই, কোনো দল বা সংগঠন নেই, থাকার মধ্যে আছে শুধু বন্য-এক স্বাধীনতার স্পৃহা, আর তার দপদপে রক্তে ভরা ইন্দ্রিয়ময় শরীর, তাই ক্রমে-ক্রমে আমরা লক্ষ করি তার আত্মিক বিনাশ। কুকুরটি বনের জীব ব'লেই একদিন বুনো কুকুরদের দলের সঙ্গে ভিড়ে যাবে, কিন্তু তার আগে টুঁটি ছিঁড়ে দিয়ে যাবে এই ক্রীতদাসের। কাকে বলে সত্যিকার স্বাধীনতা—কিংবা স্বাধীনতারও আগের পর্যায়ে যা থাকে, সেই প্রচণ্ড বিক্ষোভ—কার্পেন্তিয়ের তাঁর রচনায় বারে-বারে তারই তাৎপর্য হাৎড়িয়েছেন, যেখানে তাঁর তাত্ত্বিক চিন্তার সূত্র এসেছে কার্ল মার্কস থেকে, বিশেষত 'লুই নেপোলিয়নের আঠারোই ব্রুমেয়ার' থেকে, যার আরম্ভটা ছিলো এইরকম:

> হেগেল একস্থানে মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্বইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা যেন দু-বার হাজির হয়। সেইসঙ্গে এ-কথাটা বলতে তাঁর ভুল হয়েছিল: প্রথমবার আসে বিয়োগান্ত নাটকের রূপে, দ্বিতীয়বারে প্রহসন হিসেবে। দাঁতোঁর পরিবর্তে কসিদিয়ের; রবেস্‌পিয়েরের বদলে লুই ব্লাঁ। ১৭৯৩-৯৫ "পর্বতের" জায়গায় ১৮৪৮-৫১ সালের "পর্বত"; খুড়োর বদলে ভাইপো। আঠারোই ব্রুমেয়ারের দ্বিতীয় সংস্করণটিকে ঘিরে যে-সব ঘটনা সমাবেশ হল, সেখানেও সেই একই ব্যঙ্গ মূর্তি দেখা যায়। স্বীয় ইতিহাস মানুষই রচনা করে

বটে, কিন্তু ঠিক আপন খুশিমতো নয়, নিজেদের নির্বাচিত পরিস্থিতিতে নয়, প্রত্যাবর্তী, অতীত থেকে প্রদত্ত ও আগত পরিস্থিতির মধ্যে। মৃত পূর্বপুরুষদের সমস্ত ঐতিহ্য জীবিত লোকের মাথায় দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে থাকে। এমনকি যখন মনে হয় তারা নিজেদের মধ্যে ও বস্তুজগতে বিপ্লবসাধনে, তথা অভূতপূর্ব কোনো সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে, বৈপ্লবিক সংকটের ঠিক সেই পর্বগুলিতেই তারা অতীতের ভূত নামিয়ে এনে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তাদের নাম, রণধ্বনি ও সাজসজ্জাধার নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসপটে নূতন দৃশ্যটিকে কালপূজ্য ছদ্মবেশ ও ধার-করা ভাষায় উপস্থিত করতে চায়।

[মার্কস এঙ্গেলস, 'রচনাসংকলন', প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৭]

'আঠারোই ব্রুমেয়ারের' শুধু এই অংশটুকুই নয়, পরে দেখতে পাবো তার আরো অনেক অংশই কার্পেন্তিয়েরের চিন্তার মধ্যে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে। কিন্তু কার্পেন্তিয়েরের গল্প-উপন্যাসকে বুঝতে গেলে এই তাত্ত্বিক কাঠামো ছাড়াও আরো-একটা সূত্র মনে রাখা জরুরি।

...

অলৌকিক বাস্তব? না কি বাস্তবের কুহক?

একবার হেইতিতে যাবার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে ১৯৪৩ সালে কার্পেন্তিয়ের 'লো রেয়াল মারাভিঝোসো' কথাটার উল্লেখ করেছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে—তর্জমায়—'ম্যাজিক রিয়ালিসম্' বা 'কুহকী বাস্তববাদ'। একে হয়তো সরাসরি কোনো রচনারীতি বলা ঠিক হবে না, বরং এইভাবে দেখাই ঠিক হবে যে অনেক লেখকের কাছেই 'আমেরিকার বাস্তবতা' মনে হয়েছিলো ইওরোপের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু কার্পেন্তিয়েরের উদ্ভাবিত 'লো রেয়াল মারাভিঝোসো' অকস্মাৎ আকাশ থেকে পড়েনি—এর পেছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে।

শুভক্ষণেই আলেহো কার্পেন্তিয়েরের সঙ্গে গুয়াতেমালার মিগেল আনৃহেল আস্তুরিয়াসের দেখা হয়েছিলো পারীতে—বিশের যুগে। দুজনেই তখন ছাত্র হিশেবে পড়তে এসেছেন ফ্রান্সে, আনৃহেল আস্তুরিয়াসের স্নাতকোত্তর গবেষণার বিষয় ছিলো গুয়াতেমালার লোককথা, পুরাণ ও কিংবদন্তি। কার্পেন্তিয়ের ও

আস্তুরিয়াস দুজনেই ছোটো দুটি দেশ থেকে এলে কী হবে, দুজনের দেশেই বিপুল পরিমাণে ছিলো বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী—তাতে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত একটি জাতীয় স্বরূপ আবিষ্কার করার প্রশ্নটি ছিলো জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল। সে-সময় ফরাশি সাহিত্যে পরাবাস্তববাদের রমরমা অভ্যুদয় ঘটেছে; জেমস জয়েস থাকেন পারীতে, 'ইউলিসিস' লেখা শেষ। কার্পেন্তিয়ের ও আনহেল আস্তুরিয়াস দুজনেই পুরাণ, রূপক-উৎপ্রেক্ষা, ভাষা ও প্রতীকী ব্যঞ্জনার শক্তিতে বিশ্বাস করতেন, একই সঙ্গে দুজনের পরিচয় হয়েছিলো কার্ল মার্কস ও জিগমুণ্ট ফ্রয়েডের রচনার সঙ্গে—ফ্রয়েডকে তাঁরা রচনায় ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন, সেইসঙ্গে কিন্তু মার্ক্সবাদ ও বৈপ্লবিক আন্দোলনে তাঁদের অগাধ আস্থা ছিলো। এই সময়ে পারীতে তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের আরো-একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিলো: মার্তিনিক থেকে এসেছিলেন এমে সেজেয়ার (যাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন ফ্রান্‌জ্ ফাঁনঁ) আর সেনেগল থেকে লেওপোল্ড সেডার সেংঘর, এবং এঁরা দুজনে মিলে কালো মানুষদের জন্যে একটি শিল্পতত্ত্ব তৈরি করেছিলেন, যার নাম 'নেগ্রিচুড'—কালোত্বকে সংস্কৃতির কেন্দ্রে রেখে নেগ্রিচুডের মধ্যে একদিকে যেমন ছিলো কালো রং সম্বন্ধে এক ধরনের মরমিয়া ধারণা (যার প্রবক্তা লেওপোল্ড সেডার সেংঘর) অন্যদিকে ছিলো মার্কসবাদী বিপ্লবী চিন্তাধারা (যার তাত্ত্বিক পট রচনা করেছিলেন এমে সেজেয়ার)। বিপ্লবের পরে কার্পেন্তিয়ের যখন কাসা দে লাস আমেরিকাস-এর অধ্যক্ষ হবেন কুবায়, তখন আবার এমে সেজেয়ারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়বে—'দেশে ফেরার খাতা' ও নাটকগুলোর জন্যে কাসা দে লাস আমেরিকাস (আমেরিকাভবন) থেকে পুরস্কৃত হবেন এমে সেজেয়ার। চল্লিশের যুগে একদিকে যেমন আনহেল আস্তুরিয়াস 'কুহকী বাস্তবতা'র কথা তুলবেন, কার্পেন্তিয়েরও তেমনি সুযোগ পেলেই বলবেন লাতিন আমেরিকার 'অলৌকিক বাস্তব'-এর কথা। এটা মোটেই কাকতাল নয় যে কার্পেন্তিয়েরের 'এই মর্তের রাজত্ব' আর আনহেল আস্তুরিয়াসের 'জনারের মানুষ' দুটো বইই বেরুবে ১৯৪৯ সালে—এবং লাতিন আমেরিকায় জন্ম হবে নূতন আখ্যানরীতির।

'এই মর্তের রাজত্ব' বইয়ের সূচনায় কার্পেন্তিয়ের যে-কথা বলেছিলেন, সেটা বোধহয় এতক্ষণে মনে ক'রে নেবার সময় এসেছে:

> স্বীকার্য যে তার ল্যাণ্ডস্কেপ, ভূবিন্যাসের স্তর, তত্ত্ববিদ্যা শুদ্ধ ও আদিম, স্বীকার্য যে এখানে কী-রকম মুখোমুখি দুর্ধর্ষভাবে উপস্থিত ইণ্ডিয়ান আর নিগ্রো,

স্বীকার্য যে তার সাম্প্রতিক আ বি ষ্কা র নিষ্ফল প্রকাশের উদ্ভাস ঘটিয়েছে, জন্ম দিয়েছে দুরন্ত-উর্বর মেস্তিসো সংস্কৃতির; আমেরিকা—তাহ'লে মনে রাখতে হবে যে—তার পুরাণপ্রবাহের সজীব ধারাকে এখনও মোটেই নিঃশেষ ক'রে ফ্যালেনি।... [এই মহাদেশের] নাটকীয় ঘটনাবলির অনন্যতা, কা ফ্রঁাসেইয়ের কুহকভরা চৌমোহনায় কীভাবে একটা বিশেষ মুহূর্তে মুখোমুখি হয়েছিলো সব কুশীলব, আর কী-রকম প্রচণ্ড ও তুলকালাম ছিলো তাদের আত্মবিশ্বাস—এ-সবকিছুই কাহনে-কথনে কী-রকম যেন অলৌকিকে ভ'রে যায়, আর এ-গল্পকে ইওরোপে স্থাপন করা একেবারেই অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। আর, সব কুহক সত্ত্বেও, বিদ্যায়তনের ছেলেমেয়েদের শেখাবার জন্যে রচিত পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলিত ও সুবিদিত আখ্যায়িকার মতোই তা বাস্তব। আমেরিকার সমগ্র ইতিহাস সত্যি তবে কী, যদি তা না-হয় কোনো অলৌকিক বাস্তবতার কালপঞ্জি?

১৯৩৭-এ মেহিকোয় এসে, সবকিছু দেখে-শুনে, চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো পরাবাস্তব-বাদের পয়গম্বর আঁদ্রে ব্রেতঁর: ব্রেতঁ ভেবেছিলেন লাতিন আমেরিকার বাস্তবতা মূলত ইন্দ্রজালে ঘেরা কুহকাচ্ছন্ন, আর তাঁর মনে হয়েছিলো এই কুহেলিঘেরা কুহকী বাস্তবতা শুধু অপেক্ষা ক'রে আছে নতুন কথাকারদের আবির্ভাবের, নিঃসংকোচে যাঁরা একে ভাষায় অবিকল ধরবার চেষ্টা করবেন। ভাষাতন্ত্র ব'লে স্ব-শাসিত ইতিহাস-বহির্ভূত কোনো ব্যবস্থা যদি থেকে থাকে, তবে ভেঙে-চুরমার ক'রে দিতে হবে সেই তান্ত্রিক পদ্ধতি—কেননা শাসকদের বাসনাই ভাষাতন্ত্রকে এমন স্বনিয়ন্ত্রিত নির্বস্তুক স্তরে নিয়ে আসতে চায়—তার আভ্যন্তর গভীর-প্রোথিত কাঠামো আসলে বহন করে সমাজের ওপরমহলের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-বিধিনিষেধ। কার্পেন্তিয়ের যখন বলেন, এ-গল্প কিছুতেই ইওরোপে ফাঁদা যেতো না, ইওরোপের পাঠ্যপুস্তকে আখ্যায়িকা তৈরির যে-রীতিনীতি কৃৎকৌশল ভাষাব্যবস্থাকে আদর্শ হিশেবে খাড়া করা হয়েছে, তার সবকিছুকে ভেঙেই আমেরিকার বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তখন তিনি এও খুব-একটা অনুক্ত রাখেন না যে ইওরোপের এস্পানিওল ভাষা তার যাবতীয় অনৈতিহাসিক তান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে কিছুতেই ইণ্ডিয়ান আর নিগ্রোর দুর্ধর্ব উপস্থিতিকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না।

কার্পেন্তিয়ের আর আনৃহেল আস্তুরিয়াসের সঙ্গে পরক্ষণেই মিলেছিলেন দেমেত্রিওস আগিলেরা-মালতা, আর হুয়ান রুলফোর (১৯১৮-৮৬) পরে এই

ধারায় আসবেন পারাগুয়াইয়ের আউগুস্তো রোয়া বাস্তোস (১৯১৭-), কোলোম্বিয়ার গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস (১৯২৮-), মেহিকোর কার্লোস ফুয়েন্তেস (১৯১৮-), আরহেনতিনার হুলিও কোর্তাসার (১৯১৪-৮৪), বা চিলের হোসে দোনোসো (১৯২৪- ; অন্তত 'রজনীর অশ্লীল পাখি' বইয়ের কথা যদি মনে থাকে) এবং আরো অনেকে। ঠিক এমন ব্যাপার ঘটেছিলো আফ্রো-ইওরোপীয় সাহিত্যের বেলাতেও (আফ্রো-ইওরোপীয় সাহিত্য বলতে এনুগুগি ওয়া থিয়ং'ও-র মতোই আমরা এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে যে-সব আফ্রিকী ইওরোপীয় ভাষায়—ইংরেজি, ফরাশি, পোর্তুগিসে—সাহিত্য রচনা করেছেন) ; যখন এমোস টুটুওলার 'পাম-ওয়াইন ড্রিঙ্কার্ড' বেরিয়েছিলো, তখন একদিকে যেমন ডিলান টমাসের মতো কবিরা তার ভাষাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, অন্যদিকে পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, 'সর্বনাশ হ'লো—এ-যে দেখছি ইংরেজি ভাষাই উৎখাত হ'য়ে যাচ্ছে',—কারণ দ্য স্যোস্যুর প্রবর্তিত 'লাং' বা ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবস্থা মোটেই মানেননি এমোস টুটুওলা—ইংরেজির ছদ্মবেশে তিনি তাঁর আখ্যান রচনা করেছিলেন য়োরুবা ভাষাতেই। আফ্রিকায় অনেকেরই লেখাতে যেভাবে প্রবাদ, প্রবচন, বা বিশেষ বাগ্বিধি দেখা যায় তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজা বা রানীর ইংরেজি ভাষার অনুশাসন মেনে চলেনি। অর্থাৎ, কোনো উপনিবেশ বা প্রাক্তন-উপনিবেশ যখন ঔপনিবেশিকদের ভাষা ব্যবহার করে, তখন সবক্ষেত্রে যে ভাষাতাত্ত্বিক অনুশাসন মানে না, সেটা সম্ভবত এ-ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ রাখা উচিত। সিনক্রোনিক অর্থাৎ অনৈতিহাসিক ভাষা-ব্যবস্থার চেয়ে ডায়াক্রোনিক অর্থাৎ দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতেই ভাষার ব্যবহার হ'য়ে থাকে এ-সব ক্ষেত্রে—আর হয়তো সে-ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় ভাষা-ব্যবস্থার তত্ত্ব বেদম আঘাতে জর্জর হ'য়ে পড়ে। এটা কোনো কাকতাল নয় যে যখন জেমস জয়েস বা উইলিয়াম ফকনার বা অন্য অনেকেই ভাষার গড়নকে মুক্তবন্ধ, আবেগ-অনুষঙ্গ তাড়িত, মন্ময় রূপ দিচ্ছিলেন, তখনই ভাষাকে তন্ময়, বিষয়মুখ, বদ্ধ রূপে আটকে রাখবার জন্যে তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো। আলেহো কার্পেন্তিয়ের বা আন্হেল আস্তুরিয়াস ফ্রান্সে দ্য স্যোস্যুর কতটা পড়েছিলেন তার কোনো হদিশ নেই, কিন্তু জয়েস বা ফকনার যে তাঁরা পড়েছিলেন, তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ তাঁদের রচনা থেকে দেয়া সম্ভব। বাস্তবের কুহক যে অন্তত তথাকথিত বিষয়মুখ তন্ময় রচনার ওপর নির্ভর ক'রে থাকে না, এই কথাটা তাই স্পষ্ট ক'রে নেয়া জরুরি।

লাতিন আমেরিকার যে-লেখকদের নাম ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা প্রায়

সকলেই এসেছিলেন প্রাক্-শিল্পায়ত দেশগুলো থেকে, আর এটাই ইওরোপীয় পরাবাস্তববাদ থেকে কুহকী বাস্তবতাকে আলাদা ক'রে দিয়েছে : কেননা পরাবাস্তব-বাদ জাদু বা ইন্দ্রজাল বা পরাবাস্তবের আরাধনা করেছিলো পুঁজিবাদী শিল্পায়ত সমাজের প্রকৌশল সমাজের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হিশেবে, যে-সমাজ চেয়েছিলো মানুষের ওপর তার ধূসর, বিরস, যান্ত্রিক চিন্তাচেতনাকে চাপিয়ে দিতে। কার্পেন্তিয়ের বা আনহেল আস্তুরিয়াস—দুজনেই পরাবাস্তববাদীদের পরাক্রান্ত আন্দোলনের সময় পারীতে থাকলে কী হবে, এই দুই বন্ধুই জাদু বা ইন্দ্রজাল বা কুহককে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আনহেল আস্তুরিয়াস যখন সর্বোনে ছাত্র তখন তিনি পড়েছিলেন নৃতত্ত্ব আর তাঁর গবেষণানিবন্ধ ছিলো গুয়াতেমালার ইণ্ডিয়ানদের পুরাণ ও কিংবদন্তি সম্বন্ধে, প্রাক্-কোলোম্বীয় মায়া সভ্যতার অবদান বিষয়ে। তাঁর প্রথম সৃষ্টিশীল রচনা ছিলো মায়া ও ঔপনিবেশিক রূপকথার কবিত্ব-ময় শিল্পরূপ—'গুয়াতেমালার কিংবদন্তি ও পুরাণকথা' (১৯৩০)।

১৯৪৩-এ হেইতিতে বেড়াতে যাবার সময় আলেহো কার্পেন্তিয়ের অষ্টাদশ শতকের হেইতির দাসবিদ্রোহগুলো ও কালো রাজা অঁরি ক্রিস্তফের কাহিনী সম্বন্ধে কৌতূহলী হ'য়ে ওঠেন, যে-হেইতি সম্বন্ধে এমে সেজেয়ার 'দেশে ফেরার খাতা'য় লিখেছেন 'হেইতি, যেখানে নেগ্রিচুড প্রথম দাঁড়িয়েছিলো সটান তার পায়ের ওপর আর বলেছিলো নিজের মনুষ্যত্বে তার আস্থা আছে', যে-হেইতির তুসঁ্যা লুভেরতুরকে নাপোলিয় বন্দী ক'রে রেখেছিলো ৎসুরা পাহাড়ের জেলখানায়। [প্রসঙ্গত হয়তো উল্লেখ করা উচিত এমে সেজেয়ারের নাটকটির কথাও, 'রাজা ক্রিস্তফের ট্রাজেডি' ।] এই হেইতিকে নিয়েই ১৯৪৯ সালে কার্পেন্তিয়ের প্রকাশ করেছিলেন 'এই মর্তের রাজত্ব' (এল্ রেইনো দেল্ এস্তে মুন্দো)। উপন্যাসটি ফাঁদা ফরাশি বিপ্লবের তোলপাড় দিনগুলোয় : এর অনেক চরিত্রই ঐতিহাসিক, তবু সাধারণ অর্থে এ কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, ইতিহাসকে এখানে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা হয়েছে : কাহিনী তুলকালাম ছুটেছে মাকান্দাল-বিক্ষোভ থেকে অঁরি ক্রিস্তফের অভ্যুত্থান ও পতনে, কিন্তু তুসঁ্যা লুভেরতুর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। অথচ তবু এটা ঐতিহাসিক উপাখ্যানও—যেখানে স্বপ্ন আর বাস্তবের সীমান্ত চিরকালের মতো ঝাপসা ও অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে, কারণ এখানকার বাস্তবই এতটাই মাত্রাছাড়ানো, অতিকায় এবং আশ্চর্য যে চমৎকারকে কুহককে আশ্চর্যকেই মনে হয় বাস্তব। কার্পেন্তিয়ের একবার অবশ্য বলেছিলেন, লাতিন আমেরিকার ভাগ্য আর ভবিষ্যতে তাঁর গভীর আস্থাই তাঁর এই 'অলৌকিক

বাস্তবতা'র ধারণাকে গ'ড়ে দিয়েছে। 'এই মর্তের রাজত্ব' চারটি ভাগে বিভক্ত, তার সূচনা হয় লোপে দে ভেগা থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়ে, উপনিবেশবাদ বোঝবার জন্তে যেটা বোধহয় এখানে মনে ক'রে নেয়া জরুরি।

শয়তান ॥ আমি চাই প্রবেশাধিকার···

ঈশ্বর ॥ কে তুমি ? কী পরিচয় ?

শয়তান ॥ প্রতীচীর রাজা।

ঈশ্বর ॥ অভিশপ্ত ওরে,

তোকে আমি খুব ভালো জানি। আয় তবে।

[শয়তান প্রবেশ করে।]

শয়তান ॥ ধন্য রাজসভা, ধন্য,

চিরন্তন ঈশ্বর আমার !

কলম্বাস—তাকে তুমি পাঠাও কোথায় ?

আমার সমস্ত পাপ, সকল দুষ্কৃতী

সে আবার ঘটাক নতুন ক'রে, সত্যি এই চাও ?

তুমি কি জানো না তবে কতকাল সে-যে

আমিই রাজত্ব করি ঐ রাজ্যপাটে ?

কার্পেন্তিয়েরের এই উপন্যাসে বিপ্লবের সংজ্ঞার্থ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন—হয়তো "পলাতকেরা" গল্পটির কথাও আবার এখানে মনে ক'রে নিলে ভালো হবে। প্রথম অংশ ১৭৬০ সালে ফাঁদা, যখন মাকান্দাল—সে-এক নিগ্রো ক্রীতদাস—ফরাশিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো ; দ্বিতীয় অংশ : ফরাশি বিপ্লবের সূচনা থেকে এখানে কাহিনী এগোয় ১৮০২ অব্দি ; তারপর ১৮২০তে আঁরি ক্রিস্তফের পতন ; আর উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে ক্রিস্তফের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেকার বিবরণে। এই চারটি টুকরোকে যে শুধু প্রসঙ্গের সূত্রই ধ'রে রেখেছে তা নয়, ধ'রে রেখেছে নিগ্রো ক্রীতদাস তি নোয়েল, যে চারটে অংশেই বর্তমান। এইভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা লেখকের সুপরিকল্পিত বিন্যাসের মধ্যে নতুন-একটি আয়তন পেয়েছে, কেননা আমরা তো বিশেষ ক'রে তি নোয়েলের চোখ দিয়েই প্রায় সবগুলো ঘটনাকে দেখছি : ইওরোপ আর আফ্রিকা—ক্যারিবিয়নে এই-যে দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ—তি নোয়েল তাদের দুয়েরই যোগসূত্র। যেহেতু নিজে সে কালো, কিন্তু সে লেনর-

মাস মেজির বাড়ির ক্রীতদাসও ; শাদাদের যেমন সে কাছে থেকে দেখেছে, তেমনি আবার পলাতক বিদ্রোহী মাকান্দালের আফ্রিকী জগতেরও সে মানুষ। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো-একটা সংহতিসূত্র আছে উপন্যাসে, কেননা 'এই মর্তের রাজত্ব'র প্রধান চরিত্র মাকান্দাল, অঁরি ক্রিস্তফ বা তি নোয়েল—এরা কেউ নয়, বরং হেইতি দ্বীপটাই, যে-দ্বীপ 'জলের কাটা দাগ', 'আঘাতের প্রমাণ', 'চুরমার', 'অরূপিত', সেই রক্তাক্ত নাটকীয় দিনগুলোয় যে-দ্বীপ স্পষ্ট কোনো রূপ পাবার, অবয়ব পাবার, প্রাণান্ত চেষ্টায় ছটফট করছিলো।

কেন হেইতিকে এই ভূমিকা দিয়েছিলেন কার্পেন্তিয়ের ? কেননা ক্যারিবিয়নের এই দ্বীপেই মিশেছিলো ইওরোপ, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকা। ক্যারিবিয়নের অন্য অনেক রৌদ্রে-ঝলসানো দ্বীপের মতোই হেইতিতেও ইওরোপের লোভ আর লালসা প্রকাণ্ড দানবিক রূপ পেয়েছিলো—প্রতীচীর রাজা শয়তানের প্ররোচনায়, সেই-কবেই যেমন ভেবেছিলেন মহাকবি লোপে দে ভেগা। হেইতিতে এসেছিলো এস্পানিয়ার কোন্‌কিস্তাদোর, এসেছিলো ফরাশি ঔপনিবেশিক, এসেছিলো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ। দাস এসেছিলো আফ্রিকা থেকে। ছিলো—বেশির ভাগকে মেরে ফেলার পরে—ইণ্ডিয়ানও। কিন্তু হেইতিতেই প্রথম উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো মানুষ, লড়াই করেছিলো স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য। এমনকী হেইতিই ছিলো, যদিও-বা ক্ষণস্থায়ী, নেহাৎই সাময়িক, নূতন জগতের প্রথম স্বাধীন দ্বীপ—তুসঁ্যা লেভেরতুরকে ৎস্থুরা পাহাড়ে বন্দী ক'রে রাখবার আগে, হেইতি কিছুকালের জন্য স্বাধীন হয়েছিলো ; স্বাধীন হয়েছিলো অঁরি ক্রিস্তফেরও আমলে।

হেইতির ইতিহাস কার্পেন্তিয়েরকে কেবল রিয়্যাল আর মার্ভেলাস-এর সংযোগ-সূত্রগুলোই খুলে দেখায়নি, তাঁকে দেখিয়েছিলো বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপও। ব্যর্থ বিদ্রোহ, বার্থ স্বাধীনতা। মাকান্দাল, বুকমান, অঁরি ক্রিস্তফ। লক্ষ করতে হবে, সবগুলো বিদ্রোহকেই দেখানো হয়েছে আফ্রিকা থেকে উৎপাটিত এক কালো ক্রীতদাসের চোখ দিয়ে, যে-পরিকল্পনার মধ্যেই বাস্তবের কুহকরূপ দানা বেঁধে উঠেছিলো। এই ক্রীতদাস লেখাপড়া শেখেনি, সে বিশ্বাস করে অলৌকিকে, এই মর্তের বাইরেও অন্য-কোনো জগতের অস্তিত্বে, তার বিশ্লেষণ নেই, সে শরীর দিয়ে সাড়া দেয় সবকিছুতে—কিন্তু তার আছে অনুভূতি আর তুখোড় কল্পনা, আর আছে আফ্রিকা থেকে সে যে-সব সংস্কার, বিশ্বাস, দৃষ্টিকোণ, পুরাণকথা নিয়ে এসেছিলো সে-সব—তাদেরই স্থগিতবৃদ্ধি রূপগুলো। আর ক্রীতদাস ছাড়া কেই

বা বোঝে স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীন অর্থ? বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার অর্থ আর টানা-পোড়েন গজিয়ে ওঠে এবং উপন্যাসে, এই ক্রীতদাসের সঙ্গে তাদের সবক-টার নিবিড় যোগ—উপন্যাসটিতে বাস্তবতার একটা নতুন মাত্রা এনে দেয়।

তি নোয়েলের মতো মাকান্দালও একজন ক্রীতদাস। এক দুর্ঘটনার সময় তার একটা হাত প্রভুরা কেটে ফ্যালে। এই একহাতওলা মানুষটি একদিন পালিয়ে যায় জঙ্গলে: যেহেতু তার একটাই মাত্র হাত এখন, দাস হিশেবে তার দাম আর তেমন কিছু নয়। ফলে গোড়ায় তার খোঁজে কেউ তেমন ব্যতিব্যস্ত হয়নি। কিন্তু এক-দিন টের পাওয়া গেলো তার উপস্থিতি—কোনো অচেনা বিষের প্রভাবে পর-পর অজস্র শ্বেতাঙ্গ ম'রে গেলো—মৃত্যু যে কখন কোথায় কীভাবে হানা দেয় কেউ তা আগে থেকে জানে না। কে-যে এর জন্যে দায়ী, তার হদিশ পাবার জন্যে তোলপাড় প'ড়ে গেলো তারপর—কিন্তু মাকান্দাল, সে যেন ভেলকি জানে, ভোজবাজি জানে, কেউ ঘুণাক্ষরেও তার কোনো হদিশ পায় না। একটু হয়তো চেখে দেখা যায় কার্পেন্তিয়েরের রচনাভঙ্গি, তর্জমাতেও যার মধ্যে আন্দাজ ক'রে নেয়া যাবে কেন কার্পেন্তিয়েরকে পরবর্তী সব লাতিন আমেরিকী লেখক গুরু ব'লে মেনেছেন।

> একদিন বিকেলে তারা [শ্বেতাঙ্গরা] যখন হুমকি দিলে যে তার পাছায় তারা একতাল গাদাবন্দুকের গুলি ঠুশে দেবে, বাঁকাপায়ের সেই ফুলাহ্ শেষ অব্দি সব কথা ফাঁস ক'রে দিলে। মাকান্দাল, সেই যার এক হাত কাটা গেছে, সেই হুলো কি না এখন হ'য়ে উঠেছে রাদাদের বিশ্বাস, সংস্কার আর অনুষ্ঠানের এক 'বুন্‌গান', এখন তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে পরামানুষিক সব শক্তি ও ক্ষমতা, কেননা বেশ-কিছুবার তারই ওপর ভর করেছিলেন বড়ো-বড়ো সব দেবতারা, আর তাই এখন সে নিজেই হ'য়ে উঠেছে গরলদেব। অন্য জগতের শাসনকর্তাদের চরম কর্তৃত্ব এখন ভর করেছে তার মধ্যে, সে ঘোষণা করেছে উচ্ছেদের জিহাদ, শাদাদের একেবারে নির্মূল ক'রে দেবার জন্যে এখন সে নির্বাচিত, সে-ই এখন আদিষ্ট হয়েছে সান্তো দোমিঙ্গোতে স্বাধীন নিগ্রোদের এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য। হাজার-হাজার ক্রীতদাস তাকে অন্ধের মতো মানে। বিষের অগ্রগতিকে রোধ করার সাধ্যি কারু নেই।
>
> এই উদ্‌ঘাটন খামারের মধ্যে কশাঘাতের ঘূর্ণিঝড় লেলিয়ে দিলে। আর যখন গনগনে রোষে ছোঁড়া গাদাবন্দুকের জমকালো গুলি কালো খোচরটির নাড়িভুঁড়ি ছিটকে দিলে, এক দূত পাঠানো হ'লো কাপের উদ্দেশে। চারপাশে

যত পুরুষ পাওয়া গেলো, সেই দিনই বিকেলে সবাইকে জড়ো করা হ'লো মাকান্দালকে খুঁজে বার করতে। সবুজ মাংস, পোড়া খুর, কিলবিলে কীটের দুর্গন্ধে-ভরা সমভূমি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো ডালকুত্তোর ঘেউ-ঘেউ আর জঘন্য সব খিস্তিতে।

কয়েক হপ্তা ধ'রে কাপের সেনাবাহিনী আর খামার-মালিকদের তল্লাশিদল, দেওয়ান, খাতাঞ্চি আর উপদর্শকেরা পুরো তল্লাটটা তন্নতন্ন ক'রে চুঁড়ে ফেললো —প্রতিটি গাছ, সবগুলি নয়ানজুলি, সমস্ত আখের খেত খুঁজে দেখলো তারা: মাকান্দালের কোনো হদিশই নেই কোথাও। তার ওপর এখন যেহেতু সবাই জানে বিষের উৎস কী, তাই তার আক্রমণ স্থগিত রইলো। হয়তো গরল ফিরে গেলো কোনো বোয়মে, ঐ একহাতের মানুষটি হয়তো তাকে পুঁতেই ফেলেছে কোথাও, মাটির তলার আঁধারগর্ভে হয়তো এখন টগবগ ক'রে ফুটছে সে, গত কিছুদিন ধ'রে যা হ'য়ে উঠেছিলো কত-কত জ্যান্ত মানুষের মৃৎরজনী—মাটিতে ফিরে-যাবার রাত। সন্ধেবেলায় পাহাড় থেকে ফিরে এলো ডালকুত্তো আর মানুষের দল, দেহের প্রতিটি রোমকূপ থেকে অবসাদ আর হতাশা স্বেদ হ'য়ে ঝ'রে পড়ছে। এখন যেহেতু মৃত্যু আবার তার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পেলো, তার লয় দ্রুত হ'লো শুধু তখনই যখন কনকনে হিম হাওয়া বয় মাঘের অথবা তুখোড় বর্ষা নিয়ে আসে তুমুল জ্বর। খামার-মালিকরা আবার নিজেদের সঁপে দিলে পানোল্লাসে আর প্রমারায়, বাধ্য হ'য়েই যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আঁতাত করতে হয়েছে এটাও তাদের মনোকষ্টের একটা বড়ো কারণ। অশ্লীল গান, তাশের বাজিতে জোচ্চুরি, নেগ্রো মেয়েরা যখন ধোয়া গেলাশ নিয়ে আসে তখন তাদের স্তনমর্দন—এইসবের ফাঁকে-ফাঁকে তারা তাদের বাপ-ঠাকুর্দার সেই বীর মহিমার কাহিনী আওড়ায় যারা একদিন কার্তাহেনার লুঠতরাজে অংশ নিয়েছিলো অথবা পকেটে পুরেছিলো এস্পানিয়ার রাজসম্পদ, যখন কাঠের পা ঠকঠক ক'রে বেড়াতে-বেড়াতে পিয়েৎ হাইন চমৎকার শানিয়ে তুলেছিলো সেই দুর্ধর্ষ উৎকাঙ্ক্ষা দুশো বছর ধ'রে পূর্বপুরুষেরা যার স্বপ্ন দেখে আসছিলো। মদের দাগে ভরা টেবিলে পাশার ক্ষেপের ফাঁকে-ফাঁকে তারা পান করলে লেস্নামবুক, বারত্রাঁদ দোজেরমঁ আর দু'রোসের উদ্দেশে যারা নিজেদেরই উদ্যোগে একদিন পত্তন করেছিলো এই উপনিবেশ, যাদের কাছে নিজেদের অভিলাষই ছিলো আইন, শেষ কথা, যারা পাদ্রীর অনুশাসন অথবা 'কৃষ্ণ সংহিতা'র মোলায়েম তিরস্কারে কখনোই কোনো পাত্তা দেয়নি। আর

চৌকি বা বেঞ্চির তলায়, কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমোনো কুকুররা উপভোগ করছিলো তাদের স্বাধীনতা—যেহেতু এখন আর তাদের পরতে হচ্ছে না চোখা-চোখা ফলা-তোলা বকলশ।

সিয়েস্তার আলস্য আর গাছের ছায়ায় পানভোজন—মাকান্দালের তল্লাশিতে ঢিলে প'ড়ে গেলো। কয়েকমাস কেটে গেলো—তার কোনো সাড়া নেই। কেউ ভাবলে সে বুঝি দূরে কোথাও দুর্গম ভেতরে চ'লে গিয়েছে, বিশাল-সব শিখরদেশের মেঘমেদুর উচ্চতায়, সেই যেখানে নেগ্রোরা নাচে ফান্দাঙ্গো, কাস্তানেৎ-এর তালে-তালে। অন্যরা বললে 'বুনৃগান' নিশ্চয়ই কোনো স্কুনারে চেপে সটকেছে, এখন জাকমেল এলাকায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছে, যেখানে জমি চাষ করে এমন-সব লোক যারা ম'রে ভূত, যতক্ষণ তাদের নুন খেতে দেয়া হয় না। অথচ তবু ক্রীতদাসগুলোর হাবেভাবে দেখা গেলো উদ্ধত এক খোশমেজাজ।

রচনার ভঙ্গি, সবাই মানবেন—শুধু এই টুকরোটা দেখেই—দুঃসাহসী, চমকপ্রদ, খুঁটিনাটিতে ঠাশা—আর তার সঙ্গে মিশে আছে কৌতুক, তীব্র এবং তাৎপর্যময়। এ শুধু নিছক গল্প ব'লে-যাওয়া নয়, বরং সুদূর অতীতের বাস্তবতাকে ভাষায়-ছন্দে পুনরুদ্ধার করার দুরূহ চেষ্টা। কিন্তু সেই বাস্তবতার সঙ্গে ওতপ্রোত মেশানো আছে এমন-এক আবহাওয়া, যেটা ক্যারিবিয়ন তথা লাতিন আমেরিকার ইতিহাসের অতিকায় ও বেগবান কিংবদন্তির সঙ্গে জড়ানো। মাকান্দালের গরলদেবে রূপান্তরিত হওয়াই শুধু নয়, আমাদের কখনও ভুলতে দেয়া হয় না এই কৃশ, শীর্ণ মানুষটির একটি হাত নেই, অথচ তবু পুরো উপনিবেশের মালিকদের মধ্যে যে ছড়িয়ে দিয়েছে আতঙ্ক আর বিভীষিকা। কিন্তু শুধু এখানে এসেই থেমে যাননি কার্পেন্তিয়ের : মাকান্দাল বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে যাবার পরেও নিগ্রোরা কেন সবাই এত হাসিখুশি তারই কারণ তিনি বলেন পরমুহূর্তে, আর আমরা দেখতে পাই পুরাণ আর কিংবদন্তি, আদিম কল্পনা আর ঐতিহাসিক সময়, বাস্তব আর স্বপ্ন সব মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে গিয়ে উপন্যাসটিকে নিয়ে যায় তথাকথিত বাস্তবের পরপারে কোনো অধিকতর বাস্তবতায়, কুহকে ইন্দ্রজালে জাদুবিশ্বাসে।

রাত্তিরে তাদের ছাউনি আর কুঠুরি থেকে নেগ্রোরা একে-আরের সঙ্গে তথ্য-বিনিময় করে, সঙ্গে থাকে প্রবল উল্লাস, আর অদ্ভুত যত খবর : এক সবুজ

গিরগিটি নাকি তামাকপাতার গোলার ছাতে তার পিঠ গরম ক'রে শুয়েছিলো ; কেউ সেদিন দিনে-দুপুরে দেখেছে যে এক নিশিপোকা উড়ে বেড়াচ্ছে হাওয়ায় ; এক তাগড়াই কুকুর—তার সব লোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে—বাড়ির মধ্য থেকে হুড়মুড় ক'রে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলো, মুখে ছিলো হরিণের মাংসের মস্ত এক রাং ; এক গাংচিল—সমুদ্র থেকে এত দূরে ! তাজ্জব !—পেছনের বারান্দায় ডানা থেকে উকুন ঝেড়ে ফেলে চ'লে গিয়েছে।

তারা সব্বাই জানতো যে সবুজ গিরগিটি, নিশিপোকা, তাগড়াই কুকুরটা অথবা আচাভুয়া গাংচিলটি নানারকম ছদ্মবেশ ছাড়া আর-কিছু নয়। আর যেহেতু নানারকম চেহারা নিতে পারে মাকান্দাল—খুরওলা জন্তু, পাখি, মাছ অথবা পোকামাকড়ের—অতএব সে রোজ আসে সমভূমির খামারে, তার বিশ্বাসী অনুচরদের ওপর নজর রাখতে, আর এটাও জেনে নিতে, সে-যে একদিন ফিরে আসবে, এ-বিষয়ে তাদের এখনও পুরোপুরি আস্থা আছে কি না। এই-ঐ রূপান্তর, যাতেই হোক না কেন, এই একহাতের মানুষটি আছে সবখানে—বিশেষত জীবজন্তুর ছদ্মবেশ ধরবার আধিভৌতিক ক্ষমতা যখন তার আছে এখন। একদিন ডানা নেড়ে, অন্যদিন খুরে ঠকঠক তুলে, কদম-কদম ছুটে বা বুকে হেঁটে, সে এবার প্রভু হ'য়ে উঠেছে পাতালের সব স্রোতগুলোর, আর এইভাবেই সে এখন সারা দ্বীপ শাসন করে। অসীম তার ক্ষমতা।…কুকুররা তাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে না ; ইচ্ছেমতো সে বদলে ফেলতে পারে তার ছায়া ; গ'লে যেতে পারে তালার ফোকর দিয়ে। রাত্তিরে সে দেখা দেয় রাস্তাঘাটে, গায়ে কালো ছাগলের চামড়া, মাথায় দাউদাউ আগুনের শিং। একদিন সে—নিশ্চয়ই—দেবে মহাবিদ্রোহের সংকেত।

আর কালোদের যখন এইরকমই বিশ্বাস, তখন, অবশেষে মাকান্দালকে পাকড়ে শাদারা যখন জ্যান্ত ঝলসে মারলো, তাদের সকলের চোখের সামনে, তখন কেউ বিশ্বাস করলে না সেটা, নিজের চোখে দেখেও না, কারণ মাকান্দাল অমর, চিরজীবী, সে কখনও মরতে পারে না, আর তাই নিগ্রোদের মধ্যে একযোগে চীৎকার উঠেছিলো তখন : 'মাকান্দাল বেঁচে গিয়েছে !' শোরগোল, হল্লা, উল্লাস—হুলুস্থুল বেঁধে গিয়েছিলো চারপাশে।

সেদিন বিকেলে ক্রীতদাসেরা সারা রাস্তা হাসতে-হাসতে ফিরে এলো

খামারগুলোর। মাকান্দাল তার কথা রেখেছে, এই মর্তের রাজত্বেই সে থেকে গিয়েছে। আরো-একবার শাদাদের ভেলকি দেখিয়ে ফাঁকি দিয়েছে অন্ত জগতের বিশাল শক্তিরা।

কিন্তু এই কাহিনী, আবারও মনে ক'রে নেয়া ভালো, ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে-আনা—ফরাশি বিপ্লবের আগে-পরের কাহিনী। সময়ের ক্রম, বিভিন্ন স্থান, এমনকী ঘটনাগুলোও প্রধানত সত্যি। তারই সঙ্গে মিশেছে ভুডু, জাতিবিদ্বেষ, রতির উৎকাঙ্ক্ষা, মিথ্যা আভিজাত্যের চমকপ্রদ জাঁকজমক, সাঁসুসির অবিশ্বাস্য পাহাড়দুর্গ, রাজা ক্রিস্তফের দেহ কেমন ক'রে তাঁর নিজেরই ভৌতিক দুর্গের চুন-সুরকির সঙ্গে মিশে গেলো তার বিবরণ, তাছাড়া পলিন বোনাপার্ট-এর তাক-লাগানো আবির্ভাব (পরে তাকে আরো-একবার দেখা যাবে রোমে, কিন্তু তখন সে ভাস্করের হাতে-গড়া মর্মরমূর্তি—শীতল অথচ এমন-নমনীয় যেন জীবন্ত)। এমন-সব বিষয়ের সঙ্গে মিশেছে কার্পেন্তিয়েরের প্রখর ও সজাগ রাজনৈতিক বোধ—বিপ্লবের সারমর্ম। লাতিন আমেরিকায় অভ্যুত্থান ঘটে অবিশ্রাম, বার-বার; এক অপশাসনের পরে আসে আরেক অপশাসন; রাজা ক্রিস্তফের বিভ্রান্তির পর নতুন মুলাটোদের আবির্ভাব—কিন্তু সাধারণ মানুষের হাল বা যা-দশা পালটায় না। শুধু কালো বা দো-আঁশলা হ'লেই হয় না, স্বাধীনতার লড়াই আসলে শ্রেণী-সংগ্রাম, শোষিত শ্রেণীর মুক্তিতেই সত্যিকার মুক্তি—এই কথাই আমাদের ব'লে দিতে চান কার্পেন্তিয়ের।

...

মানুষই শিকার করে মানুষ

'মৃগয়া' (এল্ আকোসো, ১৯৫৮-৫৯)—এই ছোট্ট উপন্যাসটিতে আমরা কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস ছেড়ে এসে পৌঁছুই পঞ্চাশের দশকের কুবায়, বাতিস্তার রূঢ়-কর্কশ-স্বেচ্ছাচারী রাজত্বে। উপন্যাসটির দম আটকে রেখেছে হিংসা, রক্তারক্তি, নির্যাতন আর কঠোর ভয়। তখনকার কুবার এক প্রামাণিক দলিল যেন, এমন মনে হ'তে পারে প্রথমে—কিন্তু সে শুধুমাত্রই দলিল নয়—সে রচিত শিল্পকর্মও। প্রধান চরিত্রটি ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে বেইমানি করেছিলো, বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে পুলিশের কাছে ফাঁস ক'রে দিয়েছিলো সব পরিকল্পনা আর কারু-কারু নামধাম, এখন তারই পেছনে লেগেছে ফেউ, সে হন্তে কুকুরের মতো পালিয়ে

বেড়াচ্ছে, আশ্রয় নিয়েছে এক পুরোনো বাড়ির চিলেকোঠায়, যার পাশেই এক সংগীতশালা, সেখানে রোজ মহড়া দেয় শিল্পীরা, বাজায় বেটোফেনের সিমফনি 'এরোইকা', যে-সিমফনির বিষয়বস্তু স্বাধীনতা, যার প্রতিটি স্বর-অর্ধস্বর-আন্দোলন এতবার শুনে-শুনে সে চিনে নিতে পারে কার পর কী বাজবে, যার স্বরগুলোর পৌনঃপুনিক আবর্ত তাকে কোনো নাগপাশের মতো জড়িয়ে ধরে, পুরো সিমফনিটাই যেন তার জীবনের খুঁটিনাটির সমান্তর হ'য়ে ওঠে, তারপর একসময়ে সিমফনিটা শেষ হয় প্রেক্ষাগৃহে, যাদের হ'য়ে সে একদিন কাজ ক'রে ছাত্রদের সঙ্গে বেইমানি করেছিলো তারাই তাকে গুলি ক'রে মারে, তার পক্ষে সম্ভব হয় না তার লুম্পেন জীবনের পরিণতিকে ঠেকানো। যেমনভাবে সিমফনির সঙ্গে ভাঁজে-ভাঁজে এই পলাতকের জীবনকে জড়িয়ে দিয়েছেন কার্পেন্তিয়ের, তা আমাদের বুঝিয়ে দেয় তাঁর কল্পনার সজীবতা ও তুখোড় শিল্পিতা। এটা আরো-একটু স্পষ্ট হবে যদি আমরা একটু খুঁটিয়ে দেখি রচনাটিকে।

'মৃগয়া' বেরিয়েছিলো চে গ্যেভেরা ও ফিদেল কাস্ত্রো কুবা থেকে বাতিস্তা সরকারকে উচ্ছেদ করার পর, ১৯৫৯ সালেই। কার্পেন্তিয়ের উপন্যাসটি লিখেছিলেন ভেনেসুয়েলায় কারাকাসে ব'সে—বাতিস্তা সরকারের সঙ্গে নানা লেখায় জেহাদ ঘোষণা করবার পর দেশ থেকে যখন তিনি নির্বাসিত। অথচ এই ছোট্ট উপন্যাসটিতে এমন চাক্ষুষ- ও জীবন্ত-ভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে লা হাবানা, যে আমরা যেন কুবার রাজধানীকে শরীরী হ'য়ে উঠতে দেখি বইয়ের পাতায়: চোদ্দ বছর নির্বাসনে কাটাবার পরও বর্ণনার মধ্যে এই নগরী এমনভাবে সজীব হ'য়ে ওঠে যে মনে হয় কার্পেন্তিয়ের যেন ককখনো দেশ ছেড়ে এক পাও যাননি কোথাও। আর, প্রথমেই ব'লে নেয়া ভালো, লা হাবানা উপন্যাসের কাহিনীর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ: এই ঔপনিবেশিক শহরের জীর্ণ স্থাপত্য আর আঁধার গলিঘুঁজি এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে পাঠককে, যেন আস্তে-আস্তে চরিত্রদের সঙ্গে-সঙ্গে পাঠকেরও দম বন্ধ হ'য়ে যাবে: এই ভাঙন আর অবক্ষয়ের মধ্য থেকে কোথাও কারু পালিয়ে যাবার উপায় থাকবে না, যদি-না একেবারে পুরো ব্যবস্থাটাকেই সমূলে উচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা যায়, আগাপাশতলা ওপড়ানো যায়।

উপন্যাসটিতে শুধু একজনেরই নাম আছে, এস্ত্রেইয়া; সে একটি ধর্মপ্রাণা বেশ্যা—এস্ত্রেইয়া নামের অর্থ তারা। পাত্রপাত্রীদের আর-কারু নাম নেই কোথাও—এবং তার দরকারও থাকে না। আছে এক কালো বুড়ি দাই—যে গল্পের গোড়াতেই মারা যাবে। এককালে সে লালন করেছিলো সাংক্তি স্পিরিতুস নামের মফস্বল

শহরের এক অর্ধ-শ্বেতাঙ্গ শিশুকে—বড়ো হ'য়ে সে লা হাবানার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থপতিবিদ্যা পড়তে এসেছিলো, গোড়ায় সে উঠেছিলো এই দাইয়ের বাড়িতেই : কোন্‌কিস্তাদোরদের তৈরি-করা এক বাড়ি, এখন ধ'সে পড়ছে, এখন তাতে থাকে গরিবগুরবোরা, এখন সে একটা বস্তিবাড়ির মতো। রাস্তা থেকে মেয়েছেলে ধ'রে আনলে বুড়ি দাইয়ের আপত্তি হবে ব'লে ছেলেটি চটপট অন্য আস্তানায় উঠে গিয়েছিলো। বাড়ি-থেকে-আনা তার জিনিশপত্তর প'ড়ে ছিলো দাইয়ের কাছেই, ছাতের চিলেকোঠায়। ছেলেটির বাড়ি-থেকে-আনা জিনিশগুলো—পড়ার বই, কাঁটাকম্পাস, বাইবেল, স্তবমঞ্জরী—কিছুই তাকে মুক্তির কোনো পথ দেখায়নি। অল্পদিনেই সে জুটে যায় প্রতিবিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনে ও ঘোরপ্যাঁচে, ইস্তফা দেয় পড়াশুনোয়, হ'য়ে ওঠে ভাড়াটে গুণ্ডা বা মস্তান। তাকে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক গুণ্ডারা ব্যবহার করে গুপ্তঘাতক হিশেবে। অনেক রাজনৈতিক গুপ্তহত্যায় সে জড়িয়ে পড়ে ; গোড়ায় দলের লোকে বড়ো-বড়ো আদর্শের বুলি কপচাতো, কিন্তু একদিন সব ঢাকা স'রে যায়, সব আড়াল ঘুচে যায় : সে টের পায় নিছকই একটি ভাড়াটে গুণ্ডা ছাড়া আর-কিছুই সে নয়, কিন্তু যখন টের পায় ব্যাপারটা ততদিনে বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে. তার পরিত্রাণের সব রাস্তাই বন্ধ। পুলিশ তাকে ধরে, শাসায়, মারধোর করে, তার পুরুষাঙ্গ থেঁৎলে ফেলার ভয় দেখায়, এবং সে সবাইকার নামধাম ব'লে দেয়। পুলিশ প্রায় সবাইকেই কোতল করে, এবং বলাই বাহুল্য, পাণ্ডাদের কাউকেই নয়। এইসব মস্তানরা দক্ষিণপন্থী পাণ্ডাদের পক্ষে কেলেঙ্কারির বিষয় হ'য়ে উঠছিলো ব'লেই পুলিশের এত মাথাব্যথা। এবং, তারপর, পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়—এটা জেনেই যে-সব গুণ্ডা এখনও বাইরে বহাল তবিয়তে র'য়ে গিয়েছে তারাই তাকে খুন করবে। আর, সে নিজেও এটা জানে। কেননা তারা নিজেরাই এমনিভাবে একদিন ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছিলো একজনকে—যে পুলিশের মারের ভয়ে সব ফাঁস ক'রে দিয়েছিলো। সে পালিয়ে আসে বুড়ি দাইয়ের বাড়িতে, আশ্রয় নেয় ভাঙা চিলেকোঠায়, অপেক্ষা করে যদি দলের পাণ্ডারা তাকে বাঁচাবার জন্যে কোনো পথ বাৎলাতে পারে।

বুড়ো দাইয়ের বাড়ির উলটোদিকে থাকে এক সংগীতশিক্ষার্থী—সে একটা কনসার্ট হলে আংশিক সময় টিকিট বিক্রির কাজ করে। সেও মফস্বলেরই ছেলে, বাজনা শিখবে ব'লে লা হাবানা এসেছে। এক নামজাদা কণ্ডাক্টর এই কনসার্ট হলে বেটোফোনের 'এরোইকা' সিম্ফনি বাজাবেন—সেইজন্যে সে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড রেকর্ড কিনে এনেছে 'এরোইকা'র, সারাদিন ধ'রে সে ঐ রেকর্ড বাজায়, বারে-

যারে, যাতে সিমফনির মুভমেন্টগুলো সে বুঝতে পারে, যাতে বিচার করতে পারে এই কণ্ডাক্টর কেমন বাজান। উলটোদিকের বাড়ির চিলেকোঠায় এ-বাজনা শুনে-শুনে পলাতকের মুখস্থ হ'য়ে গেছে—সে জানে না এ কীসের বাজনা—কখনও মনে হয় বুঝি-বা এ চার্চের গান, কখনও মনে হয় মৃগয়ায় বেরিয়েছে শিকারিরা, কখনও উল্লাসে ফেটে পড়ে নাচের চটুল ক্ষিপ্র ছন্দ। পলাতক এস্ত্রেইয়ার বাড়িতেও যায়, এই সংগীতশিক্ষার্থীও যেতো এস্ত্রেইয়ার কাছে। কেউ কাউকে কোনোদিন চোখেও দ্যাখেনি আগে—এমনকী এস্ত্রেইয়ার বাড়িতেও এর সঙ্গে ওর আগে কখনও পরিচয় হয়নি।

বুড়ি দাই ছিলো অসুস্থ। পলাতক তারই খাবার চুরি ক'রে খায়। আর পথ্য না-পেয়ে একদিন বুড়ি মারা যায়—আর তাকে বেরিয়ে পড়তে হয় ঐ আশ্রয় ছেড়ে। সেদিনই পাশের কনসার্ট হলে 'এরোইকা'র অনুষ্ঠান হবে। এখন আমাদের রচনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য মনে ক'রে নেয়া উচিত: এত-সব কথা আমরা জেনেছি কিন্তু পারম্পর্যবিহীন ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবনায়, অতীতের বিদ্যুৎঝিলিকে, আসলে 'মৃগয়া'তে কিন্তু মূল কাহিনীর সময় মাত্র ছেচল্লিশ মিনিট, ঠিক যতটা সময় লাগে 'এরোইকা' বাজাতে—যদিও এখানে কেউ ঘটনার ক্রম বা কালপঞ্জি সাজিয়ে দেখছে না, যদি-না পড়তে-পড়তেই নিজেই পাঠক সেটা সাজিয়ে নেয়। কনসার্ট হলে লোকজন আসছে, এক্ষুনি কনসার্ট শুরু হবে, একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, ভাঙা বাড়িটার ছাতে অন্ত্যেষ্টির আগে নিশিজাগরের জন্য লোকজনের ব্যস্ত আনাগোনা—এই অবস্থায় 'মৃগয়া'র মূল কাহিনী বা ছেচল্লিশ মিনিটের শুরু। পলাতক অন্ধকারে গা ঢেকে যায় এস্ত্রেইয়ার বাড়ি, তার হাতে আছে একশো পেসোর একটা ব্যাঙ্কনোট, আনকোরা, কড়কড়ে; ঐ নোটটা—তার শেষ সম্বল—দিয়ে এস্ত্রেইয়াকে পাঠায় বড়ো উস্তাদের বাড়ি, একটা-কিছু ব্যবস্থা করা চাই এক্ষুনি; এস্ত্রেইয়া ফিরে আসে, একটু সন্তপ্ত, বলে যে ট্যাক্সিওলা বলছে নোটটা অচল, জাল নোট, তার কাছে আর পয়সা নেই, শরীর খাটিয়েই তাকে ট্যাক্সিওলাকে ভাড়া মেটাতে হবে, অতএব পলাতককে এক্ষুনি সটকে পড়তে হবে তার বাড়ি থেকে। আর পুরো লা হাবানায় তার যাবার কোনো জায়গা নেই, বড়ো কর্তার ডেরাটা শুদ্ধু ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, সে ফিরে আসে বুড়ির বাড়ির কাছে, যদি আজ রাতটা সে কোনোমতে কাটিয়ে দিতে পারে, আর অমনি দ্যাখে তার জন্যে অপেক্ষা-ক'রে থাকা আততায়ীদের, সে ছিটকে চ'লে আসে কনসার্ট হলে, কাউন্টারে ব্যাঙ্কনোটটা ছুঁড়ে দিয়ে কোনো ভাঙানি না-নিয়েই হুড়মুড় ক'রে ঢুকে

যায় ভেতরে, বাজনা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ তার আর কোনো ভয় নেই, আরে !, বাজনাটা তো তার চেনা, এই-তো চার্চের গান, তারপর তূরীভেরীর শব্দ, তারপর আসবে হালকা চপল ক্ষিপ্র নাচের ছন্দ···সব ক-টা মুভমেণ্টই তার চেনা। আর সংগীতশিক্ষার্থী—সে ঐ ব্যাঙ্কনোটটা নিয়ে চ'লে যায় এস্ত্রেইয়ার বাড়ি, এই নোটের বদলে কোনো টিকিট বেচেনি তো সে, অতএব এর তো কোনোই হিশেব নেই। কিন্তু এস্ত্রেইয়া নোটটা দেখেই বলে, আরে, এটা তো জাল নোট, অচল, কিন্তু তার ভাবভঙ্গি কথাবার্তা থেকে মনে হয় শুধু এটাই নয়, তার মনের ওপর অন্যকোনো বিষম ভার চেপে আছে, সে যেন কাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। আর তারপর এখন নিজের গ্লানি, পাপ, বিবেকদংশন—এ-সব ঢাকবার জন্যে কৈফিয়ৎ সাজাচ্ছে। সংগীতশিক্ষার্থী রেগে এস্ত্রেইয়াকে ছেড়ে আবার ফিরে আসে কনসার্ট হলে, তখন শেষ মুভমেণ্টটা বাজছে, বাজনা শেষ হ'য়ে গেলো তারপর, লোকজন সবাই চ'লে গেলো তারপর, আততায়ী দুজন জানে কোন্ বক্সে লুকিয়ে আছে পলাতক, তারা গুলি ক'রে তার শরীরটা ঝাঁঝরা ক'রে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

যেমন বলেছি, এখানে কালপঞ্জি ও গুপ্ত সংযোগগুলো পাঠককেই সাজাতে হয় : যতটা সহজ ক'রে কাহিনীর চুম্বক দেয়া হ'লো ততটা সহজ নয় এই উপন্যাস—অর্থাৎ এই চুম্বক আদৌ উপন্যাসটির, 'রচনাটি'র, ধারে-কাছেই যেতে পারে না। শুধু লা হাবানার স্থাপত্য বা ভাস্কর্যই নয়—কাহিনীর পরতে-পরতে মিশে আছে বেটোফেনের তৃতীয় সিম্‌ফনির মুভমেণ্ট। এটা সবাই জানে যে তাঁর বাবার মতো আলেহো কার্পেন্তিয়েরও শিখেছিলেন স্থাপত্যবিদ্যা, আর তাঁর যে প্রচণ্ড অনুরাগ ছিলো সংগীতে, সেটাও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে : ধ্রুপদী ও লোকায়ত—দু-রকম সংগীতেই তিনি যে আগ্রহী ছিলেন তা-ই নয়, তিনি লিখেছিলেন কুবার লোক-সংগীতের ইতিহাস, তাছাড়া আবার রচনা করেছিলেন একাধিক অপেরা, যার একটি হ'লো অতীব বিখ্যাত 'লা পাসিয়ঁ নোয়া'। আর 'মৃগয়া'য় তিনি কাজে খাটিয়েছেন তাঁর এই দুই অভিজ্ঞতাকেই। লা হাবানার স্থাপত্য বা বেটোফেনের সংগীত—কোনোটাই এই উপন্যাসে বাইরে থেকে চাপানো নয়—বরং এই দুয়ে মিলেই তৈরি ক'রে দিয়েছে উপন্যাসটির কাঠামো। ঘটনাক্রম বা কালপঞ্জি—এই নিয়ে যে-রকম নিপুণভাবে কার্পেন্তিয়ের এখানে খেলা করেছেন, পরে ১৯৮১তে গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস তাঁর 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি'তে তেমনিভাবেই খেলা ক'রে কার্পেন্তিয়েরের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করবেন। কালক্রমের যে-পারম্পর্য রচনার চেষ্টা যে-কোনো পাঠককেই এখানে করতে হয়, তার ভেতরেই লুকিয়ে

আছে এই ছোটো উপন্যাসটির আশ্চর্য ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি। এই কথাটি আরেকটু স্পষ্ট হবে যদি আমরা বারোক রচনানীতির কথা মনে ক'রে দেখি।

...

কাকে বলে বারোক রচনারীতি

এস্পানিওল ভাষায় লেখা সাহিত্য হয়তো আজও পুরোপুরি ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বারোক রচনারীতির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি—অন্তত লাতিন আমেরিকার সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'লে তা-ই মনে হয়। যদি 'বারোক' কথাটি এসে থাকে পোর্তুগিস 'বার্‌রোকো' থেকে, তবে তার কোথাও নিশ্চয়ই মূল অর্থের স্মরণে থেকেই যায় অসমাঙ্গ মুক্তোর প্রোজ্জ্বল ও বহুদ্যুতি বিচ্ছুরণ। আর যদি কথাটার উৎস হয় লাতিন 'ভেরুরুভা', তাহ'লে কোনো উৎরাইয়ের শিখর থেকে নেমে-আসা ঢলে নিশ্চয়ই মাথা ঘুরে যাবে পথিকের। কিন্তু কথাটির মূল অর্থ যা-ই হোক না কেন, 'মৃগয়া' এবং কার্পেন্তিয়েরের অন্যান্য রচনায় তার তাৎপর্য অনুভব করা যাবে। বারোক রচনারীতিতে ওতপ্রোত মিশে থাকে উৎপ্রেক্ষা আর রূপক, থাকে সময়ের গতি নিয়ে জট পাকানো খেলা, কাহিনীর নাটকীয় পরিস্থিতি আর ঘোরপ্যাঁচ, আর অন্তর্লীন বিশ্ববীক্ষা। অপ্রত্যাশিত শ্লেষ-পরিহাস বা উপমায় গ'ড়ে ওঠে কল্পনার বিস্তার আর বাস্তবের কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি। বারোকরীতি রচনার সময় হ'য়ে ওঠে কাঠামোরই অবিভাজ্য অঙ্গ—কেননা সে-যে শুধু স্পষ্ট ক'রে সময়ের প্রকৃতি বা গতিবেগকেই খুলে দেখায় তা নয়, সে নিপুণভাবে পরিচালনা করে তাকে, কাজে খাটায় তার সমস্ত আপাত-বিরোধী সম্ভাবনা। নাটকীয়তা গ'ড়ে ওঠে একাধিক চরিত্রের অনুভূতির তাড়নায় আর দৃষ্টিভঙ্গির টানাপোড়েনে, আর ধীরে-ধীরে সব এসে মিলে যায় এক জায়গায়, একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে দিয়ে যায় পাঠকের মনে। সুন্দর আর কদর্য, আত্মকেন্দ্রিকতা আর নৈর্ব্যক্তিকতা, ধর্মবোধের উৎসার আর যৌনতার প্রকোপ, তাৎক্ষণিক আর শাশ্বত—সব সারাক্ষণ পর-পর হানা দেয় লেখায়, যার উদ্ভাবনীনৈপুণ্য নব-নব উন্মেষশালিনী কল্পনা ফুটিয়ে তোলে সেই 'শ্রী', সেই 'সুষমা' আলেকজাণ্ডার পোপ যাকে দেখেছিলেন 'সব শিল্পেরই নাগালের বাইরে'।

বারোক রীতির এই বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখলে আলেহো কার্পেন্তিয়েরের আখ্যানগুলো কিন্তু পাঠকদের অভিজ্ঞতার পরিধিকেই বারে-বারে প্রসারিত করে: একবার প'ড়েই তা ফুরিয়ে যায় না—প্রতিবার পড়ার সময় আমরা আবিষ্কার করি

নতুন জটিলতা, নতুন বিস্তার, নতুন তাৎপর্য। 'মৃগয়া' যেমন—একটি ফাঁদে-পড়া লোকের কাহিনী, পলাতক জানে যে সে মরবেই, তবু পালাবার শেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বলির গায়ে অপ্রতিরোধ্যভাবে চারদিক থেকে এঁটে বসে ফাঁস, আর আস্তে-আস্তে আমরা ফুটে উঠতে দেখি বাতিস্তার কুবার শ্বাসরোধী পরিবেশ, তার সব বিষাক্ত জটিলতা সমেত। এমনকী খুন হবার আগে পলাতক হেসুস ক্রিস্তো বা চার্চের কাছেও কোনো আশ্রয় পায়নি। 'মৃগয়া' উপন্যাসের বিষয়বস্তু আমাদের অন্তত খুব-একটা অচেনা হবার কথা নয়। সে-কোন্ ব্যাধিপীড়িত সমাজ নিষ্পাপ ছেলেকেও বানিয়ে দেয় দুর্বৃত্ত, রাজনৈতিক পাণ্ডারা কীভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তাকে কাজে খাটায়, তারপর সে যখন পুরোপুরি অধঃপাতে গেছে, এবং 'ব্যবহৃত…ব্যবহৃত …ব্যবহৃত' হ'য়ে 'শুয়ারের মাংস হ'য়ে গেছে' তখন কীভাবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আঁস্তাকুড়ে, আবর্জনারাশির মধ্যে—তার কাহিনী আমাদের অপরিচিত হবার কথা নয়—আর সেটা হয়তো নয়া উপনিবেশবাদ ও পুঁজিবাদের নাগপাশে বন্দী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সদৃশতাই ফুটিয়ে তোলে। সারা লা হাবানাতেই সবকিছু ভেঙে পড়ছে—শুধু-যে বাড়িঘর, স্তম্ভ, গম্বুজ তা-ই নয়, ভেঙে পড়েছে শিক্ষার আদর্শ, মূল্যবোধ, ব্যক্তির মুক্তির তাড়নাও।

ইতিহাস আমাদের সময়কে চেনায়, সময়কে বিশ্লেষণ করতে শেখায়। কিন্তু ইতিহাসের কোনো বোধই যদি আমাদের না-থাকে, সমাজকে বিশ্লেষণ করবার কোনো উপায়ই যদি আমাদের না-থাকে, তাহ'লে আমরা পর-পর সাজিয়ে যেতে পারি ক্রম, পরম্পরা, কার পরে কী ঘটলো, খুঁজেও পেতে পারি তার হদিশ—কিন্তু তবু তার আভ্যন্তর টানাপোড়েনের সত্যিকার যুক্তিশৃঙ্খলা আবিষ্কার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হ'তে পারে। আর এই আবিষ্কারের চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে উপন্যাসের তাৎপর্য—আমরা বার ক'রে ফেলেছি কালানুক্রমকে, কিন্তু সময়ের এই ক্রমকে যদি সমাজের সমস্ত টানাপোড়েনের মধ্যে ফেলে আমরা বুঝতে না-শিখি, তাহ'লে সময়ের এই ক্রম থেকে যাবে ইতিহাসের নাগালের বাইরেই। অর্থাৎ 'মৃগয়া'র তাৎপর্য তখনই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবো যদি এবং যখন আমরা বাতিস্তার আমলের শেষ দিককার টানাপোড়েনের মধ্যে তাকে ফেলে দেখতে শিখি। শুধু তখনই 'মৃগয়া' হ'য়ে উঠবে আধুনিক কুবার ইতিহাসের উপক্রমণিকা।

কিন্তু এত-সব তুখোড় গল্প-উপন্যাসও বুঝি কার্পেন্তিয়েরের কাছে ছিলো নিছকই নবিশী। কেননা তাঁর কাছে প্রশ্ন ছিলো একটাই : কাকে আমরা বলবো সত্যিকার লাতিন আমেরিকা ? এই প্রশ্নেরই উত্তর হাৎড়াতে গিয়েই ইওরোপীয় মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে কার্পেন্তিয়ের ফিরে তাকিয়েছিলেন নিগ্রো, ইণ্ডিয়ান আর মেস্তিসো অধ্যুষিত লাতিন আমেরিকার তরাইয়ের দিকে। শুধু একা কার্পেন্তিয়ের নিশ্চয়ই নয়, তিনি একা ছিলেন না, আরো সহযোগী ছিলো তাঁর। প্রচণ্ড ক্ষমতা আর মৌলিকতার কবচকুণ্ডল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো ছবি, কবিতা, উপন্যাস—যাদের মধ্যে নতুন ক'রে জেগে উঠেছিলো কুবার মানুষদের মূল্যবোধ। নিকোলাস গিয়েনের কবিতা, উইফ্রাদো লাম-এর ছবি, কুবার কালো মানুষদের সংগীত : অর্থাৎ সব মিলিয়ে একটা নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গ'ড়ে উঠেছিলো হোসে মার্তিরই দেখানো পথ ধ'রে। আর এমন সময়েই, ১৯৫৩ সালে, বেরিয়েছিলো কার্পেন্তিয়েরের 'হারানো পদক্ষেপ' (লোস্ পাসোস্ পের্দিদোস)—একই সঙ্গে যে-উপন্যাস হ'য়ে উঠেছিলো লাতিন আমেরিকার শিল্পীদের আত্মানুসন্ধানের রূপক, অথচ যার শেকড় প্রোথিত ছিলো বাস্তবের কঠোর জমিতে—আর তাতে ভবিষ্যতের জন্য ছিলো এক উচ্চকিত সাবধানবাণী। কার্পেন্তিয়ের খুব ভালো ক'রেই জানতেন তিনি কী নিয়ে কথা বলছেন। এই উপন্যাসও 'মৃগয়া'র মতোই ভেনেসুয়েলায় ব'সে লেখা—বাতিস্তার জেল থেকে বেরিয়ে যেখানে নির্বাসনে তিনি কাটিয়েছিলেন অনেকদিন।

উপন্যাসের কাহিনী গ'ড়ে উঠেছে এক অতীব পরিশীলিত সংগীতশিল্পীকে ঘিরে—এখন কোনো প্রাগসর প্রকৌশলনির্ভর পুঁজিবাদী দেশে তিনি চলচ্চিত্রের জন্য সংগীত রচনা করেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিলো এক অভিনেত্রীর সঙ্গে—তিনি দিনের পর দিন একই নাটকে অভিনয় ক'রে চলেছেন, ঘুরে-ঘুরে তাঁকে নানা শহরে যেতে হয় 'কল-শো'তে, এই নাটকের অভিনয় যেন আর-কোনোদিনই শেষ হবে না। এই সংগীতশিল্পীর অবশ্য এখন এক প্রণয়িনী আছে, মুশা, জ্যোতিষচর্চা যার জীবিকা। প্রতীচীর নাগরিক ও ব্যাবসাদার সভ্যতা তিনজনকেই ক্ষিপ্ত, ক্লিষ্ট ও নষ্ট ক'রে দিয়েছে। সংগীতশিল্পী অবশ্য দ্বিতীয় আরেক সুযোগ পেলেন। তাঁকে পাঠানো হ'লো ওরিনোকোর জঙ্গলমহলে, লাতিন আমেরিকার কোনো নামহীন দেশে, প্রাক্-কলম্বাস যুগের আদিম-সব বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ ক'রে তাদের ওপর একটি

তথ্যচিত্র রচনা করবার ভার দেয়া হয়েছে তাঁর ওপর। তাঁর এই অভিযান যেন এক তীর্থযাত্রা—তাঁর নিজেরই হারানো পদক্ষেপগুলোয় পা দিয়ে-দিয়ে অতীতে ফিরে-যাবার চেষ্টা—অর্থাৎ শুধু তাঁর নিজের সাংস্কৃতিক শিকড়েই নয়, নিজের উপমহাদেশেরও সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝে নেবার চেষ্টা ছিলো এটা। পথ তাঁকে প্রথমে নিয়ে এলো লাতিন আমেরিকার কোনো নামহীন রাজধানীতে, যেখানে আচমকা বিপ্লব ফেটে পড়েছে, গুলিগোলা রক্তারক্তি মরণপণ লড়াই, আর সেখানে এক হরতালের দিনে অরণ্য আবার হানা দেয় নগরে; তারপরে তিনি পালিয়ে যান পাহাড়ে, বিপ্লব থেকে দূরে, যেখানে নিজের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন শিল্পীরা অনবরত পারীর স্মৃতি রোমন্থন ক'রে চলেছে; আর সব শেষে আচম্বিতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো একদল অভিযাত্রীর—যারা আধুনিক জীবন থেকে স'রে গিয়ে, শহর থেকে অনেক দূরে, তথাকথিত সভ্যতা থেকে কোন্ সুদূরে, নতুন সমাজ গ'ড়ে নিতে চায়; আর তাদের সঙ্গে বেরিয়ে প'ড়ে তিনি পৌঁছুলেন জঙ্গলের দুরধিগম্য গভীর থেকে অগম্য গভীরে, আর ক্রমাগত অনেক, অনেক আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে দেখা হ'তে লাগলো তাঁর, দেখা হ'লো রোসারিওর সঙ্গে, যে-মৃন্ময়ী কোনো ইতিহাসহারা আদিম ভূখণ্ডের আশ্চর্য স্বরের সঙ্গে ছন্দমেলানো, আর তিনি এসে পৌঁছুলেন এমন এলাকায় যেখানে এর আগে কোনো আধুনিক মানুষের পা পড়েনি। যেন একটা অন্য জগৎ এটা—যেখানে শুধু রোসারিওই নয়, আছে যত আদিম দেবতারা আর অদ্ভুত সব অনুষ্ঠান। আস্তে-আস্তে সংগীতশিল্পীর মধ্যে জেগে উঠলো এক নতুন চৈতন্য, যেখানে নিজের সঙ্গেই তাঁর দেখা হ'লো নতুন ক'রে, আর তিনি এই নন্দন কাননেই চিরকাল থেকে যাবেন ব'লে ঠিক করলেন। এই অভিযানে বেরুবার আগে তিনি ভেবেছিলেন শেলি-র 'বন্ধনমুক্ত প্রমেথিউস'কে সুর দেবেন, আর সারাক্ষণ তাঁর মাথায় গুঞ্জন তুলে যেতো বেটোফেনের নবম সিম্ফনি, যাতে যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের গলার স্বরও ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখন এক নতুন প্রেরণা হানা দিলো তাঁকে, পাগলের মতো অবিশ্রাম খেটে তিনি রচনা করলেন এমন-এক সংগীত, যার সুরগুলো—তিনি নিজেই জানেননি—এতকাল তাঁর নিজের ভেতরেই চাপা প'ড়ে ছিলো। তারপরেই তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর এই সংগীতের শিল্পিতাব সঙ্গে এই আরণ্য জীবনযাপনকে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। ইতিহাস তাঁকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে রোসারিওর কাছ থেকে—কেননা এই মৃন্ময়ী, রোসারিও, কোনোকিছুই জানে না ইতিহাসের, আর আদেলান্তাদো [পথিকৃৎ] সবকিছু ফিরে শুরু করতে চান একেবারে সূচনার মুহূর্ত

থেকে ; কিন্তু তাঁকে তো কেবল অতীতের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকলেই চলবে না, তাঁর নিজের ইতিহাসেরই সৃষ্টি তিনি, এবং যৎকিঞ্চিৎ হয়তো অনাগত ভবিষ্যতেরও। তাঁকে জঙ্গল থেকে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো তারই খোঁজে বেরিয়ে-পড়া হেলিকপ্টার, তিনি ভেবেছিলেন সাময়িকভাবে ফিরে যাবেন সভ্যতায়, তাঁর নতুন রচনা বাজানো হবে সহৃদয় রসিকদের মধ্যে, কিন্তু কয়েক মাস পরে যখন তিনি আবার এই অরণ্যভূমিতে ফিরে-আসার চেষ্টা করেন, চেষ্টা করেন রোসারিওর কাছে ফিরে আসতে, সেই পথ আর খুঁজে-পাওয়া যায় না, পাহাড়ের নদী থেকে ঢল নেমে, বন্যার পর তার প্রবাহপথ পালটে ফেলে, পথটা হারিয়ে গিয়েছে : ফেরার পথ বিলুপ্ত, জঙ্গল পথটাকে যেন তার বিকট হাঁয়ের মধ্যে বেমালুম গিলে ফেলেছে। শিল্পীকে হ'তেই হয় অগ্রদূত, 'আভাঁগার', পথিকৃৎ—কিন্তু জটিলতা আর সংকট ওৎ পাতে তখনই যখন শিল্পী মুখোমুখি হন জৈবতার, আদিরূপের, হারানো সময়ের।

এই কাঠামোর বর্ণনা থেকেই আড়াল ঘুচে যায় ; আর আমরা শুনে নিই কার্পেন্তিয়েরের বয়ান : নিজের সাংস্কৃতিক শিকড়ের অনুসন্ধানে না-বেরিয়ে রেহাই নেই শিল্পীর, কিন্তু তাই ব'লে অতীতের মধ্যে ডুবে থাকলেই চলবে না। উপন্যাসের শেষে প্রায় সরাসরিই তিনি খুলে বলেন এই কথা যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই সত্যি-সত্যি পেছনে ফিরে-যাওয়া সম্ভব নয়, কেননা সেটা হবে স্বরূপকেই অস্বীকার, নিজেকেই প্রত্যাখ্যান—কারণ শিল্পী হিশেবে তাঁকে তো নিতে হবে 'আদমেরই দায়িত্ব—সবকিছুর নাম দেবার দায়িত্ব'—প্রচ্ছন্ন পাঠ হিশেবে যে-কথাটা ব্যবহার করেছেন গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস তাঁর 'একশো বছর নিঃসঙ্গতা'র একেবারে গোড়াতেই। কার্পেন্তিয়ের হয়তো নিজের সম্বন্ধেই মন্তব্য করতে চাচ্ছিলেন, কিংবা তাঁর লক্ষ্য ছিলো—সাধারণভাবে—লাতিন আমেরিকার সব শিল্পীই। কেননা লাতিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক রূপ যে কত জটিল আর বিমিশ্র, জটপাকানো আর তুলকালাম, সচেতন শিল্পীদের চাইতে সে-কথা এত ভালো ক'রে আর কে জানে? গার্সিয়া মার্কেস যে কেন হুয়ান রুলফো আর আলেহো কার্পেন্তিয়েরকে গুরু ব'লে মেনেছিলেন তা 'পেদ্রো পারামো' ও 'হারানো পদক্ষেপ-এর বিন্যাসই আমাদের চমৎকার বুঝিয়ে দেয়।

কাকেই বা আমরা বলবো লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতি আর ইওরোপের সঙ্গেই বা তার সম্পর্ক কী—এ-প্রশ্নটা শুধু-যে আলেহো কার্পেন্তিয়েরকেই ভাবিয়ে-ছিলো তা নয়, তাঁর সমসাময়িক—এমনকী তাঁর পরেও—অনেক লেখককে

ভাবিয়েছিলো। 'হারানো পদক্ষেপ' এক অর্থে ক্যারিবিয়ন তথা লাতিন আমেরিকা আর এস্পানিয়া ও ফ্রান্স্ তথা ইওরোপের সম্পর্কটাকে বোঝবার একটা চেষ্টা : আধুনিকতার সঙ্গেই বা লাতিন আমেরিকার সম্পর্ক কী। সেই অর্থে 'হারানো পদক্ষেপ' ক্রমেই লাতিন আমেরিকার বিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ইশতেহার হ'য়ে ওঠে। উপন্যাসের নাম থেকেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে কার্পেন্তিয়েরর সত্যি-সত্যি কী করতে চাচ্ছেন : খুঁজে বার করতে হবে হারানো সময় আর প্রাচীন শিকড়গুলো, খুঁজে বার করতে হবে বিচ্ছেদের মুহূর্ত। আর এই সন্ধান শুরু হয় যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী নিউ-ইয়র্কে, যেখানে সংগীতশিল্পী স্বেচ্ছানির্বাসনে বন্দী, যেখানে সে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে আলবেয়ার কামু-র 'অ্যাবসার্ড' নিয়ে, সার্ত্-এর দায়বদ্ধ অস্তিবাদী প্রকল্প নিয়ে নয়। সংগীতশিল্পী শুধু-যে লাতিন আমেরিকা থেকেই বিচ্ছিন্ন তা নয়, সে বিচ্ছিন্ন এমনকী ইওরোপীয় দর্শনেরও গভীর সব দ্বন্দ্ব থেকে : কামু চলতি ফ্যাশন, তাই কামুকেই সে বাঁধাবুলির মতো আওড়ায়। তার প্রেরণা গেছে শুকিয়ে, সৃষ্টির উৎস শুষ্ক ঊষর বন্ধ্যা, বিজ্ঞাপনের ছবিতে সুর দিয়ে তার নিজের শিল্পকে বিক্রি ক'রে চলেছে—আর শিল্পকে এইভাবে পণ্য ক'রে দিয়ে সে নিজেও পণ্যই হ'য়ে উঠেছে এখন। এখান থেকে আখ্যান শেষটায় ফিরে আসে লাতিন আমেরিকায়, যখন সে তথ্যচিত্র বানাবার জন্যে লাতিন আমেরিকার পুরোনো বাদ্যযন্ত্রগুলির খোঁজে বেরিয়ে আসে। আর কোন্ লাতিন আমেরিকায় এসে সে পৌঁছোয়? শেকড়-ওপড়ানো এক দেশ, যেখানে আচম্বিতে, খেয়ালমাফিক, হঠাৎ হয় অভ্যুত্থান —অথচ সব সত্ত্বেও তার এক গভীর শরীরী উপস্থিতি আছে—যে-নিউ-ইয়র্ক সমস্ত মানবিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে তারই প্রতিতুলনায় গ'ড়ে উঠতে থাকে তার অভিযানের লাতিন আমেরিকা। আর তখনই বিকল্পগুলো স্পষ্ট হ'তে থাকে ক্রমেই : কী করবে একজন শিল্পী, আভাঁগার আধুনিক পশ্চিমী শিল্পকে নেবে? না কি নেবে সেই শিল্পেরই উত্তরাধিকার যা শুরু হয়েছিলো এস্পানিওল রোমান্সগুলোয়, 'আমাদিস দে গাউলা', 'তিরান্ত্ লো ব্লাঙ্ক', যা তৈরি ক'রে দিয়েছিলো 'দোন কিহোতে'র প্রস্থানভূমি? না কি আবিষ্কার করবে তার স্বদেশ, কাঁধে তুলে নেবে আদমের দায়, সব নামহারা জিনিশকে নাম দেবার দায়িত্ব? এই বিতর্কই উপন্যাসের অভিযানকে নাটকীয় ও উত্তেজক ক'রে তোলে। ভৌগোলিক জমির মধ্যে বেরিয়ে প'ড়ে সে পেরোয় যোজন-যোজন সময়, এসে পৌঁছোয় সময়ের ঊষায়, আলো ফোটবার সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে। পরস্পরবিরোধী সব বিষয় জড়িয়ে থাকে কাল্পনিক অভিযানটিকে—শ্লেষে-পরিহাসে-কৌতুকে যা ভরপুর। কিন্তু লাতিন আমেরিকার

ছিন্নবিচ্ছিন্ন চূর্ণ খণ্ড বাস্তবতার স্ববিরোধিতাগুলোকে শেষ অব্দি মেলাতে পারে প্রাঞ্জল এক যুক্তিশৃঙ্খলার বোধ—যা সমস্ত কাকতালের মধ্যেও আবিষ্কার করে এক গোপন সংযোগসূত্রের উপস্থিতি। অভিযান এগোয় ভিন্ন-ভিন্ন ভূগোল পেরিয়ে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরের সন্ধানে। নিজের বাস্তবতা থেকে যতটা নিজেকে দূরে সরাতে পারবে সে ততই সে ভালোভাবে দেখতে পারবে বুঝতে পারবে তার নিজের সংকট। যেহেতু উপন্যাসটি উত্তম পুরুষে লেখা তাই আখ্যানের বয়নেই নায়কের সমস্যাগুলো শরীরী রূপ পেতে থাকে—আর অন্য লেখার প্যারডি, পাস্‌টিশ, আত্মসচেতন অতিনাটকীয়তার মধ্যে শ্লেষে-পরিহাসে কথকের উদ্ভাবনী নৈপুণ্য তাতে জড়িয়ে ফ্যালে লাতিন আমেরিকার নতুন কথাসাহিত্যের সমস্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে। শিল্পীদের ফিরে যেতেই হবে উৎসে, তাদের জানতে হবে অতীত, মনে রাখতে হবে খুঁটিনাটি যতটুকু মনে ক'রে রাখা সম্ভব, পূর্বপুরুষদের জেনেই নিজেকে জানার কাজ শুরু হবে—কিন্তু সত্যি কোনো ফিরে-যাওয়াও নেই শেষটায়, শিল্পীদের তো বাঁচতে হবে বর্তমানে, আর রচনাকে উদ্ভাবন করতে হবে ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখেই।

...

আলোর শতাব্দীর বিরুদ্ধে

লাতিন আমেরিকার দশটি সেরা উপন্যাসের মধ্যে একটি 'হারানো পদক্ষেপ'—কিন্তু কার্পেন্তিয়েরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'আলোর শতাব্দী' (এল সিগ্‌লো দে লাস লুসেস্‌, ১৯৬০) আর 'বসন্ত উৎসব' (কোন্‌সাগ্রাসিওন দে লা প্রিমাভেরা, ১৯৬০)। 'আলোর শতাব্দী,' অর্থাৎ ইওরোপের আলোকপ্রাপ্তির শতাব্দী—যাকে ইতিহাসে বলে এনলাইটেনমেণ্ট। 'আলোর শতাব্দী'র পটভূমি ফরাশি বিপ্লব, ইওরোপ এবং ক্যারিবিয়ন। 'আলোর শতাব্দী'র বিষয়বস্তুও এক অর্থে অন্বেষণ—কিন্তু শেষ হয় ফরাশি বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গে শতাব্দীর ধ্বংসস্তূপে, যেখানে সমুদ্রতীরে চাঁদের আলোয় সারাক্ষণ চকচক করে গিলোটিনের ফলা আর ঢেউ সারাক্ষণ আছড়ে পড়ে তীরে। সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিবৃত করা হয়েছে একটি পরিবারের পাত্রপাত্রীর চোখ দিয়ে—কুবার এক ব্যবসায়ীর ছেলে, মেয়ে ও ভাগ্নের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। ব্যাবসাদারের মৃত্যুর পর তাদের কোনো অভিভাবক নেই, যেমন রাজবংশের পতনের পর ফরাশিরা বিপ্লবের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে নিজেদের কোনো রক্ষাকর্তা খুঁজে পায়নি। কার্লোস, সোফিয়া, আর তাদের তুতোভাই এস্তেবান—অভিভাবকহারা,

হঠাৎ-পাওয়া স্বাধীনতায় বেরিয়ে পড়ে ইওরোপের উদ্দেশে, জীবনকে স্বতঃস্ফূর্ত উজ্জ্বলতায় ভোগ করবে ব'লে তারা বদ্ধপরিকর। আর যখন স্বাধীনতার মানে হ'য়ে উঠেছে যথেচ্ছাচার, তখনই আবির্ভাব হয় হেইতির নৈরাজ্যবাদী ভিক্তর উগুর, যে আসবাবমাত্র সবকিছুর রাশ টেনে ধরে। এস্তেবান—সে ছেলেবেলা থেকেই রুগ্ন, কিন্তু আসলে সে কবি, ইন্দ্রিয়লোলুপ শিল্পী, আর যার নথি ও সেরেস্তায় রুদ্ধশ্বাস চমকপ্রদ গদ্যে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে ক্যারিবিয়নের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের স্তব। সোফিয়া—প্রেমিকা ও প্রণয়ের লক্ষ্য—বালিকা ও নারী—দুইই একসঙ্গে, যার মমতা, আবেশ আর আদর্শ তার অন্তরঙ্গ আভ্যন্তর ঝলমল ক'রে তোলে—আবার ধ্বংসও ক'রে ফ্যালে। কার্পেন্তিয়েরে এখানে সেই কাজই করেছেন যা করতে চেয়েছিলেন স্তঁদাল—একটি-দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন একটা গোটা শতাব্দীর আততি ও অধিজ্যতা, ইতিহাসের সমূহ টানাপোড়েন। মুক্তিদাতা, স্বৈরাচারী ও বলি—এই তিন আদিরূপ জীবন্ত হ'য়ে ওঠে তাঁর রচনায়, ঠিক যেমনভাবে আমরা দেখেছিলাম 'এই মর্তের রাজত্ব'তে। নির্দিষ্ট ও সুবিশেষ কোনো অনুপুঙ্খ তাঁর রচনার গুণে হ'য়ে ওঠে ইতিহাসের কোনো বিশাল সংকটের স্পন্দমান অভিজ্ঞতা। যেমন, ধরা যাক, যে-ভূগোল নিয়ে সোফিয়া আর এস্তেবান খেলা করছিলো সে হ'য়ে ওঠে 'বাণিজ্য আর নাব্যতার এক প্রতীক' (এল্ সিম্বোলো দেল্ কোমের্সিয়ো ই লা নাভিগাসিওন)। পুরো উপন্যাসটিই আসলে ইওরোপের তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তির সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যান—যে-আলোক-প্রাপ্তি ভজিয়েছিলো উপনিবেশ ও গরীয়ান বর্বরের সংজ্ঞার্থ, যা সুগম ক'রে দিয়েছিলো সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের পথ। আর সেইজন্যেই উপন্যাস শুরু হয় বিশাল আকাশের তলায়, ক্যারিবিয়নের সমুদ্রের তীরে, নীহারিকার ঝকমকে আলোয়, গিলোটিন বসাবার বর্ণনায়—যার রক্তাপ্লুত ফলায় মাখামাখি হ'য়ে আছে বুর্জোয়া বিপ্লবের ব্যর্থতা। কার্পেন্তিয়ের সবসময় প্রেক্ষিত ধরিয়ে দেন পাঠককে, একাধিক যুযুধান প্রেক্ষিত, বহুস্তর, দ্বন্দ্বময়, বহু আয়তনময়, যার ফলে কোনো বৃহত্তর অভিজ্ঞতার শরিক হই আমরা।

১৯৬০-এ বেরিয়েছিলো 'বারোক কনসার্ট'—প্রাণখোলা, উচ্ছল, জমকালো—হাসিঠাট্টার যে-ফুলঝুরি উপন্যাসের ছোট্ট আয়তনটিকে মাতিয়ে রেখেছে, তা কিছুতেই পছন্দ হ'তো না ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের টেওডোর আডোরনোর, কেননা এ-উপন্যাসে কার্পেন্তিয়ের হো-হো ক'রে হেসে উঠে দেখিয়েছেন কেমন ক'রে নিগ্রো সংগীতের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার দখল ক'রে নিলো প্রতীচীর ধ্রুপদী সংগীতের প্রায়-অনড় স্থাবর

কাঠামো। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ আর দুঃসাহসী কৌতুকের ছাপ তাঁর সব লেখাতেই থাকে—কিন্তু 'বারোক কনসার্ট' যেন এক অফুরন্ত অট্টহাসির রোল। একদিন পশ্চিম খতম ক'রে দিতে চেয়েছিলো কালো মানুষের সংস্কৃতি, তার সংগীত, তার শিল্প—এখন কালো মানুষের সংগীত প্রতিশোধ নিয়েছে ইওরোপীয় ধ্রুপদী সংগীতে তার প্রবল প্রভাব ফেলে। অথচ, ঠিক তার আগে, ঐ বছরই, তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'পদ্ধতির পথ' (এল্ রেকুর্সো দেল মেতোদো)—যার বিষয়বস্তু ছিলো, আবারও, সেই ত্রিমূর্তির আদিরূপ: অত্যাচারী, বলি আর মুক্তিদাতার অবিভাজ্য প্রসঙ্গ। প্রতিটি অধ্যায় শুরু হয় দ্যকার্ং-এর 'পদ্ধতি বিষয়ক প্রস্তাব' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আর নাছোড় ঠাট্টা আর তিরস্কারে আবার তিনি খুলে দেখান আলোকপ্রাপ্তিকে, ইওরোপের ঐ 'বিখ্যাত' আলো চাপা দিয়ে রেখেছিলো কোন্ 'বর্বর' অন্ধকার। আর সেখানেই, ২০ পরিচ্ছেদে, আমাদের সঙ্গে দেখা হয় জওহরলাল নেহরুর, ট্রেনে চেপে তিনি চলেছেন ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্ব সম্মেলনে যোগ দিতে, সম্মেলন শুরু হবে পরদিন, ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে, ব্রাসেল্‌সে, যেখানে সভাপতি হবেন বার্‌বুস। লাতিন আমেরিকার এক ছাত্রনেতার সঙ্গে সেখানে ট্রেনে দেখা হ'লো। দেখা হ'লো কুবার হুলিও আন্তোনিও মেঝার আর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেহরুর। লাতিন আমেরিকী দুজন অনবরত-অবিশ্রাম কথা বলছিলেন, কোনো স্বৈরাচারীর উত্থানপতনের এই কাহিনীতে তাঁদের কথাবার্তা নতুন পথের সন্ধান করছিলো, তাঁরা কথা বলছিলেন পরদিনের অধিবেশন বিষয়ে, স্বৈরাচারী একনায়কদের বিষয়ে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী কর্মসূচি কী হবে সেই বিষয়ে। আমাদের শেষ উদ্ধৃতি খুবই ছোটো হবে, কিন্তু বুঝিয়ে দেবে কার্পেন্তিয়েরের পরিহাস কেমন মর্মভেদী ও সত্যবাদী, যে-কার্পেন্তিয়ের কুবার বিপ্লবের পরে, ফ্রান্‌সে কুবার রাষ্ট্রদূত হবার আগে, ভারতবর্ষে এসেছিলেন, এবং নেহরুর সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়েছিলো, কিন্তু মোক্ষমভাবেই তিনি লক্ষ্যভেদ করেন, যখন উপন্যাসে আমরা পড়ি:

> তাদের ওয়ালেট খুলে—দুটোই মেহিকোর তৈরি, বাইরে আস্‌টেক ক্যালেণ্ডার-আঁকা উঁচু ছাপে—তারা তাদের প্রবন্ধ ও প্রতিবেদনের খশড়া চালাচালি করলে, পথে পড়বার জন্যে। তাঁর কোণটিতে নেহরু—তাঁর হাঁটুর ওপর একতাড়া কাগজ বেছানো—মনে হচ্ছিলো তাঁর সুপ্রসার খোলা চোখের আড়ালে নিজের ভাবনায় তলিয়ে গেছেন; অনেকক্ষণের জন্যে নীরবতা

নামলো কামরায়। ট্রেন সীমান্তে পৌঁছুলো রাত্রে—ছ-পাল্লা রাত্রি—তার এক পাল্লা কয়লাখনির অন্ধকার।

'Cool, Cool,' বললেন নেহরু, অন্যেরা ঠিক বুঝতে পারলে না সত্যি-কী বলতে চাচ্ছেন তিনি, *Cool* না *Coal*—কিন্তু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটা সত্যি ঠাণ্ডা ছিলো, বিষম ঠাণ্ডাই—বিশেষত যারা গরম দেশ থেকে এসেছে, তাদের কাছে। আর তারপর সেই ভারতীয় তাঁর চোখ খোলা রেখেই ঘুমুতে লাগলেন, যতক্ষণ-না ট্রেন ব্রাসেল্স পৌঁছুলো।

—